

বনফুল

রচনাবলী ০১

বনফুল রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলকাতা-৭৩

সম্পাদনা :
ডঃ সরোজমোহন মিত্র
শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীনিরঞ্জন চক্রবর্তী
সহযোগী :
শ্রীশুভেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ-রূপায়ণ :
শ্রীশৈলেন শীল
শ্রীসমরেশ বসু

মুদ্রাকর :
শ্রীদুলালচন্দ্র ভুঞা
সুদীপ প্রিণ্টার্স
৪/১এ, সনাতন শীল লেন, কলকাতা-১২

প্রকাশক :
মুরলীধর ঘটক
গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড
১১এ, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

সূচীপত্র

উপন্যাস :

(১) তৃণখণ্ড ----- ----- 1 - 112

(২) বৈতরণী-তীরে ----- ----- 113 - 220

(৩) দ্বৈরথ ----- ----- 221 - 319

(৪) কিছুক্ষণ ----- ----- 320 - 444

গল্পগ্রন্থ :

বনফুলের গল্প ----- ----- 445 - 548

তৃণখণ্ড

তৃণখণ্ড

"বনফুল"

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মূল্য দেড় টাকা

প্রথম সংস্করণ—পৌষ ১৩৪২
পুনর্মুদ্রণ—মাঘ ১৩৪৭, অগ্রহায়ণ ১৩৫২

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২০. ১১. ৫২

শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম. বি.,
শ্রীযুক্ত চারুব্রত রায়, এম. বি.,

শ্রীচরণেষু

যাঁহারা নিজেরা "তৃণখণ্ড" হইয়াও এই 'তৃণখণ্ড'কে সংসার-সমুদ্রে ভাসমান করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিতেছি।

বলাই

"তারপর তুমি আবছা দেখিবে, দাঁড়ায়ে নদীর পাড়ে,
জলের তাড়নে একগাছি খড় দূরে চ'লে যায় ভেসে,
ভেসে চ'লে যায় পাগল ঢেউয়ের মুখে ;
বাড়াইয়া গলা দেখিবে, দেখিবে ক্রমে—
জলের রেখায় খড়ের রেখাটি লীন,
দেখিতে পাবে না আর।"

—সজনীকান্ত

কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। হাঁ, জ্বর বইকি। তাহাকে বসিয়া চিঠি লিখিতেছি। অন্যায়, তবু লিখিলাম। সে অপরের বাগ্‌দত্তা জানিয়াও আমার কাব্য-প্রেরণা কিছুমাত্র কমিতেছে না। জ্বরে প্রলাপ বকিতেছি।

মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি,
কি ক'রে প্রকাশ করিব বল না—কিছু না জানি,
গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি,
বুঝাব কি ক'রে সাগর-জলের জ্বালার বাণী ?
ঘরের কোণেতে বসিয়া যখন হারায় দিশা,
দিবসে যখন ঘনাইয়া আসে আঁধার নিশা,
হিমানীর বুকে জাগে হায় যবে অনল-তৃষা,
ভাষাও তখন নীরব হয় যে অবাক মানি।

ভাষায় কখনো সে কথা জীবনে যাবে না বলা,
তবু কি বোঝ নি ? বুঝিতে এখনও আছে কি বাকি ?
গভীর রাতের গহন আঁধারে, হে চঞ্চলা,
আমার প্রাণের প্রবল পরশ পাইলে না কি ?

তোমারি লাগিয়া একাকী জাগিয়া যে আকুলতা,
মদির মধুর নিবিড় নিথর যে নীরবতা,
গোপনে ও মনে কহে নি কি কোন নিগূঢ় কথা—
আঁখিতে তোমার দেয় নি কি কোন আবেশ আঁকি ?

আমারে স্মরিয়া শিহরি কখনো ওঠে নি তনু ?
স্বপনে কভু কি লুকায়ে তোমারে দিই নি দেখা ?
তোমার মনের মেঘেতে আঁকে না ইন্দ্রধনু—
আমার মনের তপ্ত তপন-কিরণ-রেখা ?
তোমারে ঘিরিয়া যত ফুল ফোটে আমার মনে,
সুরভি তাহার পাও নাকি তুমি সঙ্গোপনে ?
তোমার লাগিয়া যে কবিতা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
ছন্দ কি তার আজিও তোমার হয় নি শেখা ?

মনে হয় যেন আমার লাগিয়া উতলা প্রিয়া,
গাহ মনে মনে, "আমারি যে তুমি—নহ তো কারো" ;
বুকের বেদনা ঢেকেছ মুখের হাসিটি দিয়া,
আমারে ভুলিতে যত চাও তত ভুলিতে নারো।
আমারি মতন তোমারি মুখেতে ছলনাবাণী—
মনের ভিতর ঘনায়ে তুলেছে বেদনাখানি,
যতই আমারে সরাও দূরেতে আঘাত হানি,
মনের নিভৃতে ততই চাহিছ নিকটে আরো।

প্রেমেই পড়িয়াছি। অন্ধকার বন্ধ ঘরের জানালার ফুটা দিয়া কিরণ-রেখা প্রবেশ করিয়াছে। বন্ধ ঘরে আলোকস্বপ্ন।

সেই আলোক-রেখায় শত শত ধূলিকণার উন্মাদ আবর্তন, বাসনার কলুষ। তবু তাহা আলো। শরাহত পশুর ন্যায় অন্ধকার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছি। মৃত্যুর।

ডাক্তারবাবু!

চমকাইয়া উঠিলাম।—কে? ভেতরে আসুন।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, একটু কষ্ট দিতে এলাম। দেখুন ডাক্তারবাবু, কয়েক দিন থেকে আমার স্ত্রীর কেমন মাথা গোলমাল হয়ে গেছে। পাশের বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে এই ব্যাপার মশাই।

কি রকম?

বেশ ভাল মানুষ—যাত্রা শুনতে গেল। রাত এগারোটা নাগাদ ফিরে এল—একটি বদ্ধ উন্মাদ। এসেই বললে, আমার নন্দদুলালা? কই, আমার নন্দদুলালা?—ব'লেই গান। সেই থেকে মশাই এক-নাগাড়ে চলছে। আর তো পেরে উঠছি না। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।

কোথায় আছেন তিনি?

বাইরে গাড়িতে ব'সে আছেন। আনব?

আসুন।

আসিলেন একটি যুবতী। আলুলায়িত কেশ, অবিন্যস্ত বেশবাস, চোখে উদাস দৃষ্টি। আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমায় ডেকেছেন কেন? আপনি ডাকছেন আমায়?

বলিলাম, হ্যাঁ, বসুন ওইখানে।

নিকটস্থ চেয়ারটায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

কেন ডেকেছেন আমায়—বলুন না?

আপনার কি হয়েছে? এমন করছেন কেন?

খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, কই, কিছু হয় নি তো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আপনার স্বামী যে বলছেন, আপনি বাড়িতে মহা উৎপাত আরম্ভ করেছেন। নন্দদুলাল কে?

নন্দদুলালের গান শুনবেন? শোনেন নি আপনি?—বলিয়াই—

কোথায় আমার নন্দদুলাল
কোথা রে তুই ননীচোরা?—

হঠাৎ আবার গান বন্ধ হইয়া গেল।

আসবে খোকা আমার কাছে? এস।

ফিরিয়া দেখিলাম, পাশের বাড়ির হরিশবাবুর ছোট খোকাটিকে কোলে করিয়া ঝি দাঁড়াইয়া আছে। খোকাটির

তিন দিন হইতে জ্বর, আমাকে রোজ দেখাইতে লইয়া আসে।

এস না, কেমন পুতুল দোব তোমাকে। এস আমার কাছে। আসবি না—তবে রে দুষ্টু—

বলিয়া উন্মাদিনী হঠাৎ উঠিয়া ছোঁ মারিয়া খোকাকে কাড়িয়া লইয়া প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল। খোকা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, ঝি হৈ-রৈ তুলিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকাকে উদ্ধার করিলাম। তরুণীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, আমার কাছে কোন খোকাই আসে না। কেউ আসে না। কেন, বলুন না?

রমণীটির পরীক্ষা-কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলাম। তাহার পর স্বামীটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করা প্রয়োজন বুঝিলাম।

কতদিন পূর্ব্বে আপনার 'গনোরিয়া' হয়েছিল।

লোকটা থতমত খাইল, কিন্তু সত্য কথাই বলিল, দশ বছর আগে; তখন আমার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।

ছেলেপিলে হয় নি?

একটি হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, আর হয় নি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার স্ত্রীর সর্ব্বাঙ্গে কালো কালো দাগ দেখলাম—চাবুকের দাগের মত। মেরেছেন নাকি?

ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হ্যাঁ, দু-চার ঘা দিয়েছিলাম একদিন। বন্ধু-বান্ধবেরা সব বললেন কিনা যে, ওসব ন্যাকামির এক-মাত্র ওষুধ প্রহার। তাই একটু, এমন বেশি কিছু নয়—অর্থাৎ—

আচ্ছা, আর মারধোর করবেন না। এখন শুনুন। আপনার স্ত্রীর ছেলেপিলে না হ'লে অসুখ সারবে না; ছেলেপিলেও যে হবে, তারও সম্ভাবনা অল্প। তবু চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। আপনার নাম কি?

পাঁচুগোপাল বসাক।

ব্যবস্থাপত্র দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে না করিতেই প্রতিবেশী হরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত।

কি হয়েছিল মশাই? একটা পাগলী নাকি খোকাকে গলা টিপে ধরেছিল?

তাঁহাকে সব বুঝাইয়া বলিলাম।

তিনি বলিলেন, যাক, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আপনি একবার ছেলেটাকে দেখে যাবেন। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।

আচ্ছা। গ্লুকোজটা খাওয়াচ্ছেন তো?

ওটা এখনও কেনাই হয় নি, না হয় আজ কিনেই আনি,—বুঝতেই তো পারছেন ডাক্তারবাবু, এই অল্প মাইনেতে সাত-আটটি ছেলেপিলে নিয়ে—তবু আপনাদের পাঁচজনের দয়া

আছে ব'লে টিকে আছি। আপনি একবার দয়া ক'রে দেখে যাবেন। আনছি আজই গ্লুকোজ।

আচ্ছা।

হরিশবাবু চলিয়া গেলেন। গরিব মানুষ, কাচ্চাবাচ্চা লইয়া বিব্রত। অথচ সেদিন পর্য্যন্ত Viriligen ইন্‌জেক্‌শন লইবার জন্য ঝুলোঝুলি করিয়াছেন। আশ্চর্য্য মানুষের মন! আমার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখি, আর বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই।

ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত গোঁড়া ছিলাম। আমার স্টোভে একটি ছেলে মুর্গীর ডিম সিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া স্টোভ ফেলিয়া দিই। আজ তো মুর্গীর মাংস না হইলে চলেই না। এমন কি গোমাংসেও আপত্তি নাই। মানুষের অহরহ বিবর্ত্তন! আজকের আমি, দশ বৎসর কেন, কয়েক মাস পরেই আর একজন লোক হইয়া যাইব। স্কুল, কলেজ, ধর্ম্ম, হিতোপদেশ, সকলে সমস্বরে শিখাইল—পরস্ত্রী জননীবৎ। অথচ সেই পরস্ত্রীর প্রেমেই তো পড়িয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বেও কি ইহা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? ছিল না। আপনারা হাসিতেছেন তো? হাসিবেন না। পরস্ত্রী নয়। তবে স্ত্রী বটে। আমার সমস্ত সত্তাকে সে পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজমান, অথচ—যাক, বর্ণনা করিব না। আমি ডাক্তার, আমি কবিও। আমার জীবন-কাহিনী যদি শুনিতে চান, তবে আমার কবিতাও পড়িতে হইবে। তাহাই আমার জীবনের সত্য প্রকাশ।

ডাক্তারবাবু !

কে ? ভেতরে আসুন

২

চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। নদীর উপর নৌকায় চলিয়াছি। দূর গ্রামে কোন গৃহস্থ তাঁহার একমাত্র পুত্রের অসুখে বিপন্ন। সুতরাং আমাকেও খানিকটা বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

নিবিড় অন্ধকারে নদীর ভাষা শুনিতেছি। বেগবতী তরঙ্গিণীর ভাষা—চলন্ত স্রোতের কলকল-ধ্বনি। ধীরে ধীরে সে আমার কাছে আসিয়া বসিল। কোন কথা নাই। নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, স্রোত কথা কহিতেছে, সময় বহিয়া চলিয়াছে। শতাব্দী পার হইয়া গেল, তাহার স্পর্শ যেন অনুভব করিতেছি। সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ। মনের কানায় কানায় কান্না জমিয়া উঠিতেছে। এই যে মধুর বেদনাময় অনুভূতি, ইহার ভাষা কোথায়? ছন্দে ছন্দে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে—

অন্ধকারে আঁখি মুদি দেখিতেছি তাহার স্বরূপ,
নাহি কোন ছদ্মবেশ আর ;
নয়ন-সম্মুখে তার সত্যমূর্ত্তি জাগে অপরূপ,
আলো তারে দিল অন্ধকার।

দিবসের আলো যেন আড়াল করিয়াছিল তারে,
ছলনায়, লোক-ভয়ে, ছোট বড় শত মিথ্যাচারে;
আবরিয়া রেখেছিল আপনার নিগূঢ় আত্মারে,
স্পর্শ যেন পাইতেছি তার।
দিবসে বলেছে যাহা চুপিচুপি এসে অন্ধকারে,
করিতেছে তাহা অস্বীকার।

তাহার সেই অস্বীকারের ভাষা শুনিতেছি। সে যেন বলিতেছে, দিবালোকে আমি তো তোমার কেহ নই। আমি তখন পৃথিবীর, আমি সমাজের। কিন্তু এ গভীর গহন অন্ধকার রাত্রে—

ওগো তুমি বল কে গো—ওগো মোর অন্তর-শায়িতা,
বৃথা কেন কাল নষ্ট কর,
দিবসের তীব্রালোকে অনায়াসে রহি লুক্কায়িতা
অন্ধকারে হও স্পষ্টতর।

তাহার নিশ্বাসের স্পর্শ যেন গায়ে লাগিতেছে। তাহার চুল আমার সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল।

আকাশ-কুসুম যাহা দিবসের সুতীব্র আলোকে,
অন্ধকারে তারি মালা গাঁথি আমি স্বপ্নাতুর চোখে;
সুনিবিড় তমিস্রায় ধরা দাও, বুঝিবে না লোকে
অপরূপ কি যে মূর্ত্তি ধর।
দিবসে হারায়ে ফেলি, খুঁজে ফিরি বাণীহীন শোকে—
আপনারে কোথায় সংহর।

২

অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র—অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়া জ্বলিতেছে। অন্ধকার যেন বলিতেছে, আমাকে উপেক্ষা করিও না, আমি আছি বলিয়াই তোমরা জ্বলিতেছ; দিবসে তোমরা কোথায় থাক? আমার নিবিড়তায় তোমাদের প্রকাশ।

"তুমি মিথ্যা, তুমি মোহ"—দিবসের এ তীব্র-ভাষণ
বিজ্ঞানের নানা যুক্তি বহে,
অন্ধকারে ভেসে যায় বিজ্ঞতার সকল শাসন,
অন্ধকার কহে, নহে নহে।
অন্ধকারে প্রিয়া সে যে মোর লাগি আকুলা উন্মনা,
বাহুভরা আলিঙ্গনে, উন্মাদিনী, অজস্র-চুম্বনা,
অলস রভস-ভরে শ্রুতিমূলে প্রণয়-গুঞ্জনা,
অকারণে কত কি যে কহে!
আবার দিবস আসে—মিলাইয়া যায় সে মূর্চ্ছনা,
আঁধার প্রতীক্ষা করি রহে।

সমস্ত অন্তর ভরিয়া হে অন্ধকার, তোমাকে নমস্কার করি। হে নক্ষত্র প্রকাশক, হে অনন্ত, অখণ্ড, তোমায় প্রণাম করি। স্বপ্ন-সাগরের নাবিক তুমি, অসম্ভবকে সম্ভব কর, সুদূরকে নিকটে আন, অন্তরকে বাহিরে লইয়া যাও। তুমি মহৎ, তুমি স্নিগ্ধ, তুমি নীরব। তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর। কিন্তু একটু পরে তো আর তুমি থাকিবে না। আলোকের রথ-ঘর্ঘরধ্বনি যে শোনা যাইতেছে। সেই মুখর,

সেই স্পষ্ট, সত্যবাদী কর্ম্মী, সে তো আসিল বলিয়া। তখন তুমি কোথায় আত্মগোপন কর? তখন তোমার এ স্নিগ্ধ কান্তি কোথায় লুকাইয়া রাখ? তাহার নিশ্বাসের বেগ বাড়িতেছে। তাহার আলিঙ্গন যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। আলুলায়িত কেশবাস সম্বরণ করিয়া সে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল। "আর একটু থাক।" তাহার তনুর গন্ধে আমার স্বপ্ন মদির। সে চলিয়া গেল।

কেবা সত্য, কেবা মিথ্যা—কে বলিয়া দিবে মোরে কহ,
দিবস, না গভীর আঁধার?
যুক্তি কভু মুক্তি দেয়? চিত্ত মোর ভাবে অহরহ,
উদ্বেলিছে প্রশ্নের পাথার।
সে পাথারে একখানি ভাসিতেছে দুঃসাহসী তরী,
তোমারে পাওয়ার আশা দুলিতেছে শিহরি শিহরি,
এ জীবনে হাসিয়াছি বহুদিন মন-প্রাণ ভরি,
বাকি আছে এখনো কাঁদার—
অসম্ভব সাধনায় পূর্ণ করি দিবা-বিভাবরী
বাকি আছে দুঃসাধ্য সাধার।

বাবু, একটু উঠতে হবে।—মাঝি আসিয়া বলিল।

কেন?

একটা মড়া এসে নৌকোটাতে ঠেকেছে।

উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। মড়াই বটে—একটা স্ত্রী-লোকের। চুলগুলা ভাসিতেছে। ঠোঁট এবং গালের খানিকটায় মাংস নাই। বীভৎস হাসি হাসিতেছে।

যাঁহাদের বাড়ি যাইতেছিলাম, তাঁহারা লোকজন লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া ঘাটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি নামিবামাত্রই রোগীর পিতা নয়নবাবু আসিয়া আমার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, একটু পা চালিয়ে যেতে হবে ডাক্তারবাবু, বড় বেশি বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে সন্ধ্যে থেকে।

পা চালাইয়া চলিলাম।

কদিন থেকে অসুখ?

আজ আট দিন।

ইতিপূর্ব্বে কে দেখছিলেন?

অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আমাদের ধাতে সয় না ব'লে হোমিওপ্যাথি করছিলাম, কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি দেখে আজ আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

ও।

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রোগীর ঘরে গেলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—ডবল নিউমোনিয়া। অবস্থা খুব সঙ্গিন। রাত কাটিবে না। রোগী প্রলাপ বকিতেছে—

কচাকচ কেটে ফেলছে—দেখতে পাচ্ছ না তুমি? উঃ,

কত রক্ত! আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে, ওই আর একটা মুণ্ডু পড়ল, থানায় খবর দেওয়া চাই—চল চল—আঃ—

বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ পিতাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তা হ'লে আজ রাতটা আপনি থেকে যান ডাক্তারবাবু, আপনার ফীস্ যা লাগে, তা আমি দোব। আমি যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমার থাকা বৃথা, ততই তাঁহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে থাকিতে হইল। তখন তাঁহাদের বলিলাম, তা হ'লে এক কাজ করুন। আজ সমস্ত রাত ওঁর কাছে একজনের থাকা দরকার। আপনারা পালা ক'রে সেটা করুন। আমি পাশের ঘরেই কোথাও থাকব, মাঝে মাঝে দেখে যাব। কজন আছেন আপনারা?

আমি, মহিন্দর, বউমা আর আমার স্ত্রী। গোড়ার দিকটায় না হয় বউমাই থাকুন। আমার স্ত্রীর আবার যা মাথা ধরেছে, সেখানে আবার একজনের থাকা দরকার। তাঁকেও একবারটি দেখুন না হয়। গেরো কি এক রকম ডাক্তারবাবু?

দেখিলাম তাঁহার স্ত্রীকে। ষোড়শী যুবতী। তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীরা সাধারণত যাহা হইয়া থাকেন তাহাই। মাথাধরার যে ঔষধই দিই না কেন, সারিবে না। এক বড়ি অ্যাস্‌পিরিন খাইয়া ঘুমাইতে বলিয়া বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিতে হইল, উনি বড় কাতর রয়েছেন, আপনি এইখানেই থাকুন। আপনাকে যদি দরকার হয়, খবর দোব এখন।

তখন আসিয়া আসল রোগীর ব্যবস্থাদি করিলাম, ইন্‌জেক্‌শন দিলাম। মাথার শিয়রে দেখি, তাঁহার স্ত্রী বসিয়া জলপটি দিতেছে। মহিন্দর অর্থাৎ ছেলের পিসামহাশয় নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, ডাক্তারবাবু, চলুন এইবার, একটু যা হোক মুখে দেবেন। আপনি চা খান কি?

হ্যাঁ, খাই বইকি।

বাহিরের বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে শুনিলাম, রোগী প্রলাপ বকিয়া চলিয়াছে, ধর ধর— আহাহা—আউট হয়ে গেল—আজকাল নরেনটা কিচ্ছু খেলতে পারে না। এই, একটা বিড়ি দে তো—ওরে— আহাহা—

বাহিরের ঘরে আমি আর মহিন্দর।

মহিন্দর বলিতেছে, হাড়-কেপ্পন মশাই। আমি না এসে পড়লে কি আপনাকে ডাকত নাকি?

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, এসেই বা আর বিশেষ কি করলাম! ওর তো জীবনের কোন আশা দেখি না।

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিসামহাশয় বলিলেন, আহা, তাতে আপনার আর দোষ কি? গোড়া থেকে যদি দেখতেন, তা হ'লেও বা একটা কথা ছিল! হাড়-কেপ্পন

মশাই, চেনেন না আপনি ওকে। আমি আফিংখোর মানুষ, তোর ছেলের অসুখ শুনে দৌড়ে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, এক ফোঁটা দুধ এসে-ইস্তক পেটে পড়ে নি। চামার—চামার।

প্রসঙ্গ ফিরাইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেটি করেন কি?

করবে আবার কি—বি. এ. ফেল ক'রে বিয়ে করেছে, এই মাস-ছয়েক মাত্র হ'ল। ওর ভাবনাই বা কি বলুন—বাপের এক ছেলে, নগদ টাকা, তেজারতি, বিষয়-আশয় যথেষ্ট। তবে অংশীদার জুটতেও পারে। বাপের চেষ্টার ত্রুটি নেই। পটাপট বিয়েই ক'রে চলেছে। প্রথম বউটা মোলো বেঘোরে, বিনা চিকিৎসায়। দ্বিতীয়টা গেল সর্পাঘাতে, সেও প্রায় বেঘোরে। এইবার এইটেকে ধরেছে—দেখা যাক। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া আবার মহিন্দর বলিল, হাড়-কেপ্পন, চামার—চামার। আমি আফিংখোর লোক, এক ফোঁটা দুধ দিতে ওর বুক ফেটে যায়।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করিবার আর একবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, আপনি বসুন একটু, দেখে আসি ও-ঘরে একবার।

হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম—দেড়টা।

পাশের ঘরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। শ্বাস উঠিয়াছে। বধূ পাশে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতে তখনও পাখাটি ধরা। সমস্ত মুখে গভীর পরিশ্রান্তি। সিঁথির সিঁদুরে আগুন জ্বলিতেছে। তাহাকে আর উঠাইলাম না। ব্যাগ হইতে একটা ইন্‌জেক্‌শন বাহির করিয়া দিতে যাইব, এমন সময় সব শেষ হইয়া গেল। মহিন্দরকে খবর দিলাম। সে আসিয়া বলিল, যাক। ওর ছেলে কি কখনও বাঁচে! এখানে ওটা ঢাকা রয়েছে কি?

আমি বলিলাম, দুধ বোধ হয়।

এঁটো না কি?

না, এঁটো নয় বোধ হয়।

তবে আর এটা কেন নষ্ট হয়?—এই বলিয়া মহিন্দর সেই মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইয়া লোভী শিশুর মত ঢকঢক করিয়া দুধটা খাইয়া ফেলিল।

বধূর ঘুম ভাঙিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি জড়সড় হইয়া উঠিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। এখনও বেচারা জানে না!

ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। আমি বাহিরের ঘরে অপরাধীর মত বসিয়া আছি। পিসামশাই আসিয়া ফীসের টাকাটা হাতে দিলেন। বলিলেন, বাজিয়ে নিন মশাই—ও যা চামার, হয়তো সবগুলোই খারাপ দিয়েছে।

আবার নৌকায় চড়িয়া ফিরিতেছি। আকাশে আলো ফুটিতেছে। আমার অন্তরলোক-বাসিনীরও ঘুম ভাঙিল।

সে হাসিয়া আমার পানে চাহিল। আমার মন কিন্তু তখন বিষণ্ণ। সামান্য হাসিলাম মাত্র।

নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নৌকা হইতে নামিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, কাল সন্ধ্যে থেকে আপনার খোঁজ করছি।

ভদ্রলোককে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিতে হইল, আপনি কোথায় থাকেন ?

আমি এখানে থাকি না। দু-চার দিনের জন্যে চেঞ্জে এসেছি।

ও।

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকের বয়স যদিও পঁয়তাল্লিশের উপর, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে তাদৃশ গাম্ভীর্য্য নাই, বরং শৌখিনতাই বেশি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দরকার ?

আমাদের বাড়ি একবার যেতে হবে, আমার ভাগ্নেটির তিন-চার দিন থেকে জ্বর হয়েছে। বাড়িতে আর অন্য লোকও কেউ নেই। আপনি একবার যাবেন ? ঘোষপাড়ার লাল বাড়িটাতে আছি আমরা।

আচ্ছা, যাব।

ঘোষপাড়ার লাল বাড়িতে গেলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাণকৃষ্ণবাবু, দেখিলাম, দাঁড়াইয়া আছেন। ভিতরে গেলাম, তাঁহার ভাগিনেয়কে দেখিলাম, ব্যবস্থাদিও করিলাম। প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একবার লক্ষ্য করিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু জানালা দিয়া পাশের বাড়ির ছাদের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন, এবং তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটি মেয়ে ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে আসিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে, মেয়েটি নির্বিকার, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু মুগ্ধ।

ভাগিনেয়, দেখিলাম, স-জ্বর অবস্থাতে মুচকি মুচকি হাসিতেছে। ব্যাপার কি?

হঠাৎ প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিয়া উঠিলেন, ওঃ!

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল?

না, কিছু নয়। তা আপনাকে বলতে বাধাই বা কি থাকতে পারে? এ এক বিপদ হ'ল দেখছি। চলুন বাইরের ঘরে।

বাহিরের ঘরে গেলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, মশাই, বিপদ কি এক রকম! পাশের বাড়ির ছাদে যে মেয়েটি দেখলেন—দেখেন নি?

হ্যাঁ, দেখলাম বটে একটি মেয়েকে।

ভদ্রলোক তখন আমার কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া অতি চুপিচুপি বলিলেন, মেয়েটি আমার প্রেমে পড়েছে। Hopelessly in love.

বলেন কি! কেমন ক'রে বুঝলেন?

আমি ওঘরে গেলেই ঠিক ছাদে আসবে। মুখচোখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে আমাকে দেখলেই।

কি আর বলিব! একটু হাসিলাম মাত্র।

এমন সময় শ্যামবর্ণ মোটাসোটা একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, আসুন, সনাতনবাবু, এই যে, ডাক্তারবাবু এসেছেন। সনাতনবাবুই আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। আপনাদের আলাপ-পরিচয় আছে নিশ্চয়ই।

আলাপ-পরিচয় ছিল না। তবু সনাতনবাবুকে নমস্কার করিলাম।

সনাতনবাবু বলিলেন, কেমন দেখলেন প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগ্নেকে? জ্বরটা কি ব'লে মনে হয়?

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, বিশেষ কিছুই বুঝিলাম না। আন্দাজে ম্যালেরিয়ার ঔষধ দিয়াছি। রোগীর এবং আমার যদি কপাল ভাল হয়, উহাতেই সারিয়া যাইবে।

কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজনের কাছে সরল সত্য কথা বলা চলে না, অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। বলিলাম, রেমিটেণ্ট-গোছের মনে হচ্ছে। তবে কুইনিনটা গোড়ায় গোড়ায় একটু দিয়ে রাখা ভাল। দিন-দুয়েক দিয়ে দেখা যাক। সনাতনবাবু দেখিলাম, অত সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার diagnosis কি?

সে তো আর একদিনে চট ক'রে বলা চলে না। রক্তটা পরীক্ষা করলে হয়তো ধরা যেতে পারে।

সনাতনবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন। বলিলেন, আজকাল আপনাদের ওই হয়েছে এক ফ্যাশান। অমুক পরীক্ষা কর, তমুক পরীক্ষা কর! সেকালের সব ডাক্তাররা কিন্তু এসবের ধার ধারতেন না। ছিলেন আমাদের হেমন্ত ডাক্তার। ইত্যাদি অনর্গল বলিয়া গেলেন।

হেমন্ত ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া পেটে টিউমার হইয়াছে বুঝিতে পারিতেন। রমেশ ডাক্তার রোগীর ফোটো দেখিয়া তাহার জ্বর আছে কি না বুঝিতেন। বিশ্বম্ভর ডাক্তার, পতিত কবিরাজ, হরিকিশোর কম্পাউণ্ডার, সকলেই চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমাদের অপেক্ষা বেশি পারদর্শী ছিলেন বুঝিলাম।

হাসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, এঁদের মতন কি আমরা পারি? আমাদের এর বেশি আর বিদ্যে নেই।

সনাতনবাবু যেন একটু প্রসন্ন হইলেন।

বলিলেন, সেকালের সব ব্যাপারই ছিল আলদা রকমের। খেতে পারতাম কত আমরা! ভরপেট খাওয়ার পর অবলীলা-ক্রমে দু সের সন্দেশ, দশ-বারোটা ল্যাংড়া আম কতবার খেয়েছি। গোটা পাঁঠা পারেন খেতে একটা?

স্বীকার করিতে হইল, পারি না।

তবে?

ইহার কোন্ সদুত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ

সনাতনবাবু বুকের পেশী ও হাতের গুলি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন, এখনও ব্যাপারখানা দেখুন। দেখিলাম, ভদ্রলোক পেশীবহুল সন্দেহ নাই। সনাতনবাবুর বয়স অন্তত ষাটের কাছাকাছি; এ বয়সের হিসাবে শরীরে বাঁধন আছে স্বীকার করিতেই হইবে।

আমার একবার নাড়ীটা দেখুন তো।

সনাতনবাবুর নাড়ী দেখিলাম। মনে হইল, যেন high blood pressure; বলিলাম। শুনিয়া সনাতনবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওটাও একটা আজকালকার ফ্যাশান, হাই ব্লড প্রেশার!

এমন সময় প্রাণকৃষ্ণবাবু আড়ালে লইয়া গিয়া সনাতনবাবুকে কি বলিতে লাগিলেন। একটু পরে আবার দুইজনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

সনাতনবাবু ছাদটার পানে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তাই নাকি? আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে, বিচিত্র নয় কিছুই।

বুঝিলাম, প্রাণকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। লোকটা পাগল নাকি? দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সবে ঘুমটি আসিয়াছে।

রাত্রি কত হইয়াছে বলা শক্ত। হাত-ঘড়িটা বন্ধ।

ডাক্তারবাবু!

ধড়মড় করিয়া উঠিলাম। বাহিরে গিয়া দেখি, লণ্ঠন-হাতে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে।

কি চান?

শিগগির একবার চলুন সনাতনবাবুর বাড়ি।

কেন, কি হ'ল?

তিনি পাইখানা থেকে এসে কেমন করছেন। শুয়ে পড়েছেন।

পদগতিতে যতটা দ্রুত যাওয়া সম্ভব, গেলাম। গিয়া দেখি, সনাতনবাবু আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। শিয়রে বসিয়া স্ত্রী আকুলভাবে বাতাস করিয়া চলিয়াছেন।

সনাতনবাবু, দেখি একবার আপনার হাতটা?

কোন উত্তর নাই।

আবরণ উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, মারা গিয়াছেন।

পেশীবহুল দেহ ঠিকই আছে। প্রাণ নাই।

অ্যাপপ্লেক্সি।

ফিরিয়া আসিতেছিলাম; একাই।

হঠাৎ একটা অন্ধকার গলির ভিতর হইতে কে ডাকিল, ডাক্তারবাবু নাকি?

কে ?

দেখি, গলি হইতে বাহির হইলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু।

আপনার টর্চটা একবার দিন তো ডাক্তারবাবু।

কেন, ব্যাপার কি ?

চুপিচুপি প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, এই সন্ধ্যের সময় ওই গলিটার ভেতর—সেই মেয়েটা কাগজের মত কি একটা যেন ফেললে। ঠিক লভ লেটার। দেখিলাম, গলিটা সেই ছাদ ও প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ির ঠিক মাঝখানে। কৌতূহল হইল। টর্চ লইয়া গেলাম গলির ভিতর।

সেখানে নানাবিধ আবর্জ্জনা। তাহার মধ্যে একটা সাদা কাগজের মত কি রহিয়াছে দেখিলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া তাহা লইয়া আসিলেন। কাগজে মোড়া কি একটা যেন !

খুলিয়া দেখা গেল, কতকগুলি চুল।

মেয়েরা প্রসাধন-শেষে মাথার ওঠা-চুলগুলি অনেক সময় কাগজে মুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়, তাহাই।

দেখছেন ডাক্তারবাবু ?

হ্যাঁ, চিঠি কই, ও তো চুল, ফেলে দিন।

বড় বেরসিক লোক আপনি। ইংরেজী নভেলে পড়েন নি আপনি, মেয়েরা তাদের প্রণয়ীকে চুল উপহার দেয় ? এ তাই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রাণকৃষ্ণবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, চোখে পাগলের দৃষ্টি।

ঠিক তো, পাগলই।

ঘরে শক্ত ব্যারাম, আর এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাত্রি দ্বিপ্রহরে গলির মধ্যে প্রণয়-নিদর্শন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মনে পড়িল, এই রকম পাগলদের কথা পড়িয়াছিলাম বটে। একজনকে দেখিয়াছিলামও, তাঁহার ধারণা সম্রাট পঞ্চম জর্জ গোপনে তাঁহার নিকট টাকা কর্জ্জ লইয়া শোধ দিতেছেন না। অন্য সব বিষয়ে ইঁহারা সাধারণ লোকের মতই। কিন্তু একটি কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁহারা পাগল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। ইঁহার ধারণা, মেয়েরা দেখিবামাত্র ইঁহার প্রেমে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাগ্নে কেমন আছে ?

চুলগুলি সযত্নে বুকপকেটে রাখিতে রাখিতে প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, সমস্ত দিন ওই বিদ্যেধরীর জ্বালায় কি আর অন্য কিছু করবার অবসর পেয়েছি! বার-পাঁচেক ছাদে এসেছে, জানলাতেও তিনবার উঁকি দিয়েছে। জ্বালাতনে পড়া গেছে।

পাগলের সহিত আর কতক্ষণ বকিব !

বলিলাম, আচ্ছা, বাড়ি যান।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় আবার শুইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবুকে পাগল বলিতেছি, আমি নিজে কি তাই নয় ? যাহার হাসি, ছলনা, লজ্জা লইয়া আমি

স্বপ্নের প্রাসাদ রচনা করিয়াছি, সে হয়তো আমাকে মোটেই ভালবাসে না। ওই ছাদের মেয়েটির মতই হয়তো সে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, আমি প্রাণকৃষ্ণবাবুর মত অন্ধকার গলিতে বৃথাই ঘুরিয়া মরিতেছি।

নিবিড় বর্ষা নামিয়াছে।

সকালে উঠিয়া অবধি দেখিতেছি, আকাশে বাতাসে বর্ষার আয়োজন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, আকাশের গুরু গুরু ডাক। উঠানে কদম্বগাছটায় অসংখ্য ফুল। হাতে কোন কাজকর্ম্ম নাই, একটিও রোগীর দেখা নাই। ভজুয়া চাকরটাকে কাল ছুটি দিয়াছি, এখনও পর্য্যন্ত সে আসিল না।

অলসভাবে বিছানায় বসিয়া বর্ষা-সমারোহ দেখিতেছি।

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"—মনে পড়িতেছে। আজ আষাঢ় মাসের তেসরা, এবং আরও অনেক অমিল আছে, কিন্তু মিলও যে প্রচুর। বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

আজিকে যদিও সখী, আষাঢ়ের তৃতীয় দিবস,
এবং যদিও নাম মোর
নহে কবি কালিদাস, নহি উজ্জয়িনীবাসী,
তবু আজি এই ঘন ঘোর
সুনিবিড় বরষার সুবিপুল আয়োজন—

ডাক্তারবাবু!

ভেতরে আসুন।

আসিলেন পিওন—হস্তে একটি টেলিগ্রাম।

৩

Come sharp. Nagen seriously ill.

সুতরাং সমস্ত কবিত্বকে শিকায় তুলিয়া নগেনের ব্যাপারে মগ্ন হইতে হইল। আমরা স্বাধীন ব্যবসা করি কিনা! নগেন, জাতিতে বেহারী ব্রাহ্মণ, আমার বন্ধু—বিশিষ্ট বন্ধু।

তথাপি আমাকে ফী দেয়। দুই-এক বার না লইবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে আন্তরিক অস্বস্তি বোধ করে। চিরকাল তাহার যুক্তিটা এইরূপ যে, ইহা তোমার ব্যবসায়। আমি তোমার বন্ধু বলিয়াই বিশেষ করিয়া তোমাকে ফী দেওয়া কর্ত্তব্য, কারণ আমি তাহা দিতে এখনও সক্ষম। যখন অক্ষম হইব, তখন না হয় তোমার উপর দাবি করিব। এখন কেন? বলিবার কিছু নাই। নগেন থাকে মতিহারীতে। ট্রেনে করিয়া যাইতে হইবে। তিনবার পথে চেঞ্জ। এই বিপুল বর্ষা! কিন্তু নগেনের অসুখ। যাইতেই হইবে; অন্য কোন উপায় নাই।

মুষলধারা।

স্টেশন অভিমুখে চলিয়াছি। গাড়ির ঘোড়া দুইটি যেন আর টানিতে পারিতেছে না—পথে এত কাদা। গাড়োয়ান ঘোড়ার পৃষ্ঠে অবিরাম চাবুক বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। গতি কিন্তু বাড়িতেছে না, আবার চাবুক।

ওরে, আর মারিস না।

ট্রেনের আর বেশি সময় যে নেই ডাক্তারবাবু।

হ্যাঁ, তা বটে।

ঘড়ি দেখিলাম, ট্রেন ছাড়িতে আর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বাকি আছে। পথও প্রায় মাইল-দেড়েক বাকি। টিকিট করিতে হইবে। সুতরাং ঘোড়ার প্রতি সহানুভূতি চলে না। বলিলাম, হাঁকিয়ে চল্ তা হ'লে।

আবার চাবুক চলিতে লাগিল।

কিছুদূর গিয়া একটা সাঁকো। সাধারণ কাঁচা রাস্তায় যেমন সাঁকো থাকে, সেই রকম। আমার গাড়ি যখন সেই সাঁকোর উপর উঠিল, তখন মনে হইল, যেন একজন লোক পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতে গিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

ওরে, থাম্ থাম্। দেখ্ তো, নীচে কে প'ড়ে গেল যেন। গাড়োয়ান কর্দ্দমাক্ত এক ভদ্রলোককে তুলিয়া আনিল। ঠোঁটের খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত।

প্রাণকৃষ্ণবাবু।

আপনি কোথা যাচ্ছিলেন এই বৃষ্টিতে? আসুন, গাড়ির ভেতরে বসুন। কোথাও যাবেন নাকি?

প্রাণকৃষ্ণবাবু হাঁপাইতেছিলেন। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, এই একবার স্টেশনে যাচ্ছিলাম। সেই মেয়েটি এই ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে কিনা। শেষ দেখাটা দিয়ে আসা কর্ত্তব্য নয়?—বলিয়া হাসিতে লাগিলন। ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। হাসি আর রক্ত একাকার হইয়া গেল।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া গাড়িতে বসিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সেই মুষলধার বৃষ্টিতে প্রাণকৃষ্ণবাবু সমস্ত প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, প্রতি জানালায় খুঁজিতেছেন। কই, কেহ তো মুখ বাড়াইয়া বসিয়া নাই!

হঠাৎ মেয়েদের গাড়ির কাছে গিয়া হাতলটা ঘুরাইতেই একজন রেলওয়ে কর্ম্মচারী তাঁহাকে বাধা দিল, ওটা মেয়েদের গাড়ি। স'রে যান, ট্রেন ছাড়ছে।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, ওষ্ঠ বাহিয়া রক্তধারা পড়িতেছে।

গাড়ি বাহিরের সমস্ত দুর্য্যোগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অগণিত মাঠ-বন-নদী-পর্ব্বত পার হইয়া যাইতেছে। একা একটি কামরায় বসিয়া আছি। প্রাণকৃষ্ণবাবুর কথা ভাবিতেছি। আহা, মানুষ কত অসহায়!

প্রাণকৃষ্ণবাবুর মুখটা বার বার মনে পড়িতেছে।

চতুর্দ্দিকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ঝড়ের বেগে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। বসিয়া ভাবিতেছি, সে তো একদিনও বলে নাই

যে, সে আমাকে ভালবাসে। আমি কাছে গেলে সরিয়া গিয়াছে—সাধ্যপক্ষে কাছেই আসে নাই, আমাকে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। আমি যেন একটা ডাকাত। আহা, সত্যই যদি ডাকাত হইতাম! জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া আসিতাম, যেমন অসঙ্কোচে একটা ফুল পট করিয়া ছিঁড়িয়া লই। কিন্তু আমি ভদ্রলোক, আমার মনের বর্ব্বরটাকে মুখোশ পরাইয়া রাখিয়াছি।

ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে পারি না।

পৃথ্বীরাজরা কি মরিয়াছে, সংযুক্তারা কোথায়?

ইচ্ছা করে, চীৎকার করিয়া তাহাকে বলি—

ঝঞ্ঝাসম তব দ্বারে হানা দিতে আজি আসিয়াছি,
অকস্মাৎ প্রাণ ভ'রে অকাতরে ভালবাসিয়াছি,
আপনার আচরণে শতবার কত শাসিয়াছি,
তবু ভাসিয়াছি।
ভাসিয়াছি আজি আমি সীমাহারা মহাপারাবারে—
অতল সে কালো জলে নিঃশেষে নিজেরে হারাবারে।
আপনারে বন্দী রাখি হিসাবের ক্ষুদ্র কারাগারে,
সখী, যারা পারে

নিক্তিতে ওজন করি করিতে প্রণয় নিবেদন,
আমি তাহাদের নহি। মোর নহে ক্ষীণ আবেদন।—
চিরকাল যুগে যুগে গণ্ডি-দেওয়া শান্তি-নিকেতন
করি উচ্ছেদন—

মর্ম্মান্তিক তীব্র দাহ—এ পথের পাথেয় আমার,
তাই ব'লে ভাবিছ কি ঝরাইব নয়ন-আসার ?
পুরুষ কাঁদে না কভু, চিরকাল এক দাবি তার—
'তুমি যে আমার'।

আমার আমারই তুমি—এ জীবনে নাই বা পেলাম,
স্পষ্ট ভাষে দাবিটুকু শুধু আজ জানাতে এলাম।
বেদনার বিষভাণ্ড নিজহস্তে তুলিয়া খেলাম,
মরিয়া গেলাম।

নিষ্কৃতি পেলে না জেনো—চিরকাল রহিব ঘিরিয়া,
চন্দ্রালোকে, বর্ষা-রাতে দেখা দিব মরম চিরিয়া,
দিবারাত্রি জীবনের ছোট বড় শত ফাঁক দিয়া
আসিব ফিরিয়া।

চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, অথচ পারি না। এই যে সংযম, ইহাই তো জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। হয়তো তাই এত সুন্দর !

নগেনের ঘরে ঢুকিয়া দেখি—হৈ-হৈ ব্যাপার।

সেই ক্ষুদ্র-পরিসর ঘরের মধ্যে এক বিরাট ষাঁড়কে ঢোকানো হইয়াছে, রোগী তাহার পুচ্ছ স্পর্শ করিবে। গো-দান হইতেছে। অর্থাৎ মুমূর্ষু রোগী যদি এই কার্য্য না করে, তবে তাহার মৃত্যুর পর সে নাকি বৈতরণী পার হইতে পারিবে না।

দমিয়া গেলাম। শেষ অবস্থা নাকি? ষাঁড়টাকে কোনক্রমে বাহির করিয়া নগেনকে দেখিলাম। শক্ত ব্যাপার বটে—মেনিন্‌জাইটিস।

বাহিরে আসিয়া বসিলাম রোগীর ব্যবস্থাদি করিয়া। হাত-মুখ ধুইয়া একটু শুইবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি এক ভদ্রলোক আসিয়া আমার নিকট বসিলেন। ধপধপে গায়ের রঙ, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে বুদ্ধির জ্যোতি জ্বলজ্বল করিতেছে, কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড একটা টিকা। মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি।

তিনি ইহাদের গুরু। নগেনের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীও। নগেনের কোষ্ঠীবিচার করিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আজ রাত্রি বারোটা যদি পার ক'রে দিতে পারেন, তা হ'লে ও এ যাত্রা রক্ষে পাবে। তা না হ'লে নয়। আপনি যে কোন ওষুধ দিয়ে, যেমন ক'রে হোক রাত্রি বারোটা পর্য্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। আমিও ক্রিয়াকর্ম্ম যা করবার, তা করছি।

তাঁহার ভাষাটা অবশ্য সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দী, আমি তর্জ্জমা করিয়া দিলাম।

গভীর রাত্রি। কয়টা জানি না। আকাশে চতুর্দ্দিকে ঘন ঘটা, ঘন ঘন বিদ্যুৎ, অবিরাম মেঘ-গর্জ্জন। নগেনের

শয্যাপার্শ্বে একা বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প করিয়া ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

এই ফুলেশ্বরী!

নগেন প্রলাপ বকিতেছে। ফুলেশ্বরী তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। অনেক দিন হইল মারা গিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেছে আর শুনিতেছে যে, তাহার স্বামী একবারও তাহার নাম করিল না, বার বার ডাকিতেছে ফুলেশ্বরীকে।

পাশের ঘরে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কুলগুরু রুষ্ট গ্রহের তুষ্টি-বিধানের জন্য হোমাগ্নি জ্বালিয়া স্তব পাঠ করিয়া চলিয়াছেন।

আমি অসহায়ের মত বসিয়া একটু একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

নগেন মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে, ফুলেশ্বরী!

নগেনের স্ত্রী বসিয়া চোখ মুছিতেছে।

বাহিরে মেঘ, জল আর বিদ্যুৎ।

হঠাৎ সব থামিয়া গেল যেন। বাহিরের মেঘ-গর্জ্জন কমিয়া গেল, প্রকৃতির শান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল। নগেন হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, একি, তুমি কখন এলে?

তাহার পর তাহার স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, কমলা, বালিশটা একটু ঠিক ক'রে দাও তো।

কমলা কৃতার্থ হইয়া গেল। পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, কয়টা বাজিয়াছে ?

দেখি, বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট। নগেন বাঁচিয়া গেল।

নগেন ভাল হইয়া গিয়াছে।

প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগিনেয় টাইফয়েডে ভুগিয়া ভাল হইয়াছে। ভাল হইয়া সে তাহার পাগল মামাটিকে লইয়া স্থানত্যাগ করিয়াছে।

আমার প্র্যাক্‌টিস ক্রমশ বাড়িতেছে।

অন্তরের পিপাসাও বাড়িতেছে।

বাহিরে আমি এত ভদ্র, অথচ ভিতরে আমি এত বর্ব্বর! সেই আদিম যুগের কেভ্‌ম্যান আজিও আমার মধ্যে বাঁচিয়া আছে। সভ্যতার সমস্ত চেষ্টাই তো সে পণ্ড করিয়া দিতেছে। নীতিকথা বলিয়া কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না।

কিন্তু বাহিরের ভদ্র বেশও তো খুলিয়া উলঙ্গ পশুটাকে লইয়া সমাজে বিচরণ করিতে পারি না।

আমার মনে যে এত অশান্তি, এত দ্বন্দ্ব, বাহিরে আমাকে দেখিয়া কে তাহা বলিবে ?

এই যে ডাক্তারবাবু!

সহাস্য নমস্কারে কহিলাম, আসুন।

রামগঞ্জে যেতে হবে একবার, কলেরা হয়েছে

চলুন।

৩

তুমি আমাকে ভালবাস না?

কোন উত্তর নাই।

বল না!

তথাপি কোন উত্তর নাই।

বল না!

কি বলব?

আমাকে ভালবাস কি না?

জানি না।

বলিয়া সে চলিয়া গেল। বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তবে কি আমাকে ভালবাসে না? কিন্তু আমার অন্তর্যামী তাহা তো স্বীকার করে না। কিন্তু বলে না কেন?

বসিয়া মনের গোপন গহন গভীরে,
কেন গো উতলা করিছ আকুল কবিরে,
ওগো, বল না!

তোমার স্বপন আমার নয়নে আঁকিয়া,
সুখ পাও কেন আড়ালে লুকায়ে থাকিয়া,
ওগো, বল না!
কাছাকাছি আছ, তবু মোরে ধরা দাও না—
তার মানে কি গো, মনে মনে মোরে চাও না,
ওগো, বল না!

তাই যদি হও, ডাক কেন নানা সুরেতে,
ভুলাইয়া কেন ল'য়ে যাও মায়া-পুরেতে,
ওগো, বল না!

সে যেন আবার আসিয়াছে। পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আছে। আমি ফিরিয়া চাহিলাম না, আপন মনে লিখিয়া চলিলাম। তাহার আঁচলের স্পর্শটুকু পিঠে লাগিতে লাগিল।

লঘু হাসি তব, অকারণে কাছে আসা এ,
চকিত চাহনি—নহে কি প্রণয়-ভাষা এ?
ওগো, বল না!
নহে যদি তবে বল না কেন তা খুলিয়া,
সন্দেহটুকু দাও নাকো উন্মূলিয়া,
ওগো, বল না!

মনে হইল, যেন আনত নয়নে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখে লজ্জার স্নিগ্ধ শোভা। অধর কাঁপিতেছে।

সহজ নয়নে চাহ না মুখের পানে তো,
আঁখি নত কর—বুঝি না তাহার মানে তো,
ওগো, বল না!

ডাকি যবে তুমি চ'লে যাও সম্বরিয়া,
ডাকি না যখন, নানা ছলে এস সরিয়া,
ওগো, বল না!
যে কথা ঝলকে নয়নে অধরে পলকে,
যে কথা কাঁপিছে উড়ে-পড়া ওই অলকে,
ওগো, বল না!
ফুল ফুটে শেষে জান না কি যায় ঝরিয়া?
যৌবন, সখী, জান না কি যায় মরিয়া?
ওগো, বল না!

আরও কাছে সরিয়া আসিল। তবু ফিরিয়া দেখিলাম না; আমার কি অভিমান নাই? কবিতায় কিন্তু অভিমান ফুটিতেছে না, শুধু অনুনয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিখিয়া চলিয়াছি।

যে মন রেখেছি তব পায়ে দিব বলিয়া,
অকারণে, সখী, কেন যাও তারে দলিয়া,
ওগো, বল না!
ওই তো অধরে মুচকি হাসিটি ফুটেছে,
নয়নের কোণে শরম ফুটিয়া উঠেছে,
ওগো, বল না!
জানি মনে মনে, তবুও ভাষায় বল গো,
সে কথাটি যার লাগি আমি চঞ্চল গো,
ওগো, বল না!
বল না আমারে, বল বল সখী, বল না,
অকারণে কেন এত অকরুণ ছলনা,
ওগো, বল না!

ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে যেন দেখিতেছে। ফিরিয়া বসিলাম। সে তো নয়।

কে তুমি?

অপ্রস্তুত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি দুখিনী বাবু, শুনেছি, আপনার বড় দয়া। তাই সাহস—

দিনের বেলা আসতে কি হয়?

দিনের বেলা আপনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই।

কি হয়েছে তোমার?

দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় চাকা চাকা ঘা। নাকটা ফুলিয়াছে। ঠোঁটের কোণে সাদা সাদা ঘা। চক্ষু দুইটি লাল। কুষ্ঠ নয় তো?

কতদিন হয়েছে?

দু মাস থেকে।

ইন্‌জেক্‌শন দিতে হবে। খরচ লাগবে।

আমি গরিব মানুষ, আমাকে একটু দয়া করুন; ভগবান আপনার ভাল করবেন।

ভগবান রাজি হয়েছেন?

বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমাকে ভাল ক'রে দাও, ভাল ক'রে দাও, ভাল ক'রে দাও। দুই হাত বাড়াইয়া সে আমার পা দুইটি জড়াইয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলাম।

মহা মুশকিল! কি করা যায়?

বলিলাম, আচ্ছা আমার ফী দিতে হবে না। ওষুধের দামটা দিতে পারবে তো?

আমার কিছু নেই, আপনি দয়ার সাগর—

চুপ কর।

একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলাম, বত্রিশ দাগ ওষুধ পাবে। আর এস না আমার কাছে। ভাল যদি হয়, ওতেই হবে।

প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, টাকা পাইলে উহাকে বোধ হয় এত অযত্ন করিয়া দেখিতাম না। তাড়াতাড়িতে আন্দাজে সিফিলিসের একটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখিয়া দিলাম। ঠিক হইল কি?

মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার কাছে যেন ছোট হইয়া গিয়াছি।

৪

আমায় মাপ করবেন হরিশবাবু, আমি পারব না।

সেই আমার প্রতিবেশী হরিশবাবু। তিনি কেরানী, ইন্সিওরেন্সের দালালও। আমি তাঁহার কোম্পানির ডাক্তার।

তিনি একটি কেস আনিয়াছেন। লোকটা মোটা, ইউরিনে শুগার আছে। হার্টটাও সুবিধার নয়। হরিশবাবুর অনুরোধ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রিপোর্ট যেন একটা লিখিয়া দিই। ফার্স্ট ক্লাস লাইফ না হইলে তাঁহার কোম্পানি লইবে না। কিন্তু তাহা কি করা যায়? দিনকে রাত্রি করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। হরিশবাবু বলিলেন, কত কষ্টে কত খোশামোদ ক'রে লোকটাকে রাজি করালাম, আর আপনি দু মিনিটের মধ্যে সব শেষ ক'রে দিলেন? আপনার অবিদিত তো কিছুই নেই। ছেলেটা আজ প্রায় মাসাবধি ভুগছে। ওষুধপথ্য যোগাতেই জিব বেরিয়ে যাচ্ছে। এই কেসটা হ'লে কিছু টাকা পাওয়া যেত, একটু বিবেচনা—

তা হয় না হরিশবাবু, মাপ করবেন।

মাপ আপনিই আমাকে করুন। ক'রে দিন দয়া ক'রে। আমার যে কি অবস্থা! আচ্ছা, ছেলেটির কি বাঁচবার আশা নেই?

শক্ত ব্যারাম, টাইফয়েড হয়েছে। বুঝতেই তো পারেন।

এসব জেনেও আপনি আমার অবস্থার প্রতি একটু দয়া করবেন না?

মাপ করুন।

হরিশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, দিন তা হ'লে ছেলের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা লিখে।

ভাইটামিন ডি-টা ?

ওটা এখনও কেনা হয় নি। দেখি যদি আজকে—

হঠাৎ হরিশবাবু আমার হাত দুইখানা ধরিয়া বলিলেন, সত্যি, বড় দুরবস্থায় পড়েছি ডাক্তারবাবু, ওটা যদি ক'রে দিতে পারতেন !

তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল, তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন, এই দশটা টাকা না হয় আপনি—

কথা শেষ করিতে পারিলাম না। উত্তেজিত হইয়া হরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, আপনি এমন ক'রে আমায় অপমান করতে সাহস করলেন ? আজ আমি না হয় কপাল-দোষে দরিদ্র হয়েছি, জানেন, আমি কত বড় বংশের ছেলে ? রতনগঞ্জের চাটুজ্জেদের নাম এখনও ও অঞ্চলে লোকে ভোলে নি। কম ক'রে দুশোখানা পাতা আমাদের বাড়িতে পড়ত, আর আপনি আজ দশটা টাকা আমাকে ভিক্ষা দিতে এলেন ! আপনার—

হরিশবাবু আর বলিতে পারিলেন না। দুই ফোঁটা জল তাঁহার চোখে টলটল করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

অপ্রস্তুতের চরম।

হরিশবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

বৈকালে হরিশবাবুর বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে দেখিতে গিয়াছি।

হরিশবাবু বাড়িতে নাই। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ বাবা, টাইফয়েড বলছ ; কিন্তু ছেলে এমন বিড়বিড় ক'রে কি বকছে ? মাঝে মাঝে আঁতকে উঠছে।

টাইফয়েড ওরকম হয়।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সেই যে সেদিন এক পাগলী ছেলেকে আঁকড়ে ধরেছিল, সে-ই কিছু নজর-টজর দেয় নি তো ?

না না, ও কিছু নয়।

সেই দিন থেকেই বাছা কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।

কিছু বলিলাম না। একটু পরে বলিলাম, দেখুন, এই ওষুধটা রেখে দিন। রোজ দশ-বারো ফোঁটা ক'রে দেবেন খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে—ভাইটামিন-ডি। ভুলবেন না যেন।

আচ্ছা। দাম কত এর ?

দাম লাগবে না। এমনিই স্যাম্পল পেয়েছিলাম।

মিথ্যা কথা বলিয়া এত সুখ কখনও পাই নাই।

হরিশবাবু আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, আপনি তো কিছুতে দিলেন না ; কিন্তু অল-ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানির এজেন্ট কেসটিকে বেশ বাগিয়ে নিলে। আর খগেন ডাক্তার কেমন সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস লাইফ রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে দেখে এলাম। আপনার যত সব ইয়ে—

চুপ করিয়া রহিলাম।

হরিশবাবুর স্ত্রী বলিতে লাগিলেন, দেখ, আজ অয়েলক্লথ আনা দরকার একটা। বিছানা বড্ড ভিজে যাচ্ছে।

হরিশবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

গ্লুকোজটাও ফুরিয়েছে।

আচ্ছা।

কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, বলিলাম, এবার তা হ'লে উঠি।

রাত্রে—গভীর রাত্রে, হরিশবাবুর ছেলে মারা গেল। একা উৎকর্ণ হইয়া মায়ের বুক-ফাটা কান্না শুনিতেছি। পাশে মিলের বড় চোঙটা হইতে মৃদু শব্দ করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ।

মনে হইল, একটা পাগলী যেন হাসিতেছে।

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হইতে লাগিল। হয়তো ছেলেটার ভাল সেবা হয় নাই। ভিজা কাঁথায় শুইয়া শুইয়া, ভাল পথ্য না পাইয়া, বোধ হয় ছেলেটা মারা গেল। ছোট ছেলেরা তো প্রায় টাইফয়েডে মরে না। তবে?

দারিদ্র্য! হরিশবাবুর সেই লাইফটা ফার্স্ট ক্লাস লিখিয়া দিলে ক্ষতি ছিল কি? খগেন ডাক্তার তো দিয়াছে। আমাদের বিচারই কি নির্ভুল? ওই মোটা বহুমূত্ররোগী তাহার

খারাপ হার্ট লইয়া হয়তো বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবে, আর যে সব লাইফ ফার্স্ট ক্লাস বলিয়া লিখিতেছি—তাহারা হয়তো দুই দিন পরেই মারা যাইবে। কে জানে? হরিশবাবুর শুধু কিছু টাকা লোকসান করাইয়া দিলাম। কোন্‌টা ঠিক? সত্য কি?

মিলের চোঙে পাগলী হাসিতেছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে দেখিলাম, সে আসিয়াছে। দুই হাত দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া চুম্বন দিয়া যেন বলিতেছে, তুমি ঠিক করেছ।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখন ভোর। তখনও হরিশবাবুর বাড়ির কান্না থামে নাই। পাগলীও সমানে হাসিয়া চলিয়াছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ। এলামেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সার বাঁধিয়া ভোরের আকাশে উড়িতেছে—যেন পাগলিনীর আলুলায়িত কেশভার।

৫

আমাকে রসুলপুর যেতে হবে।

নিরীহ গোয়ালা চুপ করিয়া গেল। রসুলপুর তাহার জমিদারের বাড়ি, সুতরাং সেখানেই আমার সর্ব্বাগ্রে যাওয়া

অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। তা ছাড়া গরিব মানুষ, ফী সব সময় দেয় না। মাঝে মাঝে দুধটা-দইটা দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সে চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে বলিলাম, ফেরবার পথে তোর ওখানে দেখে যাব; তুই বিকেলের দিকে বাড়িতে থাকিস। সে চলিয়া গেল।

ভাল আছেন তো ডাক্তারবাবু?

কে? দেখি আমাদের সেই মহিন্দর।

ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ, এই এক রকম চ'লে যাচ্ছে। কি মনে ক'রে?

বিশেষ কিছু নয়। একটু চুলকুনি হয়েছে, তাই—

দেখিলাম। সত্যই বিশেষ কিছু নয়। ঔষধ লিখিয়া দিলাম।

এইটে ঘ'ষে ঘ'ষে লাগাবেন। তা হ'লে আমি চলি? আমাকে অনেক ঘুরতে হবে এখন। আপনি কোথায় উঠেছেন? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

মহিন্দর দেখিলাম উসখুস করিতেছে।

বলিলাম, বেশ তো, আমার ওখানেই চাট্টি খাবেন। এই ভজুয়া!

ভৃত্য ভজুয়া আসিল। তাহাকে বলিলাম, বাবুকে বাইরের ঘরে বসতে দাও। ঠাকুরকে ব'লে দাও, উনি খাবেন এবেলা।

নানা স্থানে ঘুরিলাম।

কাহারও দাঁতে ব্যথা, কাহারও টাইফয়েড, কাহারও যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, বেরিবেরি—রোগের শেষ নাই। কাহারও আবার কিছুই নয়, মানসিক অস্বস্তি। দিব্য স্বাস্থ্য, তাহার কিন্তু বিশ্বাস, হজম হয় না। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হয়। অনেক বড়লোকের দেখি অসুখের কারণ—টাকা। হয় অত্যধিক খায়, নতুবা মাতাল, না হয় দুশ্চরিত্র। ইহার যদি কোনটাই না হয়, তাহা হইলে তাহার বিশ্বাস যে, হয় তাহার ধাতুদৌর্ব্বল্য, না হয় ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ঘটিয়াছে।

সকলের ব্যবস্থা করি।

বাড়ি ফিরিয়া দেখি, অর্দ্ধেক টাকা অচল।

বেলা দুইটায় ফিরিয়া শুনিলাম, মহিন্দর খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমিও উর্দ্ধশ্বাসে খাইয়া লইলাম। রসুলপুর যাইতে হইবে।

জমিদার-বাড়ির গাড়ি আসিল, প্রকাণ্ড মোটর।

যাইবার সময় আলোয়ানটা চতুর্দ্দিকে খুঁজিলাম। পাওয়া গেল না। ভজুয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিল। আমিও করিলাম, আলোয়ানটা কিছুতে আর পাইলাম না। বাড়িতে একটা স্ত্রীলোক না থাকিলে চলা অসম্ভব। অন্তরলোক-বাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

মোটর ছুটিতেছে।

তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছি। স্পীড-এর যুগ। জীবনের গোনা দিন কয়েকটি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। কতটুকু মানুষের আয়ু! যতটা পারি ছুটাছুটি করিয়া দেখিয়া লই। নাই বা হইল সবটা ভাল করিয়া দেখা। ক্ষণিকের চাক্ষুষ পরিচয়, সেটাও কি কম! সুন্দর ফুলে ভরা গাছটা, তাহার পর এক পাল গরু, একজন পথিক, একটা পুল, দুইটা কুকুর, আবার একটা গাছ, চমৎকার মেয়েটি, একরাশ ধূলা উড়াইয়া আর একটা মোটর, ধূলা ভেদ করিয়া এক ঝাঁক অশোকফুল চট করিয়া দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। বাঃ, পাশের মাঠে পুকুরটি কি সুন্দর! গরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে, দুইটি বুড়া-বুড়ী মোট বহিয়া যাইতেছে, সাঁওতাল মেয়েটির যৌবন কি নিটোল, মুর্গীগুলা ছুটিয়া গেল—রোখো, রোখো। যাক, ছেলেটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

তীরবেগে ছুটিয়াছি।

এইরূপ তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে সন্ধ্যা-নাগাদ রসুলপুরে পৌঁছানো গেল।

রসুলপুরের জমিদার বছর দুই হইল মারা গিয়াছেন।

নিঃসন্তান যুবতী বিধবা রাণীজী সম্পত্তির অধিকারিণী।

আমাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন জমিদারের নূতন নায়েব—কুঞ্জলালবাবু। তিনিই এখন সর্ব্বেসর্ব্বা এবং তাঁহার কর্ম্মদক্ষতায়

জমিদারির উন্নতিও হইয়াছে বিস্তর। লোকটি, দেখিলাম, বিনয়ের অবতার।

আমি গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তিনি হেঁট হইয়া আমার পদধূলিই লইয়া ফেলিলেন। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, সেকি! আপনি ব্রাহ্মণ, তা বললে কি চলে?

রসুলপুর জমিদার-বাড়িতে এই আমার অল্পদিন যাতায়াত শুরু হইয়াছে।

নায়েবটিকে ইতিপূর্ব্বে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অসুখ কার?

ভেতরে আসুন, বসুন, ঠাণ্ডা হোন। অসুখের কথা তো হবেই।

ভিতরে গেলাম। গিয়া দেখি, সমারোহ-ব্যাপার। দুইজন ভৃত্য চেয়ার আগাইয়া দিল। হাতমুখ ধুইবার জল, চা, জলখাবার, পান, তামাক, বিনয়-বচন—ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল।

আমি যেন বাড়িতে জামাই আসিয়াছি। বলিলাম, চলুন, এবার রোগী দেখা যাক।

হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

অসুখ কার?

রাণীজীর।

পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, পাঁচ মাস হইবে। ভয়ের কারণ তো কিছু দেখিতেছি না, অথচ—। নিমেষের মধ্যে কারণটা বুঝিতে পারিলাম। বিধবা যে! হিন্দুর ঘরের বিধবা!

টাকার জন্যে নয়, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

হাজার টাকা পেলেও নয়?

না। আমাকে মাপ করবেন।

আশা করি, কথাটা গোপন রাখবেন।

নিশ্চয়।

ফী লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। এবারে কুঞ্জলালবাবুর পদধূলি লইবার আগ্রহ দেখিলাম না।

বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চলিয়াছি। সমস্ত অন্তঃকরণে দারুণ বিতৃষ্ণা। অনর্থক আমার এতটা সময় নষ্ট করাইল।

এই, রোখো।

নামিয়া পড়িলাম। সকালে কারু গোয়ালাকে বলিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় তাহার বাড়ি যাইব। মাঝামাঝি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়াই চলিলাম। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম খেয়াল নাই। বারুইপুর গ্রামের ভিতর

আসিতেই একটা কুকুর ঘেউঘেউ করিয়া উঠিল, চমক ভাঙিল।

সন্ধান করিয়া কারু গোয়ালার বাড়ি বাহির করিলাম।

কাছে গিয়া বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

কান্নার শব্দ।

আগাইয়া গেলাম। কারুর ছেলে একটু আগেই মারা গিয়াছে।

কলেরা হইয়াছিল।

সময়ে চিকিৎসা করিলে বোধ হয় বাঁচিত।

কালুর স্ত্রীর আর্ত্তনাদ কানে আসিতে লাগিল, ওগো ডাক্তারবাবু, এত দেরি ক'রে কেন এলে গো, আমার বাছা যে চ'লে গেছে।

৬

রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া কিছু খাইলাম না।

মনটা খারাপ। ভজুয়া সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, একটু চা বানিয়ে দোব ?

উপুড় হইয়া শুইয়া ছিলাম। বলিলাম, না।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না।

ঘুম যখন ভাঙিল, তখন চন্দ্র অস্তোন্মুখ। ম্লানায়মান

জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী তন্দ্রাতুর। আশ্চর্য্য মানুষের মন! কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে পৃথিবীর সমস্ত-কিছু বিস্বাদ মনে হইতেছিল। এই নির্জ্জন শেষরাত্রে ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া করুণায় সমস্ত মন ভরিয়া গেল। অসহায় পৃথিবী ঘুমাইতেছে। আজন্ম রুগ্না। রোগের নানা যন্ত্রণার পর হঠাৎ যেন গভীর অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না যেন পৃথিবীর বিষণ্ণ হাসি।

সামনের বাগানটায় পায়চারি করিতেছি। শেফালি-ফুলগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘাসে ঘাসে শিশির। কে যেন সারারাত বসিয়া কাঁদিতেছে। কে সে? সে কি রাত্রে লুকাইয়া আসে?

নীরব চারিদিক,
গহন চারিধার,
এস না এ সময়ে
এস না একবার!
আকাশে তারা ছাড়া,
নাহি তো কারো সাড়া,
কেহ তো জানিবে না
এ নিশি-অভিসার!

৭

বিরক্ত বোধ হইতেছিল।

দেখুন, আপনি আমাকে না চিনলেও নলিনীবাবুকে চেনেন তো? তিনি আমার পিসতুতো শালা হন। তা ছাড়া পূর্ণিয়ার যিনি আজকাল সব্‌জজ, তিনিও হলেন আমাদের নিকট-আত্মীয়, সম্পর্কে বেয়াই বলতে পারেন। ওই যে আপনাদের মিলের ম্যানেজার সর্ব্বেশ্বরবাবু, তিনি হলেন গিয়ে আমার জাঠতুতো বোনের মামা। আপনাদের বাড়িও গেছি। তখন আপনি বোধ হয় খুবই ছেলেমানুষ। সেটা হবে গিয়ে নাইন্টিন টুয়েল্‌ভ। ওই যে নাম করছিলাম ব্রহ্মাপুরের ডাক্তার, তিনি হলেন গিয়ে আমার খুড়তুতো ভায়ের আপন শালা। তা ছাড়া এ অঞ্চলে আমাদের চেনা-শোনা ঢের লোক রয়েছে, ওই কালীকিঙ্কর—ওই যে কমিশনার সাহেবের ওখানে কাজ করেন, ওঁকে তো মেসো ব'লেই বরাবর ডাকি। তা ছাড়া আজকাল যিনি হরিহরপুরের দারোগা, তিনি হলেন আমার মামার শ্বশুর। আপনাদের পাড়াতেও রয়েছেন জীবনবাবু, তিনি গিয়ে—

তাঁহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝলাম। কিন্তু আপনি চান কি?

এই একটু দরকারে প'ড়ে এসেছি। খগেন ডাক্তারটা

এত বেশি টাকা চায় যে, আমাদের মতন গেরস্ত লোকের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আপনার শুনতে পাই দয়াধর্ম্ম আছে।

দরকারটা কি?

একখানা সার্টিফিকেটের। খগেন ডাক্তার আমার পিসের ভাগনে কিনা, সেই ভরসায় গিয়েছিলাম। শিক্ষা হয়ে গেল। ষোল টাকা চায়—একটা সার্টিফিকেট দিতে! ডাক্তার, না, ডাকাত!

আদ্যোপান্ত সব শুনিলাম। বলিলাম, আমায় মাপ করবেন। মিথ্যে সার্টিফিকেট আমি দিই না।

মিথ্যে মানে? আমি যা বলছি, তা কি মিথ্যে ব'লে মনে করছেন?

মিথ্যে ব'লে মনে করছি না। হতে পারে সত্যি। কিন্তু শোনা কথার ওপর নির্ভর ক'রে কোনও সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। ভদ্রলোকের ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু, কানে গোছা-গোছা চুল, নাকের ভিতর দিয়া খানিকটা চুল দেখা যাইতেছে। অনুমান করিলাম, বক্ষে ও পৃষ্ঠদেশেও রোমের অসদ্ভাব নাই। মাথায় টাক, গোঁফ-দাড়ি কামানো; কিন্তু তিন-চার দিন বোধ হয় কামানো হয় নাই, খোঁচা-খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে মৃদু হাস্য খেলিয়া গেল।

আমার এমন বিপদে যদি সাহায্য না করেন, তা হ'লে যাই কোথায়, বলুন ?

কি করব বলুন, আমি নাচার।

ফী আমি আপনাকে দোব, তবে একটু কন্‌সেশন করতে হবে। চাকরি ক'রে সংসার চালাতে—

আমাকে মাপ করবেন, দিতে পারব না।

বেশ, পুরো ফীই দোব আপনার। কত নেন আপনি ?

টাকার জন্যে আটকাচ্ছে না। ওরকমভাবে আমি সার্টিফিকেট দিই না।

তবে কি বলতে চান, আমার চাকরিটা যাক ?

তার মানে ?

মানে, আমি দরখাস্ত করেছি যে, এই গ্রামে এসে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এক মাসের ছুটি চাই। তারা বলেছে, অবিলম্বে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দাও। এক মাস কামাই করেছি, এখন তার সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে হয়তো দূর ক'রে দেবে। করি কি বলুন তো ? মেডিকেল সার্টিফিকেট মানে—আপনি আর খগেনবাবু। খগেনবাবু ছুরি শানিয়ে ব'সে আছেন, আপনি বিবেক শানিয়ে ব'সে আছেন। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম তো !

ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু কুঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক বসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

ভজুয়া আসিয়া খবর দিল, বাহিরে দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। ঝাঁকড়া-ভুরু প্রশ্ন করিলেন, একটু বিবেচনা ক'রে যদি দেখতেন!

মাপ করবেন, পারব না।

ভদ্রলোক উঠিলেন। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি যেন মনে করবেন না, আমি অসুখে পড়ি নি। সত্যি, আমার অসুস্থতার জন্যেই আমি কাজে জয়েন করতে পারি নি। কিন্তু আমি কখনও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাই না। আমার নিজের হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে। নিজের চিকিৎসা নিজেই করি আমি। নিজের সার্টিফিকেটও যদি লিখতে পারতাম! যাই খগেনের কাছেই। He is more amenable to reasons. He sells his services, but at an exorbitant rate—এই যা মুশকিল।

হঠাৎ ভদ্রলোকের আলোয়ানখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল, ঠিক আমার আলোয়ানটারই মত।

ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আলোয়ানটা দেখছেন? কাল এই আলোয়ানটা কিনতে গিয়েই তো হাতের টাকা গেল ফুরিয়ে। তা না হ'লে খগেনের কাছেই নিতাম সার্টিফিকেট। বারো টাকায় ড্যাম চীপ। কি বলেন? এর দাম অন্ততপক্ষে ষাট টাকা।

বলিলাম, পঁচাত্তর।

ওঃ, তাই নাকি?

কোথা থেকে কিনলেন আপনি ?

আপনি চিনবেন কি ? ওপারের একটি লোক। মহিন্দর তার নাম। এসে বললে, ভাই, মুশকিলে পড়েছি, এই আলোয়ানটা রেখে কিছু টাকা দে। দেখে লোভ হ'ল। কিনে ফেললাম। ঠকি নি তো ?

না।

আমার আলোয়ান গায়ে দিয়া ঝাঁকড়া-ভুরু চলিয়া গেল। আমি বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। পুলিসে খবর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মনের ভিতর কে যেন বলিতে লাগিল, পুলিসেই যখন খবর দিলে না, একটা আইন যখন ভঙ্গ করিলে, তখন সার্টিফিকেটটাও দিয়া দিলে না কেন ? লোকটাও খুশি হইত, তোমারও টাকা হইত। তা ছাড়া, লোকটার সত্যই অসুখ করিয়াছিল তো। না হয় তোমাদের ঔষধ খায় নাই। ভজুয়া আসিয়া আবার খবর দিল, বাহিরে লোকেরা অপেক্ষা করিতেছে।

৮

গেলাম বাহিরে।

প্রথমেই দেখা হইল এক কাবুলীর সঙ্গে। সে সেলাম করিয়া সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিল যে, তাহার পারার ব্যারাম

হইয়াছে। চিকিৎসা করাইতে চায়। তাহাকে ব্যবস্থা দিবামাত্র সে যথারীতি ফী দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

আসিল একজন বাঙালী।

একটু প্রাইভেটে আপনার সঙ্গে 'টক' করব।

বেশ তো।

প্রাইভেটে 'টক' করিলাম।

কি মনে হচ্ছে আপনার?

আমার তো মনে হয় সিফিলিস।

কি ক'রে হ'ল?

সে তো আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

ভদ্রলোক একটু কাঁচুমাচু হইয়া গেলেন।

কখনও কোন ইম্‌পিওর কানেক্‌শন হয় নি আপনার?

জিব কাটিয়া তিনি বললেন, আজ্ঞে না।

তখন বলিলাম, রক্তটা পরীক্ষা করান তা হ'লে। আমার দেখে তো ওই ছাড়া আর অন্য কোন সন্দেহ হয় না।

আচ্ছা, গামছা-টামছার ছোঁয়াচ লেগে, কিংবা কিছু ডিঙিয়ে—

হ্যাঁ, হতে সবই পারে। ওই আকাশের সূর্য্যটাও এক্ষুনি দপ ক'রে নিবে যেতে পারে। আটকায় কে? সবই সম্ভব।

উপায়?

রক্ত পরীক্ষা করান। ইত্যবসরে এই ওষুধগুলা ব্যবহার করুন।

সচ্চরিত্র বাঙালী ভদ্রলোক বিদায় লইলেন। বলিয়া গেলেন, ফীটা পরে পাঠাইয়া দিবেন।

তারপর আসিল একজন মারোয়াড়ী। তাহার সিকায়েৎ অর্থাৎ ধাতু-দৌর্ব্বল্য। বগলে করিয়া এক বাণ্ডিল প্রেস্ক্রিপ্শন আনিয়াছে। দিল্লীর হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় বহু চিকিৎসকের দাওয়াই সে করিয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হয় নাই। আমার নামডাক শুনিয়া সে অনেক আশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে—বিজলিকা ইল্‌হাজ করাইবার বাসনা। শেঠজী অনেক 'রূপেয়া' খরচ করিয়াছে এবং এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাঁহার রোগটা সারিয়া যায়। দেখলাম, দুগ্ধবতী গাভী বটে, সামান্য একটি টর্চের সাহায্যে ইহাকে বেশ কিছুদিন দোহন করা চলে। কিন্তু কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল, মামুলী একটা হজমের ঔষধ লিখিয়া দিয়া লোকটাকে বিদায় করিলাম। ফীটা কিন্তু শেঠজী নগদই দিয়া গেল।

তাহার পর আসিলেন ও-পাড়ার হারাণদা।

ওহে ডাক্তার, একটা ব্যবস্থা কর মাইরি। আর তো পারা যায় না। ভয়াবহ হয়ে উঠল ক্রমে।

ব্যাপার কি?

গিন্নী আবার কাল রাত্তিরে একটি কন্যারত্ন প্রসব করেছেন। এই নিয়ে পাঁচটি হ'ল—চারটি ছেলে ছাড়া। একটা উপায় বাতলাও ভাই। তা না হ'লে তো গেলাম।

৫

কণ্ট্রাসেপ্‌শন না কি সব তোমাদের আজকাল আছে, তাই একটা কিছু করতে হচ্ছে এবার।

হাসিয়া বলিলাম, ফুল-প্রুফ কোন কণ্ট্রাসেপ্‌শন আছে নাকি? আমার তো জানা নেই।

তার মানে, আমি কি ফুল বলতে চাও?

তা না হ'লে ত্রিশ টাকা মাইনের ওপর নির্ভর ক'রে বিয়ে ক'রে বস।

তা হ'লে বাংলা দেশে কটা বাঙালী ছেলে বিয়ে করার উপযুক্ত আমাকে বল তো?

একটাও নয়।

তা হ'লে কি বলতে চাও, বাঙালীর বংশ লোপ হোক?

হোক না। ভিখারীর বংশবৃদ্ধি নাই বা হ'ল হারাণদা।

হারাণদা হাসিয়া বলিলেন, তাই বুঝি তুমি নিজে এখনও বিয়ে কর নি? রোজগার তো বেশ করছ, এবার একটা বিয়ে-থা কর। তোমার ছেলেপিলেরা তো আর ভিখারীর বংশধর হবে না।

বুঝিলাম, হারাণদার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে।

বলিলাম, আমরা সবাই সমান।

হারাণদা বলিলেন, এখনও রক্তের তেজ আছে, বুঝতে পারছ না, কিন্তু কিছুকাল পরে বুঝবে—ছেলেপিলে না থাকলে সংসার মরুভূমি।

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। 'শুভবিবাহ'-মার্কা লাল খাম। কে আবার বিবাহ করিতেছে! খুলিয়া দেখিলাম—জনৈক যাদুগোপাল বসাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচুগোপাল বসাকের সহিত হারাধন দাসের কন্যা চঞ্চলা দাসীর শুভপরিণয় হইবে। আমি যেন সবান্ধবে—ইত্যাদি।

কে পাঁচুগোপাল বসাক?

খামের ভিতর হইতে আর একটা কাগজ বাহির হইল। হাতে-লেখা চিঠি; তাহাতে লেখা—

ডাক্তারবাবু, আশা করি মনে আছে। আমার যে স্ত্রীকে আপনার কাছে লইয়া গিয়াছিলাম (সেই 'নন্দদুলাল' গান), তিনি আত্মহত্যা করিয়া মারা গিয়াছেন।

আবার বিবাহ করিতেছি। আশীর্ব্বাদ করুন, যেন সুখী হই। যদি আসিতে পারেন, অত্যন্ত আনন্দিত হইব।—পাঁচুগোপাল।

সেই সন্তান-লালায়িতা পাগলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে!

যাক।—উঠিয়া পড়িলাম।

হারাণদা বলিলেন, উঠলে যে!

আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, কি করতাম জানেন?

হারাণদা বলিলেন, কি?

সকলকে গুলি করতাম। তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দিতাম।

বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলাম। একবার মনে হইল, উক্ত

চঞ্চলা দাসীর পিতা হারাধন দাসকে টেলিগ্রাম করিয়া মানা করি যেন পাঁচুগোপালের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ না দেয়। উহার গনোরিয়া আছে। কিন্তু একটু আগে যেমন পুলিসকে খবর দিতে পারি নাই, ইহাও পারিলাম না।

অথচ বিবেক লইয়া বড়াই করি!

৯

ক্যাঁচ করিয়া বাড়ির সামনে মোটরটা থামিল।

একি, এ যে রসুলপুরের জমিদার-বাড়ির মোটর! ড্রাইভার আসিয়া সেলাম করিয়া একখানি পত্র হাতে দিল। খাম ছিঁড়িয়া দেখি—

এবারে অসুখ খুব মর‍্যাল এবং অত্যন্ত আর্জেণ্ট। আপনি পত্রপাঠমাত্র চলিয়া আসুন।—কুঞ্জলাল

চলিলাম। অরণ্যপ্রান্তর পার হইয়া মোটর ছুটিতেছে।

সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা সংক্ষেপে এই—আমি আমার ডাক্তারী বিবেক লইয়া যাহা করিতে অসম্মত হইয়াছিলাম, একটা সামান্য দাই টাকার লোভে তাহা করিয়াছে, এবং তাহার ফলে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতি সাংঘাতিক।

কুঞ্জলালবাবু বলিলেন, আপনি বাঁচান ডাক্তারবাবু।

ভাবিয়া দেখিলাম, এখন তো আমার ডাক্তারী এটিকেটে বাধিবার কথা নয়। এখন সে রোগী; কারণ যাই হোক। বলিলাম, বেশ, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এই জিনিসগুলো গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।

এক্ষুনি।

গাড়ি ছুটিল।

রাণীজী প্রাণে রক্ষা পাইবেন, যদি আর কোন কম্‌প্লিকেশন না হয়। আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশল যেন সার্থক হইল। অথচ গোড়ার দিকটাই বা করিলাম না কেন? তাই ভাবিতেছি। সেই অসহায় শিশু তো রক্ষা পাইল না। সমাজ যাহাকে চায় না, তাহাকে বাঁচাইবে কে?

অথচ দাই না করিয়া আমি করিলে জিনিসটা এত অবৈজ্ঞানিকভাবে করিতাম না। শিশু তো গিয়াছে, জননীও যে যায়-যায়। যাই হোক, এ যাত্রা বোধ হয় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু—। যাক, আর ভাবিব না।

সমস্ত রাস্তা কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম। কি অসহায় আমরা ডাক্তারেরা! কতকগুলো অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া রোগীর হাটে তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। বিবেক বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা আর কিছুই নয়, ফাঁকি। একই বিবেক নানা কথা কয়। যাহা যুক্তিযুক্ত, বিবেক তাহা করিতে চাহে না; যাহা অন্যায়

বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে দেখি বিবেকের সায় আছে। বিবেক মানে যুক্তি-মার্জ্জিত বুদ্ধি নয়, বিবেক—সামাজিক বুদ্ধি। এই বিবেক-বলেই লোকে এককালে সতীদাহ করিত, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জ্জন দিত; আজও সেই বিবেকই কাপালিককে নরবলিতে প্রণোদিত করে, বিধবাকে উপবাসে দেহ শীর্ণ করিতে পরামর্শ দেয়, অসুখে পড়িলে ঔষধ না খাইয়া মাদুলি লইতে প্রলুব্ধ করে। সেই এক জাতীয় বিবেকই ডাক্তারকে নির্ব্বিচারে একটা পশু করিয়া ফেলিয়াছে। সে ফর্ম মানিয়া চলিয়াছে, যুক্তির ধার ধারে না।

তা ছাড়া আমরা করিতেই বা পারি কি? কতটুকু ক্ষমতা আমাদের? যাহার জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিলাম, ঔষধের পর ঔষধ দিলাম, রক্ত মল মূত্র সমস্ত পরীক্ষা করিলাম, ব্যাধি হয়তো ধরা পড়িল, হয়তো পড়িল না। ধরা পড়িল, কিন্তু তবু সারিল না। ধরা পড়িল না, অথচ সারিয়া গেল।

ইহাতে কি প্রমাণ হয়? আমরা অসহায়, নিতান্ত অসহায়। অথচ রোগী মনে করে, আমরা যেন তাহার প্রাণটা পকেটে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের টাকা, খোশামোদ—নানা প্রকারে স্তুতি করিয়া চলিয়াছে সে।

বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় রাত্রি নয়টা। আমি নামিবামাত্র একটি স্ত্রীলোক আসিয়া প্রণাম করিল।

কে ?

নতমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, আমি আসমানি।

কি চান আপনি ?

কিছু নয়। এমনই দেখা করতে এসেছিলাম।

বেশ, ভেতরে আসুন।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গেলাম। চিনিতে পারিলাম না।

কে আপনি ?

আমাকে চিনতে পারছেন না ? এই কিছুদিন আগে আপনার কাছে এসেছিলাম। সেই যে আর একদিন সন্ধ্যে-বেলা—। আমার গা-ময় ঘা ছিল। আপনি একটা টাকা দিয়ে আমাকে একটা ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন লিখে দিলেন, সেই ওষুধ খেয়ে আমার সব সেরে গেছে। আরও খেতে হবে কি ?

আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। নিতান্ত অবহেলাভরে তাহাকে যে প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনটা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহার এই ফল দেখিয়া আমার নিজেরই মুখে কথা সরিতেছিল না। এত অসামান্য রূপ তাহার ওই কদর্য্য রোগটার তলায় চাপা পড়িয়াছিল, আশ্চর্য্য !

বলিলাম, আচ্ছা, আর এক শিশি কিনে খেও। হাতে পয়সা আছে তো ? কোথা থাক তুমি ?

রংবাজারে। হ্যাঁ, এবার আমি কিনে খেতে পারব।

বুঝিলাম, রূপজীবিনী সে। স্বাস্থ্য ও রূপ যখন সে ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন তাহার পয়সার অভাব কি ?

সে চলিয়া গেল। আমি বিবেককে ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটাও কি ঠিক কাজ হইল ? এমন একটা মোহিনী অগ্নিশিখাকে সমাজে ছাড়িয়া দিয়া কি সৎকার্য্য করিলে ! এ তো নিবিয়া গিয়াছিল প্রায়। আমিই তো আবার তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিলাম। উচিত হইল কি ?

হারাণদা আসিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তার, হরিশবাবুর সঙ্গে কি তোমার কোন ঝগড়া হয়েছে নাকি ?

বলিলাম, না। কেন বল তো ?

তিনি তোমার নামে নানা রকম সব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। তুমি নাকি তাঁর ছেলের অসুখের সময় গলায় পা দিয়ে তোমার প্রাপ্য আদায় করেছ ! ফী পাও নি ব'লে সময়মত নাকি যাও নি ! বেঘোরে ছেলেটা তোমার হাতে প'ড়ে বিনা চিকিৎসায় নাকি মারা গেছে !

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, সেদিন খগেন ডাক্তারের ওখানে ব'সে তোমার খুব নিন্দে করছিলেন হরিশবাবু। তুমি নাকি দাম্ভিক !—কত রকম সব বলছিলেন।

সামান্য একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হারাণদা বলিয়াই চলিলেন, তোমার নাকি স্বভাব-চরিত্রও আজকাল খুব খারাপ হয়ে উঠেছে! ভদ্রলোকের বাড়িতে নাকি তোমাকে ডাকা বিপজ্জনক!

কি রকম?

রংবাজারের একটা মাগী নাকি তোমার বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা আসে! হরিশবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন। তা ছাড়া তুমি নাকি কচি বয়সের একটা ঝি রেখেছ আজকাল! তোমার না চাকর ছিল আগে একটা?

হ্যাঁ, ঝিটা তারই বউ। সে ছুটিতে বাড়ি গেছে। তার স্ত্রী তার হয়ে কাজ করছে। সে নিজেই রেখে গেছে। আমি বাহাল করি নি।

তোমার রান্না করে কে?

ওই ঝি।

বল কি? ওর হাতে খেতে তোমার প্রবৃত্তি হয়?

ওর স্বামীর হাতে খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল, ওর হাতেই বা হবে না কেন?

হারাণদা একটু চুপ করিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে বলিলেন, এটা ঠিক নয়, ডাক্তার। বলা যায় না কিছুই, দুর্ব্বল মানুষের মন তো। বিচলিত হতে কতক্ষণ?

বিচলিত হয় বইকি।

বল কি?

হ্যাঁ, এখন যেমন বিচলিত হয়েছে তোমার নাকে একটা ঘুষি মারবার জন্যে। এ ইচ্ছাকে যেমন দমন করছি, তেমনই সে ইচ্ছাও দমন করি। ভয় পেও না।

হারাণদা বলিলেন, আমার নাকে তোমার ঘুষি মারতে ইচ্ছে করছে? অপরাধ আমার?

কি দরকার ছিল তোমার এই সব সুসংবাদগুলি বহন ক'রে এনে আমার এমন নির্জ্জন অবসরটা মাটি করবার? কি অপরাধ করেছি তোমার? তোমার বাড়িতে বিনা-পয়সায় দেখি এবং তোমার সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করি, এই?

হারাণদা বলিলেন, আহাহা, অত চট কেন? তোমাকে ভালবাসি, তাই বলছি। না হ'লে কি দরকার আমার?

আচ্ছা, এখন উঠি তা হ'লে।—ভিতরে চলিয়া গেলাম।

নির্জ্জন বাড়ি। এলোমেলো বিছানা। বিছানার উপর একগাদা বই—অগোছালো পড়িয়া আছে। মশারির খানিকটা হাওয়ায় উড়িতেছে। চায়ের বাটিটা পিরিচের উপর কাত হইয়া পড়িয়া আছে—সকালে-খাওয়া চা এখন পর্য্যন্তও ধোওয়া হয় নাই। ঘরে চাবি দেওয়া ছিল, চাকরানীর দোষ নাই। সামনের দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবির উপর দেখিলাম, একটা টিকটিকি—লাঙুল আস্ফালন করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর ছবির উপরে আর একটা। তাহারও লাঙুলে শিহরণ। একটা বই লইয়া ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িলাম। বইটা খুলিতেই একটা দশ টাকার নোট বাহির

হইয়া পড়িল। কবে যেন রাখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। চাঁদ আর মেঘে লুকোচুরি—পুরাতন ছবি, অথচ চিরনূতন।

উতরোল নদীজল কহে থাকি থাকি,
তরী ভাসিল না।
ভাসিতেছি ব'সে ব'সে একান্ত একাকী,
ভালবাসিল না।
দীর্ঘ দিবা-বিভাবরী সমস্ত অন্তর ভরি
রয়েছে তবুও তারে বাহিরে সন্ধান করি।
অন্ধকারে ধীরে ধীরে শেফালি পড়িছে ঝরি,
সে তো আসিল না!
ভাবিতেছি ব'সে ব'সে একান্ত একাকী,
ভালবাসিল না।
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
নিশীথ-গগনে,
অনামা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে হায়,
উতলা পবনে।
মনে হয়, চিত্ত মোর ফুটিয়াছে কদম্বশাখায়,
ছুটিয়াছে মহাশূন্যে বিহঙ্গের উড়ন্ত পাখায়,
বিগলিয়া পড়িতেছে চাঁদিনীতে বিনিদ্র রাকায়
—স্বপনে স্বপনে।
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
নিশীথ-গগনে।

কোথায়? মানুষের কথার এত মূল্য? একবার কথা দিলে তাহার আর নড়চড় হইবার জো নাই? ভালবাসার মূল্য নাই, কথারই মূল্য? আশ্চর্য্য আমাদের সমাজ!

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

একি, এ যে হরিশবাবু!

কি খবর?

একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে। আমার স্ত্রীর হঠাৎ পেটে বেদনা উঠেছে একটা, ছটফট করছে।

হারাণদার কথা মনে পড়িল। মনে করিলাম, যাইব না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, হরিশবাবুর স্ত্রী তো কোন দোষ করেন নাই। ব্যাগটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

হরিশবাবুর ব্যবহারে মনটা ভাল ছিল না।

এমন সময় সকালবেলা ডাকাডাকি করিয়া এক ভদ্রলোক আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখি, একজন চেনা উকিল—দাঁড়াইয়া চশমা মুছিতেছেন।

কিছু মনে করবেন না, ঘুমটা ভাঙালাম।

না না, কিছু না। বসুন। কি খবর?

দুঃসংবাদ। ডাক্তারের কাছে যখন এসেছি, তখন বিপদ নিশ্চয়ই কিছু। তবে একটু 'ফেভার' করতে হবে।

বিরক্ত হইলাম।

বলিলাম, ব্যাপারটা কি আগে শুনি ?

উকিলবাবু আবার চশমা মুছিতে শুরু করিলেন। ফুলহাটির নন্দ মিত্তিরদের চেনেন তো? তাদেরই ফ্যামিলির। আজকাল বেচারারা বড় গরিব হয়ে পড়েছে। তার ওপর রোগও ধরেছে বিষম। চিকিৎসাও হ'ল অনেক রকম। ডাক্তারি, কবরেজি, হোমিওপ্যাথি, হকিমি পর্য্যন্ত। উপস্থিত গঙ্গার ধারে চেঞ্জে আছেন। দেখে ভারি কষ্ট হয়। আপনি তার চিকিৎসার ভারটা নিন।

রূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিলাম, এসব কেসে ফেভার করতে পারব না, মাপ করবেন। আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হ'লে ফী লাগবে।

বড় গরিব কিন্তু।

বেশ তো, আপনার যখন দয়া হয়েছে, আপনিই তাঁর হয়ে ফীটা দিয়ে দিন। আপনি তো গরিব নন। দয়া জিনিসটাও খারাপ নয়। কিন্তু আপনার মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল, তার জন্যে আমার আর্থিক লোকসান করাটা কি ঠিক ?

চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, বেশ তো, ফী আপনার দেওয়া যাবে। কিন্তু ডাক্তারদের কি দয়া-ধর্ম্ম থাকতে নেই? লোকে তো বলে, আপনার দয়া-ধর্ম্ম আছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমার স্বকীয় দয়ার দরুন যা আর্থিক ক্ষতি ও মানসিক অশান্তি, তা তো আমাকে ভোগ

করতেই হয়। তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে। দুনিয়ার লোকের দয়ার বোঝা যদি আমাকে বইতে হয়, তা হ'লে তো আমি নাচার। আমি অক্ষম, স্বীকারই করছি।

উকিল-ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নীরবে চশমা মুছিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, বেশ, তা হ'লে যাচ্ছেন কখন?

বিকেলের দিকে যাব। চারটে পাঁচটা আন্দাজ।

বেশ, তাই ঠিক রইল। যাই তা হ'লে।—বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বলিলাম, বসুন, বসুন। চা-টা খেয়ে যান। অত রাগ করছেন কেন?

উকিলবাবু আবার বসিলেন।

বলিলাম, দেখুন মশাই, আমার ক্রমশ ধারণা হচ্ছে যে, দয়া-দাক্ষিণ্য ক'রে আমরা কিছুতেই কারও উপকার করতে পারি না, অন্তত এদেশে। ওদেশে কি হয় জানি না। নিন, সিগারেট নিন।

উকিলবাবু বলিলেন, দয়া-দাক্ষিণ্য ক'রে উপকার করতে পারছেন না, মানে? বুঝলাম না।

তার মানে, আমি যদি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করি, তা হ'লে আমাকে কেউ আর ডাকবে না। কেউ ডাকেও যদি, তা হ'লেও আমি যা বলব, তা করবে না। আমার প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের ওপর ভক্তি ক'মে যাবে।

না না, তা কি কখনও হয়?

আমি নিজে দেখেছি, তাই বলছি। এই সেদিনই তো

আমাদের পাড়ার একটা লোককে দেখে হঠাৎ আমার করুণার সঞ্চার হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোর? সে বললে যে, বিগত তিন মাস যাবৎ সে জ্বরে ভুগছে। পেটে পিলে লিভার আর জল। দীন দরিদ্র অসহায় ভেবে দয়ার সঞ্চার হ'ল। নিজের সময় খরচ ক'রে তার রক্ত-পেচ্ছাব পরীক্ষা করলাম, দেখলাম, কালাজ্বর। রীতিমত ইন্‌জেক্‌শন না দিলে ম'রে যাবে। কি করি, গাঁটের পয়সা খরচ ক'রে ওষুধ কিনে তার চিকিৎসা শুরু করলাম। ফল কি হ'ল বলুন দেখি?

আশা করি, সে ভালই হয়েছে।

না। সে ছুটো ইন্‌জেক্‌শন নিয়ে স'রে পড়েছে। খবর নিয়েছি, সে এখন রামু কবরেজের দাবাই করছে এবং তার মা নিজের খাড়ু বিক্রি ক'রে অর্থ সরবরাহ করছে। What do you say?

সব ক্ষেত্রেই যে লোকে এমন অকৃতজ্ঞ হবে, তা কে বললে আপনাকে?

আহা, আপনি বুঝছেন না। এটা অকৃতজ্ঞতা নয়, এইই মানুষের স্বভাব। যা সুলভ, আমরা তার মূল্য বুঝি না। দুর্লভের দিকে আমাদের স্বাভাবিক টান। আপনারও, আমারও।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আপনি যদি নিজে আজ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে আমাকে ডাকেন এবং আমি যদি বিনা পয়সায় আপনার

চিকিৎসা শুরু করি, তা হ'লে বড় জোর তিন-চার দিন আপনি আমার চিকিৎসায় টিকে থাকবেন। যদি আপনি ভদ্রলোক হন, আপনি আমাকে বলবেন, অমুক ডাক্তারকে একবার কনসাল্ট করলে হ'ত না? অমুক ডাক্তারকে আপনি তখন টাকা দিয়ে ডেকে তৃপ্তি পাবেন। আপনার টাকা যদি বেশি থাকে, তাতেও আপনার তৃপ্তি হবে না, যতক্ষণ কলকাতা থেকে কোন হোমরা-চোমরা ডাক্তার এসে আপনাকে শোষণ না করছেন। এই করবেন, যদি আপনি ভদ্রলোক হন। আর যারা অভদ্রলোক—যা আমাদের দেশের অধিকাংশ—তারা তিন দিন জ্বর ছাড়তে না দেখলে চতুর্থ দিন আপনাকে না ডেকে বেশি-ফী-ওলা একজন ডাক্তার ডাকবে, আপনার নিন্দে করবে এবং যেহেতু তাকে টাকা দিয়ে ডেকেছে, সেইহেতু তার ওষুধ শেষ পর্য্যন্ত খেয়ে দেখবে। টাইফয়েড অবশ্য যখন সারবার, তখন আপনি সারবে। কিংবা সারবার না হ'লে সারবে না। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয় না। ওটা একটা সস্তায় নাম কেনবার উপায়—আহা, অমুক ডাক্তার দয়ার অবতার! কিন্তু আশ্চর্য্য, অসুখ একটু শক্ত হ'লেই লোকে 'অবতার'কে ত্যাগ ক'রে চামারের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই মনুষ্য-ধর্ম্ম।

উকিলবাবু তখন বলিলেন, কি জানি মশায়!

জানাজানি কিছু নেই, এই হ'ল ফ্যাক্ট। আপনার এই মিত্তির মশাই, ইনি এত চিকিৎসা যে করিয়েছেন, খুব সম্ভবত

কাউকে রীতিমত পয়সা দেন নি। তাই নানা চিকিৎসক চেখে বেড়াচ্ছেন।

হ্যাঁ, তা বটে। সবাই ওঁর ওপর দয়াই করেছেন।

Here you are। সেইজন্যে কারও ওপর বিশ্বাস হয় নি। কারও ওষুধও উনি বোধ হয় ভাল ক'রে খান নি।

আজ বিকেলে তা হ'লে—

হ্যাঁ, চারটের সময় যাব।

উকিলবাবু বিদায় লইলেন।

উঠিতে যাইব, এমন সময় ব্যাগ-হস্তে এক এজেণ্টের প্রবেশ।

নমস্কার। আজ তিন দিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি অমুক কোম্পানিকে রেপ্রেজেণ্ট করছি।—বলিয়া তিনি একখানি কার্ড হাতে দিলেন এবং বলিলেন, এই সব আমাদের লিটারেচার, এই একখানা আপনার জন্যে ডায়েরি, আর এইগুলো সব স্যাম্পল।

ধন্যবাদ।

এই ওষুধটা আপনি ট্রাই করেছেন?—বলিয়া তিনি একটা ঔষধের স্যাম্পল তুলিয়া দেখাইলেন।

না, ওটা এখনও দেই নি কাউকে। নামই মনে থাকে না।

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, ওটা ট্রাই ক'রে দেখুন। থাইসিসে একেবারে ওয়াণ্ডারফুল। কলকাতায় ডক্টর অমুক,

৬

ডক্টর তমুক এ ছাড়া তো আজকাল কিছু লেখেনই না।—বলিয়া তিনি কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারের নামই করিলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন না, কত টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছেন। —বলিয়া একগোছা ছাপানো কাগজ আমার নাসিকাগ্রে ধরিয়া দিলেন। দেখিলাম, নামজাদা কয়েকজন ডাক্তারের সহি-করা প্রশংসাপত্র রহিয়াছে বটে। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

বলিলাম, দেখুন, ওসব ডাক্তারদের নাম বেশি করবেন না আপনারা আমাদের কাছে। তা হ'লে আপনাদের ওষুধের প্রতি যা-ও আমাদের একটু শ্রদ্ধা আছে, ক'মে যাবে। ওসব ডাক্তারদের সম্বন্ধে আমাদের সত্যিকার ধারণা কি জানেন?

কি?

ওঁরা হাতুড়ে ডাক্তার—ডাক্তারী খেতাবধারী পেটেণ্ট মেডিসিনের ভেণ্ডার। ওঁরা দেশের দুঃখ বোঝেন না, রোগীর ভালমন্দ বিচার করেন না, যে ওষুধের বিজ্ঞাপন পান, সঙ্গে সঙ্গে তাই লিখে দেন। যাঁর প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন যত দুষ্প্রাপ্য, তিনি তত বড় ডাক্তার। সুতরাং ওঁদের কথার ওপর সত্যিকার ডাক্তার যাঁরা, তাঁরা মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয় রোগীর খাতিরে, দায়ে প'ড়ে—স্বেচ্ছায় নয়।

রোগীর খাতিরে কেন?

কারণ, রোগীর বিশ্বাস, কোন বড় ডাক্তার দেখলেই রোগ সেরে যাবে। দামী ওষুধ না খেলে ব্যারাম দমবে না।

রোগীরা বৈজ্ঞানিক নয়, তারা সাধারণ মানুষ। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে—যা দুর্লভ, তাই পাবার চেষ্টা করা। আমরা অনর্থক স্বাভাবিক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ন করব কেন? রোগ যদি দুঃসাধ্য হয়, রোগীর যদি পয়সা এবং বিশ্বাস থাকে, আমরা তাকে তার বিশ্বাস-অনুসারে চলতে বাধা না দিয়ে তাকে কোন বড় ডাক্তারের হাতে সঁপে দিয়ে আসি। মরা-বাঁচা! কে কিসে মরে, কে কিসে বাঁচে, জানি না। তবে আপনি যেসব ডাক্তারের নাম করছেন, ওঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। ওঁরা ব্যবসাদার, বুদ্ধিমান, ধনবান; কিন্তু বৈজ্ঞানিক নন। দরকারে পড়লে ওঁদের শরণাপন্ন হই, কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারি না।

এজেণ্ট ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি যা বলছেন, তাই বোধ হয় ঠিক। কি করব বলুন মশাই, আমাদের চাকরি করতে হয় পেটের দায়ে। কোন্ ওষুধ ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সে আপনারাই বোঝেন। তবে এটা ঠিক, এই অঞ্চলে যদি এ ওষুধটার সেল না বাড়ে, তা হ'লে হয় আমাকে আসাম অঞ্চলে বদলি করবে, না হয় দূর ক'রে দেবে।

চকচকে স্যুটের ভিতর হইতে সহসা দীন দরিদ্র বাঙালীমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিল।

প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না।

উপরন্তু বলিতে হইল, আচ্ছা, চেষ্টা ক'রে দেখব। মুশকিল কি জানেন, এসব ওষুধের কম্পোজিশন প্রভৃতি না জেনে লিখতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।

কলকাতায় ওঁরা তো বেশ লেখেন।

হ্যাঁ, সে তো জানি। সেজন্যে আমাদের মাঝে মাঝে অপবাদও সহ্য করতে হয় যে, আমরা আপ-টু-ডেট নই। অনেক রোগী এজন্যে হাতছাড়াও হয়ে যায়। আচ্ছা, রেখে যান, লিটারেচারটা প'ড়ে দেখব।

এজেণ্ট বিদায় লইলেন।

আসিলেন হারাণদা, তাঁহার স্ত্রীর জ্বর ছাড়িতেছে না।

হারাণদার সহিত আসিলেন কুমুদবাবু। তিনি হারাণদার প্রতিবেশী, সবজান্তা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কুইনিনটা আর কত দিন দেবেন ?

আরও দিন দুই চলুক।

আর কুইনিন দেওয়াটা কি ঠিক ? ওটা শুনেছি পয়জন, শরীর গরম করে।

ইচ্ছা করিল, ঠাস করিয়া একটা চড় মারি।

তৎপরিবর্ত্তে হাসিয়া বলিলাম, না, ওতে কিছু হবে না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে আসিলেন রামবরণ সিং। ইনি তেজস্বী পুরুষ। রাগিয়া একজনের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ফাটা-মাথার আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। এখন মকদ্দমা বাধিয়াছে। রামবরণ সিং আসিয়াছেন আমার কাছে

তদ্বির করিতে। আমি একজন প্রধান সাক্ষী। রামবরণ সিং ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

তৃণখণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছি।

বৈকালে ফুলহাটির মিত্রবংশের বংশী মিত্রকে দেখিতে গেলাম। গেটে ঢুকতে গিয়া দেখি, চার-পাঁচটা ছাগল রহিয়াছে। হঠাৎ চোখে পড়িল, ছাদের ওপরেও অনেক ছাগল, আলিসা হইতে গলা বাড়াইতেছে। কি সর্ব্বনাশ, বারান্দা যে ছাগলে পরিপূর্ণ! ব্যাপার কি? ছাগলের রাজত্ব যে!

বৈঠকখানায় বসিয়া ভিতরে খবর পাঠাইলাম। বৈঠকখানাতেও দেখিলাম, ছাগলের অভাব নাই। স্বচ্ছন্দে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এত ছাগল কেন এ বাড়িতে? আমার আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উকিলবাবু বাহিরে আসিলেন। উকিলবাবুটি ইহাদের নিকট-আত্মীয়। বলিলেন, চলুন ভেতরে।

ভিতরে রোগীর ঘরে দেখি, সেখানেও ছাগল। ইহাদের কি মাথা-খারাপ?

জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

এত ছাগল কেন বলুন তো—চতুর্দ্দিকেই দেখছি?

ওঁর বুকের ব্যারাম কিনা! কবিরাজ মশায় বলেছেন, বাড়িতে ও রোগীর ঘরে ছাগল রাখতে।

সর্ব্বনাশ! তাই ব'লে এত ছাগল!

রোগীকে পরীক্ষা করিলাম।

বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভদ্রলোক। মুখময় পাকা দাড়ি ও গোঁফ, ক্রমাগত কাসিতেছেন। সর্ব্বদা জ্বর ভোগ করিতেছেন। বুঝিতে দেরি হইল না যে, যক্ষ্মাই হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় রোগ ঠিকই ধরিয়াছেন। সে কথা আর রোগীর সম্মুখে উচ্চারণ করিলাম না। ছাগল-প্রসঙ্গ চালাইব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দিন থেকে এসব ছাগল পুষছেন? হঠাৎ পাশের ঘর হইতে নারীকণ্ঠে একজন উত্তর দিল, আমি তো বিয়ে হয়ে অবধি দেখছি এই ছাগল। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, পর্দ্দার অন্তরালে কেহ দাঁড়াইয়া আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছেন।

বলিলাম, ছাগল রাখা এ ব্যারামের পক্ষে ভালই।

পর্দ্দার অন্তরাল হইতে কোন জবাব আসিল না।

উকিলবাবু বলিলেন, চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে বসি। আপনার দেখা হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, চলুন।

বাহিরে গিয়া দেখি, বৈঠকখানায় যে চেয়ারটায় আমি বসিয়া ছিলাম, তাহার উপর স-দাড়ি এক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে।

বলিলাম, ছাগল তো একটা সমস্যা দেখছি এ বাড়িতে!

বলেন কেন? তাড়ান দেখি আপনি একটি ছাগল, বংশী-বাবুর মা তা হ'লে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না।

বংশীবাবুর মা বেঁচে আছেন নাকি?

চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, তা আছেন। মহা মুশকিল! কি রকম বুঝলেন?

বুঝলাম যা, তা বলতে ইচ্ছে করছে না।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ উনি বাঁচবেন না। থাইসিস হয়েছে।

দ্রুততর বেগে চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু বলিলেন, বলেন কি? থাইসিস তো ভারি ছোঁয়াচে রোগ, না?

হ্যাঁ, ছোঁয়াচে বইকি।

আপনি থাইসিস ব'লে ডিক্লেয়ার করছেন?

আশঙ্কা করছি। কোন জিনিস জোর ক'রে ডিক্লেয়ার করার মত অহঙ্কার আমার নেই। মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত থাইসিসই। স্পিউটামটা পরীক্ষা ক'রে দেখলে অনেকটা বোঝা যাবে।

তাই করুন তা হ'লে।

কাল তা হ'লে স্পিউটাম পাঠাবেন আমার কাছে। আর এক কথা। রোগীকে এসব কথা বলবেন না যেন। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, কবরেজী চিকিৎসা যেমন চলছে চলুক না। আমাকে আর কেন জড়াচ্ছেন ওর মধ্যে?

না না, আপনাকে কেসটা হাতে রাখতে হবে। আপনার ওপরই আমাদের ফেথ বেশি। বিনা বাক্যব্যয়ে সকালের সেই নূতন ঔষধটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনে লিখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আসিবার সময় উকিলবাবু পুরা ফীই দিলেন।

পরদিন সকালে বংশীবাবুর স্পিউটাম পরীক্ষা করা হইল, যক্ষ্মাই হইয়াছে।

রোজই বৈকালে মৃত্যুপথযাত্রী বংশীবাবুর বাড়ি যাইতে হয়। বাঁচিবে না জানিয়াও যাইতে হয়। লম্বা-চওড়া কথাও বলিতে হয়। থাইসিস শুনিবার পর হইতে উকিলবাবুটি কিন্তু আর এ বাড়িতে পদার্পণ করেন না।

সাবধানী লোক।

প্রায় এক মাস পরে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বংশীবাবুর বাড়িতে গিয়াছি।

বাড়িতে তিনটি প্রাণী। রুগ্ন বংশীবাবু, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা এবং বংশীবাবুর স্ত্রী। উকিলবাবু আর আসেন না। ঝি-চাকর আছে, তাহারাই কাজকর্ম্ম সব করে।

আমাকে প্রায়ই যাইতে হয়। বংশীবাবুর মাতা আমাকে পুত্র-সম্বোধন করিয়াছেন, এবং বংশীবাবুর স্ত্রীও আমার সামনে বাহির হইতেছেন। অল্প বয়স, বছর কুড়ি-বাইশ হইবে।

বংশীবাবুর স্ত্রীর মত অসামান্যা রূপসী সচরাচর চোখে পড়ে না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়া দেখি, বংশীবাবুর স্ত্রী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিলেন, আসুন, বসুন।

বলিলাম, মা কোথায় আপনার?

তিনি শিবমন্দিরে পূজো দিতে গেছেন।

তা হ'লে বংশীবাবুকে দেখি গিয়ে, চলুন। কেমন আছেন আজকাল? কাল টেম্পারেচার কত উঠেছিল?

১০১ পর্য্যন্ত। আপনি কিন্তু এক্ষুনি পালাতে পারবেন না। মা ব'লে গেছেন যে, আপনি এলে যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেন। আমি চুলটা ওঘরে ততক্ষণ বেঁধে নিই। তারপর ওই সব ছাগল তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাতে হবে। এ এক ভাল কাজ হয়েছে আমার!

বধূ চলিয়া গেলেন। আমি বংশীবাবুকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, ক্রমশই দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। বংশীবাবু রোগ-বিষয়ক নানা প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন।

আর রোগ সারিতে কতদিন লাগিবে, হার্টটা কেমন?—ইত্যাকার নানারূপ প্রশ্ন।

দেওয়ালে একটা ঘড়ি টক টক টক করিয়া শব্দ করিতেছে।

আশেপাশে ছাগল ঘুরিতেছে।

বংশীবাবু কাসিতেছেন আর প্রশ্ন করিতেছেন।

আমি বসিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া চলিয়াছি।

মিনিট পনরো পরে চামচিকার মত একটি শিশু কোলে করিয়া বংশীবাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। বলিলেন, চলুন, ওঘরে আপনি বসবেন। ওরে কানাইয়া, তুই বাবুর কাছে একটু ব'স।

আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলাম। যাহার স্বামী মর-মর, তাহার প্রসাধনের এই পারিপাট্য! কপালে খয়েরের টিপটি পর্য্যন্ত পরিতে ভুল হয় নাই। ডুরে শাড়িটি দিব্য কায়দা করিয়া পরিয়াছেন। তা ছাড়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কানাইয়াকে বসাইয়া তিনি আসিলেন আমার সঙ্গে গল্প করিতে!

বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তার চেয়ে চলুন না, বংশীবাবুর ঘরে ব'সেই গল্প করা যাক।

সর্ব্বনাশ! মা এসে যদি দেখেন যে, আমি ওঁর কাছে ব'সে আছি, তা হ'লে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। যে কবরেজ এই সব ছাগল পুষতে পরামর্শ দিয়েছে, সেই ব'লে গেছে যে, এসব রোগে স্ত্রীর সাহচর্য্যও বিষবৎ। মরবার সময় স্বামীর যে একটু সেবা করব, তাও দেবেন না আপনারা? তাঁহার চোখ দুইটা যেন হিংস্র ক্ষোভে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর নিজের মনেই বলিয়া ফেলিলেন, আমার আবার স্বামী-সেবা! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কি জানেন?—গঙ্গায় ঝাঁপ দিই।

কেন?

কেন নয়? আমার কতদিন বিয়ে হয়েছে জানেন? মাত্র চার বছর। আমার বাবা সব জেনেশুনে ওই ঘাটের মড়ার সঙ্গে আমার বিয়ে দিলেন। সবই অদৃষ্ট। না না, দ্বিতীয় পক্ষ নয়—প্রথম পক্ষই। উনি আজীবন কৌমার্য্য

রক্ষা করবেন ঠিক ক'রে জীবনের পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন রোগে ধরল, তখন মায়ের অনুরোধে প'ড়ে বিবাহ করলেন আমাকে—বংশরক্ষার জন্যে। এই দেখুন বংশধর।—বলিয়া সেই চামচিকার মত শিশুটাকে তুলিয়া ধরিলেন। ছেলেটা আচমকা ঘুম ভাঙিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল। আমি কি আর বলিব! চুপ করিয়া রহিলাম। মনে হইল, পিঠের দিকে যেন কিসে একটা ঠেলা দিতেছে! ফিরিয়া দেখি, একটা লোমশ ছাগল।

বংশীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, আমার এখন একমাত্র কাজ হয়েছে—ওই দুর্গন্ধ ছাগলগুলো চরানো আর এই বংশধরকে পালন করা।

সদর-দরজায় শব্দ শোনা গেল।

শুদ্ধ পট্টবস্ত্রপরিহিতা বৃদ্ধা নারী পুত্রের কল্যাণে শিবপূজা করিয়া ফিরিতেছেন।

দুই দিন পরে।

বাড়ি ফিরিতেই ভজুয়া এক চিঠি দিল।

আলো জ্বালিয়া দেখি, একি কাণ্ড! এ যে এক প্রেমপত্র! কোন্ এক কমলা তাহার প্রাণেশ্বরকে লিখিতেছে! খামটা উল্টাইয়া দেখিলাম—আমারই তো নাম লেখা। ডাক্তার না লিখিয়া 'শ্রীযুক্ত' লিখিয়াছে।

এ কি রকম হইল? আমার চিঠি তো নয়। কার এ? পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। বিশ্রী হাতের লেখা,

বানান-ভুলে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে অশ্লীল ইঙ্গিতও আছে, কিন্তু তবু চিঠিখানি পড়িয়া ভারি ভাল লাগিল। কত সরলতা, কত আবেগ, কত আগ্রহ চিঠিখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে! সংসারের কত খুঁটিনাটি সংবাদ, কত তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কত উদ্বেগ!

চিঠিখানি দ্বিতীয় বার পাঠ করিতেছি, এমন সময় ভজুয়া আসিয়া সংবাদ দিল, বাহিরে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন, দেখা করিতে চাহেন।

চিঠিখানি রাখিয়া বাহিরে গেলাম। অচেনা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন যে, পাট খরিদ করিতে তিনি অদ্য এ স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহার নামে একটি চিঠি আসিবার কথা ছিল। ডাকঘরে খোঁজ করিয়াছিলেন, পিওন বলিয়াছে যে, আমাদের উভয়ের নাম এক হওয়াতে, ইত্যাদি।

হ্যাঁ, চিঠি আছে আপনার। ভুল ক'রে খুলে ফেলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

পত্র লইয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনে তরঙ্গ তুলিয়া গেলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইতে গেলাম। ঘুম আসিল না। সে কি সত্যই কোন দিন আসিবে না? সম্ভাবনা তো নাই। যাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা অসম্ভব, তাহাই মানুষ চায়, তাহা লইয়াই মানুষ স্বপ্ন-রচনা করে। সেদিন সকালবেলা এই লইয়া কত বক্তৃতাই না করিলাম! সত্যই তো।

কত রাত্রি হইয়াছে জানি না।

জানালা দিয়া লুব্ধক-নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। কি উজ্জ্বল!

একবার যদি কলিকাতা যাই, সে কি আমার সঙ্গে দেখা করিবে?

না করিবার কারণ তো নাই।

কবে তুমি দেখা দেবে—থেমে যাবে কথা মোর
নীরব হইয়া বাহু-বন্ধে,
তোমারে পাই না কাছে, তাই তো বাসনা ঘোর
কবিতায় কেঁদে মরে ছন্দে।
শরতে বা বরষায়, প্রভাতে বা সন্ধ্যায়
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যে অলকনন্দায়,
তারি কলকল্লোল
ছন্দের তোলে রোল,
—সাগর চুমিতে চাহে চন্দ্রে।
সাগরের মন্ত্র কি শুনেছ কখনো প্রিয়া,
নির্জ্জন সৈকতে একান্ত মন দিয়া?
দেখেছ কি প্রান্তরে,
পবন অশান্তরে,
উন্মাদ বনানীর গন্ধে?

নাঃ, লিখিতেও ভাল লাগে না। কথার পর কথা গাঁথা! কথায় কখনও উদ্বেলিত অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করা

যায়? এ যেন ক্ষুদ্র চামচে সমুদ্রকে ধরিয়া দেখাইবার চেষ্টা। প্রকৃতির মত যদি ভাষা পাইতাম! প্রভাতের সুরঞ্জিত আকাশ বর্ষার ঘনঘোর মেঘে বিদ্যুতের শিহরণ, ঢলঢল পুষ্পের সুবাসিত পেলবতা—কথাহীন, অথচ কি ভাষাময়! কত স্পষ্ট, কত স্বচ্ছ, কত প্রাণময়!

ডাক্তারবাবু!

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দেখিলাম, বংশীবাবুর চাকর কানাইয়া।

কি রে?

জলদি চলিয়ে। বাবুকা হালৎ বড়া খারাপ।

বংশীবাবু তো মারা গেলেন। আর এক বিপদ।—বংশীবাবুর স্ত্রী সত্যসত্যই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন।

ধর—ধর—ধর।

পাড়ার দুইজন উৎসাহী ছোকরা লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া ফেলিল। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, একি! আমি তা হ'লে মরি নি? কেন আমাকে তুললেন আপনারা? আমার জীবনে কি আছে, যার জন্যে আমি বাঁচব? দরিদ্র স্বামীর চিকিৎসায় সর্ব্বস্ব গেছে, স্বামী গেছে, বাপ-মা বেঁচে

নেই; দিনকতক পরে না খেয়ে আমার ছেলেটা আমার চোখের সামনে মারা যাবে। দ'ণ্ডে দ'ণ্ডে মরবার জন্যে বাঁচালেন আমাকে আপনারা? কেন তুললেন বলুন, কেন তুললেন?

বলিবার কিছুই নাই। তাঁহাকে তুলিয়া এবং বাঁচাইয়া সত্যই যেন নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল।

১০

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। ডাক্তারী জীবনের নিত্য ঘটনার তালিকা আর নাই লিখিলাম। হাতে দুইটা টাইফয়েড-রোগী আছে—নিঃসহায়ের মত তাহাদের চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছি। রোগ আপনি বাড়ে, আপনি কমে, আমি মাত্র দুইবার করিয়া তাহাদের বাড়ি গিয়া প্রত্যহ কিছু টাকা লইয়া আসি।

ও-পাড়ার হারাণদার স্ত্রীর যক্ষ্মা হইয়াছে। বেচারীর বাঁচিবার জন্য কি আগ্রহ! অথচ বাঁচিবে না। তাহাকে রোজ সান্ত্বনা দিয়া আসিতে হয়, ভাল হয়ে যাবেন বইকি।

হারাণদা কণ্ট্রাসেপ্শন করিতেছেন।

ঘোষাল-পাড়ার কালাজ্বর-রোগীটা বেশ ভাল হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তাহার পেট-খারাপ হইয়াছে। চিন্তায় আছি।

ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ—মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই। অথচ মজ্জমান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্ব্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি—ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে!

রসুলপুরের রাণীজী ভাল আছেন। তিনি আমাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করেন। আমার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। কুঞ্জলাল আমাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। রাণীজীর জমিদারিতে আমার প্র্যাক্‌টিস একচেটিয়া।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

আসিল, রংবাজারের আসমানী। একি! চেহারা এত খারাপ কেন? খুকখুক করিয়া কাসিতেছে আসিয়া বসিয়া

কি হ'ল তোমার আবার?

আজ মাসখানেক থেকে জ্বরে ভুগছি। কেউ কাছে নেই

যে, একটা খবর পাঠিয়ে জানাই আপনাকে। তা ছাড়া রোজ রোজ যে নিয়ে যাব আপনাকে, সে পয়সা কোথায় পাব ডাক্তারবাবু? মরতে মরতে তাই নিজেই এলাম।

আসমানী হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার গলা, বুক, নাড়ী যথারীতি পরীক্ষা করিলাম। জ্বর আছে।

রক্ত উঠেছিল মুখ দিয়ে?

হ্যাঁ, আজ চার-পাঁচ দিন থেকে একটু একটু উঠেছে কাসির সঙ্গে। কাসতে কাসতে গলাটা চিরে গেছে বোধ হয়।

রাত্রে কি ঘাম হয়?

হ্যাঁ, বিছানা বালিশ একেবারে ভিজে যায়।

বুঝিলাম, করাল রোগে ধরিয়াছে। যক্ষ্মা—আসমানীর জীবন-নাট্যলীলা শেষ হইবার আর বেশি দেরি নাই।

ঔষধ লিখিয়া দিলাম। সে চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে আসব?

তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি যখন ওদিকে যাব, দেখে আসব তোমায়। ফী দিতে হবে না। কোন্‌খানটায় থাক তুমি?

রংবাজারে সেই যে শিবমন্দিরটা আছে, তার সামনের গলিতে আমার বাসা।—বলিয়া সে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আসিলেন হরিশবাবু। তাঁহার স্ত্রীর 'কলিক' আমার

৭

চিকিৎসায় সারিয়াছে। সুতরাং আমি ভাল লোক এবং সেই জন্যই বোধ হয় খগেন ডাক্তারের নিন্দা আমাকে প্রত্যহ শুনিতে হইত, যদি না সেদিন হঠাৎ তাহা থামাইয়া দিতাম।

বলিয়াছিলাম, দেখুন, হরিশবাবু, ব'সে ব'সে কারও নিন্দে-টিন্দে করবার স্থান এ নয়। আপনাদের ক্লাব রয়েছে, 'বান্ধব-সমাজ' রয়েছে কি করতে তা হ'লে ?

হতবুদ্ধি হরিশবাবু বলিলেন, নিন্দে মানে ? খগেন ডাক্তারের মত অমন 'কাট্‌থ্রোট' দুটি আছে নাকি ? এ তো তার মুখের ওপর বলতে পারি আমি। আমি কারু কিছু ইয়ে করি নাকি !

যাই হোক, ওসব আলোচনা আমার এখানে হয়, এটা আমি পছন্দ করি না।

আচ্ছা, বেশ তো।

সেই হইতে হরিশবাবু ও-কথা আর বলেন না।

হরিশবাবু আসিলেন।

হরিশবাবু পুত্রশোক ভুলিয়াছেন।

আসিয়াই বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, 'ওকাসা' জিনিসটা কেমন ? কখনও ব্যবহার করেছেন ?

না, আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনি এ বয়সে ওসব উত্তেজক ওষুধ আর নাই ব্যবহার করলেন !

না না, আমার জন্যে নয়। আমার এক ফ্রেণ্ডের জন্যে।

হরিশবাবুর রসনা যাহাই বলুক, তাঁহার মুখচোখ আসল কথা ফাঁস করিয়া দিল। দুর্ব্বল মানুষ! আমিও তো দুর্ব্বল।

নয়ন মল্লিকের বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন ভোর।

নয়ন মল্লিককে মনে আছে, সেই যাঁহার বাড়িতে মহিন্দরের সঙ্গে দেখা হয়? মল্লিক মহাশয়, দেখিলাম, একটি ভাঙা মোড়ার উপর বসিয়া দাঁতন করিতেছেন।

আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু। ওরে, একটা মোড়া দে।

বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, অসুখ কার?

অসুখ হচ্ছে গিয়ে আমার স্ত্রীর এক গ্রাম-সম্পর্কের দাদা আছেন, তাঁর। তিনি এখানে আসেন প্রায় মাঝে মাঝে। এবার এসে জ্বরে প'ড়ে গেছেন।

মহিন্দরবাবু কোথা?

কি জানি! সে যে কখন কোন্ চুলোয় থাকে, সেই জানে। —বলিয়া খড়ম চটচট করিতে করিতে মল্লিক মহাশয় ভিতরে গেলেন। মল্লিক মহাশয়ের তিন কুলে কেহ নাই, এক পরিবার ছাড়া। শুনিয়াছি, লক্ষপতি লোক। অথচ ঘরদ্বার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহা বোঝা শক্ত। মহিন্দরের কথা মনে পড়িল।

মল্লিক মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চলুন তবে। শ্যামলালকে দেখেই নিন আগে। তারপরে চা-টা হবে এখন, কি বলেন ?

হ্যাঁ, সেই ভাল।

শ্যামলালকে দেখিলাম। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক। জ্বর একটু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কিছু নয়। অর্থাৎ এমন কিছু নয়, যাহার জন্য দূর হইতে পঁচিশ টাকা ফী খরচ করিয়া ডাক্তার আনা প্রয়োজন। সাধারণ ম্যালেরিয়া বলিয়াই বোধ হইল। অথচ ইহার জন্য কৃপণ মল্লিক সহসা কেন এতগুলা টাকা ব্যয় করিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

ফিসফিস করিয়া মল্লিক-পত্নী মল্লিককে বলিলেন, তুমি আহ্নিকটা সেরে নাও না। ডাক্তারবাবু শ্যামদাদাকে ততক্ষণ দেখুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যাই। ত্রস্ত মল্লিক আহ্নিক করিতে গেলেন।

ব্যাপারটা ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। দেখিলাম, শ্যামদাদার জন্য মল্লিক-পত্নীর উৎকণ্ঠার অবধি নাই। নানারূপ প্রশ্নে তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বেদানা কতখানি করিয়া রোজ খাওয়ানো প্রয়োজন, শহর হইতে দামী পেটেণ্ট ঔষধ কি কি আনাইতে হইবে, শরীরটা সারিয়া গেলে ইঁহার পক্ষে বায়ু-পরিবর্ত্তন করিবার উপযোগী স্থান মসুরি, শিলং, না পুরী, এই সব নানা কথা। শেষটা তিনি প্রসঙ্গত বলিলেন, উনি টাকা না দেন, আমি দোব। আপনি যা যা ব্যবস্থা করা

দরকার মনে করেন, সমস্ত খোলাখুলি একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান। হ্যাঁ, আর শ্যামদাদাকে ব'লে যান তো আপনি ভাল ক'রে যে, দুধ খাওয়াটা কত উপকারী এই রোগা শরীরে ; কিছুতে উনি দুধ খাবেন না।

দুধ খাইতে বলিতে আর আপত্তি কি ? বলিলাম।

দেখিলাম, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে, স্মিত মুখে শ্যামলাল নিরানব্বই ডিগ্রী জ্বর লইয়া শুইয়া আছেন, মল্লিক-পত্নী আন্তরিকতার সহিত তাঁহার মাথায় হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন। ভ্রাতৃবৎসলা মল্লিক-পত্নী।

আহ্নিক সারিয়া মল্লিক মহাশয় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। চলুন ডাক্তারবাবু, বাইরে গিয়ে বসা যাক।

বাহিরে বসিয়া চা পান করিতেছি। মল্লিক মহাশয়ের বাড়ির চা যে কি বস্তু, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, চায়ের সহিত তাহার যাহা সাধারণ মিল আছে তাহা এই যে, তাহা গরম।

মল্লিক মহাশয়ও দেখিলাম, প্রাতঃকালীন জলযোগ করিতেছেন—কিছু ছোলাভিজা ও মিছরি। মিছরি খাওয়ার পদ্ধতিটি একটু বিচিত্র। না চিবাইয়া—চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, জিবকে ঠকাচ্ছি ডাক্তারবাবু। তাহার পর মল্লিক কাজের কথা পাড়িলেন, কেমন দেখলেন ?

ভয়ের কোন কারণ নেই, ভাল হয়ে যাবেন।

আচ্ছা, বেদানাটা কি খুব বেশি খাওয়া ভাল জ্বরের ওপর?

দিতে পারেন। আপত্তি কি?

বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

আবার বলিলেন, এবারে কিন্তু ফী-টা কিছু মাপ করতে হবে আমায়। দরিদ্র মানুষ আমি। আপনাদের যথাযোগ্য দর্শনী কি দিতে পারি?

বলিলাম, তা হ'লে আমাদের চলে কি ক'রে বলুন?

আচ্ছা, কিছু কম ক'রে নিন।

এই পৃথিবীতে ভাগ্যিস শ্যামলালদাদারা আছেন, তবু আমরা করিয়া খাইতেছি।

ফী কিছু কমই লইতে হইল।

মল্লিক মহাশয় নাছোড়।

১১

আরও পনরো দিন কাটিয়াছে।

দিনের বেলা কাজ ছিল না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। সে যেন আসিয়াছে। বাগানে নির্জ্জন জ্যোৎস্নায় যেন তাহার সহিত মুখামুখি বসিয়া আছি।

সেই কতকাল আগে—তোমার একটা কবিতায় চিঠি পেয়েছিলাম। আর তো চিঠি লেখ না। ভুলে গেলে আমায়?

না, ভুলি নি। তবে—

তবে কি?

ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তুমি এর আগে এমন ক'রে ভালবেসেছ কাউকে?

হ্যাঁ, নার্স ব্রাউনকে।

আর?

অত মনে নেই। তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি।

আর কবিতা লেখ না আজকাল?

বল তো মুখে মুখে বানাই একটা।

বানাও তো।

স্বপ্নের ঘোরে কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। বেশ মনে আছে, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া বলিয়া চলিয়াছি—

ভুলব কবে কাহার কথা কি ভাবে,
নিজেই আমি জানি না তার খবর;
কোন্ শিখাটি মন যে কবে নিবাবে,
কখন খোঁড়া হবে যে কার কবর—
কেমন ক'রে বলব বল সখী,
নিজের কাছে নিজেই আমি ঠকি।
তোমার চোখে অশ্রুধারা,—ওকি!
হঠাৎ দেখি বিপদ হ'ল জবর।

কাল কি হবে ভাবছ কেন সেসব ?
আজকে তুমি মনিব, আমি নফর।
সখী, আমার সারা হৃদয় জুড়ে যে
আজকে তুমি পেতেছ এই আসন,
জান সেথায় কত আগুন পুড়েছে ?
কতদিনের কত স্মৃতি-নাশন ?
আগুন কত জ্বলে এবং নেবে,
সেসব কথা লাভ কি বল ভেবে ?
অশ্রু মুছে এক্ষুনি তো দেবে
চুম্বনেতে উচ্ছ্বসিত ভাষণ।
ইন্সিওরেন্স প্রেমের চলে কি ?
মানবে কি তা প্রিমিয়ামের শাসন ?

প্রথম মনে লাগল যবে আগুন
লকলকিয়ে রক্ত-রাঙা ঝলকে,
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব তার এখন রাখে বল কে ?
হঠাৎ জ্ব'লে হঠাৎ পুনরায়
দীপ্ত শিখা লুপ্ত হয়ে যায়,
তাহার পানে মন কি ফিরে চায়,
তোমায় দেখে গেলাম ভুলে পলকে ;
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব রাখে এখন তার বল কে ?

পুড়েই যদি যেতাম, হ'ত ভাল কি—
এক প্রেমের আলো এবং ধূমেতে ?
মদির হ'ত তা হ'লে এই আলো কি,
সুধায় ভরা তোমার মধু-চুমেতে ;
ক্ষণিক তরে সকল ভুলে থাকা,
অধরখানি অধর 'পরে রাখা,
শরমভরে সোহাগটিরে আঁকা,
স্বপন দেখে জড়িয়ে ধরা ঘুমেতে ?
পুড়েই যদি যেতাম হ'ত ভাল কি—
এক প্রেমের জ্বালা এবং ধূমেতে ?

পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো—
একই মন্ত্রে একই রকম বলিতে,
প্রতিমাটাই বদল হয় খালি তো।
একটি সুরে বাজল বাঁশী নানা,
সত্যি সখী নাইকো তব জানা ?
একই আগুন ফিরিয়ে দিয়ে হানা
বারে বারেই নানা প্রদীপ জ্বালি তো।
পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো।

আজকে সখী, আকাশ-ভরা জ্যোছনা,
হৃদয় মোর চলছে দ্রুত, গোন তো।

কাঁদছ কেন? সত্যি কথা বোঝ না?
বুকের 'পরে কান পাতিয়া শোন তো।
চকমকিয়ে তুলছে দুটি দুল,
মন্দ বায়ে কাঁপছে দুটি চুল,
বলেছি যা ভুল—সেসব ভুল,
উতল প্রাণ তোমার পায়ে প্রণত।
কাঁদছ কেন? ঠাট্টা তুমি বোঝ না?
বুকের 'পরে কান পাতিয়া শোন তো।

ডাক্তারবাবু!

ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। খক খক খক—বাহিরে কে কাসিতেছে। উঠিয়া কপাট খুলিলাম। দেখি, আসমানী দাঁড়াইয়া আছে। হাতে তাহার একটি পুঁটুলি।

একি আসমানী, হঠাৎ?

আপনি দু-তিন দিন যান নি, তাই একবার দেখাতে এলাম।

কেমন আছ? ভেতরে এস।

ভাল নেই, ডাক্তারবাবু। এবার আমার অসুখটা সারছে না কেন বলুন তো?

সেরে যাবে। দু-চার দিন সময় নেবে।

কমছেও না তো, বরং যেন বাড়ছে, কাল সারা রাত্তির আমার ঘুম হয় নি। সারা রাত ব'সে কেসেছি।

আবার সে খকখক করিয়া কাসিতে শুরু করিল।

একটু পরে সে আবার সসঙ্কোচে বলিল, কিছু যদি মনে না করেন ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলব।

কি কথা, বল।

আমার গয়নাপত্তর যা অল্পস্বল্প আছে, আপনার কাছে এনেছি। আপনি যদি দয়া ক'রে নিয়ে—

তোমার গয়নাপত্তর? আমি নোব কেন?

কতদিন আর বিনা-পয়সায় আপনাকে কষ্ট দোব! সেবার এক শিশি ওষুধ খেয়েই আমার সেরে গেল; এবারে সারছে না কিছুতে। আপনি বরং ভাল ক'রে দেখে একটা ওষুধের ব্যবস্থা করুন।

তাহার মনস্তত্ত্ব বুঝিলাম। সে ভাবিতেছে যে, বুঝি বিনা-পয়সায় দেখি বলিয়া তাহার ভাল চিকিৎসা করিতেছি না। ভিক্ষার চাউল আকাঁড়া তো হইবেই।

তাহাকে বলিলাম, তোমাকে ভাল ওষুধই তো দিচ্ছি। সেবারেও তো তুমি আমাকে কিছু দাও নি। খারাপ ওষুধ দিয়েছিলাম কি?

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া আসমানী কহিল, না। আমি তা ভাবি না। পাঁচীর মা বলছিল কিনা যে, বদ্যির কড়ি না দিলে ব্যামো সারে না। তাই আমি—

আচ্ছা, আগে ভাল হয়ে ওঠ, পরে দিও এখন। দেবার সময় ঢের পাবে।

তা হ'লে একটা ভাল দেখে ওষুধ লিখে দিন, যাতে চট ক'রে সেরে যাই। কতদিন ভুগব!

চোখের কোণে তাহার অশ্রু জমিয়া উঠিল। তাহার সে শ্রী নাই, গালের হাড় দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, বিবর্ণ রক্ত-হীন মুখে জীবনের ভাতি নিবিয়া আসিতেছে, কোটরগত চক্ষু দুইটিতে অস্বাভাবিক জ্যোতি। বসিয়া কাসিতেছে—খক খক খক। তাহাকে বলিলাম, আচ্ছা, এবারে একটা দামী ওযুধ লিখে দিলাম, খাও, ভাল হয়ে যাবে।

অনেক আশ্বাসবাণী দিয়া তাহাকে বাড়ি পাঠাইলাম।

তৃণখণ্ডের আশ্বাস-বাণী!

১২

কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়া ছিলাম জানি না। যতই দিন যাইতেছে, ততই নিজের অসারতা নিজের কাছে ধরা পড়িতেছে। ছদ্মবেশ খুলিয়া খসিয়া যাইতেছে।

জ্ঞানের অহঙ্কার! কতটুকু আমাদের জ্ঞান? এ যেন সামান্য শঙ্কিত দীপশিখা জ্বালিয়া বিশ্বব্যাপী অন্ধকারকে আলোকিত করিবার চেষ্টা! অনেকের প্রদীপে আবার শিখাও নাই, শুধুই প্রদীপটা লইয়া ঘুরিতেছে।

বিবেক? প্রচলিত আইনের মত সমাজের শৃঙ্খলা বজায়

রাখিবার শৃঙ্খল—ন্যায়-অন্যায়-সম্পর্ক-বিরহিত। দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার তোয়াক্কা রাখে না। সময় ও সুবিধা-অনুযায়ী নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করে।

আমার বাহিরে যাইবার 'সুট', ও আমার বিবেক—প্রায় একই বস্তু। 'সুট' বহিরাবরণ মাত্র—আমার জীবন্ত ত্বকের সহিত তাহার আকাশ-পাতাল তফাত।

হঠাৎ বাহিরে কলরব উঠিল।

কে যেন কাহাকে মারিয়াছে! মহা হৈ-চৈ।

ক্ষণপরে হরিশবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত। মাথা দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, কামিজটা ভিজিয়া গিয়াছে।

ব্যাপার কি?

ভজুয়া তাহার মাথায় লাঠি মারিয়াছে।

ভজুয়া? আমার চাকর ভজুয়া?

হঠাৎ? খোঁজ করিয়া যাহা জানিলাম, তাহা এই—

হরিশবাবু নাকি ভজুয়ার স্ত্রীর প্রতি— বাকিটা আর নাই লিখিলাম। ভজুয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, মার ডালেঙ্গে—। অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখিয়াছি।

সমাপ্তি কিন্তু এখানেই নয়।

হরিশবাবু আমারই দেওয়া ব্যাণ্ডেজ মাথায় বাঁধিয়া বন্ধুমহলে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, আমারই প্ররোচনায়

ভজুয়া তাঁহাকে মারিতে সাহস করিয়াছে। তা না হইলে ভজুয়ার সাধ্য কি— ইত্যাদি।

লোকটাকে চাবকাইয়া দিব ?

কিন্তু আমি অশিক্ষিত ভজুয়া নই। সে যাহা পারে, আমি তাহা পারি না। সুতরাং বোধ হয় মনে মনে হরিশবাবুকে ক্ষমাই করিলাম, এবং প্রত্যহ তাঁহার ফাটা মাথা জোড়া দিবার চেষ্টায় স্মিত মুখে ড্রেস করিয়া চলিতে লাগিলাম।

কে ?

হরিশবাবুর চাকর—রামধন।

হরিশবাবুর স্ত্রী, আমার জন্য একটু তরকারি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভদ্রমহিলা সত্যই আমাকে স্নেহ করেন।

অথচ স্বামী-স্ত্রী।

এক খানা চিঠি হাতে করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

নয়নবাবুর পত্র—নয়ন মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন, মহিন্দর জেলে গিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষও পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছেন ; শ্যামলাল সহকারী।

নয়নবাবু লিখিতেছেন, সংসারে আর সুখ নাই। মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে। আমার নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি কোন সৎকার্য্যে দান করিয়া যাইতে চাই। আমি একটা উইল করিতে চাই যে, আমার পত্নী—যেখানেই থাকুন—আমার সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণ-খরচা পাইবেন। তাঁহাকে আমি ভালবাসিতাম। একটা ভুল করিয়াছেন সত্য। কিন্তু উদরের দায়ে যেন সে ভুলটাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য না হন—এই আমার অভিপ্রায়। আমিও তো ভুল করিয়াছিলাম, এই বয়সে একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া। ভুলের কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইতে চাই। আমার বাকি টাকা ও সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষা প্রচারের জন্য খরচ হউক—ইহাই আমার ইচ্ছা। আপনাকে ট্রাস্টী করিতে চাই। আপনার মতামত ও পরামর্শ জানাইবেন।

ভাবিতেছি, মানুষের কতটুকু চিনি আমরা!

আচ্ছা, তাহাকেও কি আমি ঠিক চিনিয়াছি? সেই কি তাই, যাহা আমি ভাবি? সে তো আমার এত ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়া অপরের বাগ্‌দত্তা হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে একছত্র চিঠিও লেখা দরকার মনে করে না। তবে কি— কিন্তু হায় মানুষের মন! সমস্ত যুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে—

মনে হয় যেন বাতায়নে আছ দাঁড়ায়ে একা,
ঘুমায় সকলে, শয়ন-ঘরের নিবেছে বাতি,
আঁধারের বুকে চাহিছ আমার বারেক দেখা,
আকাশ জুড়িয়া থমথম করে নিশীথ-রাতি।
মেঘের মতন উদাসী হৃদয় ভাসিয়া চলে,
মূর্ত্ত কামনা জ্বলিছে নিবিছে তারার দলে,
সহসা নয়ন ভরিয়া উঠিছে নয়নজলে,
ক্ষণিকের তরে চাহিছ আমার স্বপন-সাথী।
এ কি মিছে কথা? হয়তো বা তাই—ব'লো না তবু,
ভেঙো না সে ভুল—ভেঙো না, এ ভুল
অনেক দামী,
হোক মিছে কথা, কল্পনা হোক, ভেঙো না কভু,
ভেঙো না, ভেঙো না, ভুলেরই স্বপন দেখিব আমি
যদি কভু মোরে ধরা নাহি দাও সর্ব্বনাশী,
তোমারি স্মরণে বাজুক আমার বিরহ-বাঁশী,
ছলনা তোমার, চাহনি তোমার, তোমার হাসি
নানা সুরে মোরে আকুল করুক দিবস-যামী।

১৩

ডাক্তারের দিন কাটিতেছে।

রোগী বাঁচে, রোগী মরে, টাকা রোজগার করি। বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। আবার যেদিন 'কল' কম থাকে, সেদিনও

শান্তি পাই না। কি চাই? বুঝিতে পারি না। এইজন্যই বোধ হয় মানুষ শেষবয়সে ভগবানকে চায়, অর্থাৎ এমন একটা জিনিসকে আকাঙ্ক্ষা করে, যাহা পাওয়া যায় না। সুতরাং মোহ ফুরায় না, শিশুর চাঁদ পাওয়ার মত। আমি মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়া চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু যদি কোন ছবি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, সে ছবি ভগবানের নয়, তাহার। অবর্ণনীয় সে চাহনি!

জীবনের গোনা দিনগুলি একে একে ফুরাইয়া যাইতেছে। এ জীবনে আর তাহাকে পাইলাম কই? পাই নাই? আমার সমস্ত প্রাণ মন পরিপূর্ণ করিয়া এই তো সে অহরহ বসিয়া আছে, তবু তাহাকে পাই নাই? তাহাকে বাহিরে চাই, বাহিরে পাইয়া হারাইতে চাই। আশ্চর্য্য!

সত্যই তো, জীবনের দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে, একদিন মরিয়া যাইব। তাহাকে পরজন্মে পাইব কি? পরজন্ম কি আছে? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, আছে। বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, এই জীবনের পরপারে আবার আমাদের মিলন হইবে। সেখানে সে কাহারও বাগ্‌দত্তা নয়। সেখানে সে কেবল আমার—আমারই।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

আসিলেন ঝাঁকড়া-ভুরু।

ডাক্তারবাবু, আপনি কি আসমানীর চিকিৎসা করছিলেন?

৮

হ্যাঁ, কেন বলুন তো ?

চলুন একবার দয়া ক'রে, তার অবস্থা বড় খারাপ।

আসমানীকে আপনি চিনলেন কি ক'রে ?

সে আমার মেয়ে।

আপনার মেয়ে ?

হ্যাঁ, আমারই মেয়ে, বাড়ি থেকে এক ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেই থেকে খুঁজছি তাকে। সেইজন্যেই অসুখের মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে ছুটি নিচ্ছি। আমার অসুখ-টসুক সব মিছে কথা। আমার আসল অসুখ এই।

ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কার মুখে শুনেছিলাম, হতভাগী এইখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আজ তাকে পেয়েছি, কিন্তু এ কি অবস্থায় পেলাম! কি হয়েছে তার ? তার মুখে শুনলাম, আপনি তার ওপর অনেক দয়া করেছেন। বলুন না ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে তার ? বাঁচবে তো ?

বলিতে পারিলাম না।

কেবল বলিলাম, চলুন, গিয়ে দেখি।

আসমানী মরিয়াছে।

সবাই মরিবে। আমিও মরিব, হয়তো কালই। তাহার কথা কেবলই ভাবিতেছি। আসমানীর নয়, তাহার। আশ্চর্য্য

মানুষের মন! এ সময় সে আসিয়া মন জুড়িয়া বসিল। এই তো জীবন, আজ আছে কাল নাই।

আঁধার—আঁধার খালি, চতুর্দ্দিকে গাঢ় অন্ধকার,
তীব্র বেগে বহিতেছে বায়ু,
খুঁজি কারে হাতে ল'য়ে ক্ষুদ্র দীপ ত্রস্ত শিখা তার,
অতি অল্প অনিশ্চিত আয়ু।
অচিরাৎ বায়ুবেগে নিবে যাবে ক্ষুদ্র দীপশিখা,
অকস্মাৎ অন্ধকারে চূর্ণ হবে স্বপ্ন-অট্টালিকা,
স্রোতমুখে তৃণখণ্ড। বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা,
দুঃখে সুখে কাঁপে তার স্নায়ু।
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য-লিপিকা
ল'য়ে অল্প অনিশ্চিত আয়ু।

বৈতরণী-তীরে

"বনফুল"

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস

২৫।২ মোহনবাগান রো

কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৪৩
দ্বিতীয় সংস্করণ—কার্ত্তিক ১৩৫১
পুনর্মুদ্রণ—বৈশাখ ১৩৫৩

মূল্য দুই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—২৫. ৪. ৪৬

উৎসর্গ

পূজনীয়
পিতৃদেবের শ্রীচরণে

ইহা শুধু ভূতের গল্প নহে—বর্ত্তমানেরও গল্প এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেরও।

ভাগলপুর
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

"বনফুল"

মড়া কথা কহিতেছে।

বই হাতে করিয়া একা জাগিয়া আছি। আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে।···কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না। আমি নিজে ডাক্তার, ঘুমের কোন ঔষধ বাকি রাখি নাই। নরম বিছানা শক্ত বিছানা নানা রকম করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই কিছু হয় না। ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিলেও যাহা ফল, আলো জ্বালিয়া রাখিলেও তাহাই। আলোর রঙ বদলাইয়াও দেখিয়াছি, পয়সা খরচ হয় মাত্র, ঘুম হয় না। চোখ বুজিয়া কতদিন এক হইতে এক হাজার পর্য্যন্ত গণনা করিয়াছি, কল্পনা করিয়াছি, পাহাড় বাহিয়া মেষের পাল নামিতেছে—এক, দুই, তিন, চার···দশ··· বিশ···শত···সহস্র। ঘুম আসে না। কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না।

অন্ধকার দুর্য্যোগের রাত্রে বই হাতে করিয়া জাগিয়া আছি। আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে। ইহাদের এককালে আমি চিনিতাম, প্রত্যেককে আমি চিরিয়াছি। সরকারী চাকুরির দৈনন্দিন কর্ত্তব্য ; রোজ মড়া চিরিতে হয়। অনেক চিরিয়াছি। তাহাদেরই কয়েকজন আজ আমার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কথা কহিতেছে। সকলেই নিজের কাহিনী শুনাইতে ব্যগ্র।

"তুমি তো জান, আমি আফিং খেয়ে মরেছিলাম। আমার পেট চিরে সে খবর তুমি বার করেছিলে—ছুরি দিয়ে চিরে। উঃ, কি ধারালো তোমাদের ছুরিগুলো—কি চকচকে! কিন্তু একটা খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। আফিং খাওয়ার আগেই আমি মরেছিলাম। সে খবর আমার পেটে ছিল না—মনে ছিল। মনকে তো আর ছুরি দিয়ে চেরা যায় না। যতই ধারালো হোক না কেন তোমাদের ছুরি।"

একটি উদ্ভিন্নযৌবনা ষোড়শী সুন্দরী। মুখখানি এখনও কোমল। অমন সুন্দর ধপধপে গায়ের রঙ অহিফেনের বিষে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটি অর্দ্ধবিকশিত নীলপদ্ম। একটু থামিয়া মেয়েটি আবার বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, আমি আগেই মরেছিলাম। মৃত্যু কত রকম হয় জান? তোমরা তো মরণ নিয়ে দিনরাত কারবার কর? আত্মা অমর ব'লে জান তো? সেটা মিছে কথা। আত্মাও মরে। তোমাদের চারপাশে কত যে জীবন্ত শব রোজ ঘুরে বেড়ায়, তা যদি টের পেতে! কেউ হয়তো তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেউ হয়তো পিতা, কেউ স্ত্রী। অনেকের আত্মা ম'রে যায়, তোমরা বুঝতে পার না। তাদের মৃত আত্মার দুর্গন্ধ তাদের কথায় ব্যবহারে চিন্তায় সকলকে অতিষ্ঠ ক'রে তোলে, তবু তোমরা বুঝতে পার না যে, তারা মড়া। তবু তাদের তোমরা পুড়িয়ে ফেল না। আমারও আত্মা ম'রে গিয়েছিল।"

বলিয়া একটু হাসিয়া মেয়েটি বলিল—"তুমি ভাবছ, প্রেমের

গল্প শুরু হ'ল এবার। প্রেমের নয়—মৃত্যুর। সে প্রণয়ী নয়, যম। কিন্তু কি মনোহর সে! তার দোষ ছিল না তত। আমিই তাকে ফাঁদ পেতে ধরেছিলাম। নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে এনেছিলাম। সাপুড়ে যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, আমিও ঠিক তাকে তেমনই খেলিয়েছি। আমার বাঁশীর তানে মুগ্ধ হয়ে সেই চিক্কণ চিত্রিত বিষধর কত খেলাই না খেলেছে ফণা বিস্তার ক'রে! নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু একদিন সে দংশন করলে—করাল সে দংশন। মারা গেলাম।" বলিয়া সে চুপ করিল।

আমার টেবিল-ল্যাম্পটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছোট বড় নানা রঙের পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ একটা বড় রঙিন ফড়িং আসিয়া ডানা ঝটপট করিয়া বাতিটার কাচের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুইজনে নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আবার সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমার সে মৃত্যুর খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। সে শোচনীয় মৃত্যু। জননী হয়ে সন্তানহত্যা। হেসো না। আমি একা হত্যা করি নি। সমাজ শিশুটার পা ধরেছিল, শাস্ত্র হাত ধরেছিল, আমি তার টুঁটি চেপে ধরেছিলাম। রুদ্ধ আর্ত্তনাদ ক'রে সে ম'রে গেল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমিও ম'রে গেলাম। আমার আত্মা, আমার ইহলোক, পরলোক সমস্ত একসঙ্গে ম'রে গেল—শোচনীয় সে

মৃত্যু। সমাজ কিন্তু এখনও মরে নি, শাস্ত্র এখনও বেঁচে আছে আমার এ মৃত্যুর খবর তুমি জানতে ?"

"না৷

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে তোমার ?"

"আমি কিছু বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা ?"

"না।"

মেয়েটি উৎসুক নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি হইতে একটা অব্যক্ত বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে। মিনতি করিয়া সে আবার বলিল—"আমি মিছে কথা বলি নি ডাক্তারবাবু। বেঁচে থাকতে অনেক মিছে কথা বলেছিলাম, এখন যা বলছি সব সত্যি। আফিং খেয়ে মরেছে আমার দেহটা, আমি মরেছি তার পূর্ব্বে। আমার সে শব-জীবন ব'য়ে বেড়াতে পারলাম না। আফিং খেয়েছিলাম বাঁচবার আশায়। আমি আবার বাঁচতে চাই—সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়ে বাঁচতে চাই—বিশ্বাস কর—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া একটি যুবক আগাইয়া আসিল। তাহার মাথার খুলিটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। একটা ফাটল দিয়া খানিকটা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখময় খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি—যেন কয়েক দিন কামানো হয় নাই।

যুবকটি বলিতে লাগিল—"দেখ, পৃথিবীর মানুষের কাছে দুঃখের কথা জানানো বৃথা। তা কি আজও বোঝ নি ? এরা যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না—

বুঝতে পারে না। ওরা এক রকম সোনাই চেনে, স্বার্থের কষ্টিপাথরে যার দাগ পড়ে। পৃথিবীর বাকি সব জিনিস ওদের কাছে বাজে।"

বলিয়া লোকটি আগাইয়া আসিয়া আমার টেবিল-ল্যাম্পটার কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া পোকাগুলা দেখিতে লাগিল। বিচিত্রবর্ণ ফড়িংটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সে হাসিয়া বলিল—"যখন বেঁচে ছিলাম, এদের নিয়ে কবিতা লিখেছি। কত রকম উপমাই যে দিয়েছিলাম! নারী যেন আলোকের শিখা, পুরুষ যেন পতঙ্গ। পতঙ্গ আলোকশিখার মোহে তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভারি মুখরোচক সব উপমা!" লোকটি আবার খানিকক্ষণ সেই আলোক-লুব্ধ পতঙ্গটির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—"পৃথিবীর মানুষ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না। নিঃস্বার্থভাবে তারা যা করে, তার মধ্যেও স্বার্থ আছে—আত্মতৃপ্তি। আমি ছিলাম কবি। কারও কোন অনিষ্ট করি নি। নিজের মনে নিজের কোণে থাকতাম। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে খুব কমই আমার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু সবাই আমাকে এমন ভুল বুঝতে শুরু করলে যে, স'রে পড়তে বাধ্য হলাম। আমার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ঠিক করেছিল, আমি পাগল। ছন্দের পর ছন্দ গেঁথে যার বন্দনা করলাম, সে সুদ্ধ আমাকে ভুল বুঝলে, সে সুদ্ধ আমাকে—" বলিয়া ছোকরা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতেই বলিতে লাগিল—"এখন শুনেছি, সে নাকি অনুতাপ করে। শুনেছি, আমার মৃত্যুর পর সেও নাকি মরেছে। কোথা গেছে খুঁজে পাই না। এখানে যাদের দেখি, সবাই অচেনা। যদি দেখতে পাও তাকে, ডেকে দিও তো আমার কাছে।"

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তাকে ভালবাসতেন?" কবি কোন উত্তর দিল না। তাহার সমস্ত মুখখানা সহসা রক্তবর্ণ হইয়া আবার কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মাথার ফাটলটা দিয়া আরও খানিকটা মস্তিষ্ক গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কোন কথা সে বলিল না।

মেয়েটি বলিল—"উত্তর দিচ্ছেন না যে?"

"ও কথা জিজ্ঞাসা ক'রো না। 'ভালবাসতাম' এই কথাটা এত সস্তা, এত বেশি রকম খেলো হয়ে গেছে যে, ওটা ব্যবহার করতে আমার লজ্জা হয়। মনে হয়, তাকে অপমান করা হবে। মনে আছে, একবার একটা কবিতায় লিখেছিলাম—

আমার মনের রঙিন কথাটি
মনের ভিতরে আছে,
তাহারে মূরতি দিবে বলি মোরে
কবিতা আসিয়া যাচে।
এত রঙ তার আছে কি ভাষায়?
ভয় হয় মোর খালি,
কলমের মুখে লিখিতে গিয়া সে
লাগাইয়া দিবে কালি।"

মেয়েটি আবার প্রশ্ন করিল—"কেমন দেখতে সে?"

"দেখতে? কালো রঙ। এক পিঠ চুল। বড় বড় চোখ। মুখে তার হাসি লেগেই আছে। ঠোঁটে যখন হাসি থাকে না, চোখ দুটি হাসে। আশ্চর্য্য তার হাসি! আমি যেদিন রাত্রে রিভল্‌ভার দিয়ে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিলাম, শুনেছি, ঠিক তার পরদিনই সেও পুড়ে মরেছে—গায়ে কেরোসিন তেল লাগিয়ে। কেন সে মরতে গেল? তার অমন স্বামী, অমন সংসার। তার যদি দেখা পাও—এ কি, কোথা গেলে?"

সন্তান-হত্যাকারিণী নিঃশব্দে কখন মিলাইয়া গিয়াছিল, কবি জানিতেও পারে নাই। সে তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—

"দেখুন, তাকে যদি কখনও দেখতে পান, আমার কথা বলবেন। বলবেন, আমি তাকে খুঁজছি। বলবেন, সেদিন রাত্রে তো কিছুই বলা হয় নি, দেখা পেলে এখন বলব। সে আমাকে ভুল বুঝেছিল—তার ভুলটা ভেঙে দিতে চাই।"

বলিয়া যুবক বাহিরে চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

আশেপাশে কাছে দূরে শবেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

হঠাৎ কে যেন কথা কহিয়া উঠিল।

দেখিলাম, বিচিত্রবর্ণ সেই প্রজাপতিটি বলিতেছে—

"হে মনুষ্যনির্ম্মিত বর্ত্তিকা, তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে আলোকশিখা, হে বন্দিনী, তোমার দুর্দ্দশা দেখিয়া অনুকম্পায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া

উঠিয়াছে। মানবের হস্তে ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তুমি, বিধাতার অভিপ্রেত এই বিপুল অন্ধকারকে বিদূরিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতেছ। অন্ধকারকে তুমি আলোকিত করিতে পার না—শুধু তাহার স্নিগ্ধতাটুকু নষ্ট করিয়াছ। তোমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব যে কতদূর হাস্যকর, তাহা তুমি নিজেও বুঝিতে পার না। তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে।”

কম্পিত আলোকশিখা তাহাকে সভয়ে প্রশ্ন করিল—“কে তুমি ?”

“আমি ? আমি আলোকের উপাসক। সুদূর আকাশচারী প্রদীপ্ত সূর্য্য আমার উপাস্য দেবতা। আমার এই বহুবর্ণ-বিচিত্রিত পক্ষ দুইটিতে ভর করিয়া প্রতিদিন তাঁহারই উদ্দেশ্যে আকাশযাত্রা করি। কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারি না, দুর্ব্বল পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর টানে আবার মাটিতে নামিয়া আসি। দিবাকর অস্তাচলগামী হয়—অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। অন্ধকারের গভীর নিবিড়তায় আমি সেই মহাজ্যোতিষ্মান সূর্য্যেরই ধ্যান করিতেছিলাম। তুমি আমার তপোভঙ্গ করিয়াছ। তোমাকে আমি অভিশাপ দিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে নকল জ্যোতিষ্ক, হে ছদ্মবেশী অহঙ্কার, হে কালিমাবিতরণকারী কেরোসিন-শিখা, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি নির্ব্বাপিত হও।”

আলোকশিখা কাঁপিতে লাগিল।

"আইন বিশ্বাস কর ?"

একটি ছিপছিপে পাতলা যুবক আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল। খড়্গের মত তাহার নাকটা। শীর্ণ মুখের কোটরগত চক্ষু দুইটিতে অস্বাভাবিক তীব্রতা। তাহা জ্যোতি নয়—জ্বালা। মাথার সম্মুখ দিকটা কেশবিরল। বাকি চুলগুলি দীর্ঘ—অবিন্যস্ত। কানের কাছের দুই গোছা চুল ললাট ও কপোলের খানিকটা অংশ ঢাকিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন দুই টুকরা অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শীর্ণ সূচালো চিবুকের উপর দুই-চারিগাছা রোম উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"আইন বিশ্বাস কর ? আইন ? যার জন্যে এত আদালত, এত জজ, এত কেতাব, এত উকিল—এত সব ? যে আইনকে সাহায্য করবার জন্যে তুমি দিবারাত্রি ছুরি হাতে ক'রে ব'সে আছ ? বিশ্বাস কর সেই আইনে ?" তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল—চাহিয়া দেখিলাম, যেন দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তাহার নাসারন্ধ্র হইতে উষ্ণ বাষ্প বাহির হইতেছে। মুখখানা সে আমার আরও কাছে লইয়া আসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার তপ্ত নিশ্বাস যেন আমার মুখে লাগিতে লাগিল। অধর দুইটি সহসা কাঁপিয়া উঠিল—"বিশ্বাস কর আইনে ?"

বলিলাম—"করি বইকি। আইনে বিশ্বাস না করলে বাঁচব কি ক'রে ?" লোকটির অধর দুইটিতে এক ঝলক বিদ্যুতের মত

একটা তীক্ষ্ণধার হাসি খেলিয়া গেল। জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিতে লাগিল—"ও, ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি যে এখনও বেঁচে আছ। তুমি তো করবেই। সমাজের জীবন্ত মানুষ তুমি। তুমি তো বিশ্বাস করবেই আইনে—তুমি তো বিশ্বাস করবেই—তুমি তো বিশ্বাস করবেই।" বলিয়া সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল। তাহার পর আবার আপন মনেই যেন বলিতে শুরু করিল—"যতক্ষণ ভাঁড়ার-ঘর আছে, ততক্ষণ ইঁদুর ধরবার জন্যে কল তো পাততেই হবে। কচাকচ সেই কলে রোজ ইঁদুর পড়বেই। ইঁদুরের বিচার করবার অবসর জীবন্ত মানুষের থাকতে পারে না। 'স্ট্রাগ্‌ল্ ফর একজিস্‌টেন্স্'—সুন্দর কথাটা বার করেছ তোমরা। ওই এক মন্ত্র আউড়ে লক্ষ কোটি বলি হচ্ছে। আইন তোমরা তো বিশ্বাস করবেই। আমিও যখন বেঁচে ছিলাম, অনেক মামলা করেছি। প্রগাঢ় ভক্তি ছিল আইনের ওপর। অনেক উকিলের অনেক পকেট আমার টাকায় ভর্ত্তি হয়েছে। সে কি সোজা ভক্তি? বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই বলছে—'পারবে না, হেরে যাবে, ছেড়ে দাও।' আমি কি সহজে ছাড়ি? আইন-আদালতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তখন আমার। ভক্তির পুরস্কারও পেয়ে গেলাম। দেশসুদ্ধ লোকের সামনে সেদিন আইনত প্রমাণ হয়ে গেল, আমার স্ত্রী সতী আর নির্ম্মল একজন সচ্চরিত্র যুবক। 'অনারেব্‌লি অ্যাকুইটেড'। আইন! এখন আর আইনে বিশ্বাস করি না, টাকায় বিশ্বাস করি। নির্ম্মল ছোকরার অনেক টাকা ছিল।"

লোকটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। যে বইটি পড়িতেছিলাম, তাহাই আবার তুলিয়া পড়িতে শুরু করিলাম। ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের গল্প। একটি বিদেশী যুবককে একটি ল্যাপ-যুবতী পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতেছে। যুবকটি বলিতেছে—

"মেয়েটি আমার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর তার চেহারা আর কি অপূর্ব্ব তার বেশ! বল্‌গা-হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি তার অঙ্গচ্ছদ, মাথায় লাল উলের টুপি। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট্। বেল্টে হলুদ আর নীল সুতোর কাজ করা, বেল্টের গায়ে খাঁটি রূপোর বড় বড় ডুমো ডুমো বোতাম—কোনটা চৌকোনা, কোনটা গোল। বেল্টে ঝুলছে একখানা ছোরা, তামাকের একটা থলি আর জল খাবার একটা মগ। গাছপালা কাটবার জন্যে একটা ছোট কুড়ুলও গোঁজা রয়েছে দেখলাম। তার পায়ের গোছ নরম সাদা বল্‌গা-হরিণের চামড়া দিয়ে ঢাকা—লেগিং বলে তাকে। পরনে হরিণের চামড়ার ব্রিচেস। গোছের লেগিং ব্রিচেসের সঙ্গে বেশ শক্ত ক'রে আঁটা। পায়েও হরিণের চামড়ার জুতো—নীল সুতো দিয়ে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। পিঠে তার বোচকা। বোচকাটি বার্চ-গাছের ছাল দিয়ে তৈরি, আর তাতে আছে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিস। আমার কাঁধেও একটা বোচকা ছিল; কিন্তু ও বোচকাটা ডবল ভারী।

২

বড় বড় ঢালু পাহাড়ের ওপর দিয়ে সে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। নিঃশব্দ তার গতি। সামনে গাছের গুঁড়ি বা ছোট পাহাড়ী নদী পড়লে অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। সামনে হয়তো একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড—খুব উঁচু। পথ রোধ ক'রে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি হরিণীর নৈপুণ্যে তার ওপর লাফিয়ে উঠে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, পথ কোন্ দিকে! পাহাড় থেকে নেমে দেখলাম, একটা বেশ বড় স্রোতস্বিনী। বেশ চওড়া—লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না। ভাবছি, কি ক'রে পার হব! দেখি, মেয়েটি নিঃশঙ্কচিত্তে জলে নেমে পড়েছে। আমিও তার অনুসরণ করলাম। সেই তুহিনশীতল বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম—"

"ওটা কি পড়ছ ?"

দেখিলাম, সেই আইন-পাগল লোকটি আবার আসিয়াছে। তাহার জ্বলন্ত চোখ দুইটা আমার মুখের উপর রাখিয়া সে বলিল—"ওসব গল্পের বই রাখ। আমার কথা শোন এখন। তখন কতদূর বলেছিলাম ?"

"নির্ম্মল অনারেবৃলি অ্যাকুইটেড হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, অনারেবৃলি অ্যাকুইটেড। খবরের কাগজে সে কি আন্দোলন! আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল—কি ইচ্ছে হয়েছিল বল তো ?" বলিয়া আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর আমার মনের কথাটা যেন পড়িয়া লইয়া তীব্র ব্যঙ্গহাস্যে বলিয়া উঠিল—"না না, আপীল করতে নয়,

খুন করতে। হাতে কিন্তু একটি পয়সা ছিল না। খুন করব কি ক'রে? বন্দুক না হ'লেও অন্তত পক্ষে একটা ছোরা চাই তো। হাতে এমন একটি পয়সা ছিল না যে, ছোরা কিনি। অস্ত্রের মধ্যে ঘরে ছিল একটা ভোঁতা জাঁতি আর তার চেয়েও ভোঁতা একটা বঁটি। আইনের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্রও যার কাছে ব্যাহত হয়ে ফিরে এল, তাকে খুন করতে হ'লে খুব শানিত হাতিয়ার দরকার। অর্থাৎ খুন করতে গেলেও পয়সা চাই। নিতান্ত নিঃস্ব যে, সে কাউকে খুন করতে পারে না; বিশেষত সে যদি আমার মত দুর্ব্বল হয়।"

বলিয়া সে হাসিতে লাগিল। বিশ্রী সে হাসি। মনে হইতে লাগিল, যেন চিতার আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

একটু পরে সে আবার বলিল—"ভেবে দেখলাম, দুর্ব্বলের মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। মৃত্যুই তার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র পথ। কিন্তু একটি কথা আমার বিশ্বাস কর—মরতে আমার বড় কষ্ট হয়েছে। মরবার ইচ্ছে ছিল না। আমি অপেক্ষা করেছিলাম—হ্যাঁ, তার জন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম। সে অসতী জেনেও তাকে আমি ভালবাসতাম। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো অসতী ব'লেই বেশি ভাল লাগত তাকে। তা ছাড়া ভালবাসা ভাল-মন্দ সতী-অসতী বিচার করে না। ভেবেছিলাম—আশা করেছিলাম, সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না।

নির্ম্মলের প্রকাণ্ড চকচকে মোটরখানা চ'ড়ে সে আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমার ভাঙা কুঁড়েতে সে এল না।

তখন মৃত্যুরই শরণ নিলাম।

দেখলাম, উঠানের কল্‌কেগাছটায় অনেক ফল ধরেছে— অজস্র। যত্ন ক'রে গাছটা ছেলেবেলায় পুঁতেছিলাম, সে আমাকে স্নেহভরে ডাক দিলে। আকুল আগ্রহে ছুটে গিয়ে তার ফলগুলো কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খেলাম। মৃত্যু হ'ল বটে, কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সায়ানাইড খেলে শুনেছি কোন কষ্ট হয় না—"

"বাজে কথা।"

আর একজন আগাইয়া আসিল।

"আমি সায়ানাইড খেয়ে মরেছিলাম। ভয়ঙ্কর কষ্ট। তা ডাক্তারবাবু জানেন, কত কষ্ট! কিন্তু কষ্ট পেয়েছি ব'লেই সুখী, আরও কষ্ট পেলে আর একটু তৃপ্তি পেতাম। প্রায়শ্চিত্তটা পুরো হয়ে যেত। ভাবছ, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমি এত ব্যগ্র কেন?— এ কি, কোথা গেল!" কল্‌কেফুলের বিচি খাইয়া যাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে তখন অন্তর্দ্ধান করিয়াছে।

চাহিয়া দেখিলাম, আগন্তুক একটি অল্পবয়স্ক যুবক। বয়স বড় জোর উনিশ কি কুড়ি। নিটোল স্বাস্থ্য—উন্নত প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষ, সর্ব্বাঙ্গের মাংসপেশীগুলি সুপুষ্ট ও সুন্দর। সুবিন্যস্ত চুল। সুন্দর ভাসা ভাসা দুইটি চোখ। দাঁতগুলি পরিষ্কার ঝকঝকে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যুবাটিকে দেখিলেই মন স্নেহসিক্ত হইয়া উঠে। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"গল্পটা

শুনতে চান কি? গল্প নয়, সত্য কাহিনী। সময় আছে আপনার? আপনি ডাক্তার মানুষ। আপনার সময়ের দাম আছে। সংক্ষেপে বলি।"

বলিয়া ছেলেটি একটু হাসিল। পরিষ্কার সুন্দর দাঁতগুলি থাকাতে হাসিটি তাহার সুন্দর।

"দেখুন, কলেজে পড়তাম। স্বপ্নের মত সেসব কথা মনে পড়ছে এখন। সে যেন একটা স্বপ্ন-জগতে বাস করতাম। প্রথম যেদিন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের চিরপরিচিত জল দুটো গ্যাসের সম্মিলনে সৃষ্ট হয়েছে, সেদিন আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিস্ময় ক্রমে বেড়েই চলল। সামান্য নুনের মধ্যে কে জানত অমন একটা দারুণ গ্যাস আছে—ক্লোরিন!"

বলিয়া খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার সে তন্ময় আত্মমগ্ন রূপ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন কিসের ধ্যান করিতেছে। চক্ষু দুইটি চাহিয়া আছে, অথচ কিছুই দেখিতেছে না।

"ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার এদের জীবনী পড়লাম। দেখলাম, কি অদ্ভুত এদের সাধনা! সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে কি তপস্যা! আমারও সাধ হ'ল, আমিও ওদের মত হব। কি আকুলতা নিয়েই যে সে দিনগুলো কেটেছে! হঠাৎ একদিন সব উল্টে-পাল্টে গেল। আমাদের সংসারে—আমার জীবনে—একটা আঁধি ঝড় এল। দাদাকে পুলিসে নিয়ে গেল।"

আবার সে চুপ করিল।

"বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। অপরাধ—রাজদ্রোহ। সঙ্গে

সঙ্গে আমার বিচারেও ভোল্টা, গ্যাল্ভানি, ল্যাভয়শেয়ার সকলের ফাঁসি দিয়ে দিলাম। দাদা রাজদ্রোহী ছিলেন কি না জানি না, আমি কিন্তু হলাম অগ্নি—অগ্নিমন্ত্রের সাধক।"

বলিয়া সে একটু মৃদু হাসিল।

"আমার মত ভীরু ভাবপ্রবণ লোকের এ কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু মায়ের অবিশ্রান্ত কান্না, বউদিদির বিধবা-বেশ, আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছিল। তখন বিচার করবার অবসর ছিল না, আমি এ কাজের উপযুক্ত কি না। তখন ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি ভাবের বাষ্পে স্ফীত একটা রবারের রঙিন বেলুন মাত্র। আমার গায়ে আলপিনের খোঁচাটিও সইবে না। কিন্তু তখন বিচার করে কে? সামান্য ফানুস যখন আবেগভরে হঠাৎ আকাশে উড়ে গিয়ে নিজেকে নক্ষত্রদের সগোত্র ব'লে মনে করতে চায়, তখন সে বাধা মানবে কেন? আমিও মানলাম না। বোমার দলে ভিড়ে গেলাম। অগ্নিমন্ত্র! সুন্দর কথাটা। অগ্নিও যে না ছিল তা নয়।"

বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

"ও রকম অগ্নি আমি দেখি নি। দূর থেকে মনে হয় স্বপ্ন, কাছে গেলে মনে হয় শিখা। দূর থেকে কাছে টানে—কাছে গেলে দূর ক'রে দেয়। হেঁয়ালি ভেঙেই বলি—প্রেমে পড়লাম। আমাদেরই দলের একটি মেয়ে। 'আনন্দমঠ' পড়েছেন? মেয়ে জুটেই সব মাটি হয়ে গেল। আমাদেরও তাই হ'ল। আমাদেরও কাজ হ'ল, তার মনস্তুষ্টি করা। সবাই মিলে তার চারিদিকে ঘিরে

দাঁড়ালাম। সেই হ'ল আমাদের আরাধ্য দেবতা—দেশ নয়। সেই হ'ল লক্ষ্য—দেশ উপলক্ষ্য মাত্র।"

আলোটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জন-ধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

প্রজাপতি আলোকশিখাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"তোমার জ্যোতি আছে, শিখা আছে, উত্তাপ আছে স্বীকার করি। কিন্তু কত ক্ষুদ্র তুমি—কত হীন তুমি! সামান্য একটা কাচের কারাগারে বন্দী হইয়া আছ! তুমি কি অগ্নি? তুমি কি সেই অনলের সগোত্র, যাহার দ্যুতি সূর্য্যে নক্ষত্রে বিদ্যুতে ইন্দ্রধনুতে নিত্য প্রতিভাত? দাবানলে, বাড়বানলে যাহার প্রকাশ? তাই যদি হয়, তাহা হইলে ধিক্, শত ধিক্ তোমাকে! দেবতা তুমি, সামান্য মানবের হস্তে বন্দী হইয়া সামান্য ভৃত্যের ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছ!"

"স্বদেশ উদ্ধারের নেশা ছুটে গেল,"—যুবকটি বলিতে লাগিল—"নতুন নেশায় বিভোর হয়ে গেলাম। অদ্ভুত সে উন্মাদনা! ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার, শোকাতুরা মা, সদ্য-বিধবা বউদিদি, দেশের কাজ—সব ভেসে গেল। শুধু সে আর আমি। সে দেবী, আমি তার পূজারী। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম—নিজের চোখে দেখলাম, সে বরদান করেছে আর একজনকে। নিজের চোখে দেখলাম, সে আর একজনের—আমার নয়। সেই আর একজন কে জানেন? আমারই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্ফীত রবারের বেলুনটায় এবার আলপিনের খোঁচা লাগল।

নিমেষের মধ্যে চুপসে গেলাম। অ্যাপ্রুভার হয়ে তাকে ধরিয়ে দিলাম। বন্ধু? হ্যাঁ, বন্ধু ছিল বইকি—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমন বন্ধু জীবনে পাই নি, পাবও না। তথাপি ধরিয়ে দিলাম তাকে। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ঈর্ষার শরশয্যায় শুয়ে ছটফট করছিল। ধরিয়ে না দিয়ে পারলাম না। কাগজে আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়। কাগজে যা বেরিয়েছে, তা ভুল। তাকে ধরিয়ে দেবার আসল কারণ এই। তার ফাঁসি হয়ে গেল। আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। সেই মেয়েটি? সে ধরাই পড়ে নি।

দেবীপূজায় সাধারণত পশু বলিদান দেওয়া হয়। আমি দেবীপূজায় আমার বন্ধুর মত অত বড় একজন মহামানবকে বলিদান দিলাম—আমার বিবেককে বলিদান দিলাম—আমার যা কিছু প্রিয় ছিল, সব ত্যাগ করলাম। দেবী কিন্তু প্রসন্ন হ'ল না। দেবী কি করলে, বলুন দেখি?"

বলিয়া ছেলেটি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। তাহার পর বলিল—

"না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আত্মহত্যা সে করে নি—সন্ন্যাসিনীও হয়ে যায় নি। সে বিয়ে করেছে একজন বিলেত-ফেরত আই. সি. এস.কে। তার জর্জেট শাড়ির এখন নিত্য নূতন রঙ। মোটর ছাড়া সে রাস্তায় বেরোয় না। নানা রঙের নানা আকারের ছোট কুকুর তার কোলে কোলে ফিরছে। হাতে অদ্ভুত রকম কাজ-করা ভ্যানিটি-ব্যাগ। সঞ্চারিণী অগ্নি-শিখার মত এখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

যুবক চুপ করিল। দেখিলাম, তাহার ভাসা ভাসা বড় চক্ষু দুইটিতে অশ্রু টলটল করিতেছে।

"আমাকে কিন্তু সে ভোলে নি। তার সুপারিশের জোরেই তার আই. সি. এস. স্বামী আমাকে একটা চাকরি ক'রে দেবেন ব'লে ভরসা দিয়েছিলেন। আমাকে মাঝে মাঝে টি-পার্টিতে নেমন্তন্নও করতেন। কিন্তু পারলাম না। সায়ানাইড সংগ্রহ করতে হ'ল। কষ্ট হয়েছিল বইকি। কিন্তু ওঁর মুখে শুনলাম, কল্‌কেফুলের বিচি আরও কষ্টকর। আগে জানলে তাই খেতাম। আমার শাস্তি হওয়ার দরকার আছে। লোকে ফাঁসির পর কোথা যায় জানেন?"

"জাহান্নামে।"

চমকাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, কুচকুচে কালো দীর্ঘাকৃতি একটা লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত কালো লোক খুব কম দেখা যায়। মাথার চুল কোথায় শুরু হইয়াছে বোঝা যায় না—এত কালো। প্রকাণ্ড তাহার মাথাটা। ভাঁটার মত বড় বড় চোখ দুইটা অদ্ভুত রকম সাদা। ঠোঁটে ধবল কুষ্ঠ। গলদেশে ভীষণ একটা কাটা ঘা দগদগ করিতেছে।

লোকটা সেই স্বদেশী যুবকটির দিকে ফিরিয়া আবার চীৎকার করিয়া উঠিল—"জাহান্নামে গিয়ে খোঁজ কর্। ও-রকম ফাঁসির

আসামীরা সেইখানে যায়। তুমিও সেইখানে—জাহান্নামে যাও—সব্বাই তোমরা জাহান্নামে যাও।"

তাহার স্বর উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষতটা ভরিয়া রক্তের বুদ্বুদ ফেনাইয়া উঠিল। স্বদেশী যুবকটি নিমেষে অন্তর্হিত হইল।

তখন সেই কৃষ্ণমূর্ত্তি আমার দিকে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলাটা বাড়াইয়া দিল—"দেখ তো ডাক্তার, সেলাই-টেলাই ক'রে এটাকে কোনক্রমে জোড়া লাগানো যায় কি না! বড় দুঃখে বড় জোরের সঙ্গে ক্ষুরটা চালিয়েছিলাম। ভাল ক্ষুর ছিল। বেশ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। বেইমানি করে নি। ম'রে এখন আফসোস হচ্ছে।···আমার অতগুলো ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে ম'রে যাবে যে! তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি ছিল—বাড়িওলা নিশ্চয়ই তাদের পথে বার ক'রে দিয়েছে। আমার গলাটা জুড়ে দাও ডাক্তার—আমি ফিরে যাই আবার।"

বলিয়া সে তাহার গলাটা বাড়াইয়া রহিল।

"দাও না জুড়ে গলাটা।"

কি বলিব, চুপ করিয়া আছি।

"দেবে না জুড়ে?"

"ও আর জোড়া যাবে না।"

"তাই নাকি? টং টং ক'রে নগদ ফীস গুনে দিলে যাবে না? তোমরা তো টাকা পেলে সব পার।"

বলিয়া লোকটা আবার হাসিতে লাগিল। আবার তাহার

গলার ক্ষতে রক্ত ফেনাইয়া উঠিল। সমস্ত মুখে তিক্ত বিদ্রূপের হাসি।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"রাগ করলে ডাক্তারবাবু? রাগ ক'রো না। বড় দুঃখে বলেছি কথাটা। দুনিয়ার কেউ আমার প্রতি সুবিচার করে নি —কেউ না। জীবনে যতটুকু সুবিধে পেয়েছি, টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। বেটাছেলে হয়ে জন্মেছিলাম ব'লেই বোধ হয় মা ছেলে-বেলায় বিনা পয়সায় দুধ খেতে দিত—ভবিষ্যৎ-লাভের আশায়। মেয়ে হয়ে জন্মালে অশেষ দুর্গতি হ'ত। আমার একটা বোন ছিল, আমারই মত কুৎসিত। মা তো সেটাকে দু-চক্ষে দেখতে পারত না। মাই-দুধ হয়তো তাকে দিয়েছিল—মাই টনটন করত ব'লে, গাই-দুধ কখনও তাকে খেতে দেখি নি। বাবা মা উভয়ে এ বিষয়ে একমত ছিলেন—'মেয়েমানুষে আবার দুধ খাবে কি?' এর চেয়ে রাজপুতরা ঢের বেশি সদাশয় ছিল—মেয়ে হ'লে আঁতুড়ঘরেই মুখে নুন দিয়ে মেরে ফেলত। আফ্রিকায় শুনেছি কচি কচি মেয়েকে বঁড়শিতে গেঁথে ওরা কুমীর ধরে। মেয়ের চেয়ে কুমীর দামী জিনিস। একটা কুমীর ধরতে পারলে অনেক টাকা হয়। বাপ-মাই যখন টাকার অনুপাতে ছেলেমেয়েদের প্রতি কম-বেশি ভালবাসা দেখান, তখন তোমরা টাকা না পেলে—"

আমি বলিলাম—"ভুলে যাচ্ছ কেন যে, তুমি ম'রে গেছ? মরা মানুষ বাঁচাতে পারি কি আমরা? টাকা পেলেও পারি না।"

লোকটা আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আমার বিশ্বাস টাকা পেলে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। দিতে পার আমাকে কিছু টাকা? এক্ষুনি দেখ বেঁচে উঠব।"

"কত টাকা চাই তোমার?"

"দেবে—দেবে? ভারি ভাল লোক তো তুমি!"

"ওই সামনের দেরাজে, টেনে দেখ। যা আছে নিয়ে যাও।"

"কোথা? কোন্ দেরাজে?"

দেরাজটা দেখাইয়া দিলাম। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল। আমি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! আমি দেরাজের হাতলটা কিছুতেই ধরতে পারলাম না। কেমন যেন ফসকে ফসকে যাচ্ছে। আমার দেহটা কি হাওয়া হয়ে গেছে?"

বলিয়া সে বারম্বার নিজের প্রসারিত বাহু দুইটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হাত দুইটা বারম্বার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সমস্ত মুখে এক বিচিত্র হাসি। খানিকক্ষণ পরে সে আবার বলিল—"তাই তো! সব বদলে গেছে দেখছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"কিন্তু আমার সব বদলে গেছে। সব হাওয়া হয়ে গেছে—শক্ত আর কিছু নেই। দেরাজটা খুলতে পারলাম না। টাকা পেলে হয়তো বেঁচে যেতাম। এখন টাকা পেয়েও যে নিতে পারছি না! আহা, বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হ'ত—হয়তো আমি মরতাম না। হয়তো আমার—"

"কেন মরেছিলে তুমি?"

"কেন? ওই যে ছোঁড়াটা এসে বক্তৃতা দিচ্ছিল—ওরাই তো আমার এই দুর্দ্দশার কারণ। পথে ঘাটে কাগজে দেওয়ালে এক রব তুললে—'বয়কট ফরেন গুড্স'। এই সব ছোকরাদের বক্তৃতার চোটে আমার দোকানখানা ডুবে গেল। আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কি সব পিকেটিং করবার ধুম! 'বয়কট ফরেন গুড্স'! ওদের ওই বুলিটাই যে 'ফরেন', সে তখন ওদের বোঝাবে কে? দোকানখানা আমার ডুবিয়ে দিলে ব্যাটারা। আমাকেও ডুবিয়ে দিলে।···সে দোকান থাকলে কি আমার মেয়ের বিয়ের পণের অভাব হয়?"

লোকটা হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল। একটু থামিয়া আবার শুরু করিল—"বাজারে ধার বাড়তে লাগল। মেয়েরও বয়স বাড়তে লাগল। আমার মেয়ে, বুঝতেই পারছেন, কি রকম কালো সে। বাজার-দর যাচিয়ে দেখলাম। অন্তত পক্ষে তিনটি হাজার টাকা দরকার। সদাগরী আপিসের একটি প্রৌঢ় কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষ করার দরকার হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন যে, একটি প্রতিমার মত পাত্রী তাঁর জন্যে সেজে ব'সে

আছে দুটি হাজার টাকা নিয়ে। মিছে কথা নয়। ভেবে দেখলাম, আমার ওই মেয়ের যুবক পাত্র জোটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। অন্তত পক্ষে কুড়িজন ছোকরাকে জলখাবার খাইয়েছি—কেউ মেয়ে পছন্দ করে নি। শেষে সদাগরী আপিসের সেই কেরানীবাবুটিকেই ধ'রে পড়লাম আমার শালার মারফৎ। আমার শালার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি অবশেষে দয়া ক'রে আমার কালো মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজী হলেন—কিন্তু তিনটি হাজার টাকা চাই। আমার হাতে তখন তিনটি টাকা নেই। টাকার জন্যে পাগলের মত ঘুরতে লাগলাম। কত লোকের কাছে যে হাত পেতেছি! মাঝে মাঝে চুরি করতেও ইচ্ছে হয়েছে। আহা, তখন যদি আপনার সঙ্গে দেখা হ'ত! কিন্তু টাকার আমার আর দরকার হ'ল না। একদিন সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখলাম, মেয়ে আমার উধাও হয়েছে। মজা দেখুন, মেয়ে কালো ব'লে পাত্র জুটল না, কিন্তু প্রণয়ী জুটে গেল! এর মূলেও ওই হতভাগা ছোঁড়াগুলো—ওই হারামজাদা ব্যাটারা—জাহান্নামে যাক সব।"

তাহার গলার ক্ষত দিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার পূর্ব্বে সে বলিয়া গেল—

"তবু আমি মরতাম না। কিন্তু মুখরা স্ত্রীর বাক্য-যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারলাম না। আশ্চর্য্য, কিন্তু এখন তার জন্যেই মন-কেমন করছে। সত্যি বলছি, বড্ড মন-কেমন করছে।"

ছায়া-মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল।

ঘড়িতে টং টং করিয়া কয়টা বাজিল, গুনিলাম না। প্রবৃত্তি নাই।

চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ।

একা বসিয়া আবার সেই ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডের গল্পে মনোনিবেশ করিয়াছি। দুইজনে বরফ-গলা শীতল জল সাঁতার দিয়া পার হইতেছে—সেই যুবক এবং যুবতী। কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না।

যুবক সুইডেনবাসী—যুবতী ল্যাপ্‌ল্যাণ্ডবাসিনী। যুবক বলিতেছে—

"ওপারে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন শরীর ঠাণ্ডায় প্রায় জ'মে গেছে। ওপারের তীর কিন্তু সমতল নয়—চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। উঠতে উঠতে শরীর গরম হয়ে উঠল। মেয়েটি বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা বলছিল না। বললেও বিশেষ কিছু সুবিধা হ'ত না—তার ভাষা আমার পক্ষে দুর্ব্বোধ্য। চড়াই ভেঙে আমরা একটু পরে ওপরে উঠলাম। ওপরে উঠে আমরা শৈবালাসনে ব'সে আহারে প্রবৃত্ত হলাম—যবের শুকনো রুটি, টাটকা মাখন আর পনির। ধোঁয়ায়-সেঁকা বল্‌গা-হরিণের জিবও ছিল। মেয়েটি তার মগে ক'রে পাহাড়ী ঝরনার ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল। এত তৃপ্তি ক'রে বহুকাল খাই নি। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে পাইপ ধরিয়ে ব'সে পরস্পরের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

২৬০

'ওই পাখিটির নাম জান ?' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'লাহোল্।' হেসে মেয়েটি উত্তর দিলে।

পাখিটির গলার স্বর ঠিক বাঁশীর মত—ভারি কোমল। ল্যাপ্ল্যাণ্ডবাসীদের নির্জ্জনতার সহচর এই পাখিটি। কাছেই একটি ঝোপ থেকে আর একটি পাখি গান গেয়ে উঠল: আশ্চর্য্য তার স্বর—নীল রঙের গলাটি !

'জিলো—জিলো—' মেয়েটি হেসে ব'লে উঠল।

ল্যাপদের ধারণা এই নীলকণ্ঠ পাখিটির গলার ভেতরে নাকি একটি ঘণ্টা আছে আর এরা নাকি একশো রকম বিভিন্ন সঙ্গীত জানে। ঠিক আমাদের মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা কালো ক্রস নীল আকাশের গায়ে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে আছে দেখলাম। পক্ষীরাজ ঈগল তার গতিবেগকে সংহত ক'রে নিজের নির্জ্জন সাম্রাজ্য পরিদর্শন করছেন। দূরে পাহাড়ের হ্রদ থেকে হাঁসের বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। সমস্তটা যেন ইন্দ্রজাল !

'রো—রো—রেইক্—' মেয়েটি বলতে লাগল।

এর অর্থ—'আজ দিন ভাল—আজ দিন ভাল।'

হ্রদ থেকে হাঁস উত্তর দিলে—'ভার লুক্, ভার লুক্, লুক্ লুক্।'

মানে—'বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে,—হবে হবে।'

আমি সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম, মেয়েটি তার জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখছে। একটি ছোট নীল উলের [illegible]

আর এক জোড়া হরিণের চামড়ার সুন্দর জুতো, চার্চে পরবার জন্যে চমৎকার এম্ব্রয়ডারি-করা এক জোড়া লাল দস্তানা, একটি বাইবেল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম—কি সুন্দর তার হাত দুটি!"

"ডাক্তারবাবু, শুনুন। সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—" দেখিলাম সেই কবি আসিয়াছে। বই বন্ধ করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলাম। তাহার মাথার ফাটা খুলিটা হইতে আরও খানিকটা রক্তমাখা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"দেখুন ডাক্তারবাবু, সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—তাকে বলবেন যে, তার জন্যে একটা কবিতা লিখেছিলাম। তাকে শোনানো হয় নি। শোনাবার অবসর পাই নি—অবসর সে দেয় নি।"

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল—

"শুনবেন আপনি? আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনার হয়তো কবিতা ভাল লাগে না। তবু—"

তাহার সমস্ত চোখে মুখে কেমন একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। সেতারের তারে ঝঙ্কার দিলে তারগুলি যেমন কাঁপিতে থাকে, তাহার দৃষ্টি দেখিলাম সেইরূপ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"শুনবেন কবিতাটা? সে যদি আসে, বলবেন তাকে—"

"আচ্ছা।"

কবি আবৃত্তি করিতে লাগিল। বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে আমার মনটাও সুদূর অতীতে ফিরিয়া গেল।—

"তুমি এসেছিলে।
বহি সুখ, বহি দুঃখ, বহি জ্বালা, বহি জটিলতা
এসেছিলে জীবনে আমার।
ক্ষুদ্র জলাশয়
সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ
তব আবির্ভাবে।
রবি-শশী-গ্রহ-তারা-দীপ্ত নীলাকাশ,
পথহারা কত ধূমকেতু
প্রসব-বেদনাতুরা কত নীহারিকা
সন্ধ্যা, উষা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার,
সেই সাগরের বুকে ধরেছিল মূর্ত্তি অভিনব
বহুবর্ণ-বিচ্ছুরিত স্বপন-উৎসবে।

কোটি-উর্ম্মি-শিহরিত সে সমুদ্র-মাঝে
কত কি যে ছিল!
কি ঐশ্বর্য্য—কি দারিদ্র্য তার!
সূর্য্যালোকহীন সেই আঁধার অতলে
মুক্তা ছিল, শঙ্খ ছিল—আছিল কত কি!
ছিল কত নামহীন অপরূপ রূপের প্রকাশ!

বাড়ব-অনল
জ্বলিয়া মরিত সেথা নীরব জ্বালায়।
অনুত্থিতা উর্ব্বশীর অন্ধ আকুলতা
ছন্দোহীন বেদনায় মরিত কাঁদিয়া।
কত সর্প, কত অজগর
বিচিত্র কুণ্ডলাকারে—ভীষণ, মোহন,
পিচ্ছিল, চিক্কণ দেহ দিত প্রসারিয়া
রক্তবর্ণ প্রবাল-পল্লবে।"

শুনিতে শুনিতে আমি মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, একটি কৃশ দরিদ্র যুবক নগ্নপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। পেটে অন্ন নাই, মাথার চুল তৈলহীন, পরিধানে ছিন্নবাস। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। চক্ষু দুইটিতে তাহার তীব্র জ্যোতি—অন্তরে অমৃতের পিপাসা। অমৃতের প্রলোভন দেখাইয়া একটি কিশোরী তাহাকে ডাকিতেছে। সে চলিয়াছে তাহারই আহ্বানে। কিশোরীর আয়ত নয়ন দুইটিতে কি অপূর্ব্ব রসাভাস—ভাষাহীন সে কি নীরব নিবেদন!

"গহন সে জলতলে তরঙ্গ তুলিয়া
লোলুপ আগ্রহভরে প্রসারিয়া অষ্টবাহু তার
লুব্ধ মুগ্ধ
ছিল 'অক্টোপাস'।
রক্তলোভী 'শার্ক'
সু-সতর্ক সঞ্চরণে ফিরিত সতত।

গভীর সে কালো জলে
আলোড়ন তুলি
উন্মাদিনী কত ঝঞ্ঝা প্রলয়-তাণ্ডবে
বিধুনিয়া জলরাশি মহা-অট্টহাসে
সুসজ্জিত কত তরী ডুবাল অতলে।

আরও যে কত কি ছিল
দেখি নাই স্বরূপ তাদের।
চকিতে ইঙ্গিতে শুধু
পেয়েছি আভাস।
অনন্ত আভাস-ভরা সমুদ্র বিশাল।
নিত্য তারে সুরাসুর করিত মন্থন
মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের লাগি।
মোর তুচ্ছ জীবনের ক্ষুদ্র জলাশয়
সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ
তব আবির্ভাবে।"

"খুলে দাও, খুলে দাও, বাঁধনটা খুলে দাও তো—"

চাপা রুদ্ধস্বরে কথা বলিতে বলিতে একটি যুবতী আগাইয়া আসিল। তাহার রক্তাক্ত চোখ দুইটা যেন ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে। গলার দড়িটা শক্ত করিয়া বাঁধা। দুই হাত দিয়া টানাটানি করিয়া নিজেই সে বাঁধনটা আলগা করিয়া

ফেলিল। আলুলায়িত তাহার দীর্ঘ কুন্তল। পাতলা ঠোঁট দুইটিতে বিচিত্র হাসি।

"কোথায় গেলেন সেই কবি? কবিতা যে শেষকালে মৃত্যুর ফাঁসি হয়ে গলায় চেপে বসে, এ খবর কি উনি জানেন?

উঃ, কত কবিতাই জীবনে শুনলাম!

এই রূপের কত ব্যাখ্যা!

যেখানেই যাই, সহস্র চক্ষু আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে—যেন গিলে খাবে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীষ্টান, বালক, বৃদ্ধ, যুবা—সকলেরই চোখে সেই একই ক্ষুধিত দৃষ্টি। কবি কবিতা লিখেছে, ধনী টাকা দেখিয়েছে, বলী বলপ্রকাশ করেছে, যার কিছু নেই—নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সে মিনতি করেছে। অসহ্য!"

মেয়েটি তাহার পর আমার আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"আচ্ছা, ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলতে পারেন আমাকে? ছাপা কেতাবে যে সব প্রেমের গল্প লেখা থাকে, সে সব কি সত্যি? ও-রকম কি হয়? আমার জীবনে আমি তো দেখেছি, পুরুষগুলো আমাকে নিয়ে লোফালুফি করেছে খালি। আমি যেন একটা ফুটবল, আর আমায় ঘিরে সুদক্ষ একদল খেলোয়াড়।—সবারই লোলুপ দৃষ্টি আমার ওপর। কিন্তু আমাকে কাছে পাওয়া মাত্র লাথি মেরে তারা দূর ক'রে দিয়েছে। দূর ক'রে দিয়ে আবার ছুটেছে আমার পেছনে আমাকে ধরবে ব'লে। এ কি আশ্চর্য্য ব্যাপার বলুন তো!"

বলিয়া মেয়েটি আগাইয়া আসিয়া বাতিটার কাছে দাঁড়াইয়া আলোর পোকাগুলি দেখিতে লাগিল। কতকগুলি মরিয়া গিয়াছে, কতকগুলি মৃতপ্রায়—কতকগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে। রঙিন প্রজাপতিটি এখনও সমানে আলোকশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে।

"ডাক্তারবাবু, তখন তো বললেন না আমাকে—মানুষ ফাঁসি হ'লে কোথায় যায়? বলুন না!"

সেই স্বদেশী যুবকটি আসিয়াছে।

"বলুন না!"

"আমি ঠিক জানি না।"

"জানেন না?"

"না।"

"আচ্ছা, ভোল্টা, গ্যাল্‌ভ্যানি, ল্যাভয়শেয়ার, পাস্তুর, গ্যালিলিও—এঁরা কেউ আসেন আপনার কাছে? এঁদের আমি অপমান করেছি—ক্ষমা চাইব। কেউ আসেন এঁরা?"

"না।"

যুবকটি চলিয়া গেল। অদ্ভুত তাহার দৃষ্টি!

মেয়েটি আলোর পোকাগুলি এতক্ষণ পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। যুবকটি চলিয়া যাইবার পর আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে?"

যতটুকু জানিতাম, বলিলাম।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"সবারই পরিচয় শুনেছেন, আমার

পরিচয় শুনুন। আচ্ছা, ওই ছেলেটি যাদের নাম করছিল, তারা কে? কি অদ্ভুত নামগুলো! কারা ওরা?"

"ওঁরা সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক। সবাই মারা গেছেন। ছেলেটি তাঁদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"ছেলেটি খুব বিদ্বান বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

মেয়েটি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তারপর বলিল—"শুনবেন আমার কথা?"

"বল।"

"ভাল ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে আমি। আমার মা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন। মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিনই উপবাস ক'রে থাকতেন। আমরা গরিব হ'লেও মায়ের নিষ্ঠার জোরে আমাদের খাতির ছিল খুব। মায়ের মুখখানা এখনও আমার মনে পড়ে। ধপধপে ফরসা ছিলেন তিনি, ধপধপে ফরসা থান প'রে থাকতেন।"

মেয়েটি একটু চুপ করিল।

"অমন মায়ের মেয়ে হয়ে কি ক'রে যে আমি এমন হলাম, তাই ভাবি। আমার যখন ন বছর বয়স, তখনই আমার বিয়ে হয়েছিল। মা গৌরীদান ক'রে পুণ্য অর্জ্জন করেছিলেন। পাড়ার লোককে বলতে শুনেছি যে, আমি নাকি গৌরীর মত দেখতে ছিলাম। আমার এই রূপের জোরেই একটি বড়-লোকের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। কোন গরিবের

হাতে পড়লে বোধ হয় আমার এ দুর্দ্দশা হ'ত না।" একটু হাসিল।

"সবাই আমার এই রূপের প্রশংসা করেছে—কেবল আমার স্বামী ছাড়া। তিনি আমার দিকে কোনদিন চেয়েও দেখেন নি বোধ হয়। মদ নিয়ে এত মশগুল থাকতেন যে, আমার প্রতি দৃষ্টি দেবার তাঁর অবসর হ'ত না। তিনি আছেন টের পেতাম, যখন রাত্রে তাঁর দুর্গন্ধ বমিগুলো পরিষ্কার করতে হ'ত। স্বামী দেবতা হ'লেও ভাগ্যে অমর নয়। তাই নিষ্কৃতি পেয়ে গেলাম। দেবতারা শুনেছি স্বর্গে থাকেন। পচা লিভারটা নিয়ে আশা করি তিনিও স্বর্গেই আছেন। যান···যেতে চাই না আমি সে স্বর্গে।"

তাহার চোখে মুখে যেন একটা আগুনের হলকা বহিয়া গেল।

"স্বামী স্বর্গে গেলেন যখন, তখন আমার বয়স তেরো বছর। বিয়ের সময় শুনেছিলাম, তাঁরা বড়লোক। বড়লোক ছিলেন। আমার স্বামীর প্রপিতামহ টাকা রোজগার করেছিলেন—এঁরা দু-তিন পুরুষ ধ'রে সেটা নানা ভাবে খরচ করছিলেন। আমার স্বামীর অংশে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু তিনি মদ খেয়ে নিঃশেষে খরচ ক'রে মরবার আগে কিছু ধারও রেখে গেলেন। ভাল লাগছে শুনতে আপনার ?"

"ভাল লাগছে না। তবু বল।"

"ভাল লাগছে না ? পচা মড়া চিরতে ভাল লাগে, মিথ্যে

প্রেমের উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে, আর আমার জীবনের এই সত্যি ঘটনাটা ভাল লাগছে না ?”

“সত্য সর্ব্বদাই অপ্রিয়। তুমি বল।”

মেয়েটি বলিতে লাগিল—

“হ্যাঁ, কি বলছিলাম ! স্বামী স্বর্গে চ'লে গেছেন। আমি মর্ত্ত্যে থেকে গেলাম। আর থেকে গেলেন আমার স্বামীর মামাতো ভাই, পুলক ঠাকুরপো। তিনিই আমার প্রথম প্রেমিক।” বলিয়া মেয়েটি একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—“আমাদের দেশে সতীদাহ প্রথাই ঠিক ছিল, স্বামীর সঙ্গে মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলত, বাস্, নিশ্চিন্ত ! এ রকম দ'গ্ধে দ'গ্ধে মরতে হ'ত না। এই দেশে কখনও সতীদাহ প্রথা লোপ পেতে পারে ? আজও এ দেশের ঘরে ঘরে বিধবা সতীরা পুড়ে মরছে। আগুনের চেহারাটা শুধু বদলেছে। আগে ছিল চিতানল, এখন হয়েছে তুষানল। আমার সারা জীবন ভ'রে তার প্রমাণ পেয়েছি। এই তুষানল নেবাবার নানা চেষ্টা আমি করেছি, জল পাই নি। নরকে কখনও জল পাওয়া যায় ? পাই নি। এই মর্ত্ত্যলোকই আমার কাছে নরক হয়ে উঠেছিল, আর সে নরক আমি গুলজার ক'রেও তুলেছিলাম। কি ক'রে আমার এই সামান্য দেহটা দিয়ে যে এত লোককে আমি কাবু করেছিলাম, তাই ভাবি। সে কি এক-আধটা লোক ? প্রতি দিন প্রতি বেলা নূতন লোক। একটা সামান্য বারাঙ্গনার জীবন-কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা ক'রে আপনার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, সাধ

ক'রে গলায় দড়ি দিই নি। সম্ভব হ'লে ছ্যাকড়া-গাড়ির ঘোড়া-গুলোও আত্মহত্যা করত। পারে না ব'লেই করে না।

জীবনে আমার সবচেয়ে বেশি দুঃখ কি জানেন? কাউকে ভালবাসি নি। ভালবাসবার মত কেউ আমার কাছে আসে নি। অথচ টাকার লোভে অহরহ ভালবাসার ভান করতে হয়েছে। কি আশ্চর্য্য এই পুরুষমানুষগুলোর প্রবৃত্তি! তারা ঘরে সতী স্ত্রী ফেলে আমাদের কাছে ছুটে আসে। আমার স্বামীও যেতেন শুনেছি। পুরুষদের ষোল-আনা লোভ এই অসতী মেয়েগুলোর প্রতি। অসতী জেনেই তারা আমাদের কাছে আসে, অথচ এসেই একনিষ্ঠতা দাবি ক'রে বসে। আর আমরাও টাকার লোভে একনিষ্ঠতার অভিনয় করতে থাকি। মরেছি কি সাধে?"

বলিয়া হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল।

খোলা জানালাটা দিয়া হু-হু করিয়া একটা হিমশীতল বাতাস ঘরে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল।

সেই প্রজাপতি শুনিলাম আলোকশিখাকে বলিতেছে—

"আমি নীলাকাশচারী জ্যোতির্ম্ময় সবিতার উপাসক, মুক্ত আলোকে, নির্ম্মল বাতাসে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াই। এই রুদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতায় আমার সমস্ত অন্তর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।"

বাতায়ন-পথে আবার খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকিল। আলোকশিখা দেখিলাম, একটু কাঁপিয়া আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

পতঙ্গ আবার তাহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মৃদু গুঞ্জনে কি যেন বলিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম না।

বিনিদ্র নয়নে বাতায়নের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশ্চর্য্য আমার এই বাতায়নটি! এই বিশ্বজগতের তুলনায় ইহা তো কিছুই নয়। আকাশভরা লক্ষ কোটি নক্ষত্রসমাজে কত ক্ষুদ্র আমাদের এই সৌরজগতের সীমাই! সেই সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী! সেই পৃথিবীর এক কোণে কত নগণ্য আমার ছোট ঘরখানি! সেই ঘরের দেওয়ালে ছোট একটি জানালা। কত সামান্য, অথচ কত অসামান্য! এই ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথে বাহিরের পৃথিবীর খবর পাই। আকাশপটে বিশ্বরূপ দেখি। আলো আসে, অন্ধকারও আসে।

"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, দেখ তো—"

সেই সন্তানহত্যাকারিণী জননীটি আসিয়াছে। কোলে তাহার একটি মরা শিশু।

"দেখ তো ডাক্তারবাবু, এখনও বেঁচে আছে কি না! মনে হচ্ছে, বুকের কাছে যেন এখনও একটু ধুকধুক করছে। দেখ না একটু। নদীর ধারে প'ড়ে ছিল। একটা কুকুরে-এর হাতটা চিবিয়ে খাচ্ছিল। দেখ না—বেঁচে আছে কি না!"

মৃত শিশুটা সে বাড়াইয়া ধরিল। নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহ। একটা চোখ নাই—হয়তো কাকে ঠুকরাইয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে।

কচি হাতটিতে সত্যই কয়েকটি আঙুল নাই, কুকুরে চিবাইয়া খাইয়াছে।

"ডাক্তারবাবু, এখানে এই কালো দাগ্‌টা কিসের ?"

"ওই জায়গাটায় তুমি টিপে ধরেছিলে।"

ছেলেটি কোলে করিয়া যুবতী দেখিলাম থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"এখনও যে এর একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে। বেঁচে আছে কি ? দেখ না একটু।"

কি বলিব ?

মিথ্যা কথা বলিলাম।

"হ্যাঁ, এখনও প্রাণ একটু আছে।"

"আছে ?"

চুম্বনে চুম্বনে উন্মাদিনী সেই মৃত শিশুটার সর্ব্বাঙ্গ যেন ভরিয়া দিল। তাহার অঙ্গের বসন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, বেণী বিস্রস্ত—"বাবা আমার, মানিক আমার, সোনা আমার—"

বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মৃত শিশুর অধর দুইটি যেন নড়িয়া উঠিল, অভিমানভরে সে যেন বলিল, মা—মা !

বাহিরে হাওয়ার বেগ বাড়িতেছে।

জানালা দিয়া দেখিতেছি, ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জীভূত মেঘমালা আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রবিহীন অন্ধ রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। চিরকালের সেই

উজ্জ্বল শাশ্বত নক্ষত্রগুলি দেখিতে পাইতেছি না। সামান্য মেঘের কি অসামান্য ক্ষমতা, নক্ষত্র বিলুপ্ত করিয়া দেয়!

সমস্ত তিমির ভেদ করিয়া মন সুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে। সীমাহীন স্মৃতির সমুদ্রে সমস্ত অন্তঃকরণ হাবুডুবু খাইতেছে। যেন একখানি ক্ষুদ্র অসহায় ভেলা। চতুর্দ্দিকে কোটি তরঙ্গ…। মানসচক্ষে একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

গ্রামের একটি পুষ্করিণী। তীরে নারিকেল, সুপারি, আম, জাম, কাঁটালের বাগান। চতুর্দ্দিকে শ্যামল-শ্রী। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। একটা কোকিল কোথায় যেন ডাকিতেছে। সরসর করিয়া একটা গিরগিটি শুষ্ক পত্রগুলিকে সচকিত করিয়া সরিয়া গেল।

পুষ্করিণীর অপর পাড়ে একটি জীর্ণ দেবালয়—বুড়া শিবের মন্দির। সেখান হইতে ধূপধুনার গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত।

ঘাটে স্নানার্থিনীর দল। সমস্ত দিন উপবাসের পর জননীগণ সন্তানের মঙ্গলকামনায় শিবের পূজা করিতে আসিয়াছেন। নীলষষ্ঠী।

প্রত্যেক জননীর মুখে, চোখে, আচারে, অবয়বে একই ভাষা ফুটিয়া উঠিতেছে, সন্তানের যেন কোন অনিষ্ট না হয়—"হে দেবতা, হে শঙ্কর, আমার ছেলেদের সুখে রাখিও।"

ভাবিতেছি, এই জননীও প্রয়োজন হইলে সন্তানহত্যা করে।

পৃথিবীতে প্রয়োজনের তাগিদে শিবপূজাও করে, শিশুহত্যাও করে। ভাবিয়া দেখিতেছি, এ জগতে প্রয়োজনের দাবিটাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ দাবি। দয়া, মায়া, বিবেক, নীতি সমস্ত গুঁড়া করিয়া দিয়া প্রয়োজনের এই লৌহ-'রোলার'টা দুনিয়ার রাজপথ দিয়া সগর্জ্জনে চলিয়াছে। ইহার চাপে মা-ও ছেলের গলা টিপিয়া ধরে। স্বামী স্ত্রীকে অপরের—

"আমার দড়িটা ফিরিয়ে দাও।"

চমকিয়া দেখিলাম, আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে একটি বৃদ্ধা চাহিয়া আছে। মুখের চামড়া বলিরেখাঙ্কিত—কুঁচকাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথাটা জরাভারে কাঁপিতেছে। মাথার চুলগুলা শ্বেত নয়, পীতবর্ণ। নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টিটা আমার মুখের উপর নিবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধা আবার বলিল—

"ফিরিয়ে দাও আমার দড়িটা, ফিরিয়ে দাও। আমার গলার দড়ি কেন তুমি খুলে দিয়েছিলে? কোথা রেখেছ সেটা, দাও। আবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমার নিশ্চয় এখনও ভাল ক'রে মরা হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে, সমস্ত মনে পড়ছে।"

বলিয়া বৃদ্ধা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"একে কি মরা বলে? নিশ্চয় আমি বেঁচে আছি এখনও। আমার হাতটা দেখ তো ডাক্তারবাবু, বোধ হয় আমি বেঁচে আছি। আমার সব মনে পড়ছে যে! দেখ তো—"

বৃদ্ধা তাহার কম্পিত দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল।

"দাও আমার দড়ি ফিরিয়ে, আমি ঠিক বেঁচে আছি। না, বেঁচে থাকতে আমি পারব না, পারব না, আমি পারব না। আমায় আবার মেরে ফেল তুমি।"

"তুমি তো ম'রে গেছ। প্রায় এক মাস আগে।"

"মিছে কথা। এক মাস আগে আমি মরবার জন্যে গলায় দড়ি দিয়েছিলাম, কিন্তু মৃত্যু আমার হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে যে! আমার গলার দড়ি তুমি খুলে দিয়েছিলে।"

চুপ করিয়া রহিলাম।

ভ্রূকুটি করিয়া তীব্রস্বরে বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল—"খুলে দাও নি তুমি?"

"দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মৃত্যুর পর।"

"আমার সব মনে পড়ছে কেন?"

"কি মনে পড়ছে?"

"উঃ, মর্মান্তিক সে কথা! পটাপট সে আমার মুখে জুতো মেরে গেল। চুলের ঝুঁটি ধ'রে উঠোনে ফেলে পেটে লাথির পর লাথি মারলে, আমার বুকের পাঁজরার হাড় গুঁড়িয়ে গেল তার লাথির চোটে,—এই দেখ।"

যে স্থানটা চিরিয়া ভগ্ন অস্থিটি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, বৃদ্ধা সেই ক্ষতস্থানটা দেখাইল।

"আমি আবার মরব। সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু, আবার

আমাকে মরতে হবে। তোমার ছুটি পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমায় মেরে ফেলো তুমি।"

তাহার গণ্ড বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

"মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু কে জান? নিজের পেটের ছেলে। এত বড় শত্রু আর হয় না। বিশেষত সে যদি আমার মত বিধবার একমাত্র সন্তান হয়। শত্রু—শত্রু—দারুণ শত্রু। গর্ভে যতদিন ছিল আমার রক্ত শোষণ করেছে। ভূমিষ্ঠ হবার পরও তার শোষণ বন্ধ হয় নি। চোঁ-চোঁ ক'রে শতমুখে সে আমার রক্ত শুষেছে। দেহের রক্ত থেকেই না ছুধ হয়? সেই ছুধ সে আট বছর ধ'রে খেয়েছে। শুনেছেন কখনও, আট বছরের ছেলে মাই খায়? কত ঠাকুর-দেবতার দোর ধ'রে, কত মানত পুজো ক'রে যে এই ছেলেকে মানুষ করেছি! একটা ষষ্ঠী কখনও বাদ দিই নি, উপোসে উপোসে শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে আমার।"

চকিতের মধ্যে আমার মনে সেই পুষ্করিণী-তীরের নীলষষ্ঠীর ছবিটা আবার ভাসিয়া আসিল। দেখিলাম, সবুজ গাছগুলিতে আগুন লাগিয়াছে—গগনস্পর্শী অনলশিখা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। অস্তগামী সূর্য্যের সে দীপ্তি আর নাই, যেন একটা অঙ্গারখণ্ড। কোকিলটা দেখিতে দেখিতে শকুনি হইয়া গেল। পুষ্করিণীর জল রক্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহাতে শত শত লোলুপ কুম্ভীর একে একে আসিয়া জননীদের গ্রাস করিতেছে।

জননীর আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক মুখরিত। জীর্ণ শিবমন্দিরে বসিয়া আছে—শিব নয়, একটা বিকট রাক্ষস, জননীদের দুর্দ্দশা দেখিয়া হা-হা করিয়া হাসিতেছে।

"একমাত্র ছেলে আমার। কত কষ্ট ক'রে যে মানুষ করেছি! যখন সে যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। তার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যে আমার যা কিছু ছিল, সব গেছে। শুনেছ কখনও তেরো বছরের ছেলে হাতে রুপোর হাত-ঘড়ি বেঁধে ইস্কুল যায়? শুনেছ কখনও, যে ছেলে একটাও পাস করতে পারে নি, তার রোজ রোজ নতুন পোশাক চাই? কত রঙের কত ধরনের পাঞ্জাবি যে তার কিনে দিয়েছি! কত রকমের জুতো, কত রকমের ছড়ি! গ্রামের ইস্কুলে তার পড়তে মন হ'ল না। শহরে গেল। কত কষ্টে যে তার খরচ যুগিয়েছি! আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না ডাক্তারবাবু, মায়ের কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না। নিজের পেটের ছেলে যখন মদ খেয়ে এসে জুতো মারে, তখন মায়ের মনে কি যে হয়, তা বোঝবার তোমার ক্ষমতা নেই। সে তুমি বুঝতে পারবে না, সে তুমি বুঝতে পারবে না—দড়িটা আমার ফিরিয়ে দাও।"

কাহাকে দড়ি ফিরাইয়া দিব?

কোথায় গেল সে?

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, চতুর্দ্দিক মেঘাচ্ছন্ন। কেবল সামান্য একটু আকাশ এখনও নির্ম্মেঘ রহিয়াছে। তাহাতে

জ্বলজ্বল করিয়া একটা তারা জ্বলিতেছে। সমুদ্রের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আলো জ্বলিতেছে। কোন্ পথহারা পথিককে ও পথ দেখাইতেছে? ওই মেঘের সমুদ্রে কি কোন নাবিক আছে? থাকিলেও কি তাহার পথ হারায়? পথ হারাইলে কি ওই তারার আলোয় সে পথ পাইবে? তারার আলোয় কি পথ হারায় না?

কিন্তু কি সুন্দর—কি উজ্জ্বল ওই তারাটি! আর্দ্রা নক্ষত্র কি? পুঞ্জীভূত এই তমিস্রার মধ্যে ওই একক নক্ষত্রটি দেখিয়া ভরসা হয়। মনে হয়, সমস্ত কালো নয়, আলোও আছে। মনে ধীরে ধীরে আশার সঞ্চার···। দেখিতে দেখিতে নির্ম্মেঘ আকাশ-টুকুও মেঘে ঢাকিয়া গেল। নক্ষত্র ঢাকা পড়িল। মেঘের গুরু গুরু গর্জ্জনে অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল।···ভাবিতেছি, আকাশ যাহার সৃষ্টি, মেঘও কি তাহারই সৃষ্টি? আলো এবং অন্ধকার কি একই কবির কবিতা? পাপ এবং পুণ্য? সত্য এবং মিথ্যা?

"সত্য-মিথ্যার সৃষ্টিকর্ত্তা আমরাই। ম'রে সেটা বুঝতে পেরেছি। আমাকে একটু জল দিতে পারেন? বড় জ্বালা। আগুনটা এখনও যেন নেবে নি।"

একটি উলঙ্গ অর্দ্ধদগ্ধ নারী দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার পেট, বুক এবং পায়ের খানিকটা পোড়া। পেটের ও বুকের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া গিয়া লাল মাংস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে বড় বড় ফোস্কা।

এত দুঃখেও কিন্তু সে হাসিতেছে। এক পিঠ চুল। কালো মুখটিতে বড় বড় চোখ দুইটি বেদনাতুর ; তবু যেন কৌতুকদীপ্ত।

"দিন না একটু জল। জ্বালা কমে নি এখনও—উঃ, বড় জ্বালা! ম'রে গেছি, তবু জ্বালা কমে না কেন বলুন তো ?"

কাঁদিতে কাঁদিতেও মেয়েটি যেন হাসিতেছে। হাসি-কান্না যেন মেঘ ও রৌদ্রের মত তাহার মুখে আসা-যাওয়া করিতেছে। কালো, কিন্তু কি চমৎকার মুখশ্রী ? হঠাৎ মনে হইল, এ কি সেই মেয়েটি, যাহার কথা কবি—

সেই মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"কি ভাবছেন বলব ?"

"কি ?"

"সেই কবির কথা। সে এসেছিল বুঝি আপনার কাছে ? বেচারা! তার সব গল্প বিশ্বাস করেছেন আপনি ? কবিতা শুনিয়েছে সে আপনাকে ? বেশ কবিতা, নয় ?"

তাহার বড় বড় কৌতুকভরা সজল চক্ষু দুইটি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল।

"বেচারা আসল কথাটা যদি জানত! ভুলটা তার কোন-দিন ভেঙে দিই নি। আমার স্বার্থ ছিল কিনা! এখন দেখা পেলে ভেঙে দিতাম। যদি যে আসে, তার ভুলটা ভেঙে দেবেন আপনি ?"

"কি ভুল ?"

"একদিনের জন্যও তাকে আমি ভালবাসি নি। কবিতা-টবিতা আমার মোটে ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, ওসব

ন্যাকামি। হয়তো আমি বুঝতে পারি না। তাই ব'লে ভাববেন না যে, আমি আমার স্বামীকেই ভালবাসতাম। স্বামীকে আমি মোটে দেখতে পারতাম না। আমার স্বামী রক্তমাংসের শক্ত মানুষ ছিল না। যেমন লিকলিকে তার দেহ—তেমনই লিকলিকে তার মন। তার দেহ বা মনে এতটুকু শক্তির সন্ধান কখনও দেখতে পাই নি। সে যদি শক্ত সমর্থ বর্ব্বর একটা দস্যুও হ'ত, তা হ'লেও আমি ঢের বেশি সুখী হতাম। এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব? না, এম. এ. পাস প্রফেসার স্বামীকে আমার মোটে পছন্দ হয় নি। আমার একটা গল্প শুনবেন? গল্প নয়, সত্যি কথা। যখন বেঁচে ছিলাম, তখন নিজের কাছেই কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা হ'ত। এখন আর লজ্জা কি, ভয়ই বা কি?”

আর একটু কাছে সরিয়া আসিল।

“আমাদের বাড়ির পাশে একটা ছোটলোক থাকত, বুঝলেন, ছোটলোক মানে গরিব লোক। আমাদের বাড়ির জানলা থেকে তাদের বাড়ির উঠোন দেখা যেত। কি ষণ্ডা লোকটা—মাথায় বাবরি-চুল, প্রকাণ্ড গোঁফ, গালপাট্টা-দাড়ি। দেখলে মনে হ'ত, যেন যমদূত। সে রোজ এসে তার বউটাকে চুলের ঝুঁটি ধ'রে ঠেঙাত। বউটার কান্নার জ্বালায় পাড়ার সবাই অস্থির হয়ে উঠতাম। এক-একদিন আবার সেই লোকটা বউটাকে আদরও করত দেখতে পেতাম। অত অজস্র আদর করতেও কাউকে দেখি নি কখনও। অত সোহাগ কোন পুরুষ

যে কোন স্ত্রীকে করতে পারে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল। সত্যি বলছি, সেই বউটাকে দেখে আমার হিংসে হ'ত। আহা-হা, অমন সুন্দর প্রজাপতিটা পুড়ে গেল, দেখুন!"

দেখিলাম, সেই রঙিন প্রজাপতিটা দীপশিখায় পড়িয়া সত্যই পুড়িতেছে। একটা ডানা পুড়িয়া গিয়াছে, ছটফট করিতেছে। শুনিতে পাইলাম, সে যেন বলিতেছে—"যত হীন তোমাকে মনে করিয়াছিলাম, তত হীন তুমি নও, তুমি বন্দিনী, তবু তুমি সুন্দরী।"

পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। একটা বিকট গন্ধে চতুর্দ্দিক ভরিয়া উঠিল। দীপশিখা দেখিলাম হাসিতেছে।

বিশ্বের সমস্ত নিস্তব্ধতা যেন ঘরটাতে ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

হঠাৎ সেই মেয়েটি আবার কথা কহিল—

"ভাল আমিও বেসেছিলাম। কাকে জানেন? ওই কবিরই একটি ভাই ছিল, তাকে। সুন্দর ছেলে। সে কবিতাও লিখত না, লেখাপড়াও বেশি জানত না। কিন্তু চমৎকার ছেলে, কি তার স্বাস্থ্য, কত বলিষ্ঠ তার মন! বেশি কথা বলত না। নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকত। বি. এ. না কি পড়ত, তখনও তার লেখাপড়া শেষ হয় নি। বীরেন তার নাম। কবির কাছে কবিতা শোনবার ছুতোয় যেতাম তাকেই দেখতে। কবি মনে করত, আমি বুঝি তারই প্রেমে প'ড়ে গেছি। কবিতা শুনে

মুগ্ধ হয়েছি, তাই নানা ছুতোয় রোজ যাই। কি ভীষণ অহঙ্কারী এই কবিরা!"

বলিয়া মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

"আমি যেতাম বীরেনকে দেখতে, কত মিথ্যেই যে সত্যের মুখোশ পরে! কবি ছিলেন আমার স্বামীর বন্ধু। একটা বড় বাড়ির দুটি বিভিন্ন অংশে থাকতাম আমরা। কবির বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। তাই ব'লে ভাববেন না যে, স্বামী আমার উদারমতাবলম্বী ছিলেন। একেবারেই তা নয়। সাহস ক'রে বারণ করবার মত বলিষ্ঠতা তাঁর ছিল না। তাঁর দুর্ব্বলতার এই সুযোগ নিয়ে আমি যখন খুশি ওদের বাড়ি চ'লে যেতাম। আর একটা সুযোগও ছিল। কবির একজন বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা ছিলেন বাড়ির কর্ত্রী। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। বার বার আমায় ডেকে পাঠাতেন, তাঁর কাছে যাওয়ার নাম ক'রে রোজ যেতাম সেখানে।"

কবি আমাকে একলা পেলেই কবিতা শোনাতেন। বুঝতাম, কবিতার মারফৎ প্রেম-নিবেদন করছেন। সব বুঝতাম, কিছু বলতাম না। বরং মুগ্ধ হবার ভান করতাম। ভান করতে আমরা কত পটু, তা জানেন তো?" বলিয়া মেয়েটি আবার ফিক করিয়া একটু হাসিল। তাহার পর বলিল—"উঃ, বড় জ্বালা করছে! সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল আমার! আগুনটা কি নেবে নি এখনও? একটু ব্যবস্থা করুন না!"

"গল্পটা আগে শেষ কর।"

"এ অসমাপ্ত গল্প। বীরেনকে আমি পাই নি তো। লোকে ঘেয়ো কুকুরকে যেমন দূর-দূর ক'রে তাড়িয়ে দেয়, সেও তেমনই ক'রে একদিন তাড়িয়ে দিলে আমাকে। একদিন মাত্র তাকে একা পেয়েছিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যে…মাত্র পাঁচ মিনিট, তাও বোধ হয় নয়। লজ্জার মাথা খেয়ে সেদিন তার কাছে সমস্ত মনখানা মেলে ধরেছিলাম। সে কি বললে, জানেন? 'দ্বিতীয় বার এ কথা আর আমার কাছে উচ্চারণ করবেন না। আমি জানতাম, আপনি ভাল। এ কি আপনার ব্যবহার, ছি ছি! বাড়ি যান।' এই ব'লে সে বেরিয়ে চ'লে গেল। বজ্রাহতের মত নির্ব্বাক হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল, যেন পায়ের তলা থেকে মাটি স'রে যাচ্ছে। আমার সমস্ত ইহকাল, সমস্ত সত্তা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, সমস্ত বিশ্বভুবন যেন আমার চোখের সামনে দুলতে লাগল। ঠিক সেই সময় কবিও এলেন। তিনিও আমাকে একা পেলেন। তাঁর মানসী যে আমি ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা তিনিও এতকাল বলবার শুভযোগ খুঁজে পান নি। সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার সুদুর্লভ নির্জ্জনতার নিবিড়তায়,—কি ছাই আমার ভাল মনেও নেই সেসব ভাষা। মোট কথা, তিনিও প্রেম-নিবেদন করলেন সেদিন। বীরেনের কথাগুলো আমার কানে বাজছিল। অবিকল সেই কথাগুলি আবৃত্তি ক'রে দিলাম।"

মেয়েটি আবার চুপ করিয়া গেল।

"কি হ'ল তারপর?"

"তারপর তো আপনি সব জানেন। কবি সেই দিন রাত্রেই রিভল্‌ভার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। পরদিন আমিও পুড়ে মলাম। পুড়ে মরবার আগে অবশ্য স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া প্রায় রোজই যেমন হ'ত তেমনই হয়েছিল। পাড়ার লোকে জেনেছে, আমার মৃত্যুর কারণ আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া। আমার স্বামী বুঝলেন, মৃত্যুর কারণ কবির সঙ্গে প্রেম। কবির ধারণা হয়েছিল বোধ হয় যে, আমি তাকে ভালবাসতাম। কবির মৃত্যুর কারণ আপনারা ঠিক করেছিলেন বুঝি পাগলামি—টেম্‌পরারি ইন্‌স্যানিটি। বীরেন কি ভেবেছে সেই জানে। সত্য-মিথ্যার কেমন একটা হেঁয়ালি বলুন তো ?"

মেয়েটি হাসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে কাতর মিনতি ফুটিয়া উঠিল আবার।

"উঃ, বড় জ্বালা! একটু কিছু করুন না, ডাক্তারবাবু! বড় জ্বালা!"

জীবিতের চিকিৎসা হয়তো কিছু জানি। মৃতের কি চিকিৎসা করিব ? শিখি নাই তো।

মূঢ়ের মত বসিয়া শুনিতেছি—"বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—"

ধীরে ধীরে আর্ত্তস্বর অন্ধকারে মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া বসিয়া আছি।

নীরন্ধ্র অন্ধকারকে চিরিয়া চিরিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎশিখা আকাশ ব্যাপিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। সামনের মাঠে কুলগাছটা যেন প্রেতিনীর মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় অসংখ্য জোনাকি। প্রেতিনীর সহস্র অলন্ত চক্ষু যেন অন্ধকারে কাহাকে খুঁজিতেছে।

কাহাকে ?

একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকিল।

বইয়ের পাতাগুলা ফরফর করিয়া উড়িতে লাগিল। বইটা তুলিয়া লইয়া আবার গল্পে মন দিলাম।

"খুব সঙ্কীর্ণ পথ। দুই ধারে আকাশচুম্বী খাড়া উঁচু পাহাড়। গিরিসঙ্কটের ভিতর বেশ অন্ধকার। মেয়েটির চোখে মুখে একটা ভীত চকিত ভাব। রাত্রি আসবার আগে সে এই সঙ্কীর্ণ পথটুকু অতিক্রম ক'রে যেতে পারলে যেন বাঁচে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মটাস ক'রে একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দ যেন শুনতে পেলাম। অন্ধকারে—প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে মনে হ'ল। কি ওটা ?

'ছুটে পালাও তুমি'—মেয়েটি মনে হ'ল বলছে। তার মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডান হাত দিয়ে সে তার ছোট কুড়ুলের বাঁটটি চেপে ধরেছে।

শক্তি থাকলে হয়তো আমি ছুটে পালিয়েই আসতাম। কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না। ভয়ে আমার পায়ের পেশীগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পাথরের মূর্তির

মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এইবার সেই বস্তুটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—শ্বেতভল্লুক। একটা ঝোপের ভেতর থেকে মুণ্ড আর সামনের পা দুটো বের ক'রে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মুখে একগোছা 'বেরি'ফল। তার আহারে আমরা বিঘ্ন উৎপাদন করেছি। প্রকাণ্ড বড় ভাল্লুক। গায়ের লোম দেখলে মনে হয়, খুব বুড়ো।

'পালাও'—আমিও মেয়েটির কানে কানে বললাম। আমার মনে সহসা কেন জানি না একটা পৌরুষভাব জেগে উঠল। মনে হ'ল, মেয়েটি পালিয়ে যাক, আমি বুক দিয়ে ওকে আগলাব। ভালুকের সঙ্গে লড়তে হয় যদি, তাও স্বীকার। মনে মনে এই পুরুষোচিত সঙ্কল্প করলাম বটে, কিন্তু তখনও আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ। বৃহৎ পশুটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি কিন্তু পালাল না। সে যা করলে, তাও কেউ যে কোনদিন করতে পারে, তা কখনও কল্পনা করি নি। সে না পালিয়ে ভালুকটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার অঙ্গচ্ছদ খুলে ফেললে। খুলে ফেলে সে আঙুল দিয়ে তার 'ব্রিচেস' ভালুকটাকে দেখাতে লাগল, এই রকম চওড়া 'ব্রিচেস' মেয়েরা পরে। অর্থাৎ সে যে নারী এই কথাটি সে ভালুককে বোঝাবার চেষ্টা করলে। ভালুকটা একবার চেয়ে দেখলে, ফলের গোছাটা মুখ থেকে তার প'ড়ে গেল। নাসারন্ধ্র থেকে বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস আওয়াজ ক'রে জঙ্গলের নিবিড়তায় দেখলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ফিরে এল না।

ল্যাপদের ধারণা, শ্বেতভল্লুক মেয়েদের কিছু বলে না—"

"আমরা কিন্তু শ্বেতভল্লুক নই, আমরা মানুষ। নারীমাংস আমাদের অরুচি নেই।"

"কে ?"

চমকাইয়া উঠিলাম।

একটা মুণ্ড শূন্যে ঝুলিতেছে। পুরু পুরু ঠোঁট দুইটিতে পাশবিক একটা হাসি। মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা এবং খাড়া। মুখের গোঁফ-দাড়িও সেইরূপ। একটা সজারু যেন সর্ব্বাঙ্গের কাঁটাগুলাকে উদ্যত করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া আছে।

"নারীমাংস আমার ভারি প্রিয় জিনিস ছিল। অভাবও কোনদিন হয় নি। বাবা প্রচুর টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাদ সাধল কিন্তু বিবেক। এই বিবেকের টুঁটি চেপে ধরবার জন্যে কি কম আয়োজন করেছিলাম ? মোসায়েব, মদ, আফিং, গাঁজা, কোকেন, যত রকম হতে পারে। কিন্তু পারলাম না। বিবেককে হত্যা করতে পারলাম না। বিবেকই আমাকে হত্যা করলে। আচ্ছা, ডাক্তার, হত্যা করলে মানুষের ফাঁসি হয়, বিবেকের ফাঁসি হয় না ? বিবেকের প্ররোচনায় কত হত্যাকাণ্ড রোজ হয় জান ? অনেক…এক-আধটা নয়, অনেক। অথচ এই বিবেককে কেউ শাস্তি দেয় না, কেমন তোমাদের আইন ?"

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিয়া হাসিয়া উঠিল—"আইনের দোষ কি ? বিবেককে তো আর ধরা যায় না। তার হাতে হাতকড়ি লাগাবারও উপায় নেই। আশ্চর্য্য

অশরীরী জিনিস এই বিবেক! অথচ কি ভয়ঙ্কর! আমার ঘাড় ধ'রে নিয়ে গিয়ে রেল-লাইনের ওপর মুখটা গুঁজড়ে ধ'রে রেখে দিলে, যতক্ষণ না বম্বে-মেলটা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চ'লে গেল। কিছুতে নড়তে পারলাম না আমি। আচ্ছা, ডাক্তার, আমার ধড়টা কোথা গেল বলতে পার? ধড়টা না হ'লে যে চলছে না!"

কাটা মুণ্ড আবার শূন্যে মিলাইয়া গেল। মনে হইল, দেওয়ালের ওই ক্যালেণ্ডারখানার পাশে অন্তর্হিত হইল।

সামান্য একটা ক্যালেণ্ডার।

তাহারই দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। ক্যালেণ্ডারের ছবিটাকে এত ভাল করিয়া আর কোনদিন দেখি নাই। ছায়া-মুণ্ডটা উহার পাশ দিয়া মিলাইয়া গেল, তাই ছবিটার দিকে নজর পড়িল। অগ্রাহ্য করিবার মত ছবি তো নয়। রূপদক্ষ শিল্পীর অন্তরের সৌন্দর্য্যবোধ তুলির টানে টানে যেন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নীলাম্বরী শাড়ির আবেষ্টনীতে সুন্দর মুখখানি অপরূপ। এতকাল ধরিয়া সম্মুখে টাঙানো আছে, লক্ষ্যই করি নাই। আশ্চর্য্য!

মানুষের জীবনে সব সময়ে সব জিনিস লক্ষ্য করিবার সুযোগ আসে না। মানুষ এক সময় একটা জিনিস লইয়াই মাতিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাকি জিনিসগুলার সহিত সে বাহ্যিক লৌকিকতা রক্ষা করে মাত্র। অন্তর দিয়া একই কালে সমস্ত জিনিসের সত্তাকে সে সমান আগ্রহে অনুভব করে না। করিতে

পারে না। ইহা তাহার ক্ষমতা ও অক্ষমতা। ফুলকে যখন দেখি, পাখীর কথা বিস্মৃত হই।

চিত্রার্পিতা সুন্দরী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে। ভাবিতেছি, ছবি কি ভালবাসে? আমাদের মত উহার বুকেও কি সুখ-দুঃখের দোলা লাগে? লাগিলেও কি আমাদের মত বিচলিত হয়? ছবি কি কখনও কাঁদে? হয়তো কাঁদে। আমরা দেখিতে পাই না। ছবির ক্রন্দনের ভাষা হয়তো অশ্রু নয়, আর কিছু। জড় ও চেতনের মধ্যে সত্যই কি কোনও তফাত আছে? এই নিখিল বিশ্বের বিরাট বস্তুপ্রবাহের মধ্যে কে জড় কে চেতন কে ঠিক করিয়া দিবে? সীমারেখা কোথায়? সীমা বলিয়া কিছু আছে কি? সীমা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আমাদের বুদ্ধির। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা প্রত্যেক জিনিসের সীমা-নির্দ্দিষ্ট করিতে চাই। সীমা না পাইলে আমরা অসীমের কল্পনা করিতে পারি না। গণ্ডির ভিতর আছি বলিয়াই ভূমার কল্পনা করি। ভূমার কল্পনা করি, কিন্তু গণ্ডি রচনা করিতেও ছাড়ি না। সারাজীবন নানা ভাবে গণ্ডির পর গণ্ডি রচনা করিয়া চলিয়াছি। তাহাতেই আমাদের তৃপ্তি। অথচ একটু ভাবিয়া দেখিলেই সমস্ত সীমা বিলুপ্ত হইয়া যায়, চেতন জড় হয়—জড়ের চেতনা জাগিয়া উঠে। সমস্ত গণ্ডি মুছিয়া যায়। জীবন ও মরণের ব্যবধান আর থাকে না।...

মনে হইল, ছবির চোখের যেন পলক পড়িল। পীবর বক্ষটি

যেন তুলিয়া উঠিল, দীর্ঘনিশ্বাস মোচনের শব্দ যেন পাইলাম। মনে হইতেছে, এইবার যেন কথা কহিবে।...একা অন্ধকার রজনীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানিকে অত্যন্ত নিকট-আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইচ্ছা করিতেছে, উহাকে ডাকিয়া বলি—"হে সুন্দরী, রেখার বন্ধনে কে তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে? তুমি প্রাণময়ী হও, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। প্রমাণ করিয়া দাও যে, জড় ও চেতনার কোনও প্রভেদ নাই।"

সহসা এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল। চাহিয়া দেখিলাম, মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র উঠিতেছে। মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, আশেপাশে এখনও কালো কালো মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

মনে হইল, যেন ওই কৃষ্ণপক্ষের ম্রিয়মাণ চন্দ্রকলার মুখে একটা বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুদূর আকাশ হইতে মনে হইল তাহার কথা আমি শুনিতে পাইতেছি—

"আমাকে দেখিয়া অত মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছ কেন? এখন তো আমার মধ্যে মুগ্ধ হইবার মত কিছু নাই। একদিন ছিল বটে, যখন আমার পর্ব্বতের শিখরে শিখরে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত মহিমা প্রধূমিত হইয়া উঠিত, প্রতি পরমাণুতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতাম, প্রদীপ্ত জ্বালায় নিজের কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা আমিও আকাশের দীপালীতে আমার অন্তরদীপটিকে সগৌরবে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আজ কিন্তু আমার কিছু নাই!

এখন আমি নিবিয়া গিয়াছি। এখন আমি আমার পূর্ব্ব-গৌরবের কঙ্কাল মাত্র। মহাকাশে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জীবন্ত সূর্য্যের করুণা-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া এই যে আমার প্রকাশ, ইহাতে আমার গৌরবের কিছুই নাই। আমি মৃত, আমি প্রেতাত্মা।”

মেঘ আসিয়া কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল। চন্দ্রমা অবলুপ্ত হইল।

একটা ভেকের আর্ত্তস্বর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিতেছে। তাপে ধরিয়াছে। কোঁক-কোঁক-কোঁক—একটানা একঘেয়ে শব্দ একটা—সুর আছে, তালও আছে।

সঙ্গীত ?

মনে হইল, যেন একখানা অতি শীতল হস্ত আমার কাঁধের উপর কে রাখিয়াছে! ফিরিয়া দেখি, একটি মেয়ে। কিশোরী, যুবতী, কি বৃদ্ধা বুঝিবার উপায় নাই। একদা হয়তো পরমা সুন্দরী ছিল, জানি না, এখন বীভৎস। সমস্ত মুখখানা ফুলিয়া পচিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মাংস নাই। বিদীর্ণ স্ফীত উদরটা হইতে পচা অন্ত্রগুলা বাহিরে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিগলিত ...ন চক্ষু দুইটি নিষ্পলক।

'কোথা গেল সে? কোথায় হারিয়ে গেল? আমরা যে একসঙ্গে জলে ডুবেছিলাম, আর তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেল? ম'রেও কি তাকে পাব না? তাকে যে আমি

চাই। ওগো, কে তুমি, খুঁজে দাও না তাকে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে! চারিদিকে এ কি অন্ধকার—"

হাতড়াইতে হাতড়াইতে মেয়েটি অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে অন্ধের অর্থহীন দৃষ্টি।

মুখে হাত চাপা দিয়া কে যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। মুখটা রক্তহীন, ফ্যাকাশে।

"ভুল ভাবছেন আপনি। সব আত্মহত্যার কারণ প্রেম নয়। আমি প্রেমে প'ড়ে মরি নি। আমি মরেছি আপন খুশিতে—সজ্ঞানে এবং বহাল তবিয়েতে। তাই ব'লে ভাববেন না যে, জীবনে কখনও প্রেমে পড়ি নি। অনেকবার পড়েছি। পড়েছি এবং উঠেছি। কিন্তু আত্মহত্যা করবার প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করি নি।"

বলিয়া ভদ্রলোক পিছন দিকে দুই হাত দিয়া শিস দিতে দিতে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভাবটা যেন—আত্মহত্যা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আর কি হইয়াছে, যাহা লইয়া ক্রমাগত কবিত্ব করিতে হইবে!

হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আবার তিনি বলিলেন—

"ব্যথা, অভিমান কিছুই নয়। বিদ্রোহ। জীবনে কখনও কোন ব্যাপারে হার মানি নি। এম. এ. পর্য্যন্ত সব পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হয়েছি। শুধু পড়াশোনাতেই নয়, খেলাতেও ফার্স্ট। এমন কি তাস-খেলাতেও।"

বলিয়া ভদ্রলোক আমার দিকে চোখ বড় বড় করিয়া ়াহিলেন।

"প্রেমের ব্যাপারেও চিরকাল জিতেছি। পেটের জন্যেও ারও কাছে হাত পাতবার দরকার হয় নি। 'ব্যাচিলর' মানুষ, ানন্দেই ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি— কি দখলাম বলুন তো?"

সকৌতুকে আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া ঠিলেন—

"না না, ব্যাঙ্ক ফেল নয়। সকালে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, -একগাছা চুল পেকেছে। সমস্ত সকালটা মন খারাপ হয়ে ইল। খবরের কাগজে মন দিতে পারলাম না। বন্ধুরা এলেন। ালাপ জমল না।"

দিনটা এক রকম কাটল। রাত্রে কিন্তু ওই পাকা চুল দুটো ড় জ্বালাতন করতে লাগল। যেই একটু ঘুম আসে, অমনই মনে হয়, যেন মাথার পাকা চুল দুটো সাদা সাদা প্রেতমূর্ত্তির মত ামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, ওহে ভাগ্যবান ধনীর দুলাল, এইবার তো সময় হ'ল। এইবার হার মানতে হবে। আর দেরি নেই। ঘুম হ'ল না। এমনই প্রায় রোজ। আমাদের াড়ির পাশে একজন থুড়থুড়ে বুড়ো থাকত। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, সে যেন বলছে, 'কি হে ছোকরা, ভারি যে আমাকে অনুকম্পা করতে! এইবার?' বলছে আর হাসছে।"

ভদ্রলোক চুপ করিলেন।

৫

"বুড়োটা সত্যিই সকলের কৃপা-পাত্র ছিল। মুখে একটি দাঁত ছিল না। চোখে দেখতে পেত না। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতিনী সবাই একে একে চোখের সামনে ম'রে গেল বুড়োর কিন্তু মৃত্যু নেই। মহাকাল যেন চাবকাচ্ছে তাকে ধ'রে।

আমারও মনে হ'ল, এই তো আমারও 'নোটিস' এসে গেছে এইবার কোন্‌দিন এসে চুলের মুঠিটা ধরবে। তারপর শুরু হবে টানাটানি। এক দিকে ধরবে আত্মীয়-স্বজনরা, আর এক দিকে যমদূতরা। সেই টানাটানির মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। অসহ্য! সে চিন্তাও অসহ্য! শেষকালে জরার কাছে পরাভব স্বীকার করব? কেন স্বীকার করব—রিভল্‌ভার থাকতে?...ভাল করি নি?"

হাসিমুখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন।

"মাথায় গুলি করি নি। তার কারণ, আমার এমন সুন্দর চেহারাটা নষ্ট করতে মায়া হ'ল। আচ্ছা, দেখুন তো ডাক্তার-বাবু, আমার মুখের চেহারা ঠিক আছে তো?"

ভদ্রলোক স্মিত মুখে নিজের মুখটা তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া তিনি দুই হাত দিয়া কোটটা ফাঁক করিয়া বলিলেন—

"এই দেখুন, মহাকালের ওপর টেক্কা দিয়েছি।"

দেখিলাম, বুকে ঠিক হার্টের উপর নিদারুণ ক্ষতটা। মনে হইল, ক্ষতটাও যেন হাসিতেছে।

ভদ্রলোক কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া বলিলেন—"এত

সহজে মরেছিলাম, তার কারণ বোধ হয় পৃথিবীতে আমাকে বেঁধে রাখবার মত কেউ ছিল না। বাবা-মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন। সুখের পারাবতের মত কতকগুলি বান্ধব-বান্ধবী এসে চারিদিকে বকবকম করতেন বটে; কিন্তু তাঁদের আকর্ষণ এত শক্ত ছিল না, যার খাতিরে জরার অত্যাচার সহ্য করা যায়।”

বলিয়া ভদ্রলোক নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে।

“ওটা আপনার ভুল ধারণা। সব মৃত্যুর কারণ প্রেম নয়, অপ্রেমও হতে পারে। জীবনে আমার কোন বন্ধন ছিল না, তাই সহজে মরেছি।”

ভদ্রলোক আবার একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ মনে হইল, তাঁহার চোখে কি যেন চকচক করিতেছে! অশ্রু নাকি? ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার পূর্ব্বে ছায়ামূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।

মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, ক্যালেণ্ডারের মেয়েটি হাসিতেছে।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আকাশের আবার রূপ বদলাইয়াছে। পুঞ্জীভূত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া আবার চাঁদ উঠিতেছে। প্রকাণ্ড একখানা নিকষকৃষ্ণ মেঘ চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটল দিয়া অবিরল-ধারে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে।

সৃষ্টি জুড়িয়া আলো ও আঁধারের এই চিরন্তন লীলা। সৃষ্টির

প্রারম্ভ হইতে আছে, শেষ পর্য্যন্ত থাকিবে। রৌদ্রে, জ্যোৎস্নায়, ইন্দ্রধনুতে, বর্ণালঙ্কৃত মেঘমালায় ঋতুতে ঋতুতে আলো-আঁধারের যুগলরূপ নানা বেশে রূপায়িত হইয়া আছে। ইহাদের বিরহ-মিলনের অনবদ্য প্রকাশে দশ দিক সুরঞ্জিত।

আঁধার-বিরহিত আলোক সমস্ত দিনের তীব্র রৌদ্রদাহে কামনা করে স্নিগ্ধ অন্ধকারকে। দিবসের এই আঁধার-কামনা মূর্ত্ত হয় ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায়, গভীর জলরাশির ঘন নীল কান্তিতে, অরণ্যের ছায়ার স্নিগ্ধতায়। আলোক-বিরহিত গাঢ় অন্ধকার রাত্রির নির্জ্জনতায় ধ্যান করে আলোকের শুভ্র মূর্ত্তি। অন্ধকারের আলোক-স্বপ্ন মূর্ত্ত হয় লক্ষ কোটি নক্ষত্রে, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আবেশে, অনন্ত-প্রসারিত শুভ্র ছায়াপথে।

হঠাৎ মনে হইল, আকাশের গায়ে যেন কবির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। ওই বিদীর্ণ মেঘখানা যেন তাহার বিদীর্ণ মাথাটা, জ্যোৎস্নাধারা—যেন তাহার বিগলিত মস্তিষ্ক গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ, সমস্ত অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া কবির গম্ভীর স্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"গভীর বিরহ মাঝে কত যে মাধুরী আছে,
তৃপ্ত ও অতৃপ্ত কত সাধ!
কত সত্য, কত ভ্রান্তি কত জ্বালা, কত শান্তি,
কত তীব্র হরষ-বিষাদ!

কে বুঝিবে তার মূল্য ? কিবা আছে তার তুল্য ?
বুঝিবে না—চাহি না বুঝাতে,
চাহি না আনিতে টানি কাহারও সান্ত্বনা-বাণী,
এই অশ্রু হবে না মুছাতে।
ভরি সর্ব্ব চেতনারে অন্তরে বেদনারে
স্নেহভরে করিব লালন।
বেদনাই প্রিয়তম চিত্ত ভরি থাক মম,
চাহি না তা করিতে ক্ষালন।"

অকস্মাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো মেঘের দল চতুর্দ্দিক হইতে দানবের মত ছুটিয়া আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সোঁ—সোঁ—সোঁ—সোঁ। অন্ধকারের বক্ষ হইতে যেন লক্ষ লক্ষ কালনাগিনী জাগিয়া উঠিয়াছে।···চাঁদ ঢাকা পড়িয়া গেল। কবি ও তাহার কবিতা ঝড়ের বেগে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। উন্মত্ত বাতাস ঘরে প্রবেশ করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে।···টেবিল হইতে একখানা খাম উড়িয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।···ক্যালেণ্ডারের হাস্যমুখী তন্বীর অধরে আর হাসি নাই।

সে ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া একটা ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিল।

"ডাক্তারবাবু, সেই ছেলেটি কি আর এসেছিল ?"

সেই সুন্দরী বারাঙ্গনাটি আসিয়াছে। জীবনে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই বলিয়া গলায় দড়ি দিয়াছিল।

সত্যই অপূর্ব্ব সুন্দরী। মৃত্যু তাহাকে মলিন করে নাই।

একটু ইতস্তত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সেই বোমার দলের ছেলেটি আবার আসবে ?"

"কি করবে তা জেনে ?"

দেখিলাম, ঠোঁট দুইটি তাহার কাঁপিতেছে।

"ঠাট্টা করবেন না ?"

"না।"

"দেখুন, আমার আকণ্ঠ পিপাসায় ভ'রে আছে। সারা জীবনটা এক বিন্দু ভাল ঠাণ্ডা জল পেলাম না। পচা নর্দ্দমার জল কখনও খাওয়া যায় ? জীবনে একটাও নদী দেখতে পাই নি, খালি নর্দ্দমা—কেবল দুর্গন্ধ পচা জল। দারুণ পিপাসায় তাও কতবার তো খেয়েছি। তবু মৃত্যু হয় নি। মরবার জন্যে শেষটায় দড়ি খুঁজতে হ'ল। কিন্তু মৃত্যুর পরও দেখছি, পিপাসা তো সমানই আছে। একটুও কমে নি। সমস্ত সত্তা এক বিন্দু ভাল জলের জন্যে এখনও হাহাকার করছে। একটু জল পেলে যেন বাঁচি। সেদিন সেই কবিকে ঠাট্টা করলাম বটে, কিন্তু সে ঠিকই বলছিল বোধ হয়। জীবনে প্রেমের আবির্ভাব হ'লে ক্ষুদ্র জলাশয় সমুদ্র হয়ে ওঠে, লোহা সোনা হয়ে যায়। সেদিন সেই যে ছেলেটি দেখলাম আপনার কাছে, কোথায় সে ? আহা,

ঠিক যেন ঝরনা! ও কি—ও কে—এ কি—মৃত্যুর পরও লোকটা সঙ্গে সঙ্গে এসেছে! এখানেও মুখপোড়ারা সঙ্গ ছাড়বে না!"

রমণী অন্তর্হিত হইল।

দেখিলাম, সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি লোক টলিতেছে।

লম্বা শীর্ণ তাহার দেহ। গালের হাড় দুইটা অসম্ভব রকম উঁচু। জবাফুলের মত চক্ষু দুইটা বিস্ময়-বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। জড়িতস্বরে শুনিলাম বলিতেছে—

"ডাক্তার, কতখানি মাল আমার পেট চিরে পেয়েছিলে বল তো বাবা? সেদিন কি সোজা মাল টেনেছিলাম! দু বোতল নির্জ্জলা হুইস্কি। পরের পয়সায়। মাইরি বলছি—"

বলিয়া লোকটা আবার টলিতে লাগিল।

"পরের পয়সায় বাজি রেখে খেয়েছিলাম। গলাটা জ্ব'লে পুড়ে খাক হয়ে গেস্‌ল, মাইরি বলছি। আমার মতন পাঁড় মাতাল সঙ্গে সঙ্গে কাত—কোন্ শালা মিছে কথা বলে!—একেবারে বেহুঁশ।"

আবার খানিকক্ষণ টলিয়া সে শুরু করিল—

"পরের পয়সায়, মাইরি বলছি। নিজের পয়সা পাব কোথা? ট্যাঁক তো হরদম গড়ের মাঠ। এক জমিদার-পুত্তুর কাপ্তেন পাকড়েছিলাম, সেই শালার সঙ্গে বাজি রেখে তারই পয়সায় এই কাণ্ড। মাইরি বলছি। ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো দেখছি, যা বাবা, সব

ফরসা—ম'রেই গেছি। এমন বেকুব আর জীবনে কখনও হ নি। মাইরি বলছি। হ্যাঁ, আমাদের বিন্দীর গলার আওয়াজ যেন শুনলাম। আমাদের বিন্দী-বাঈজী। চেনো তাকে ভাল নাম বোধ হয় বিনোদিনী। বেড়ে নাচে বেটী! ও কোমর ঘোরানো যদি দেখ একবার! একখানি 'চিজ'—মাইরি বলছি।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল। চক্ষু দেখিলাম বুজিয়া আসিতেছে। হঠাৎ চক্ষু খুলিয় বলিল—"আচ্ছা ডাক্তার, এ অঞ্চলে আবগারির দোকা কোন্‌খানটায় আছে জান কি? মদের ভাঁটি? অন্ততপক্ষে তাড়িখানা? একটু না টানলে কেমন যেন বেজুত মনে হচ্ছে, মাইরি বলছি।"

টলিতে টলিতে লোকটা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

বিনিদ্র নয়নে একা বসিয়া আছি।

মনে হইতেছে···।

বাঁচিয়া আছি, অথচ বাঁচিয়া থাকার অর্থ বুঝি না। মৃত্যু সহিত প্রত্যহ মুখামুখি দেখা হয়, তাহাকেই চিনি কি? রোজ তো তাহার কত রূপই দেখিতেছি! কত জননীর কোল খালি করিয়া ফুটন্ত ফুলের মত কত শিশু সে ছিঁড়িয়া লয়! আশা আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম-পূর্ণ কত উন্মুখ জীবন অকালে শেষ করে! কা

স্বপ্ন চূর্ণ করে, কত সাধের বাগান বিশুষ্ক করিয়া দেয়! নির্ম্মম সে, নির্দ্দয় হস্তে নির্ব্বিচারে সংহার করিয়া চলিয়াছে।

আবার সেই একই মরণের আর এক রূপ। করুণাময় আবির্ভাব। অনাহারক্লিষ্ট অভিশপ্ত জীবনের সকল আগুন সে মুহূর্ত্তে নিবাইয়া দেয়। বার্দ্ধক্যপীড়িত জরাগ্রস্ত লোলচর্ম্ম বৃদ্ধের সকল অশান্তির অবসান করে। জীবনের সকল অপমান, সকল লজ্জা, সকল কলঙ্ক, সকল শোক, সকল দুঃখের উপর স্নিগ্ধ অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দেয়। মহামুক্তিময় বিস্মৃতির দেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।...

গল্প-পুস্তকে আবার মনোনিবেশ করিয়াছি।

"ওপারে উঁচু তীরের চড়াই ভাঙিয়া তাহারা প্রকাণ্ড এক জলাভূমিতে উপস্থিত হইল। বরফ-শীতল তাহার জল। সেই জল ভাঙিয়া যাইতে হইবে। মেয়েটির চোখে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন পথ ঠিক করিতে পারিতেছে না। এই জলাভূমিতে পথ হারাইলেই মুশকিল।

হঠাৎ সে দূরে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, "রগ।" দেখা গেল, দূর দিগন্ত হইতে মেঘের মতন কি যেন একটা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে।

একটু পরেই বোঝা গেল, কুয়াশা। নিমেষমধ্যে তাহারা ঘন

চাই। যেমন ক'রে হোক, অনেক টাকা চাই। পরজন্মে কোটিপতি হয়ে জন্মাতে চাই। এর জন্যে যে কোন তপস্যা, যে কোন কৃচ্ছ্র-সাধন করতে আমি প্রস্তুত আছি। নির্ম্মলকে একবার দেখে নেব। এমন শিক্ষা তাকে দিয়ে দেব যে, পাথরও শিউরে উঠবে। দ'লে, পিষে, পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চাই। টাকা চাই—টাকা চাই—টাকা চাই—টাকা—টাকা—টাকা—"

চক্ষু দুইটি হইতে আগুনের হলকা ছুটিতে লাগিল।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম উৎসুক আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার চক্ষুতেও ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেও যেন বলিতেছে—

"ঠিক বলিয়াছ বন্ধু, টাকাই সব। আমার এই প্রস্ফুটিত যৌবনটিকে শিল্পীর দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম টাকারই জন্য। বর্ণের বন্ধনে বন্দী হইয়া টাকারই বন্দনা করিতেছি আমার দেহের সমস্ত মাধুরী দিয়া প্রলুব্ধ দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে প্রসারিত করিয়াছি শুধু টাকার জন্য। আমার অঙ্গের এই প্রদীপ্ত বর্ণবিন্যাস, বিকশিত এই যৌবনশ্রী নীরব ভাষায় সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—টাকা দাও, টাকা দাও, ওগো, কিছু টাকা দিয়া যাও।"

বাহিরে অকস্মাৎ এক ঝলক তীব্র বিদ্যুতের আলো অন্ধকারকে চিরিয়া ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্র-পতনের শব্দ। তাহার পর সব চুপচাপ।

বাতাসের বেগে আলোটা নিবিয়া গিয়াছিল। উঠিয়া আবার জ্বালিয়া দিলাম। জ্বালিয়া দেখি, সেই প্রজাপতিটা আবার উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটু আগেই তো পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল!

মুমূর্ষু ভেকের করুণ আর্ত্তনাদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিমূঢ়ের মত বসিয়া রহিলাম।

সহসা নিজের বিগত জীবনটা মনে পড়িল।

কি দুঃখের সে জীবন! বাবা ছিলেন অতি সামান্য একজন কেরানী। মাহিনা পাইতেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। খোলার বাড়িতে বাস করিতাম। আমরা ছিলাম তিন ভাই, পাঁচ বোন। আমাদের এই ধর্ম্মপ্রাণ দেশে কেরানীর ঘরে মেয়ে! কি কষ্ট করিয়াই যে ছেলেবেলাটা কাটিয়াছে, এখন মনে হয়, যেন দুঃস্বপ্ন!

আমার বাবার কথা মনে পড়িতেছে। জীবনে তিনি এতটুকু শান্তি পান নাই। সকালে কোনক্রমে দুইটি ভাত মুখে দিয়া আপিসে যাইতেন, ফিরিতেন রাত্রি আটটায়। ফিরিয়া আসিয়াও যে শান্তি পাইতেন, তাহা নহে। বাড়িতে মায়ের গঞ্জনা তাঁহার দৈনিক বরাদ্দ ছিল। মায়েরও দোষ ছিল না। তিনিও মানুষ ছিলেন তো, শরীরে রক্ত-মাংস ছিল। সুতরাং একটা ভাঙা খোলার ঘরে অতগুলি ছেলেমেয়ে লইয়া একা হাতে সংসার চালাইবার পর মানসিক সামঞ্জস্য রক্ষা করা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হইত না। মুখে মিষ্ট কথা ফুটিত না। সাধারণ

কথাও কটু হইয়া উঠিত। মেয়েরা নীরবে নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট হয়তো সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সন্তানের দুঃখ বহন করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সন্তানদের একটু ভাল খাবার খাওয়াইবার জন্য কিংবা একটু ভাল জামা-কাপড় কিনিয়া দিবার জন্য দরিদ্র জননীরা অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আমার মা-ও কম কৃচ্ছ্রসাধন করিতেন না। আমার একই মা পয়সা বাঁচাইবার জন্য ধোপানী, চাকরানী, রাঁধুনী সবই ছিলেন বাড়িতে হাতে সেলাই করিয়া দরজীর কাজও করিতেন। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যার অধিকাংশ অভাবই মিটাইতে পারিতেন না। নিকটেই আর এক উপদ্রব ছিল। পাশের বাড়িতে একজন ধনী থাকিতেন। তাঁহার বাড়িতে নিত্য উৎসব। তিন-চারখানা মোটরকার নানা বিচিত্র শব্দ করিয়া বারম্বার যাতায়াত করিত। গ্রামোফোন দিন রাত বাজিতেছে। একদল ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। কাহারও চাঁপা-রঙের সুন্দর সিল্কের ফ্রকের উপর দোদুল্যমান বেণী, কেহ 'সেলার্স সুট' পরিয়া বগলে ফুটবল লইয়া চলিয়াছে, কাহারও মুখে সুন্দর বাঁশী, কাহারও হাতে রঙিন বেলুন। নিত্য নূতন খেলনা লইয়া নিত্য নূতন রঙিন পরিচ্ছদ পরিয়া তাহারা আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তালি-দেওয়া কাপড় এবং শতছিন্ন জামায় অঙ্গ আবৃত করিয়া আমরা প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতাম। কি যে ভাবিতাম, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং আমার মায়ের মনে শান্তি ছিল না। প্রতিক্রিয়াটা গিয়া পড়িত বাবার উপর। তাঁহার উপরই তিনি যেন শোধ তুলিতেন।

বাবা কোনদিন কিছুই বলিতেন না। এই গঞ্জনাটাও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখের মত তিনি নীরবে সহ্য করিতেন। অসাধারণ তাঁহার সহ্যশক্তি ছিল। মা কিন্তু এই সহ্যশক্তির মর্য্যাদা দিতেন না। এই সহ্যশক্তির জন্যই মায়ের কাছে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাঁহাকে কত দিন বলিতে শুনিয়াছি—

"মানুষের রক্ত কি তোমার গায়ে নেই, না কি? এই যে ছেলেগুলোর গায়ে একটা জামা নেই, মেয়েটা সর্দ্দিতে ঝামরে রয়েছে, দেখতে পাও না তুমি? তোমার ওগুলো মানুষের চোখ, না পাথরের?"

বাবা কখনও কোন প্রত্যুত্তর করিতেন না। তাঁহার মনে কোনদিন কোন বিকার দেখি নাই। আপিসের জামা-জুতা ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া নির্ব্বিকার চিত্তে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়া যাইতেন। হয়তো পরমব্রহ্মের চিন্তাই করিতেন।

"দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?"

স্থূলাঙ্গিনী কালো একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সত্যি কি দেখতে আমি খুবই বিশ্রী? কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। দলে দলে লোক এল আর চ'লে গেল। কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। কিছুতেই বিয়ে হ'ল না।"

মেয়েটি যে কুৎসিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বলুন না আপনি, আমি কি দেখতে খুব খারাপ ?"

অসঙ্কোচে বলিলাম—"না।"

"তবে আমাকে কেউ পছন্দ করলে না কেন ? কেন এমন ক'রে আফিং খেয়ে মরতে হ'ল আমাকে ? আমার এই দেহটা তো আমি সৃষ্টি করি নি। কে সৃষ্টি করেছিল জানেন আপনি ? ঠিকানা জানেন তার ?"

তাহার দুই চক্ষু ব্যাঘ্রীর মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"এই যে আমার রঙ কালো, ঠোঁট পুরু, সামনের দাঁত উঁচু, নাকের ডগাটা শুকচঞ্চুর মত নয়, এর জন্যে দায়ী কে ? আমি তার কাছে জবাবদিহি চাই। আমি তাকে চীৎকার ক'রে জিজ্ঞাসা করতে চাই, কেন তুমি একজনকে রূপসী, আর একজনকে কদাকার করেছ ? কেন—কেন—কেন ? কি অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে ?"

চীৎকার করিতে করিতে সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আমার বাবাও কি কম ভুগিয়াছিলেন মেয়েদের লইয়া ! এক-আধটা নয়, পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে। তিনটির বিবাহ দিতেই তাঁহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল। দেশে দশ বিঘা জমি ছিল তাহাও গেল, পূর্ব্বপুরুষের ভিটাটা ছিল সেটুকুও গেল। কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না।

"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু!"

সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি ছুটিয়া আসিয়াছে। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, সর্ব্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"ওই লোকটাকে চ'লে যেতে বলুন না। দেখলেই আমাকে তাড়া করছে। এই দেখুন, কামড়ে দিয়েছে।"

সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা আসিয়া দাঁড়াইল। গলায় ক্ষুরের ক্ষতচিহ্নটা রক্তাক্ত। সমস্ত মুখ হিংস্র। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—

"কামড়ে আমি তোমার গলার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব। জুয়াচোর, বদমায়েস, পাজি কোথাকার! বল, কোথায় আমার মেয়ে?"

যুবকটি কাতর স্বরে বলিল—"আমায় বিশ্বাস করুন। আমি আপনার মেয়ের কোন খবর জানি না। আমি কখনও দেখি নি তাঁকে।"

ভীমগর্জ্জনে লোকটি উত্তর দিল—"তুমি না জান, তোমার বন্ধুরা জানে। খুঁজে আন, যেখান থেকে পার খুঁজে আন। তা না হ'লে তোমার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলব আমি।"

লোকটা মুখব্যাদান করিয়া দুই পাটি প্রখর দন্ত মেলিয়া তাহার দিকে আগাইয়া গেল।

যুবক উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

"কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। আমার দোকান ফিরিয়ে দাও, আমার মেয়ে ফিরিয়ে দাও।"

তাহার গলার ক্ষতটা রক্তের ফেনায় ভরিয়া গেল।

আবার সব চুপচাপ।

প্রজাপতির প্রেতাত্মা আলোকশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে।

ইহাদের সহিত নিজের জীবন মিলাইয়া দেখিতেছি। কি আর এমন বেশি তফাত! বিশেষ কিছুই নাই। যে অবস্থায় পড়িয়া ইহারা আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, সেই অবস্থায় আমিও তো পড়িয়াছিলাম। কেন যে আত্মহত্যা করি নাই, আশ্চর্য্য!

আমি যেবার আই. এস-সি. পাস করিলাম, তখন ছোট ভাই দুইটি ম্যাট্রিক ক্লাসে। দুইজনেই তাহারা এক ক্লাসে পড়িত। আমরা তিনজনেই লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম, ক্লাসে কেহ কখনও সেকেণ্ড হই নাই। স্কলারশিপের টাকাতেই আমাদের লেখাপড়ার খরচ বরাবর চলিয়াছে। আমাদের নানা দৈন্যের মধ্যে এইটুকুই সুখ ছিল।

যেবার আমি আই. এস-সি. পাস করিলাম, সেইবারই বাবা আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে তাঁহার আপিসে ঢুকাইয়া দিলেন। ইহার ঠিক পরে যাহা ঘটিল, তাহার মত আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি জীবনে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হয়তো কাকতালীয়বৎ ঘটনা, কিন্তু খুবই বিস্ময়জনক।

যেদিন আমার চাকরি হইল, সেই দিনই বাবারও মৃত্যু হইল। আশ্চর্য্য সেই মৃত্যু! রাত্রে রোজ যেমন খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িতেন, সেদিনও তেমনই শুইয়াছিলেন। কোন অসুখ

ছিল না। সকালে উঠিয়া আমরা দেখিলাম, তিনি মারা গিয়াছেন।...আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের চাকুরি জুটাইয়া দিয়া আশা করি তিনি পরম নিশ্চিন্তেই অন্তিম নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। অবনী ঠাকুরের "শেষ বোঝা" ছবিটা দেখিয়া বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।

আর মা?

তিনিও কি কম দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন জীবনে! দরিদ্র জননীর অন্তর্নিহিত ব্যথা-বেদনার পরিমাপ করা আমার সাধ্যাতীত। কত অপূর্ণ সাধ, কত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মাতৃ-হৃদয়কে আলোড়িত করিত তাহা জানি না। এইটুকু জানি যে, বহুদিন তিনি অনাহারে কাটাইতেন। নানারূপ ব্রত উপবাস তো ছিলই। আহারও সব দিন কুলাইত না। বাবার মৃত্যুর পর আমাদের আয় কমিয়া গিয়াছিল। যাহা জুটিত তাহা অল্পই, এবং তাহার সমস্তটাই মা আমাদের দিয়া নিজে কোন ছুতায় উপবাস করিতেন।

"ডাক্তারবাবু, এ তো বেঁচে নেই, কেন মিছে কথা ব'লে আমাকে ভোলাচ্ছ তুমি?"

সন্তানহত্যাকারিণী সেই জননী, আর তাহার কোলে সেই মৃত শিশু।

এ কি কখনও বাঁচতে পারে? বাঁচা কি সম্ভব? মা যখন নিজের ছেলের গলা টিপে ধরে, তখন সে ছেলে কি আর

বাঁচে? আমার মত পিশাচী আর কজন দেখেছ তুমি ডাক্তা বাবু? পৃথিবীতে কি রোজ এমনই শিশুহত্যা হয়? অনে হয়? চন্দ্রসূর্য্য কি উঠছে এখনও? ভূমিকম্পে পৃথিবী এখন ফেটে যায় নি?” মৃত সন্তানটাকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিল

“বাছা আমার—বাছা আমার—”

অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

তাহার পর ধীরে ধীরে সে আমার আরও কাছে আসি বলিল—

“কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য্যের ব্যাপার কি জান ডাক্তারবাবু কি বল তো? তাকে এখনও আমি ভুলি নি। সেই কাল এখনও ব'সে আমার মনের বাঁশী শুনছে। ফণা বিস্তার ক' এখনও আমার বুকের ভেতর কুণ্ডলী পাকিয়ে ব'সে আছে কিছুতেই নড়বে না। কিছুতেই তাকে তাড়াতে পারছি ন একটা উপায় ব'লে দাও, কি করলে আমি সব ভুলতে পা আমায় ব'লে দাও, কি ক'রে এই স্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পা আমাকে সমস্ত ভুলিয়ে দাও তুমি।”

তাহার শুষ্ক নয়ন-পল্লবে এক ফোঁটা জল নাই।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জলের ঝাপটা। বাহিরের আক মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি নামিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী অঝোরঝ কাঁদিতেছে। বিদ্যুৎ নাই, বজ্র নাই, কেবল বৃষ্টি। অশ্র

কান্নার মত অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার চোখেও জল।

বর্ষণমুখরিত অন্ধকারকে বিক্ষুব্ধ করিয়া কবির গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল—

"পড়ি নাই ঘুমায়ে তো, ছিলাম না জাগিয়াও,
চোখে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা!
সেই তন্দ্রার ঘোরে এসেছিলে সখী মোর—
আহা যেন গীতি মধু-ছন্দা!
তন্দ্রায় ভর করি
এসেছিলে মরি মরি
জাগরণে ব'সে আজি সে কথা স্মরণ করি,
সে কথা গুমরি ওঠে গভীর আঁধার ভরি
বুকে করি রাখে নিশিগন্ধা!

সে স্বপন ক্ষণিকার,
জ্যোতি যেন মণিকার
মনের আঁধার ভরি ঠিকরিছে অনিবার,
আকাশের শশীতারা সে আলোক-কণিকার
প্রসাদ বিহনে হায় বন্ধ্যা!"

চতুর্দ্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। রিম-ঝিম রিম-ঝিম বর্ষণের সুরের সহিত কবির উদাত্ত গম্ভীর স্বর এক অপরূপ ঐক্যতান

সৃষ্টি করিল। জানালা দিয়া হিমশীতল বাতাস প্রবেশ করিতেছে। কম্পমান দীপশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেত-পতঙ্গটি অবিরাম ঘুরিয়া মরিতেছে। কবি ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বিদীর্ণ মস্তক হইতে কপাল বাহিয়া বিধ্বস্ত মস্তিষ্কটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অনাবৃত মস্তিষ্কের উপর বৃষ্টির ছাট লাগিতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কালো কালো যাহা লাগিয়া আছে, তাহা রক্ত নয়—কাদা। কবি আসিল ও আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আমিও প্রেমে পড়িয়াছিলাম।

বাবা কত কষ্ট করিয়া যে চাকরিটি যোগাড় করিয়া দিয়া মারা গেলেন, আমি তাহা রাখিতে পারিলাম না। এক মাস যাইতে না যাইতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

কেন আসিলাম? নিজেকে সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা সদুত্তর নহে।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই যে আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিলাম, তাহা সত্য নহে। আরও একটা কারণ ছিল। প্রেমে পড়িয়াছিলাম। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন কোন হীন কাজ করিতে সে সঙ্কোচবোধ করে। তাহার কাছে নিজেকে একটা কুড়ি টাকা মাহিনার কেরানী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করিত।

পঙ্ক হইতেই পঙ্কজের উদ্ভব। আমার দারিদ্র্যের মলিনতাকে ধন্য করিয়া জীবনে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছিল। কালো মেঘে কি আলো প্রতিভাত হয় না?

এক সহপাঠীর বাড়িতে আমার গতিবিধি ছিল। কলেজে ভাল ছেলে বলিয়া আমার খাতির—সরস্বতীর দরবারে ধনী দরিদ্রের জাতিভেদ নাই, সেখানে আমার ললাটেই বিজয়ীর বরমাল্য। চেহারাও খুব যে কুৎসিত ছিল, তাহা নয়। সুতরাং আমার বন্ধুর ভগ্নী মুগ্ধ হইলেন, আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমিও মুগ্ধ হইলাম।

জীবনে নূতন পালা শুরু হইল।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছন তো!"

ফিরিয়া দেখি, একটা কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত ভিখারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। হাতে একটিও আঙুল নাই। নাক মুখ চোখে কুৎসিত ব্যাধিটার প্রকোপ নিদারুণ বীভৎসতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছেন আপনি। কিন্তু তার আগে আমার কবিতাটা শুনে নিন। যদিও জীবনে কবি ব'লে বাজারে নাম ছিল না, আমার একটা কবিতাও কখনও মাসিক-পত্রে বেরোয় নি; কিন্তু আমার মনে কবিতা ছিল। যদিও খেতে পেতাম না, ভিক্ষে ক'রে খেতে হ'ত, তবু আমি কবি ছিলাম।"

বলিয়া সে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"চিরটা কাল কষ্ট পেলাম
জীবনভরা দুঃখ-জরা;
মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।

সবুজ কচি দূর্ব্বাদলে
স্বর্ণরবি পূর্ব্বাচলে
কজ্জলিত স্নিগ্ধ মেঘে
মুগ্ধ হ'ত মনটা ঠিক্‌ই।

কিন্তু তবু সর্ব্বখনে
সর্ব্বদেহে সর্ব্বমনে
ব্যাধি এবং ক্ষুধার জ্বালা
কি যন্ত্রণা বলুন দিকি!

কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি
হায় রে, অহোরাত্রি ভরা,
মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।

কোন্ লগনে, কার তাগিদে,
কিসের মোহে, কাহার স্নেহে,

কোন্ জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন্ গেহে !

অভাগাটার জন্য হা রে
কোন্ রমণী স্তন্যধারে
সুধার ধারা ঝরিয়েছিল
ঠিকানা তার দিল না কেউ !

সত্যি সে কি আমার লাগি
দীর্ঘ নিশি থাকত জাগি ?
মিথ্যা কথা ! মিথ্যা কথা !
আমার কভু ছিল না কেউ !

স্নেহের কভু দেয় নি আভাস
ব্যাধিই দিল সর্ব্বদেহে
কোন্ জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন্ গেহে !

কাহার পাপে জন্ম হ'ল ?
কাহার শাপে হেথায় এলাম ?
কোথা সে মোর পিতামাতা,
যাদের লাগি শাস্তি পেলাম !

নাকটা বসা—চোখটা কানা
দুষ্ট ব্যাধি অঙ্গে নানা
কুষ্ঠ ব'লে করত ঘৃণা
সুস্থ যত মর্ত্ত্যবাসী।

লজ্জানত মস্তকেতে
সবার দ্বারে হস্ত পেতে
পেটের দায়ে তাড়িয়ে কুকুর
কুড়িয়ে খেয়ে শুকনো বাসি

দিন কেটেছে মর্ত্ত্যলোকে;
এর বেশি আর কিবা পেলাম!
মোটর চাপা প'ড়ে সেদিন
সত্যি আমি বেঁচে গেলাম।

একটি শুধু দুঃখ আমার
ত্রাণ করেছে যে আমারে
সে নাকি আজ পাচ্ছে সাজা
মর্ত্ত্যলোকে কারাগারে!

আমার কথা ভুলে গেলেন ডাক্তারবাবু? আমার সেই মোটর-চাপা শবদেহটা আপনি কেটে-ছিঁড়ে পরীক্ষা ক'রে

দেখেছিলেন। এত ক'রেও কিন্তু সুবিচার করতে পারলেন না আপনারা। বিচারে 'ড্রাইভার' বেচারা দোষী ব'লে সাব্যস্ত হ'ল। কিন্তু সে বেচারার কোন দোষ ছিল না। আমি ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার মোটরের তলায় প'ড়ে আত্মহত্যা করেছিলাম। সে আমাকে চাপা দেয় নি। সাধ্যমত বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিল। আপনারা সবাই দয়ালু, সবাই আমাদের বাঁচাবার চেষ্টাই করেন।"

লোকটার চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল—"আপনারা সবাই মহাদয়ালু, আপনারা সক্কলে—কেউ কখনও একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে, কেউ এক মুঠো চাল দিয়ে, কেউ—"

হঠাৎ তাহার কথা থামিয়া গেল। সে সামনের দেওয়ালটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, সে ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। মুখে একটি কথা নাই। ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা ধীরে ধীরে সেই ছবিখানার দিকে আগাইয়া গেল। ছবিটার সহিত মুখামুখি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল—

"তোমাকে যেন চিনি ব'লে মনে হচ্ছে! তুমিই কি আমার মা? এত আপনার ব'লে মনে হচ্ছে কেন তোমাকে? কে তুমি—বল, বল, কথা কও, কে তুমি? ঠিক তুমি আমার মা। আমার মা! এত সুন্দরী ছিলে তুমি, অথচ আমি এত কুৎসিত!"

একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া ক্যালেণ্ডারখানাকে মেঝেতে ফেলিয়া দিল। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল। আমি উঠিয়া ক্যালেণ্ডারখানা কুড়াইয়া আবার টাঙাইয়া রাখিলাম।

ছবিখানা কাঁদিতেছে ?

মেয়েমানুষ কত সহজে কাঁদে—আবার কত সহজে হাসে! সেও কাঁদিয়াছিল। যে মুহূর্ত্তে নিঃসংশয়ে ঠিক হইয়া গেল যে আমাদের মিলন অসম্ভব, সে মুহূর্ত্তে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া সে কি কান্না! বিবাহের পর আবার তাহাকে হাসিতেও দেখিয়াছি। সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কার, সীমন্তে সিন্দূর, দেহের প্রতি পরমাণুতে যৌবনের মাদকতা। ধনীর দুহিতা, ধনীর বনিতা, ধনীর পুত্রবধূ। হাসিবে না কেন? তাহার কান্নাও যেমন সত্য, হাসিও তেমনই সত্য।

জীবনে আমার সেই প্রথম প্রেম এবং প্রথম ব্যর্থতা। যাহাকে ভালবাসি সে যখন চলিয়া যায়, তখন মনে হয়, বিশ্বের হাটে একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেলাম যেন। মূলধন যে তখনই হাতে আসিল, সে কথা বুঝিতে দেরি লাগে।

তাহাকে পাই নাই, ইহাই তো পরম দুঃখ। কিন্তু যখন বুঝিলাম যে, আমি গরিব বলিয়াই তাহাকে পাই নাই, তখন সে মর্ম্মান্তিক বেদনা হীনতার ছোঁয়াচ লাগিয়া অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিল। নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করিয়া বারম্বার হাসিলাম—"বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার শখ মিটিয়াছে তো? যাহাকে

অতবড় একটা নেটিভ স্টেটের দেওয়ান সাধিয়া পুত্রবধূপদে বরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহাকে তুমি অধিকার করিতে চাও! স্পর্দ্ধা তো তোমার কম নয়!"

সত্যই আমার স্পর্দ্ধা কম ছিল না। গগনস্পর্শী স্পর্দ্ধা অচিরেই ধূলিসাৎ হইল।

আরও কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা আমার অদৃষ্টে বাকি ছিল। দারিদ্র্যের অনল চতুর্দ্দিক হইতে শত শিখা বিস্তার করিয়া আমাকে বেড়িয়া ধরিল।

নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়িভাড়া দিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। যতদিন আমি একটা কিছু জুটাইতে না পারি, ততদিন যদি মামারা আশ্রয় দেন—এই আশা লইয়া মা আমার চতুর্থ বোনটিকে হইয়া পিত্রালয়ে গেলেন। আমি একটা খোলার ঘরে বাকি কয়জনকে লইয়া সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে। মা চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে আমার দুই ভাই এবং ছোট বোনের এক দিনে কলেরা হইল। আমি যে কেন রক্ষা পাইলাম জানি না। গরিবের ঘরে কলেরা হইলে যে কি ব্যাপার হয়, তাহা চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারা শক্ত। সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

তখন দীন-দরিদ্র আমরা ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার কথা ভাবিতেও পারি না। ওলাবিবির শরণাপন্ন হইলাম। ওলাবিবিও দয়া করিলেন না। তখন একদিন এক

দাতব্য-চিকিৎসালয়ের ভিখারীর দলে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইলাম ডাক্তারবাবুর দাক্ষিণ্যের আশায়। শুনিয়াছিলাম, দরিদ্রদের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়; সেখানে গিয়া দেখিলাম, দরিদ্রের দল এক জায়গায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, ডাক্তারবাবু তাঁহার বড়লোক রোগীদের লইয়াই ব্যস্ত। প্রায় দেড় দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। হাসপাতালের ডাক্তারবাবু চাকুরি করেন, চিকিৎসা করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। এই ভিখারীর দলকে এগারোটার মধ্যে বিদায় করিতে হইবে—এই তাঁহাদের লক্ষ্য। এই যাঁহার লক্ষ্য, সমাগত দেড় শত লোকের নানাবিধ ব্যাধির বিস্তৃত ইতিহাস শুনিবার ধৈর্য্য তাঁহার থাকিবার কথা নয়।

সুতরাং আমার কথা শুনিতে শুনিতেই ডাক্তারবাবু প্রেস্‌ক্রুপ্‌শন লিখিতে শুরু করিলেন এবং কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই প্রেস্‌ক্রুপ্‌শনখানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"যাও, দিনে রাতে তিনবার ক'রে খাওয়াবে। বার্লি ছাড়া আর কিছু খেতে দিও না।"

বলিলাম, "তাদের পেটে জল পর্য্যন্ত থাকছে না—।" এ কথা ডাক্তারবাবু বোধ হয় শুনিতে পাইলেন না। কারণ তখন তাঁহার সামনে একজন মোটা লোক জিব বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তারবাবু জিবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক হাতে তাহার নাড়ীটা ধরিয়া অন্য হাতে লেখনী চালনা করিতেছেন।

হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, জীবনে তাহা কোনদিন ভুলিব না। গিয়া দেখিলাম, একজনও বাঁচিয়া নাই। 'মরিয়া যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু কি ভয়াবহ সে মৃত্যু! মল-মূত্র-বমির মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া তিনজন শুইয়া আছে। মানুষ নয়, যেন কৃমি!...তাহাদের সেই জ্যোতিঃহীন নিশ্চল চক্ষুগুলি আজও আমি ভুলি নাই। তিনটি সুন্দর ফুলকে ছিঁড়িয়া, মলিন করিয়া, চিতার আগুনে ফেলিয়া দিয়া মহাকাল যেন হা-হা করিয়া হাসিতেছে।

আজ আমি ডাক্তার হইয়াছি। অনেক কলেরা-রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আজ দরিদ্রের ক্রন্দনে আমার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। মনে হয়—

"শোন, শোন।"

সেই বিন্দি। অ্যানার্কিস্ট যুবকটিকে ডাকিতেছে। বিন্দির স চেহারা নাই। সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুল গাঁজা। এত সব পাইল কোথা! গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ, সুন্দর ানা-টানা চোখ দুইটিতে কাজল পরিয়াছে। পরনে মখমল-পাড় ়ন্দর ফিনফিনে শাড়ি। রীতিমত মোহিনী বেশ!

অ্যানার্কিস্ট যুবকটি বলিল—"কি বলছ?"

ফিক করিয়া হাসিয়া বিন্দি বলিল—"বেশি কিছু নয়, আমার পেছনে এই সেফ্‌টিপিনটা লাগিয়ে দাও না, এই পিঠের দিকে।"

বলিয়া রঙ্গভরে পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইল।

অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি একটু ইতস্তত করিয়া শেষে সেফ্‌টিপিন লাগাইয়া দিতে লাগিল।

লাগানো তাহার আর শেষই হয় না।

যে হতভাগিনী বাঁচিয়া থাকিতে পুরুষের মনোযোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া গলায় দড়ি দিয়াছিল, মৃত্যুর পর সেও অভিসারিকা সাজিয়াছে এবং ভুলাইতেছে সেই ব্যর্থ প্রণয়ীকে, যে নারীর উপর অভিমান করিয়া সায়ানাইড গিলিয়াছিল শান্তির আশায়!

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইতেছে। পাতলা মেঘের স্তর ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আভাস ফুটি ফুটি করিতেছে। বৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। সামনের মাঠের কুলগাছটা দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। প্রেতিনীর সমস্ত চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। জোনাকি একটিও নাই। একটা অস্ফুট মর্ম্মরধ্বনি সমস্ত অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কাছে দূরে অবিরাম ঝিল্লীরব। সহসা খানিকটা মেঘ সরিয়া গেল দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন কাহার দুইটি আঁখি কৌতুকভরে আমার দিকে চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে আবার তাহা মেঘে ঢাকিয়া গেল।

বৃষ্টির শব্দ কমিয়া আসিতেছে।

ভেকের আর্ত্তরবটা এখনও শোনা যাইতেছে।

এখনও তাহার মৃত্যু হয় নাই।

আমরাও কি ওই সর্প-কবলিত ভেকের মত পলে পলে মরিতেছি না?

মহাকাল কৌতুকও করিয়াছেন মাঝে মাঝে। জীবন যখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন নিজের অভিশপ্ত জীবনটাকে কোথায় লুকাইব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, যখন অকূল পাথারে ঝঞ্ঝা আর ঢেউ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়িতেছিল না, তখন সহসা কূল দেখা দিল। আমার সহপাঠী বন্ধুর পিতা আমার দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া আমার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। তাঁহারই কৃপায় এবং অর্থসাহায্যে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। আমার মা অনূঢ়া ভগ্নীটিকে লইয়া পিত্রালয়ে রহিয়া গেলেন। আশা করিতে লাগিলেন, আমি ডাক্তার হইয়া বাহির হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে।

মায়ের গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া সানন্দে কলেজের বই কিনিয়া ফেলিলাম। ওই গহনাগুলিই ছিল আমাদের শেষ সম্বল। রহিল শুধু মায়ের আশীর্ব্বাদ এবং আমার অদৃষ্ট।

পড়াশোনার ব্যাপারে অদৃষ্ট বরাবরই ভাল ছিল। ভারতী কোনদিন বরদান করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। মেডিকেল কলেজের সমস্ত পরীক্ষাগুলিতেই ফার্স্ট হইলাম। সমস্ত স্কলার্‌শিপ এবং মেডেল আমার করায়ত্ত হইল।

হইল তো, কিন্তু আবার দুঃখের পালা আসিল। নির্ম্মল

আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল—বজ্র-বিদ্যুতের ঘটায় চতুর্দ্দিক শিহরিয়া উঠিল।

আমার বন্ধুর পিতা, যাঁহার করুণায় মেডিকেল কলেজে ঢুকিয়াছিলাম, অকস্মাৎ একদিন মারা গেলেন। দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম। শুধু পিতৃহীন হইলাম যে তাহা নয়, বন্ধুহীনও হইলাম। আমার বন্ধু বি. এস-সি. পড়িতেছিলেন, তিনি একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি ভাই ওই মড়ার হাড়-টাড় নিয়ে বাইরের ঘরটাতে থাক—মা এসব পছন্দ করছেন না। আমিও আজ কদিন থেকে এমন সব বিশ্রী স্বপ্ন দেখছি রাত্তিরে—"

মড়ার হাড় লইয়া আমি তো দুই বৎসর আছি। এতদিন তো মায়ের কোন আপত্তি উঠে নাই—বন্ধুও স্বপ্ন দেখেন নাই। হঠাৎ এই সব হইতে শুরু করিল কেন? কেন যে এমন হইল, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমার ব্যবহারে নালিশ করিবার মত কিছুই ছিল না। তবে কেন এমন হইল?

অনেক দিন পরে বুঝিয়াছি, ইহার কারণ কি। কারণ আর কিছুই নয়, কারণ আমার কৃতিত্ব। আমি ভাল ছেলে, প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতেছিলাম। অথচ আমার বন্ধু বি. এস-সি. পরীক্ষায় বারম্বার ফেল করিতেছিলেন। ইহাই তো যথেষ্ট গ্লানির কারণ। ঈর্ষা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি খুব কম লোকই ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ঈর্ষা না করিতে

পারে এমন জিনিস নাই। অধিকাংশ কলহের মূলে এই ঈর্ষা হয় প্রত্যক্ষভাবে, না হয় পরোক্ষভাবে বিরাজমান।

যাই হোক, ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, আমার বন্ধুর বাড়ি হইতে আমার বাস উঠিল। তাঁহাদের বাড়িতে দুই বেলা খাইতে ও শুইতে পাইতাম, তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

বোঝার উপর শাকের আঁটিটার মত প্রাইভেট ট্যুইশনির ভারও স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। সমস্ত দিন কলেজের হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটি ধনীর দুলালকে লইয়া বসিতাম। কি যে তাহাকে পড়াইতাম, তাহা জানি না। বস্তুত কিছুই পড়াইতাম না। সে আপন মনে যাহা খুশি করিয়া যাইত, আমি বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিতাম। তাহাকে জোর করিয়া কিছু করিতে বলিলে সে ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। শীর্ণকায় বিষণ্ণ একটি দশ বৎসরের শিশু—নাকটা বসা, দাঁতগুলা খাওয়া-খাওয়া। পিতামাতার নয়নমণি। তাহাকে কিছু বলিবার জো নাই। তাহার পড়াশোনা কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তাহার বাবাকে একদিন বলিলাম—"ছেলেটিকে একটু শাসন করা দরকার।" ভদ্রলোক নির্ব্বিকারচিত্তে উত্তর দিলেন—"শাসন করবার দরকার নেই। সেজন্য আপনাকে রাখা হয় নি। আপনি সন্ধ্যেবেলাটা ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখুন। পড়াশোনা একটু আ-্টু করে ভাল, না করে বেশি জোরজবরদস্তি করবার দরকার নেই। দেখবেন খালি, সন্ধ্যেবেলা কিছুতে যেন ওপরে না যায়।" ভদ্রলোক বেশ

মোটা রকম বেতন দিতেন। তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিলাম না। কিছুদিন পরেই বুঝিয়াছিলাম, ছেলেটির সন্ধ্যার সময় উপরে যাওয়ার বাধা কি। ছেলেটির মা পাগল। তাঁহাকে একটি ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে জোর করিয়া কিছু খাওয়ানো হয়। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া নল দিয়া খানিকটা খাবার প্রত্যহ তাঁহার মুখে ঢালিয়া না দিলে তিনি অনাহারে মারা যাইবেন—ডাক্তারেরা এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন। জোর করিয়া খাওয়ানো ব্যাপারটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু জিনিস। ভদ্রলোক তাই নিজের পুত্রকে নীচে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লেখাপড়া উপলক্ষ্য মাত্র।

"আমি তোমাকেই বিয়ে করব। তোমার তো চোখ নেই—তুমি তো দেখতে পাও না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।"

সেই কালো মোটা মেয়েটি কথা কহিতেছে। সম্মুখে একটা কবন্ধ দুই লোলুপ বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

মেয়েটি বলিতেছে—"ওগো, তুমিই আমাকে নাও। যাদের চোখ আছে, তারা আমার কষ্ট দেখতে পেলে না। তোমার ভাষা নেই, তোমার চোখ নেই, তুমি হয়তো আমার ব্যথা বুঝবে।"

একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া আলোটা নিবিয়া গেল।

উঠিয়া আবার আলোটা জ্বালিলাম। দেখিলাম, কেহ নাই। কেবল ঘরের মধ্যে খামখানা পাগলের মত ছুটাছুটি করিয়া

বেড়াইতেছে। তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। দরকারী চিঠি।

পাগল মায়ের একমাত্র ছেলেকে আটকাইয়া আমার প্রতি-সন্ধ্যা কাটিত। ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ভদ্রমহিলা কেন পাগল হইয়াছিলেন। কারণ আর কিছুই নয়, উপর্য্যুপরি সাত-সাতটি সন্তান মারা গিয়াছে। এই ক্ষীণজীবী পুত্রটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সাতটি সন্তানের মৃত্যুর কারণও পরে জানিতে পারি। ভদ্রলোকের দারুণ চরিত্রহীনতা। এত শোক পাইবার পরও তাঁহার স্বভাব বদলায় নাই। পাগলিনী স্ত্রীকে তেতলার ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া, ছেলেটিকে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়া ভদ্রলোক প্রতিদিন দেখিতাম অভিসারে বাহির হইতেন। গায়ে গিলে-করা আদ্ধির পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের পাম্‌শু, হাতে যুঁইফুলের মালা জড়ানো। মদিরা-পানে চক্ষু দুইটি আরক্ত, ডান হাতে একটি দামী সিগার—চকচকে দামী মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া যাইতেন। রাত্রে ফিরিতেন না। মানুষের মধ্যে এই কামপ্রবৃত্তিটা ভগবান দিয়াছিলেন হয়তো সৃষ্টিরক্ষার জন্য। কিন্তু মানুষ সভ্য হইবার পর—কিংবা হয়তো তাহার আগেও—এই প্রবৃত্তিটাকে সৃষ্টি ধ্বংস করিবার উপায় করিয়া ফেলিয়াছে।

কবি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

অদ্ভুত তাহার চেহারা! মস্তিষ্কটা সবটা যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

"আমার ঘুমেতে স্বপন আঁকিয়া আঁকিয়া
মনের মাঝারে পরশ-মাধুরী রাখিয়া
শোভন শরমে মোহন মোহের আড়ালে
সহসা আসিয়া দাঁড়ালে!

তোমার উজল কাজল নয়ন-কিনারে
কোন্ সে দেবতা বাজাল মনের বীণারে
আঁধারে আলোকে চন্দ্রে তারায় তপনে
আধ-জাগরণ স্বপনে!

কার সে মাধুরী তোমার তনুটি ভরিয়া
আমার আঁখির নিমেষ নিল গো হরিয়া!
কহিল মরমে কোন্ সে কাহিনী কি ভাবে
বেহাগ—ললিত—বিভাসে!

তোমার মাঝারে কাহারে দেখি গো গোপনে
স্বপনে তুমি কি ভেবেছ কখনো শোভনে?
ছন্দে ও গানে হয়েছি কাহার পূজারী
মরমখানিরে উজাড়ি?

হয়তো, হে মোর গোপন-মানস-হারিণী,
পাব না তোমারে,—তবু তো বলিতে পারি নি .
শুধু মায়া তুমি আর কিছু নও মায়া গো
মিছে ছলনার ছায়া গো !

বলিতে পারি নি তাই তো জীবনে মরণে
কত অঞ্জলি সাজাই তোমার চরণে
গন্ধে বরণে কত না ছন্দ-বাহিনী
কত ক্রন্দন-কাহিনী ।”

আসিল এবং চলিয়া গেল ।

কামের আর এক মনোহর রূপ। ছন্দে মিলে অনুপ্রাসে নিজের অন্তরের সত্য ও মিথ্যাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

অনিবার্য্য ।

সত্যই অনিবার্য্য ।

হঠাৎ একদিন মায়ের চিঠি পাইলাম। চিঠি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, কারণটা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আমার ভগ্নীটির বিবাহ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে। আমি গিয়া প্রয়োজনীয় কথা-বার্ত্তাদি শেষ করিয়া দিলেই শুভকর্ম্ম সমাধা হইয়া যাইবে। প্রয়োজনীয় কথাবার্ত্তার মধ্যে যেটুকু ভীতিপ্রদ, সেইটুকু এ ক্ষেত্রে নাই। টাকাকড়ির জন্য কিছুই আটকাইবে না ; পাত্র চপুকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে। পণ লাগিবে না। প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে মাতুলালয়ের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

সেখানে গিয়া কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া গেল! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—পাত্রের বয়স পঁয়ষট্টি, না পঁচাত্তর, না আরও বেশি? প্রত্নতাত্ত্বিক না হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্ত্তীর ঠিক বয়স নির্ণয় করা শক্ত। গ্রামে তাঁহার সমবয়সী আর কেহ বাঁচিয়া নাই।

চপুর মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। মায়ের চোখের জল মুখের হাসিতে রূপান্তরিত হইয়া আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদায় যে বিষম দায়! মা ওই বৃদ্ধের সহিতেই চপুর বিবাহ দিবার জন্য উন্মুখ।

মাকে বলিলাম—"এর চেয়ে চপুকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দাও না।"

মা উত্তর দিলেন—"কেষ্ট চক্কবত্তি যে সুপাত্র নয় তা আমি জানি, তা আর তোমাকে ব'লে বোঝাতে হবে না। কিন্তু যাদের হাতে একটি কানা-কড়িও নেই, তারা এর চেয়ে ভাল পাত্র কি ক'রে জোটাবে বলতে পারিস? চপার বয়স যে সতরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়ল, তার হিসেব রাখিস? কেষ্ট চক্কবত্তির একটু বয়স হয়েছে এই যা, তা না হ'লে লোক ভাল। এ অঞ্চলে একটা মানী লোক। ঘরে দু-পয়সা আছে—জমি, বাগান, পুকুর, খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট কোনদিন পাবে না। কেষ্ট চক্কবত্তি যখন নিজে থেকে কথাটা পেড়েছেন, তখন এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আমরা গরিব মানুষ, এর চেয়ে ভাল আর পাব কোথায়?"

যুক্তি সারবান সন্দেহ নাই। কিন্তু ওই কামকণ্টকিত লোলুপ লোলচর্ম্ম বৃদ্ধটার হস্তে আমার অমন সুন্দরী বোনটাকে সঁপিয়া দিতে ইচ্ছা হইল না। বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের সেই লালায়িত কথাগুলা এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টিটা যেন এখনও আমার বুকে বিঁধিয়া বসিয়া আছে।

মাকে বলিয়া আসিলাম—"আরও দিন কতক তুমি সবুর কর, আমি ভাল পাত্রের চেষ্টা দেখছি। আমার বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে দেখি না একবার খোঁজ ক'রে।"

কলিকাতায় ফিরিয়া বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে খোঁজ করিতে লাগিলাম।

মা দেশে বসিয়া সবুর করিতে লাগিলেন।

আমি খোঁজ করিবার ত্রুটি করিলাম না।

দেশে যে পাত্রের অভাব ছিল, তাহাও নয়। কিন্তু কিছুতেই জুটিল না। বিনা পণে বিবাহ করিতে পারে, এমন একজন অপরিণামদর্শী সচ্চরিত্র যুবক মিলিল না। সকলেই পরিণামদর্শী। ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া কেহই এক পা অগ্রসর হইতে চাহে না। সকলেই আমার ভগ্নীর গুরুভার স্কন্ধে তুলিয়া লইতে রাজি, যদি ভারবহনের মজুরিটা আমরা দিয়া দিতে পারি। কিন্তু সে সামর্থ্য আমাদের তখন ছিল না। দুইজন যুবক বিনাপণে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিলেন। তবু হইল না। একজন লেখাপড়া জানা মেয়ে চান, এবং আর একজন চান নিখুঁত

সুন্দরী। আমার বোনকে লেখাপড়া শেখানো হয় নাই এবং নিখুঁত সুন্দরীও সে ছিল না। সৌন্দর্য্যে তাহার খুঁত ছিল। চুল খুলিয়া দিলে হাঁটু পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিত না।

সুতরাং আমি ক্রমাগত খুঁজিতেই লাগিলাম এবং মা-ও ক্রমাগত সবুরই করিতে লাগিলেন। এই রকমই চলিতেছিল এবং কত দিন চলিত তাহা বলা কঠিন, এমন সময় মামার বাড়ির গ্রামের একটি সদাশয় ছোকরা আসিয়া খবর দিল—

"বাঁচান, বাঁচান আমাকে ডাক্তারবাবু।"

তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি ছুটিয়া আসিল, তাহার পশ্চাতে সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা। তাহার প্রকাণ্ড কালো মুখে সাদা চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—তাহাতে উন্মাদের হিংস্র দৃষ্টি। তাহার গলার ক্ষতটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটা প্রকাণ্ড অঙ্গার অগ্নিযোগে নীরবে পুড়িতেছে।

"কারও বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে বাঁচায়। আমার মেয়ে নিয়েছ, আমার দোকান নিয়েছ, ছেড়ে দেব তোমাদের? কড়মড় ক'রে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। পাজি, হারামজাদা, শুয়ার—"

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সত্যই সে তাহার গলায় কামড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান—বাঁচান—বাঁচান আমাকে।"

আর্ত্তনাদে সমস্ত অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছে। লোকটার সমস্ত মুখ রক্তে ভরিয়া গেল।

সহসা বিন্দি ছুটিয়া আসিল। কালো লোকটার চুলের মুঠি ধরিয়া জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।"

ঝাঁকানি খাইয়া কালো লোকটা যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—"কে তুই ?"

"যেই হই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও, ওগো, তোমার হুটি পায়ে পড়ি।"

বিন্দি হঠাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র মেঘের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে। তাহার মুখে প্রেতের হাসি। এই জীবন্ত কর্দ্দমাক্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃত জ্যোতিষ্কটা যেন নীরবে অট্টহাস্য করিতেছে। নিকটেই কাল-পুরুষের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার মেঘলোকের নিবিড় রহস্যে আত্মগোপন করিল। প্রকাণ্ড বড় একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসিয়া সব ঢাকিয়া দিল। চাঁদও ঢাকা পড়িল, ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু মরিয়া গেল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে।

ক্ষান্তবর্ষণ গভীর রাত্রির অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া ভেকের মৃত্যুকাতর যন্ত্রণাধ্বনি রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। বাহিরে

গাঢ় অন্ধকার। ঘরে কম্পিত দীপশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পতঙ্গটা এখনও ঘুরিতেছে।

যেন একটা এরোপ্লেন।

শিখা আর পতঙ্গ!

আমার বোন···

তাহাকে গুণ্ডায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমার বুড়ী মা-ও তাহাদের পাশবিক অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পান নাই।

আমার মা-বোনকে যখন গুণ্ডারা ধর্ষিত করিতেছিল, তখন আমি মেডিকেল কলেজে একটি রূপসী নার্সের সহিত নানা ছুতায় আলাপ করিতেছিলাম। তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সকলেই উৎসুক হইত। আমিও সুযোগ পাইলে আলাপ করিতাম। আলাপ না বলিয়া প্রেমালাপ বলিলে খুব বেশি অত্যুক্তি হইবে না।

কত কথাই মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, সেই সপ্ত মৃত পুত্রের সিফিলিস-গ্রস্ত পিতা, কবিতামুখর প্রেমিক ওই কবি, বিবাহোন্মুখ লোলচর্ম্ম সেই বৃদ্ধ, নারীধর্ষণকারী গুণ্ডা এবং নার্সের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমি—একই জিনিস। বিশেষ তফাত তো দেখি না।

কিন্তু না, আমি সব ভুলিতে চাই। নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চাই সব। কিছুতেই পারি না। অদ্ভুত আমার স্মরণশক্তি! কিছু ভুলি না।...ছেলেবেলায় একটা পাগলা কুকুরকে ঠেঙাইয়া মারিতে দেখিয়াছিলাম।...তাহার ফাটা মাথা, থেঁতলানো চোখ তুইটা আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি। কুকুরটার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কালো রঙ, একটা কান একটু বেশি ঝোলা, লেজের কাছে একটা প্রকাণ্ড ঘায়ে পোকা কিলবিল করিতেছে। সব মনে আছে। কিছুই আমি ভুলি না। কোথায় কবে ছারপোকাটি মারিয়াছি, তাহার চেহারাটা পর্য্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে।

নিস্তব্ধ রাত্রে বিনিদ্র আমার সঙ্গে জাগিয়া আছে আমার স্মরণশক্তি।

প্রেতিনী।

বাবার মুখখানা মনে পড়িতেছে। শান্ত ধীর শীর্ণ মুখটা। দারিদ্র্যের জন্য কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত নীরবে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুও তাঁহাকে কোন কষ্ট দেয় নাই। ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন যেন।

একটা ভাষাহীন চীৎকার অন্ধকারকে চিরিয়া চলিয়া গেল।...পেচকের শব্দ? একটা আকুল ক্রন্দন যেন। ল্যাপ-ল্যাণ্ডের হিমশীতল জলাভূমিতে তুইটি অপরিচিত যুবক যুবতী

দাঁড়াইয়া আছে না? চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না। কুয়াশা নিবিড় হইয়া আসিতেছে। তাহাদেরই অন্তরের আকুলতা গভীর নিশীথে নৈশ-বিহঙ্গমের করুণ স্বরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল নাকি?

"ডাক্তারবাবু!"

চমকাইয়া উঠিলাম। সেই ভদ্রলোক আসিয়া হাজির হইয়াছেন, যিনি জরার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মহাকালের উপর টেক্কা দিয়া বুকে গুলি করিয়াছিলেন।

"দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমার চেহারাটা ঠিক আছে কি না!"

ভদ্রলোক শিস দিতেছেন।

"ঠিক আছে।"

"চুল আর পাকে নি?"

"না।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন।

কালো মেয়েটি আসিয়া হাজির হইল।

"বড় জ্বালা ডাক্তারবাবু, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা।" তাহার পা, পেট, বুক দুর্গন্ধ বড় বড় ক্ষতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাম স্তনটা পচিয়া পূঁয গড়াইয়া পড়িতেছে।

"বড় যন্ত্রণা, জ্ব'লে গেল, সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে গেল আমার।"

নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া শুনিতেছি।

"আমার জ্বালা কমিয়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।"

"এর ওষুধ আমি জানি না।"

"হ্যাঁ, তুমি জান। তুমি এত বড় ডাক্তার, তুমি জান না?"

কি বলিব? একবার ইচ্ছা হইল, গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করি। হয়তো যদি কোন উপকার—

"ওয়াক, ওয়াক—"

মাতালটা আসিয়া মেয়েটার গায়ে হুড়হুড় করিয়া বমি করিয়া দিল।

"দাদা, একটু জল দাও, একটু জল দাও, উঃ, পায়ে বড় খিল ধরছে।"

ভাই-বোনগুলার হাহাকার এখনও ভাসিয়া আসিতেছে কোথা হইতে? কলেরা-রোগীর আকণ্ঠ-পিপাসা কি এখনও মিটে নাই?

কবন্ধটা মোটা কালো মেয়েটার গলা জড়াইয়া আগাইয়া আসিল। কাটা মুণ্ডটাও শূন্যে দেখা দিল। মুখে বিকট হাসি।

"ঠকিয়েছে! ভারি ঠকিয়েছে! ছেড়ে দে, ওরে, ওটাকে ছেড়ে দে! কালো মোটা কুৎসিত মেয়েটা! নারীমাংস আমার প্রিয় বটে, কিন্তু ওই পেত্নীটাকে নিয়ে থাকতে পারব না। ছেড়ে দে, ছেড়ে—"

কবন্ধটা তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে ছাড়িয়া পিছাইয়া গেল।

মুণ্ডটা হাসিতে লাগিল, হা—হা—হা—হা—।

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে।"

কবি সেই পোড়া মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার বিদীর্ণ খুলি হইতে মস্তিষ্কটা বাহির হইয়া মেয়েটার চোখে মুখে লাগিয়া যাইতেছে। কবি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা হি-হি করিয়া হাসিতেছে। তাহার সিংহের মত মুখটা হইতে বিষাক্ত লালা ঝরিয়া ঝরিয়া আমার ঘরের মেঝে ভাসিয়া গেল।

"যেমন ক'রে হোক নির্ম্মলকে দেখে নিতে হবে। টা । চাই—"

"ঠিক বলেছ ভাই, টাকা চাই, টাকা চাই, টাকা—টাকা—টাকা—কই—কোথায়—?"

কালো লোকটা লম্বা হাত বাহির করিয়া শূন্যে হাতড়াইতে লাগিল।

সর্পকবলিত ভেকটা তারস্বরে শেষ চীৎকার করিয়া থামিয়া গেল হঠাৎ।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানার সর্ব্বাঙ্গে কুষ্ঠ।

শেষ

দ্বৈরথ

"বনফুল"

রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

মূল্য তিন টাকা

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৪৪
দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ ১৩৫২

শনিরঞ্জন প্রেস
২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে
শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত
১১—৩. ৫. ৪৫

এই গ্রন্থখানি

আমার পূজনীয়া জননীর

শ্রীচরণে

উৎসর্গ করিয়া

কৃতার্থ হইলাম

নিবেদন

এই আখ্যায়িকার প্রধান চরিত্র চতুষ্টয়কে অবলম্বন করিয়া প্রথমে আমি একটি ছোট গল্প রচনা করিয়াছিলাম। পাণ্ডুলিপি অবস্থায় গল্পটি শুনিয়া আমার প্রতিবেশী ও শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় (ভাগলপুরের স্বনামধন্য পটলবাবু) গল্পটিকে উপন্যাসে রূপান্তরিত করিতে পরামর্শ দেন। তাঁহার কথামতই এই উপন্যাসটি রচনা করিতে প্রবৃত্ত হই।

সেজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

দুইজন সাহিত্যিক বন্ধুর নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। 'দ্বৈরথ' নামটি শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া। ইনি এবং শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস পাণ্ডুলিপি অবস্থায় উপন্যাসটি আদ্যন্ত ধৈর্য্যসহকারে শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং ইহার উৎকর্ষ-সাধনকল্পে নানা উপদেশ দিয়াছিলেন। ইহাদিগকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বন্ধুত্বের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট সঙ্গীতগুলি আমি শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত সঙ্গীত-সংগ্রহ পুস্তকগুলি হইতে আহরণ করিয়াছি এবং সেজন্য তাঁহার নিকট ঋণ স্বীকার করিতেছি।

২৭এ বৈশাখ, ১৩৪৪
ভাগলপুর

"বনফুল"

দ্বৈরথ

।। এক।।

কাছারি-বাড়ির সম্মুখে বিস্তৃত ময়দান। আজ সেখানে বহু লোকের জনতা। 'তৌজি'র দিন। জমিদারের কাছারিতে সকলে খাজনা জমা দিতে আসিয়াছে।

প্রবীণ গোমস্তা হরিহর দাস খাতা খুলিয়া কাছারি-বাড়ির বারান্দার এক কোণে বসিয়া এ অঞ্চলের ধনী মহাজন গোলোকচন্দ্র সাহার সহিত চুপিচুপি কি কথাবার্তা কহিতেছেন।

সম্মুখস্থ নিমগাছটার নীচে বসিয়া কয়েকজন প্রজা একটু উত্তেজিতভাবেই কি যেন আলোচনা করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে রুক্ষপ্রকৃতির একটি যুবক বলিতেছিল, ন্যায্য খাজনা দিয়ে থাকব, তার আবার এত ভয়টা কিসের? ভারি তো আমার—! প্রবীণ-গোছের বিশাই মণ্ডল তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছিল, অত রক্ত গরম করলে জমিদার-বাড়িতে কাজ হাঁসিল হয় না। একটু ঠাণ্ডা মেজাজে কথাবার্তা কইতে হয়।

যুবকের মেজাজ ঠাণ্ডা নয়; ফলে কলরব বাড়িতেছিল।

আর একটু দূরে একটি যুবতীকে কেন্দ্র করিয়া আর কয়েকজন প্রজাও দাঁড়াইয়া নানারূপ পরামর্শ করিতেছিল। ব্যাপারটা গোপনীয়। তাহাদের মুখে চোখে সে ভাবটা পরিস্ফুট।

নিকটেই একটা আটচালায় কতকগুলি লোক আহারে ব্যস্ত। দধি, চিঁড়া এবং গুড়ের ফলার চলিতেছে। যে আসিবে, সেই খাইতে পাইবে।

মুন্‌শীজী খাওয়া-দাওয়ার তদারক করিতেছেন।

আটচালার দক্ষিণ পার্শ্বে কতকগুলি প্রজাকে লইয়া রমজান তহশীলদার বেশ জমাইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। বক্তৃতার বিষয়টা এই যে, জমিদার তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে। তাঁহার নির্দেশমতই তিনি উত্থান ও উপবেশন করেন, অর্থাৎ ওঠেন বসেন। সুতরাং তাঁহাকে হাতে রাখিতে পারিলে প্রজাদের সুবিধা বই অসুবিধা কিছুই নাই। প্রজারা হাঁ করিয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছিল।

মাঠের মধ্যে দু-একটি গরুর গাড়িও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে নানা জাতীয় উৎসুক ও চিন্তাগ্রস্ত লোক মুখ বাহির করিয়া আছে।

এক জায়গায় সারি সারি ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া নগ্নগাত্র কতকগুলি লোক বসিয়া ছিল। তাহারা নিতান্তই গরিব প্রজা। তাহাদের আশ্বাস দিবার কিংবা তাহাদের হইয়া কিছু বলিবার কেহ নাই। ইহাদের সংখ্যাই বেশি। তাহারা নিজেদের মধ্যেই চুপিচুপি কথাবার্তা বলিতেছে। চতুর্দিকে একটা মৃদু গুঞ্জন।

সহসা চতুর্দিক সচকিত করিয়া ঘোড়ার খুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং নিমেষের মধ্যেই বিশাল অশ্বপৃষ্ঠে একজন বলিষ্ঠকায় দীর্ঘদেহ ব্যক্তি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

সমবেত জনমণ্ডলী সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিল। আগন্তুক গম্ভীরভাবে শির ঈষৎ আনত করিয়া অভিবাদন গ্রহণ করিলেন এবং সহিসের হাতে লাগাম ও চাবুক দিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের অভ্যাগমে সমস্ত কাছারিবাড়িটা গমগম করিতে লাগিল।

দেওয়ানজী ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রভুর অনুগমন করিলেন।

।। দুই।।

জমিদার উগ্রমোহন সিংহ একটা উঁচু মসনদের মত আসনে বসিয়া ছিলেন। রাখালবাবু—অর্থাৎ দেওয়ানজী, নিকটেই তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রভুর কর্ণগোচরযোগ্য বিষয়গুলি একে একে বলিয়া যাইতেছিলেন। নিবিষ্টচিত্তে সিংহ মহাশয় সব শুনিতেছিলেন। আদ্যোপান্ত সব শুনিয়া তিনি আদেশ দিলেন, ডাক তাকে।

সেই রুক্ষপ্রকৃতির যুবকটি আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া উগ্রমোহনবাবু পরুষকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলবার আছে তোর? বিধবার গায়ে হাত দিয়েছিস কেন?

ছোকরা আমতা-আমতা করিয়া কি খানিকটা বকিয়া গেল।

উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন, জুতিয়ে পিঠের চামড়া তুলে দেব, জানিস? এই মহাব্বত খাঁ!

সঙ্গে সঙ্গে সেলাম করিয়া লম্বা-চওড়া চেহারা চাপদাড়িসমন্বিত মহাব্বত খাঁ হাজির হইল।

উগ্রমোহন হুকুম দিলেন, পঁচিশ জুতি লাগাও।

কম্পিত-কলেবর যুবককে লইয়া মহাব্বৎ খাঁ চলিয়া গেল।

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন আবার আদেশ করিলেন, ওর বাপ্‌কে ডাক।

বৃদ্ধ বিশাই মণ্ডল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তোমরা আমার জমিদারি ছেড়ে এক মাসের মধ্যে উঠে চলে যাও। আমার জমিদারিতে তোমাদের স্থান নেই।

হুজুর—

কিছু শুনতে চাই না আমি। এক মাসের মধ্যে যদি তোমরা উঠে না যাও, ঘরে তোমাদের আগুন লাগিয়ে দেব। যাও।

বিশাই চলিয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন, ডাক সেই বিধবাকে।

বিধবা আসিল ও তাহার সহিত তাহার দূরসম্পর্কের এক খুল্লতাতও আসিলেন। খুল্লতাত যেমনই শুরু করিলেন, দোহাই হুজুর, আপনি হলেন আমাদের—, অমনই উগ্রমোহন সপদদাপে বলিয়া উঠিলেন, চোপরাও! কে তোমাকে আসতে বলেছে? এই কোন্ হ্যায়?

খুল্লতাত ত্বরিতগতিতে বহির্গমন করিলেন।

উগ্রমোহন তখন বিধবাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গ্রামে এত মেয়ে থাকতে তোমার গায়েই বা লোকে হাত দেয় কেন? জবাব দাও।

বিধবা মাথার ঘোমটাটা আর একটু টানিয়া দিয়া অবনতমস্তকে দাঁড়াইয়া ফোঁপাইতে লাগিল।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বিধবা মানুষ, তোমার মাথায় অত খোঁপা কেন? দেওয়ানজী!

হুজুর!

এখনই নাপিত ডেকে এর মাথার চুল কামিয়ে দাও। আর ওকে বুঝিয়ে দাও যে, আবার যদি ওর ওপর কেউ নজর দেয়, ওকেই আমি গ্রামছাড়া করব। সব প্রজাদের তো আমি দূর করে দিতে পারি না। যাও।

যে আজ্ঞা।

বিধবাকে লইয়া দেওয়ানজী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

দেওয়ানজী ফিরিয়া আসিলে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আজ আর কি কাজ আছে?

আজ্ঞে, কতকগুলি গরিব সাঁওতাল প্রজা এসেছে, তারা নিবেদন করছে যে—

রূঢ়কণ্ঠে উগ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তাদের নিবেদন, তোমার মুখ থেকে শুনতে চাই না। বুড়ো বয়সে ঘুষ খাচ্ছ নাকি? ডাক তাদের।

সেই নগ্নকায় প্রজার দল আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তাহাদের বক্তব্যটা উগ্রমোহন আগেই কি করিয়া যেন টের পাইয়াছিলেন। তাহাদের দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, খাজনাপত্তর কিছু আনিস নি তো?

তাহারা কহিল যে, অগ্রাণি ফসলটা ভাল না হওয়ার দরুন তাহারা সম্পূর্ণ খাজনাটা আনিতে পারে নাই, হুজুর যদি অনুগ্রহ করেন এবং ভগবানের যদি কৃপা থাকে, আগামী বৈশাখীতে তাহারা বাকিটা শোধ করিয়া দিবে।

আচ্ছা। এবার কিন্তু যদি শোধ দিতে না পার, তখন আর কিছু শোনা হবে না।

ইহা শুনিয়া একজন বৃদ্ধ-গোছের প্রজা প্রস্তাব করিল যে, যদি তাহারা শোধ না দেয়, তাহা হইলে হুজুর যেন তাহাদের নিকট হইতে সুদ আদায় করিয়া লয়।

উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন, সুদ! বৈশাখীতে যদি না দাও, জুতো মেরে আদায় করে নেব। সুদের হিসেব করবার আমার সময় নেই।

প্রজার দল চলিয়া গেল।

দেওয়ানজীকে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আর বাকি কি আছে?

আজ্ঞে, গোলোক সাকে ডাকতে বলেছিলেন, সে এসেছে।

ডাক তাকে।

গোলোক সার নাম শুনিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখখানা ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল।

গোলোক সাহা আসিল। গোলোক সাহা এই অঞ্চলে তেজারতী কারবার করিয়া থাকে। তাহার নামে লোকের ভাতের হাঁড়ি ফাটিয়া যায়—এইরূপ জনশ্রুতি। তাহাকে দেখিয়া বোঝা

দুঃসাধ্য যে, সে যে-কোন মুহূর্তে লক্ষ টাকা বাহির করিয়া দিতে পারে। গোলোক সার মাথায় কাঁচা-পাকা চুল। মুখটি গোলোক সদৃশ। ঘরে প্রবেশ করিয়া গোলোক সাহা অত্যন্ত ভক্তিভরে ভূমিতে ললাটদেশ স্পর্শ করাইয়া উগ্রমোহনকে প্রণাম করিল। কিন্তু প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতে না দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন আসিয়া গোলোক সাহার গণ্ডদেশে প্রচণ্ড এক চপেটাঘাত করিয়া বলিলেন, খুব বেশি টাকা হয়েছে, না?

গোলোক সা টালটা সামলাইয়া গালে হাত বুলাইতে লাগিল।

তর্জনী আস্ফালন করিয়া উগ্রমোহন বলিতে লাগিলেন, আজ এই দ্বিতীয়বার তোমাকে বলে দিচ্ছি, চন্দ্রকান্ত রায়কে তুমি টাকা ধার দিতে পারবে না। যদি দাও, মুশকিলে পড়ে যাবে।

গোলোক সা নয়নে অশ্রু আনিয়া বলিল, চন্দ্রকান্তবাবু তো আপনারই সম্বন্ধী হুজুর। কি করে তাঁর আদেশই বা অমান্য করি?

উগ্রমোহন বলিলেন, তুমি আমার জমিদারিতে বাস করে আমার বিপক্ষ জমিদারকে টাকা দিতে পারবে না। তা সে আমার সম্বন্ধীই হোক, আর যেই হোক। বুঝলে? যাও। আবার যদি খবর পাই যে, তুমি চন্দ্রকান্তকে টাকা দিয়েছ—

আর কি দিতে পারি হুজুর?

যাও।

গোলোক সাহা চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্তের নামে সেই ফৌজদারিটা দায়ের করে দিয়েছ তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আসামী কাকে কাকে করা হয়েছে?

চন্দ্রকান্তবাবু, রামপিরীত, অহঙ্কার পাঁড়ে।

আচ্ছা। আর কিছু কাজ বাকি রইল নাকি?

আজ্ঞে না। গোপাল পাস করে এসেছে। আপনাকে প্রণাম করবে বলে বাইরে অপেক্ষা করছে।

ডাক।

রাখালবাবুর জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল আসিয়া প্রণাম করিল।

উগ্রমোহনবাবু বলিলেন, বাঃ, বেশ! দেওয়ানজী, গোপালকে আমাদের হাবেলির চিকিৎসক করে বাহাল করে নাও।

গোপাল ডাক্তারি পাস করিয়া আসিয়াছে।

কাজকর্ম শেষ করিয়া জমিদার উগ্রমোহন সিংহ অশ্বারোহণে কাছারি ত্যাগ করিলেন। ধাবমান অশ্বটার দিকে সকলে সভয়ে চাহিয়া রহিল।

প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার শ্রীযুক্ত উগ্রমোহন সিংহের দুর্জয় প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত না। তাহার কারণ এই যে, যদিও তাঁহার জমিদারিতে গরু যথেষ্ট ছিল, কিন্তু একটিও বাঘ ছিল না।

।। তিন।।

সন্ধ্যা আসন্ন।

পশ্চিম দিগন্তে মহাসমারোহে সূর্য অস্ত যাইতেছে। ছোট, বড়, কালো, সাদা, স্তর, স্তূপ— সকল প্রকার মেঘেই অস্তগামী সূর্যের দীপ্ত প্রভাব। কেহই নিজের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিতেছে না। অস্তগামী রবির আলোক-সমুদ্রে যেন তাহারা ছোট ছোট দ্বীপ। বিভিন্ন ভঙ্গীতে সকলেই যেন এই বিরাট দৃশ্যকে সার্থক করিয়া তুলিয়াছে। অস্তালোকচ্ছটার বিচিত্র অভিব্যক্তির ঐকতানে চরাচর সম্মোহিত। প্রান্তর-লক্ষ্মী ক্ষুদ্র নদীটিও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছে। তাহার উর্মিশিহরিত বক্ষেও এই শাশ্বত স্বপ্নের ক্ষণিক উৎসব। তরঙ্গে তরঙ্গে অবর্ণনীয় বর্ণ-বিন্যাস। সে যেন চঞ্চল গতিবেগকে ক্ষণিকের জন্য সংহত করিয়া অস্তগামী সূর্যকে বর্ণ-অভিনন্দন জানাইতে ব্যগ্র।

দিগন্ত-প্রসারী সরিষার ক্ষেত্র, যেন দিগন্ত-প্রসারী একখানি সোনার স্বপ্ন, লক্ষ কোটি ফুলে আত্মহারা।

মাঠের আলের উপর দিয়া অশ্বারোহণে মন্থরগতিতে উগ্রমোহন এই দৃশ্য উপভোগ করিতে করিতে চলিয়াছেন। সহসা তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন, ধীরে ধীরে নদীতীরে গিয়া পরিচ্ছদাদি খুলিয়া ফেলিলেন। তাঁহার সুগৌর নগ্ন গাত্রে শুভ্র উপবীত মাত্র শোভা পাইতে লাগিল। চক্রবালরেখা-লীন সূর্যকে উদ্দেশ করিয়া সেই নিস্তব্ধ প্রান্তরে উগ্রমোহন উদাত্ত কণ্ঠে সূর্য-বন্দনা করিলেন। হস্তে জলের অর্ঘ্য—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্
ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্।

উগ্রমোহনের উদ্ধত শির সূর্যপ্রণামে অবনমিত হইল। সূর্যপ্রণাম শেষ করিয়া উগ্রমোহন মুগ্ধ বিস্মিত নেত্রে পশ্চিম-আকাশের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। সূর্য অস্ত গেল।

*　　　*　　　*　　　*

উগ্রমোহন যখন বাড়ি ফিরিলেন, তখন সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। শিবমন্দিরের সন্ধ্যারতির শঙ্খ-ঘণ্টা-ধ্বনি তখনও থামিয়া যায় নাই। তিনি অন্দর-মহলে প্রবেশ করিলেন। শয়ন-কক্ষে গিয়া দেখিলেন, পত্নী রাণী বহ্নিকুমারী বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছেন।

মৃদুহাস্যসহকারে উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, উপস্থিত কার প্রেমে পড়েছ? জগৎসিংহ, না গোবিন্দলাল?

বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ না তুলিয়াই উত্তর করিলেন, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের।

সে আবার কে?

জগৎসিংহকে চেন, অথচ গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে চেন না?

কি করে চিনব? কখনও পড়িনি, ও নাম দুটো শোনা ছিল।

এইবার বহ্নিকুমারী পুস্তক হইতে মুখ তুলিয়া ছদ্মবিস্ময়ে প্রশ্ন করিলেন, এতকাল কি করেছ তা হলে? আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েছে তো এই সেদিন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রও পড়নি?

তোমার দাদার মত উপন্যাস, কবিতা, গান, বাজনা নিয়ে থাকব—এত বড় দুর্মতি কোন কালে আমার যেন না হয়। আমার যৌবন কেটেছে কুস্তিগীরে সঙ্গে, ঘোড়ার পিঠে। উপন্যাস হাতে তাকিয়া ঠেস দিয়ে নয়। তোমাদের অবশ্য ওসব সাজে।

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া উগ্রমোহনের দিকে শুধু চাহিয়া রহিলেন। বুদ্ধিদীপ্ত আয়তচক্ষু দুইটিতে তীব্র ব্যঙ্গ যেন মূর্ত হইয়া উঠিল। কানের হীরার দুল দুইটি যেন দুলিয়া দুলিয়া উগ্রমোহনের এই শোচনীয় মূর্খতাকে নীরবে ব্যঙ্গ করিতে লাগিল। উগ্রমোহন এই নীরব ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতায় অভিভূত হইয়া অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলিয়া ফেলিলেন, দু দিনেই বোঝা যাবে, কে বেশি বুদ্ধিমান—তোমার দাদা, না, আমি!

বলিয়া তিন মাথার পাগড়িটা নামাইয়া, দুই বাহু প্রসারণ করিয়া আলস্যভরে গা ভাঙিয়া, দুই হাত কোমরে দিয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নীরবতার পর বহ্নিকুমারী বলিলেন, তোমার বুদ্ধিও তো কম নয়। তা না হলে আমার দাদার দেওয়া 'বাণী' নামটাকে বদলে 'বহ্নি' করে দিলে!

নামটা তোমার পছন্দ হয়নি?

বহ্নিকুমারী কোনও উত্তর দিলেন না। কেবল হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টি মেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া নীরব হাসিতে উগ্রমোহনকে অস্থির করিয়া তুলিতে লাগিলেন। উগ্রমোহন বলিয়া উঠিলেন, তুমি তো আগুন। তোমার নাম কি বাণী মানায়? উঠিলেন, বহ্নিকুমারীই তোমার উপযুক্ত নাম। পছন্দ হয়নি তোমার? আশ্চর্য!

বলিয়া উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি সোফায় উপবেশন করিলেন। বহ্নিকুমারী নির্নিমেষ নেত্রে এতক্ষণ স্বামীর বলিষ্ঠ দেহসৌষ্ঠব নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। স্বামী উপবেশন করিতেই বিনা ভূমিকায় স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া বাহু দিয়া তাঁহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিলেন, তর্ক থাক, ছাদে চল। কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না আজ!

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, আচ্ছা, ঠিক করে বল তো তোমার কাকে বেশি ভাল লাগে? আমাকে, না, তোমার দাদাকে? কে ভাল? আমি, না, চন্দ্রকান্ত?

বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, সিংহে আর ময়ূরে তুলনা হয় কি? চল, ছাদে যাই।

উভয়ে ছাদে গেলেন।

এই উপমাটায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

সুপুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিতে দিতে তাই তিনি বলিয়া ফেলিলেন, বাঃ, সুন্দর শানাইটা বাজছে তো! চমৎকার পূরবী ধরেছে।

বহ্নি দেবীর চক্ষু দুইটি নীরব হাস্যে আবার প্রখর হইয়া উঠিল।

উগ্রমোহন পত্নীর চক্ষুর এই ভাষাময় বিদ্রূপ বুঝিতেন। তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন, পূরবী নয়?

না, ইমন-কল্যাণ।

শুনিয়া উগ্রমোহন মনে মনে আবার দমিয়া গেলেন। এ বিষয়ে বহ্নি যে সত্যই বেশি সমঝদার এবং বহ্নির মানসিক এই উৎকর্ষের মূলে যে চন্দ্রকান্তের প্রভাব বিদ্যমান, তাহা অনুভব করিয়া উগ্রমোহন মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন।

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব।

চতুর্দিক জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। দূরে নহবৎখানায় ইমনকল্যাণে শানাই বাজিতেছে। জ্যোৎস্না আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সহসা বহ্নি দেবী বলিয়া উঠিলেন, আমারই ভুল হয়েছিল। এ ইমন-কল্যাণ নয়, পূরবীই।

উগ্রমোহন বলিলেন, তাই নাকি?

এমন সময় নীচে শব্দ শোনা গেল, হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো, হুম্ ব্রো।

উগ্রমোহন উঠিলেন। বলিলেন, চন্দ্রকান্তের পালকি এল। যাই, একটু দাবায় বসি।

উভয়ে নীচে নামিয়া গেলেন।

নীচে বৈঠকখানায় একটি গালিচার উপর দাবার ছকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহন বসিয়া আছেন, কে বলিবে এই চন্দ্রকান্তকে ফৌজদারী মকদ্দমায় আসামী করিয়া উগ্রমোহন দেওয়ানজীকে মকদ্দমা দায়ের করিতে হুকুম দিয়া আসিয়াছেন! চন্দ্রকান্তও যে আসিবার ঠিক পূর্ব-মুহূর্তে উগ্রমোহনের একটা জলকর লুঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও তাঁহার মুখ দেখিয়া নির্ণয় করা অসম্ভব।

বহুকালাবধি এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। বৈষয়িক ব্যাপারে একজন আর-একজনকে জব্দ করিবার জন্য অহরহ সচেষ্ট। অথচ প্রত্যহ সন্ধ্যায় দুই শালা-ভগ্নীপতির একত্র বসিয়া দাবা খেলা চাই-ই।

সন্ধ্যায় দাবার ছক লইয়া দুইজনে যখন বসেন, তখন তাঁহারা যেন পরম মিত্র। আজ পর্যন্ত কেহ কখনও সামনা-সামনি বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া আলোচনা করেন নাই। বৈষয়িক ব্যাপারের আলোচনা আদালতে হওয়াই সঙ্গত, বৈঠকখানায় নহে,—যেমন দাবা খেলার আলোচনা বৈঠকখানাতেই শোভন, আদালতে নহে। ইহাই যেন উভয়ের মনোভাব।

চন্দ্রকান্তের ছিপছিপে শ্যামবর্ণ একহারা চেহারা। গোলাকার মুখে শুকচঞ্চুর মত নাসা। গোঁফ-দাড়ি কামানো। চোখে মুখে বুদ্ধির জ্যোতি ঝলমল করিতেছে।

একজন চাকর দুইটি রূপার গেলাসে করিয়া সিদ্ধি লইয়া আসিল।

উভয়ে নীরবে তাহা নিঃশেষ করিয়া আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

ভৃত্য গেলাস লইয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

।। চার।।

সেদিন সকাল হইতে বাদল নামিয়াছে। সূর্যের দেখা নাই। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। আর্দ্র বাতাস বহিতেছে। পথে লোকজন নাই বলিলেই হয়। চন্দ্রকান্ত রায় নিজের খাস-কামরায় বসিয়া রহিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত রায় শৌখিন লোক তাঁহার বসিবার ঘরটি তাঁহার নিজের রুচি অনুযায়ী সাজানো। টেবিল চেয়ার নাই। প্রকাণ্ড ঘরখানা জুড়িয়া একখানি দূর্বাদলশ্যাম মখমলের গালিচা পাতা। তাহার উপর কয়েকটি শুভ্র ওয়াড়-পরানো তাকিয়া। গালিচার মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একখানি রূপার পরাত। পরাতের উপর সুদৃশ্য একটি গড়গড়া মীনার কাজ করা। ঘরের কোণে একটি মেহগনি কাষ্ঠের তেপায়া এবং তেপায়ার উপর সোনা-রূপার কাজ-করা একটি বড় ফুলদানি। ফুলদানিতে তিন-চারটি কেয়াফুল দাঁড় করানো রহিয়াছে। ঘরের দেওয়াল পরিষ্কার চুনকাম করা। একখানিও ছবি নাই। সেতার এস্রাজ প্রভৃতি কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র একটি কোণে ঠেসানো রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত তন্ময় হইয়া বসিয়া গান শুনিতেছিলেন। প্রিয় ওস্তাদ মিশিরজী তানপুরা হস্তে মিয়ামল্লার গান ধরিয়াছেন—

বূঁদন ভিজে মোরি শারী,
অব ঘর জানে দে বনবারি।
এক ঘন গরজে, দুজে পবন বহত,
তিজে ননদী মোসে দেত গারী।।

—কৃষ্ণের কাছে রাধিকার এই মিনতি গানের সুরে সুরে যেন কাঁদিয়া ফিরিতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন। গড়গড়ার নল হাতে ধরাই আছে, তাহাতে টান দেওয়া আর হইতেছে না। এই প্রায়ান্ধকার নিবিড় বর্ষা-প্রভাতে তাঁহার সমস্ত অন্তর গানের তানে ভর করিয়া যমুনার কূলে চলিয়া গিয়াছে। সেখানে তিনি যেন দেখিতেছেন, একটি গৌরী কিশোরী এক শ্যামকান্তি কিশোরের দুইটি হাত ধরিয়া মিনতি করিতেছে, ওগো, আমাকে ছাড়িয়া দাও। এই বর্ষায় আমার শাড়ি ভিজিয়া গিয়াছে। আকাশে মেঘ ডাকিতেছে, জোরে বাতাস বহিতেছে। ননদী আমাকে গালি দিবে। এবার আমাকে ছাড়িয়া দাও।

গান বন্ধ হইল। কিছুক্ষণ উভয়েই নির্বাক। সুরের রেশ তখনও ঘরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। চন্দ্রকান্ত রায় প্রথমে কথা কহিলেন। বলিলেন, চমৎকার!

মিশিরজী দুই হাত জোড় করিয়া বলিলেন, হুজুরের মেহেরবানি।

দ্বারপ্রান্তে একজন বলিষ্ঠকায় জমাদার আসিয়া সেলাম করিল। চন্দ্রকান্ত রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর ছোটন সিং?

ছোটন সিং বলিল, গতকল্য তাহারা হুজুরের হুকুম অনুযায়ী যে জলকরটি লুণ্ঠন করিতে গিয়াছিল, তাহা সুসম্পন্ন হইয়াছে। দুই মণ মৎস্য তাহারা লইয়া আসিয়াছে। এখন কি করিতে হইবে, তাহা জানিবার নিমিত্ত দেওয়ানজী তাহাকে পাঠাইয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত রায় বলিলেন, দেওয়ানজী যেন সমস্ত মৎস্যই উগ্রমোহনবাবুর নিকট উপঢৌকনস্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

কোনও খুন-জখম হয়েছে?

তেমন বিশেষ কিছু নয়। রামঅওতার সিপাহীর মাথায় একটু চোট লাগিয়াছে, তবে তাহা সাংঘাতিক কিছু নয়।

আচ্ছা, যাও।

ছোটন সিং সেলাম করিয়া যাইবার পূর্বে বলিয়া গেল, গোলোক সাহা আসিয়া কাছারি-বাড়িতে বসিয়া আছে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইখানে পাঠিয়ে দাও।

মিশিরজী বলিলেন, হুজুর যদি হুকুম দেন, তা হলে এবার উঠি। আমার স্নানাদি কিছুই এখনও সারা হয়নি। বলিলেন অবশ্য হিন্দীতে।

আচ্ছা।

মিশিরজী উঠিয়া গেলেন। গোলোক সা প্রবেশ করিল এবং ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল।

সা-জী, বস। তারপর খবর কি?

গোলোক সা সসঙ্কোচে উপবেশন করিয়া বলিল, খবর ভাল নয়।

ওরে ভজনা, তামাক দিয়ে যা।

ভজনা খানসামা আসিয়া কলিকা লইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত গোলোক সার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, খবর ভাল নয় মানে?

গোলোক সা নিম্নস্বরে উত্তর দিল, ও-তরফে আমার ডাক পড়েছিল। উগ্রমোহনবাবু, আমাকে হুকুম দিয়েছেন যে, আমি যেন কিছুতেই আপনাকে টাকা ধার না দিই।

চন্দ্রকান্তের চক্ষু দুইটি ক্ষণিকের জন্য দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া আবার শান্তভাব ধারণ করিল। তাঁহার টাকার আর দরকার ছিল না। তথাপি তিনি বলিলেন, টাকা যখন চেয়েছি, তখন দিতে হবে বইকি।

ভজনা খানসামা কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে দ্বারদেশে দেখা দিল।

চন্দ্রকান্ত অতি ধীরভাবে বলিলেন, আগামী বুধবার, অর্থাৎ পরশুদিন আমার গোমস্তা রাধিকামোহন তোমার কাছে যাবে।

ভজনা কলিকাটা বেশ করিয়া ধরাইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

গোলোক সা কাতরকণ্ঠে বলিল, আমার অবস্থাটা হুজুর, একবার ভেবে দেখুন। আমার যে ডাঙায় বাঘ জলে কুমীর গোছ অবস্থা হল।

বেশ, তুমি আমার জমিদারিতে এসে বাস কর। কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। পীরপুর বাজারে আমার নিজের একখানা খাস বাড়ি আছে। ইচ্ছে করলে কালই তুমি তাতে উঠে আসতে পার।

ভজনা খানসামা কলিকাটি গড়গড়ার মাথায় বসাইয়া নলটি প্রভুর হাতে দিয়া পিছু হাঁটিয়া বাহির হইয়া গেল।

গড়গড়ায় একটা মৃদু-গোছের টান দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তা হলে সব ঠিক রইল। পরশুদিন রাধিকামোহন যাবে।

গোলোক সা খানিকক্ষণ বসিয়া মাথা চুলকাইল। পীরপুরের বাসায় আসিবে কি না, তাহাই ভাবিতেছিল বোধ হয়। কিন্তু সে যখন কথা কহিল, তখন বোঝা গেল, তাহার চিন্তাধারা ভিন্নমুখী। আম্‌তা আম্‌তা করিয়া সে কহিল, লেখাপড়াটা তা হলে—

রাধিকামোহনকে আমার পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দেওয়া আছে। তার জন্যে ভাবনা নেই। টাকাটা তুমি মজুত রেখো। —নির্বিকারচিত্তে তিনি তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন।

গোলোক সা খোঁচা খোঁচা দাড়িতে খানিকক্ষণ হাত বুলাইয়া অবশেষে বলিল, পীরপুরের বাসাটা—

হ্যাঁ, কালই আসতে পার।

গোলোক সা বিদায় লইল।

চন্দ্রকান্ত নিঃশব্দে তাম্রকূট সেবন করিতে লাগিলেন। অম্বুরিতামাকের সুগন্ধে ঘর ভরিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষণকাল পরেই চন্দ্রকান্ত জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন যে, কলিকাতা হইতে আগত তাঁহার বন্ধুগণ শিকার করিয়া ফিরিতেছেন। হাতী গেটে ঢুকিল দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বালাপোশ-খানা গায়ে দিয়া বারান্দায় আসিয়া স্মিতমুখে দাঁড়াইলেন।

হস্তীপৃষ্ঠ হইতেই একজন শিকারী চিৎকার করিয়া বলিলেন, ওহে, ভারি গুড লাক্। একটা ফ্লরিকান পেয়েছি।

হস্তী উপবেশন করিতেই তিনজন ভদ্রলোক অবতরণ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, কায়েমও অনেকগুলো পেয়েছ দেখছি।

শিকারীদের মধ্যে আর একজন বলিলেন, চখাও পেয়েছি গোটা তিনেক।

কলরব করিতে করিতে সকলে অতিথি-নিবাসের দিকে অগ্রসর হইলেন। শিকারীরা বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াছিলেন। তখনও টিপটিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। সে বৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করিয়া চন্দ্রকান্ত বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভজনা খানসামা ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা ছাতা আনিয়া প্রভুর মাথায় ধরিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, থাক্, দরকার নেই।

অতিথি-ভবনে উপস্থিত হইবামাত্র দেখা গেল, সেখানে অতিথিদের জন্য ধূমায়িত গরম চা প্রস্তুত। তাহার সঙ্গে গরম ফুলকো লুচি এবং গরম গরম মাছ-ভাজা।

তাড়াতাড়ি বেশ-পরিবর্তন করিয়া সকলে প্রাতরাশে প্রবৃত্ত হইলেন। যখন শিকারের গল্প বেশ জমিয়া উঠিয়াছে, তখন একজন সিপাহী আসিয়া খবর দিল যে, ম্যানেজারবাবু কোন জরুরি দরকারে বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন।

বাহিরে যাইতেই ম্যানেজারবাবু বলিলেন, রমেশবাবু বেলা তিনটে নাগাদ এন্‌কোয়ারি করতে আসবেন।

আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রমেশবাবু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। উগ্রমোহন সিংহ চন্দ্রকান্তবাবুকে আসামী করিয়া যে মকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন, তাহারই সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আসিতেছেন। পূর্বেই এ খবর চন্দ্রকান্ত রায় জানিতেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে কেহই বলিতে পারিবে না যে, তিনি আত্মরক্ষার বিশেষ কোন চেষ্টা করিতেছেন। উপরন্তু তিনি কলিকাতায় নিমাইবাবুকে তার করিয়াছেন, যেন তিনি অবিলম্বে সবান্ধবে আসিয়া উপস্থিত হন, এই সময়টা শিকার ভাল জুটিবে। নিমাইবাবু দুইজন বন্ধু লইয়া গতকল্য আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। নিমাইবাবু চন্দ্রকান্তের সহপাঠী। দুইজনে কলিকাতায় এম.এ.পড়িতেন।

আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত তো ভিতরে চলিয়া গেলেন, কিন্তু বিমূঢ় ম্যানেজার কমলাক্ষবাবু প্রভুর এতাদৃশ ঔদাসীন্যের কারণ কিছুই অনুমান করিতে না পারিয়া করতল দুইটি উল্টাইয়া চোখমুখের ভঙ্গীতে নৈরাশ্য-মিশ্রিত বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ করিলেন এবং খানিকক্ষণ ইতস্তত করিয়া কাছারি-বাড়িতে চলিয়া গেলেন।

* * *

বেলা তিনটার সময় রমেশবাবু ডেপুটি আসিলেন।

আসিয়াই তাঁহার নিমাইবাবুর সহিত দেখা হইয়া গেল। নিমাইবাবু রমেশের ভগ্নীপতি।

আরে নিমাই যে, তুমি কোথা থেকে?

গল্প জমিয়া উঠিল। চা খাবার গানবাজনা সহযোগে জিনিসটা আরও উপভোগ্য হইল। চন্দ্রকান্তবাবু হাস্যমুখে অতিথি-সম্বর্ধনা করিতে লাগিলেন।

বলা বাহুল্য, রমেশবাবু রিপোর্ট দিলেন, চন্দ্রকান্ত রায় সম্পূর্ণ নির্দোষ। উগ্রমোহনের মামলা ফাঁসিয়া গেল।

।। পাঁচ।।

জমিদার উগ্রমোহন সিংহের বজরা বাহিনী-নদীর ঘাটে আসিয়া ভিড়িল। বাহিনী একটি অখ্যাতনাম্নী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী। গঙ্গার সহিত ইহার যোগ থাকাতে বর্ষার গঙ্গাজলে ইহা পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। সেই সময় নদীটি যে জলসঞ্চয় করিয়া লয়, তাহাতেই তাহার সারা বৎসর চলিয়া যায়। নদীটির বিশেষত্ব এই যে, নদীটি একটি জঙ্গলের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিরাট জঙ্গল, নাম যম-জঙ্গল। সত্যই জঙ্গলে প্রবেশ করিলে মনে হয়, যমালয় বোধ হয় নিকটেই কোথাও আছে। দিনের বেলায় রৌদ্র প্রবেশ করে না, চতুর্দিকে এমন নিবিড় ঘন অন্ধকার।

মধ্যে মধ্যে অবশ্য ফাঁকা জায়গাও আছে। এরূপ একটি ফাঁকা জায়গায় ঘাট। বজরা ঘাটে ভিড়িতেই চারিজন বরকন্দাজ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল; বজরা হইতে নামিলেন উগ্রমোহন সিংহ, তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু এবং দুইটি সুন্দরী বালিকা। বালিকা দুইটির বয়ঃক্রম আট-নয় বৎসর এবং তাহারা দেখিতে প্রায় একই প্রকার। নাম রুম্‌নি ও ঝুম্‌নি। ইহাদের সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে। উগ্রমোহনবাবুর মৃতা জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর একমাত্র কন্যা কমলার বিবাহ হইয়াছিল গরিবের গৃহে। কমলা উগ্রমোহনবাবুর খুব প্রিয় ছিল। সুতরাং কমলার বিবাহের পর উগ্রমোহন প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন যে, কমলাকে লইয়া গঙ্গাগোবিন্দ গৃহ-জামাতারূপে থাকুন, উগ্রমোহন তাঁহাকে সমাদরে রাখিবেন। কমলার স্বামী গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র সাধারণ গরিব গৃহস্থ হইলেও এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন না। আত্মসম্মানজ্ঞান তাঁহার প্রবল ছিল। উগ্রমোহন সিংহও প্রবল প্রকৃতির লোক। সুতরাং খিটিমিটি চলিতেছিল। কমলার মুখ চাহিয়া উগ্রমোহন গঙ্গাগোবিন্দের বিশেষ কিছু করিতে পারিতেছিলেন না। এমন সময় একটা ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ঝুম্‌নিকে প্রসব করিয়া কমলা ইহলোক ত্যাগ করিল। কমলার মৃত্যুকালে উগ্রমোহন উপস্থিত ছিলেন। কমলা তাঁহাকে যাইবার সময় বলিয়া গেল, মামা, আমার মেয়ে দুটি তোমায় দিয়ে গেলাম। তাদের দেখো।

ইহা প্রায় নয় বৎসর পূর্বেকার ঘটনা। এই নয় বৎসর ধরিয়া উগ্রমোহন ক্রমাগত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে গঙ্গাগোবিন্দের নিকট হইতে লইতে পারেন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আর বিবাহ করেন নাই, কন্যা দুইটিকে লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহার দিন কাটিতেছিল। উগ্রমোহন বহুবার তাহাদের লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি কিন্তু দেন নাই। বিনীতভাবে তিনি একই উত্তর চিরকাল দিয়া আসিয়াছেন, আপনার অনুগ্রহ-দৃষ্টি থাকিলেই যথেষ্ট। রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে আমি দিতে পারিব না।

গতকল্য কিন্তু উগ্রমোহনের ধৈর্য ভাঙিয়াছে। এতদিন তিনি গঙ্গাগোবিন্দের সঙ্গে শ্বশুরোচিত ভদ্রতা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আর নয়। কাল তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে নিমন্ত্রণ করিয়া পালকি পাঠাইয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দের এত বড় স্পর্ধা, পালকি ফেরত পাঠাইয়া বিনীতভাবে এক পত্র লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে কাল সকালে পাঠাইয়া দিব। রাত্রে ঠাণ্ডা লাগিবার ভয়ে তাহাদিগকে আর পাঠাইলাম না। আশা করি, আপনি দুঃখিত হইবেন না।

উগ্রমোহনের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সকালে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আসিতেই তাহাদের লইয়া বজরাতে তিনি বাহির হইয়া পড়িয়াছেন, সঙ্গে ম্যানেজারবাবুকে লইয়াছেন। কেন, কেহ জানে না। আসিবার সময় বাজারের যত মিষ্টান্ন ছিল সমস্ত কিনিয়া আনিয়াছেন। বাড়িতে বলিয়া আসিয়াছেন, বাগান দেখিতে যাইতেছি। যম-জঙ্গলে উগ্রমোহন সিংহের বাগান আছে। প্রায় পাঁচ শত মহিষ তাঁহার এই জঙ্গলে থাকে।

উগ্রমোহন সিংহ নামিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, পালকি ঠিক আছে তো?

হ্যাঁ হুজুর।

সঙ্গে সঙ্গে তিনটি পালকি আসিয়া হাজির হইল। একটিতে উগ্রমোহন, একটিতে অঘোরবাবু এবং আর একটিতে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আরোহণ করিলেন এবং ত্বরিতগতিতে পালকি তিনখানি নিঃশব্দে বনপথে অদৃশ্য হইয়া গেল।

নধরকায় কৃষ্ণকান্তি মহিষগুলিকে উগ্রমোহন সিংহ মিষ্টান্ন খাওয়াইতেছিলেন—সন্দেশ, রসগোল্লা, জিলাপি, যে যত খাইতে পারে। মহিষগুলির চিক্কণ মসৃণ গাত্র হইতে সূর্যকিরণ যেন পিছলাইয়া পড়িতেছিল।

অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে তাহারা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া চলিয়াছে। উগ্রমোহন স্বয়ং দাঁড়াইয়া তদারক করিতেছেন। হঠাৎ তিনি পরিচারক গোয়ালাটিকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ রে, মহিষদের গায়ে শিঙে আজ ঘি মাখিয়েছিস তো?

একটু পরে মাখানো হবে হুজুর।

একটু পরে কেন? সকালে মাখাবার কথা!

বড় বাথান থেকে আজ ঘি এসে পৌঁছয়নি এখনও।

উগ্রমোহন সিংহ হাঁকিলেন, মনক্কা পাঁড়ে!

মনক্কা পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

তুম্ আভি যা কর্ বড়া বাথানমে খবর লেও, ঘিউ কাহে নৈ য়হা পৌঁছা।

মনক্কা পাঁড়ে চলিয়া গেল।

তাহার পর উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে এখন কটা মোষ আছে?

পঞ্চাশটা। বাকি সব বড় বাথানে আছে।

উগ্রমোহন ঘুরিয়া ঘুরিয়া গণনা করিতে লাগিলেন। এই বাথানে আসন্নপ্রসবা মহিষীগুলি এবং যে সব মহিষীর বাছুর বড় হইয়া দুধ বন্ধ হইয়াছে, তাহারাই থাকে।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, দুশমন কোথা?

নদীতে আছে।—বলিয়া গোয়ালাটি কণ্ঠ হইতে এক বিচিত্র শব্দ করিতে লাগিল, আঁঃ-হা-হা-হা-হা-হা—আঁঃ-হা-হা-হা। একটু পরে দেখা গেল, মৃদু শব্দ করিতে করিতে কর্দমাক্তদেহ এক বিরাট মহিষ বনজঙ্গল ভেদ করিয়া আসিতেছে।

দুশমন বিরাটকায় পুরুষ মহিষ। উগ্রমোহনের বড় প্রিয়। উগ্রমোহন স্বহস্তে তাহাকে খাবার খাওয়াইতে লাগিলেন।

খাওয়ানো শেষ হইলে তিনি তাহার গলদেশে আদর করিয়া একটু হাত বুলাইয়া দিতে দুশমন গলিয়া গিয়া আনন্দে গলা বাড়াইয়া রহিল।

একটু পরেই উগ্রমোহনের সুসজ্জিত অশ্ব আসিল। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া তিনি গভীরতর জঙ্গলে একটি সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া চলিতে লাগিলেন। মুখে গভীর চিন্তার রেখা। এই পথেই কিছুক্ষণ পূর্বে ম্যানেজারবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া গিয়াছেন।

জঙ্গলের ভিতর দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে মন্থরগতিতে আসিতে আসিতে উগ্রমোহন সিংহ রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সম্বন্ধে যাহা করিবেন, ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্রের নিকট আর ফিরিয়া যাইবে না।

উগ্রমোহনের অশ্ব বনজঙ্গল ছাড়াইয়া একটি ফাঁকা জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হইতেই একজন সহিস ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। উগ্রমোহন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। সহিসের হস্তে বল্গা চাবুক প্রভৃতি দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ম্যানেজারবাবু এসে পৌঁছেছেন?

সহিস উত্তর দিল, হাঁ হুজুর।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি।

হাঁ হুজুর।

কোথায় তারা?

কাছারি-বাড়িতে আছে।

অল্প দূরেই একটি আটচালা ছিল। মাটির ঘর। কিন্তু আয়তনে প্রকাণ্ড। চতুর্দিকে বারাণ্ডা। ইহা উগ্রমোহন সিংহের জংলি-কাছারি নামে পরিচিত। উগ্রমোহন সেই দিকেই পদচালনা করিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি, তাঁহার ম্যানেজার এবং প্রবীণ জমাদার ভিখন তেওয়ারি সকলেই একটি সদ্যোধৃত বন্য শশককে লইয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির আগ্রহ সীমা অতিক্রম করিয়াছে। উগ্রমোহন উপস্থিত হইতেই তাহারা উগ্রমোহনকে আসিয়া ধরিল, দাদু আমরা খরগোশ পুষব।

উগ্রমোহন বলিলেন, তোরা তো সিংহ পুষেছিস। খরগোশের শখ কেন? আমার গোঁফ জোড়া পছন্দ হয় না?—বলিয়া তিনি নিজের পুষ্ট গুম্ফে চাড়া দিলেন। ম্যানেজারবাবু ও ভিখন তেওয়ারি প্রভুকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। তাঁহাকে রসিকতা-প্রবণ দেখিয়া স্থান ত্যাগ করিয়া আড়ালে গেল। আড়ালে যাওয়াই নিরাপদ। কারণ উগ্রমোহনের সম্মুখে হাসিয়া ফেলিলে আর রক্ষা নাই। একবার এক নায়েব হাসিয়া ফেলাতে উগ্রমোহন তাহার কর্ণ-মর্দন করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দূর করিয়া দেন। উগ্রমোহন রসিক লোক; তিনি তাঁহার নাতনী বা বয়স্য সকলের সঙ্গেই বেশ প্রাণখোলা রসিকতা করেন। কিন্তু ভৃত্য-স্থানীয় কেহ তাহাতে যোগ দিয়া হাসিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে শিক্ষা দিয়া দেন।

রুম্‌নি কহিল, খরগোশের কান দুটি সুন্দর।

ঝুম্‌নি কহিল, চোখ দুটিও।

উগ্রমোহন নিকটস্থ একটি মোড়ায় উপবেশন করিয়া বলিলেন, তোদের পছন্দ অতি বাজে দেখছি। গোঁফ কই?

ওই তো রয়েছে।

আরে, ওটা কি একটা গোঁফ! আমার দেখ্ তো কেমন!

রুম্‌নি কহিল, আপনি যে এত পাখী পুষেছেন, গোঁফ আছে নাকি কারও? তবে পুষেছেন কেন?

পাখি কেমন গান গায়, কথা বলে! খরগোশ পারবে?

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি দেখিল, তর্ক দ্বারা দাদুকে পরাজিত করা তাহাদের সাধ্যাতীত। তাহারা উভয়ে তখন দাদুর কোলে চড়িয়া আবদারের সুর ধরিল, না দাদু, আমরা পুষব।

উগ্রমোহন বলিলেন, আচ্ছা, বেশ। আমারও কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে। আমি এখন এইখানে একমাস থাকব। তোমাদেরও থাকতে হবে। থাকতে পারবে তো আমার কাছে? বাবার কাছে যেতে চাইবে না?

বাবা যদি বকেন?

আমার কাছে থাকলে বকবে কেন?

তুমি এখানে থাকবে এক মাস? দিদি কার কাছে থাকবে তা হলে?

আমি মাঝে মাঝে গিয়ে দিদিকে দেখে আসব।

তখন আমরা কার কাছে থাকব?

হাসিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, কেন খরগোশের কাছে। অঘোরবাবুও থাকবে।

তখন রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সাগ্রহে বলিল, অঘোরবাবু বেশ লোক দাদু, এই দেখ, আমাদের হাতে কেমন মানুষ এঁকে দিয়েছে।

উভয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে সত্যই দুইটি মনুষ্য-মুখ আঁকা আছে, উগ্রমোহন দেখিলেন।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আরও বলিল, কাপড় দিয়ে ঘোমটা করে দিলে কেমন বউ হয়! বলিয়া তাহারা অঞ্চলপ্রান্ত দিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠেব উপর অবগুণ্ঠন রচনা করিয়া মহা খুশী হইয়া উঠিল। উগ্রমোহন বুঝিলেন, চতুর ম্যানেজার বালিকা দুইটিকে বশ কবিয়াছে। তিনি খুশী হইলেন।

* * *

এক ঘণ্টা পরে তিনি ম্যানেজারবাবুকে ডাকিয়া আদেশ করিলেন, নিমাইনগরের মৃন্ময় ঠাকুরের নিকট একটি পালকি এবং একজন সিপাহী পাঠাও। অবিলম্বে তাঁর আমি সাক্ষাৎ চাই।

* * *

সন্ধ্যার অনতিকালপূর্বে জংলি-কাছারির একটি কোণের ঘরে পঞ্জিকা-হস্তে উগ্রমোহন সিংহ বসিয়াছিলেন। সম্মুখে শতরঞ্জির উপর মৃন্ময় ঠাকুর। রোগা-গোছের লোকটি, বয়স চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হইবে। দক্ষিণ প্রান্তের খানিকটা পুড়িয়া গিয়াছিল, তজ্জন্য মুখাবয়বের সেই অংশটি কুঞ্চিত এবং দক্ষিণ চক্ষুটি অস্বাভাবিক ভাবে বিস্ফারিত। এই খুঁতটুকু না থাকিলে মৃন্ময় ঠাকুরকে সুশ্রীই বলা চলিত। মৃন্ময় ঠাকুর নিমাইনগরের একজন বর্ধিষ্ণু প্রজা। সহসা উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে পালকি পাঠাইয়া আহ্বান করিলেন কেন, তাহা মৃন্ময় ঠাকুর বুঝিতে পারেন নাই এবং বুঝিতে পারেন নাই বলিয়াই তাঁহার অন্তরাত্মা ভয়ে কাঁপিতেছিল। উগ্রমোহনকে তিনি বিলক্ষণ চিনিতেন।

সহসা উগ্রমোহন নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, দেখ মৃন্ময়, এক বিশেষ জরুরি ব্যাপারে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি।

অনুমতি করুন।

আগামী তেইশে মাঘ দেখছি বিবাহের ভাল দিন আছে। বলিয়া তিনি পঞ্জিকাটি খুলিয়া আর একবার দেখিলেন। হ্যাঁ, তেইশে মাঘ। আমি মনস্থ করেছি, আমার নাতনী দুটির সঙ্গে তোমার ছেলে দুটির উক্ত দিন বিবাহ দেব।

অকস্মাৎ বজ্রপাত হইলে বোধ হয় মৃন্ময় ঠাকুর এতটা আশ্চর্য হইতেন না। উগ্রমোহনের কথা শুনিয়া মৃন্ময় ঠাকুর একেবারে নির্বাক হইয়া গেলেন। তাঁহার বিস্ফারিত দক্ষিণ চক্ষুটি আরও একটু বিস্ফারিত হইল মাত্র।

উগ্রমোহন মৃন্ময়ের এই ভাবান্তর গ্রাহ্যের মধ্যে না আনিয়া বলিয়া চলিলেন, কুলে শীলে তুমি গঙ্গাগোবিন্দের সমতুল্য ঘর। বরং তোমার অবস্থা ভাল। অবস্থার জন্য কিছু যায়-আসে না। আমি আমার নাতনীদের যথেষ্টই দেব। তবে একটা কথা আছে। আমার নাতনী কিংবা নাতজামাইদের আমি যখনই দেখতে চাইব, 'না' বলতে পারবে না। আর দ্বিতীয় কথা এই যে, গঙ্গাগোবিন্দের অমতে আমি এ বিয়ে দেব। আমি নিজেই সম্প্রদান করব। এ নিয়ে যদি মামলা হয়, তার ভার আমার, বুঝলে? কথা বলছ না কেন?

মৃন্ময় ঠাকুর সব কথা ঠিকভাবে বুঝিয়াছিলেন কি না, তিনিই জানেন; কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, হুজুর যখন ঠিক করেছেন, এতে আর আমার আপত্তি কি থাকতে পারে? এ তো আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। তবে বাড়িতে একটু জিজ্ঞাসা করলে হত না?

উগ্রমোহন বলিলেন, তাতে লাভ কি? ধর, যদি তোমার গিন্নী আপত্তি করেন, তা হলে তো সত্যি সত্যি তুমি আর বিয়ে উলটে দিতে পারবে না। তার চেয়ে বরং একেবারে খবর দাওগে যে, উগ্রমোহনবাবুর নাতনীদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করে এলাম। ধানদূর্বা সব এইখানেই আছে, আমার নাতনীদের আশীর্বাদ করে একেবারে বাড়ি যাও।

একটু থামিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন, আমিও আজই তোমার ছেলেদের আশীর্বাদ করে তবে বাড়ি ফিরব।

নির্বাক মৃন্ময় ঠাকুরের আর দ্বিরুক্তি করিবার সামর্থ্য রহিল না।

* * *

সেই দিনই সন্ধ্যার পর রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ঘুমাইলে উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গেলেন এবং নিমাইনগরে পৌঁছিয়া মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের আশীর্বাদ করিলেন।

মনে অসীম তৃপ্তি লইয়া যখন তিনি স্বাগ্রমে ফিরিতেছিলেন, তখন এক প্রহর সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, আকাশে নক্ষত্রের দীপালী, চতুর্দিক অন্ধকার। সহসা পূর্বাকাশ উদ্ভাসিত করিয়া কৃষ্ণা-চতুর্থীর চন্দ্রোদয় হইল। উগ্রমোহন দেখিলেন, স্বাতীনক্ষত্র চাঁদের কাছেই রহিয়াছে। স্বাতী

চন্দ্রের প্রিয়তমা পত্নী। সহসা উগ্রমোহন ঘোড়ার পিঠে চাবুক দিলেন, অশ্ব দ্রুতবেগে ছুটিতে লাগিল। উগ্রমোহন ভাবিতে লাগিলেন, বহ্নি না-জানি এতক্ষণ কি করিতেছে!

বাড়ি পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার দেওয়ানজী কাতরমুখে বসিয়া আছেন। প্রভুকে দেখিয়া তিনি আরও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর, এখনও বাড়ি যাও নি?

রাখালবাবু ভীতমুখে অস্ফুটস্বরে কেবল বলিলেন, হুজুর—

তাঁহার মুখ দিয়া কথা সরিতেছিল না।

বিস্মিত উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্যাপার কি?

মরিয়া হইয়া রাখালবাবু বলিয়া ফেলিলেন, বাহারকে পাওয়া যাচ্ছে না।

তার মানে! চন্দনদাস কোথা?

তার সুদ্ধ খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না।

উগ্রমোহন ক্ষণকাল কি চিন্তা করিলেন। তাহার পব জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্ত আজ সন্ধ্যের সময় এসেছিল?

আপনি ফিরেছেন কি না খোঁজ নেবার জন্যে একজন সিপাহী এসেছিল।

তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন বলিলেন, পালকি তৈরি করতে বল। চন্দ্রকান্তের কাছে যাব।

রাখালবাবু পালকিব হুকুম দিতে বাহিরে গেলেন।

*　　*　　*

উগ্রমোহনের পালকি আসিয়া চন্দ্রকান্তের খাস-কামরার বারান্দার নীচে থামিল। চন্দ্রকান্ত ভিতরে বসিয়া সঙ্গীতচর্চা করিতেছিলেন। উগ্রমোহন আসিতেই তিনি বলিলেন, আরে, এস এস। ভারি ভাল একটা গান শিখেছি আজ। শুনবে? ওরে ভজনা, তানপুরাটা আন্ তো রে!

উগ্রমোহন ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন, কিছু বলিলেন না।

তানপুরা আনিলে সহাস্যমুখে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, শোন এবার। বাহার চৌতাল, সদারঙ্গের গান। বিনা সঙ্গতেই শোন—

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই—

গান শেষ হইলে উগ্রমোহন বলিলেন, আমার বাহারও চুরি গেছে আজ। চন্দনও সরেছে।

ছদ্মবিস্ময়ে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই নাকি?

তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, যাক, গরুর শোকে অতটা উতলা হলে কি মানুষের চলে?

বাহার নাম্নী গাভীকে পাঁচ শত টাকা দিয়া উগ্রমোহন খরিদ করিয়াছিলেন। বাহারের বিশেষত্ব ছিল তাহার গায়ের রঙ—ঠিক বাঘের মত। তাহার পরিচর্যার জন্য উগ্রমোহন একটি পৃথক গোয়ালঘর এবং পৃথক পরিচারক চন্দনকে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

সহসা সেই বাহারের রহস্যময় অন্তর্ধানে উগ্রমোহন দমিয়া গিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু চন্দ্রকান্তের কথায় তিনি বলিলেন, না উতলা হইনি। তোমার বাহার শুনে মনে পড়ল। এস, একদান দাবায় বসা যাক।

উভয়ে তখন দাবার ছকে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া বসিলেন। ভজনা খানসামা দুইটি গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া দিয়া কপাটটা ধীরে ধীরে ভেজাইয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

।। ছয়।।

গঙ্গাগোবিন্দ মিশ্র যখন শুনিলেন যে, উগ্রমোহন সিংহ রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া যম-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়াছেন, তখন তিনি একটু চিন্তিত হইলেন; কি করিবেন স্থির করিতে না পারিয়া চন্দ্রকান্তের নিকট গেলেন। গঙ্গাগোবিন্দ এবং চন্দ্রকান্ত উভয়ে পরম বন্ধু ছিলেন। একসঙ্গে পাঠশালায় পড়িয়াছিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ দারিদ্র্যের জন্য বেশিদূর লেখাপড়া করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধির দীপ্তির জন্যই বালক চন্দ্রকান্ত একদা যাচিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করেন। সেই আলাপ কালক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হয় এবং সেই বন্ধুত্ব আজিও অক্ষুণ্ণ আছে।

গঙ্গাগোবিন্দের চরিত্রের একটা বিশেষত্ব ছিল। ধনীলোকের সংস্পর্শ তিনি যথাসাধ্য পরিহার করিয়া চলিতেন। তাঁহার এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের জন্যই তিনি উগ্রমোহনের অনুগ্রহমূলক প্রস্তাবে রাজী হইতে পারেন নাই, এবং এইজন্যই তিনি অকারণে চন্দ্রকান্তের নিকট বন্ধুত্বের দাবি লইয়া যখন-তখন হাজির হইতেন না। তিনি নিজের স্বল্প আয়ে ব্যবস্থা করিয়া সংসার চালাইতেন এবং অবসর-সময়ে স্থানীয় পাঠাগার হইতে পুস্তকাদি লইয়া তাহাতেই অবসর-বিনোদন করিতেন। সুতরাং যদিও দেবী সরস্বতী তাঁহাকে পাঠশালার পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে দেখা দিবার সুযোগ পান নাই, কিন্তু এমন একজন ভক্তকে তিনি বেশিদিন অগ্রাহ্য করিয়াও থাকিতে পারেন নাই। প্রকৃত শিক্ষার সত্য আলোকে গঙ্গাগোবিন্দ বাণীর বরলাভ করিয়াছিলেন। গ্রামের সকলেই ইহা জানিতেন এবং মানিতেন। গঙ্গাগোবিন্দের বন্ধুত্ব লাভ করিয়া চন্দ্রকান্তের মত মার্জিতরুচি জমিদারও নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার মাঝে মাঝে দুঃখ হইত, গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার নিকট আসেন না বলিয়া। এইজন্যই কিন্তু তিনি আবার গঙ্গাগোবিন্দকে বেশি শ্রদ্ধাও করিতেন। বহুকাল পরে গঙ্গাগোবিন্দ অকস্মাৎ আসাতে চন্দ্রকান্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, তুমি বাণীর কাছে একটা খবর পাঠাতে পার?

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, চন্দ্রকান্ত, তুমি তো সব জান। কেন তবে আবার এ কথা বলছ?

একটু হাসিয়া চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন। ক্ষণপরে বলিলেন, আচ্ছা, থাক তবে। আজকের দিনটা দেখই না। আজ যদি খবর না পাও, কাল নাগাদ পাবেই। উগ্রমোহন তোমার মেয়েদের এত বেশি ভালবাসে যে, তাদের কোন অনিষ্ট হবে না, এটা ঠিক।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, তা জানি। কিন্তু আমার নিজের কষ্ট হচ্ছে যে। আচ্ছা, এ কি অত্যাচার বল তো।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, উগ্রমোহন এখনও বালক আছে। স্কুলে, মনে নেই, সামান্য সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি রকম দাপাদাপি করত ও?

চন্দ্রকান্ত, গঙ্গাগোবিন্দ এবং উগ্রমোহন সহপাঠী ছিলেন। কিন্তু উগ্রমোহন অন্য স্কুলে পড়িতেন এবং নানা বিষয়ে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতেন। সরস্বতীপূজা, দোল, দুর্গোৎসব, স্কুলের খেলাধূলা—সকল বিষয়েই উভয়ে উভয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কাহার প্রতিমা ভাল হইল, দোলের সময় কে কাহাকে কোন্ অভিনব উপায়ে রঙ দিয়া অপ্রস্তুত করিতে পারে, খেলায় কাহার দল জিতিবে—এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের রেষারেষির অন্ত ছিল না। গঙ্গাগোবিন্দ যদিও চন্দ্রকান্তের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং বাল্যকালে যদিও তাঁহার চন্দ্রকান্তের বাড়িতে অবাধ গতিবিধি ছিল; কিন্তু তিনি কখনও এই জমিদার-পুত্রদ্বয়ের ক্রীড়া-কৌতুক-কলহের মধ্যে নিজেকে জড়াইয়া ফেলেন নাই। সসঙ্কোচে তিনি বরাবর দূরে সরিয়া থাকিতেন। এই বিনম্র স্বভাবের জন্যই উগ্রমোহনের পিতা বীরমোহনবাবু গঙ্গাগোবিন্দকে স্নেহ করিতেন এবং এত স্নেহ করিতেন যে, অবশেষে তাঁহাকে নাতজামাই-পদে বরণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ শেষে যে তাঁহার ভাগনীজামাই হইয়া পড়িবেন, ইহা উগ্রমোহন ভাবিতেও পারেন নাই।

কিন্তু পৃথিবীতে অভাবনীয় ব্যাপার অহরহ ঘটিতেছে। উগ্রমোহন তাহার দ্বিতীয় প্রমাণ পাইলেন, যখন তাঁহাকে চন্দ্রকান্তের ভগ্নী বাণীকে বিবাহ করিতে হইল। চন্দ্রকান্তের পিতা সূর্যকান্ত রায় বীরমোহনবাবুর পরম মিত্র ছিলেন এবং বাণীর যেদিন জন্ম হয়, সেই দিনই উগ্রমোহনের সহিত বাণীর বিবাহ-সম্বন্ধ পাকা হইয়া যায়। চন্দ্রকান্তও হয়তো উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ী কমলাকে বিবাহ করিতেন; কিন্তু কোষ্ঠীবিচার করিয়া দেখা গেল যে, চন্দ্রকান্তের কোষ্ঠীতে এমন কয়েকটি গ্রহ পত্নীস্থানে বিরাজ করিতেছেন, যাঁহাদের প্রভাব ও প্রতাপ কোন হিন্দুই অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং চন্দ্রকান্তের বন্ধু গঙ্গাগোবিন্দ কমলাকে বিবাহ করিলেন। বীরমোহন সিংহ মানুষ চিনিতেন। এই নম্র, সুশ্রী, মেধাবী যুবকের হাতে পড়িলে কমলা যে সুখী হইবে, সে বিষয়ে বীরমোহনের সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার বিচার যে নির্ভুল ছিল, তাহা উগ্রমোহন সিংহ না বুঝুন, কমলা বুঝিয়াছিলেন।

বীরমোহন এবং সূর্যকান্ত সেকালের লোক হইলেও আধুনিকমনা ছিলেন। তাহার প্রমাণ এই যে, সূর্যকান্ত নিজ কন্যা বাণীকে সুশিক্ষিতা করিবার জন্য কলিকাতা হইতে জনৈকা শিক্ষয়িত্রী আনাইয়া বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। সেই শিক্ষয়িত্রী, বীরমোহন সিংহ এবং সূর্যকান্তকে জড়াইয়া এখনও স্থানীয় বৃদ্ধগণ নিম্নস্বরে যে সব আলোচনা করেন, তাহা আংশিকভাবে সত্য হইলেও বিস্ময়ের বস্তু।

*　　　*　　　*

গঙ্গাগোবিন্দ কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া প্রশ্ন করিলেন, এখন কি করা উচিত তা হলে?

এখন কিছু করো না। আমার মনে হয়, কাল নাগাদ একটা খবর পাবেই। ব্যস্ত কি? রুম্‌নি-ঝুম্‌নি তাদের দাদুর কাছে আছে, এ কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? দাদুও যে-সে লোক নয়,—উগ্রমোহন সিংহ।

গঙ্গাগোবিন্দ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া যাইবার পর চন্দ্রকান্ত খানিকক্ষণ চক্ষু মুদিত এবং দক্ষিণ করতলের উপর গণ্ড বিন্যস্ত করিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে একটা মৃদুহাস্য খেলিয়া গেল। তিনি উঠিয়া হাঁক দিলেন, ওরে ভজনা!

ভজনা আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে অবিলম্বে ডাকিয়া আনিতে।

সীতারাম পাঁড়ে বৃদ্ধ জমাদার। চন্দ্রকান্তকে কোলেপিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছে। চন্দ্রকান্তের চরিত্র সম্বন্ধে তাহার তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি। সুতরাং চন্দ্রকান্ত যখন সীতারামকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, উগ্রমোহনের শখের বাহার নাম্নী গাভী কোথায়, কি ভাবে এবং কাহার জিম্মায় আছে, তখনই সীতারাম ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু কিছু বলিল না। চন্দ্রকান্ত যাহা জানিতে চাহিয়াছিলেন, তাহার যথাযথ উত্তর দিয়া বৃদ্ধ সীতারাম সহাস্যদৃষ্টিতে মিটিমিটি চন্দ্রকান্তের দিকে তাকাইতে লাগিল। ভাবা যেন, তোমার আবার একটা দুষ্টবুদ্ধি জাগিয়াছে, বুঝিয়াছি আমি।

চন্দ্রকান্ত অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং দেরাজ হইতে দুই শত টাকার নোট বাহির করিয়া সীতারামের হস্তে দিয়া মৃদুস্বরে সংক্ষেপে বলিলেন, যা লাগে খরচ করো, আজ সন্ধ্যের আগে বাহারকে বেমালুম সরানো চাই। আমি এর ভেতরে আছি, তা কিছুতেই যেন প্রকাশ না পায়।

প্রত্যেক বারই চন্দ্রকান্ত এই জাতীয় ছোটখাটো কার্যে সীতারামের সহায়তা লন। ম্যানেজার, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতি সকলের নিকটই চন্দ্রকান্ত রায় গম্ভীর প্রকৃতির বুদ্ধিমান জমিদার। কিন্তু সীতারামের নিকট তিনি এখনও বালক মাত্র। শুধু তাই নয়, এই শ্যামকান্তি তীক্ষ্ণবুদ্ধি যুবকের মধ্যে সীতারাম নিজের আরাধ্য দেবতা নবদূর্বাদলশ্যাম রামজীকে যেন দেখিতে পাইত। তাই স্নেহ-ভক্তি-ভয়-মিশ্রিত আগ্রহে প্রভুর কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিত সে।

অর্থের লোভ দেখাইলে পঙ্গু গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে কি না জানি না, খঞ্জ চন্দন-গোয়ালা মাত্র একশত টাকার লোভে ছাপরা জেলায় চলিয়া যাইতে রাজী হইয়া গেল এবং ট্রেন ধরিবার জন্য দশ ক্রোশ দূরবর্তী রেলওয়ে স্টেশনের অভিমুখে অবিলম্বে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে লাগিল। রক্ষকবিহীন বাহার সীতারামের নিয়োজিত সাঁওতাল মজুর দ্বারা বিতাড়িত হইয়া উগ্রমোহনের জমিদারি ত্যাগ করিল।

কিছুক্ষণ পরে সীতারাম আসিয়া প্রভুকে নব্বুই টাকা ফেরত দিয়া কহিল যে, চন্দনদাস ছাপরা জেলায় চলিয়া গিয়াছে। একশত টাকা লইয়া সেখানে সে নিজের ক্ষেত-খামার করিবে। বাহার গাভীকে টালা নামক জঙ্গলে ছাড়িয়া দিয়া আসিবার জন্য দুইজন সাঁওতাল মজুরকে দশ টাকায় নিয়োগ করা হইয়াছে।

টালা নামক বনকরটি চন্দ্রকান্ত রায়ের জামদারর অন্তর্ভুক্ত। যম-জঙ্গলের মত ইহাও একাট নিবিড় ও দুর্গম বনভূমি।

সীতারাম চলিয়া যাওয়ার পর গোমস্তা রাধিকামোহন আসিয়া প্রণাম করিল। রাধিকামোহন পূর্বনির্দেশমত গোলোক সাহার নিকট টাকা আনিতে গিয়াছিল।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, টাকা পেয়েছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তহবিলে জমা করে দাও।

গোলোক বলছিল যে, পীরপুরের বাসাটা—

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হ্যাঁ, ওকে ছেড়ে দাও। আমার কাছে হুকুম নিয়েছে। বাসার চাবি দিয়ে দাও ওকে।

রাধিকামোহন চলিয়া গেলে পুলকিত চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ওরে ভজনা, তামাক দে, আর মিশিরজীকে একবার ডেকে দে তো।

মিশিরজী আসিলে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ওস্তাদজী, বাহার একটা শোনান তো।

খালি বাহার, না, বসন্ত-বাহার?

খালি বাহার।

ওস্তাদজী বাহার আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপ করিবার পূর্বে অবশ্য তিনি চন্দ্রকান্তকে বলিলেন যে, বাহারের সম্পূর্ণ জাতি, নি কোমল লাগে এবং ইহাই তাহার ঠাটের বিশেষত্ব। বিবাদী কিছু নাই, মা অর্থাৎ মধ্যম সম্বাদী।

চন্দ্রকান্ত যত্নসহকারে শিক্ষা করিলেন।

সব বনমে কৈসে শোহে ঋতুরাজ দিন আই,
মন্দ মন্দ পবন বহুত বহু বরণ হোয় সুমন।
কোয়েলা পাপিহাঁ বনমে, ধরত নেক নেক তান
ভ্রমর সব গুঞ্জরাত, কহন যা ত রহ লগন।

গানের সুরে সুরে বসন্তের বর্ণনা মূর্ত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিন এই গান লইয়াই চন্দ্রকান্ত রহিলেন। সন্ধ্যার পর উগ্রমোহন আসিলেই তাঁহাকে গানটা শুনাইয়া দিলেন এবং ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিলেন যে বাহার নাম্নী গাভী হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বাহার সুর একবার আয়ত্ত করিলে সহজে পলাইয়া যাইবে না। উগ্রমোহন এতটা বুঝিলেন কি না ভগবানই জানেন, কিন্তু তিনি বাড়ি গিয়া যাহা করিলেন, তাহাতে রাণী বহ্নি বিস্মিত হইয়া গেলেন।

।। সাত ।।

উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে যখন ফিরিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। চন্দ্রকান্তের বাহার আলাপ শুনিয়া অবধি তাঁহার সর্বশরীরে আগুন ছুটিতেছিল। দাবাখেলায় যদিও তিনি জিতিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্রোধ কিছুমাত্র কমে নাই। তাঁহার সাধের গাভীকে যে

চন্দ্রকান্তই চক্রান্ত করিয়া সরাইয়াছে, তাহাতে উগ্রমোহনের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বাহার গাভীকে অপহরণ করিয়া তাঁহাকে বাহার রাগের আলাপ শুনাইয়া দেওয়ার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ছিল, তাহা উগ্রমোহনের পক্ষে বরদাস্ত করা শক্ত। সুতরাং সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর তিনি যখন পালকি হইতে নামিয়া বৈঠকখানায় পদার্পণ করিলেন, তখন তাঁহার সমস্ত মন তিক্ত।

মৃন্ময় ঠাকুরের বাড়ি হইতে ফিরিবার সময় আকাশপটে চন্দ্রের পার্শ্বে স্বাতীকে দেখিয়া তাঁহার মনে যে কোমলতার সঞ্চার হইয়াছিল, যাহার ফলে তিনি চাবুক চালনা করিয়া অশ্বের গতিবেগ বাড়াইয়াছিলেন, চন্দ্রকান্তের সংস্পর্শে আসিয়া তাহা লোপ পাইয়াছে। দারুণ ক্রোধে তাঁহার সমস্ত অন্তর পুড়িয়া যাইতেছিল। চন্দ্রকান্ত এবং চন্দ্রকান্তের সম্পর্কে যে কেহ আছে, সকলকে আঘাত করিলে তবে যেন তিনি কতকটা শান্তি পাইবেন—মনের এই অবস্থা।

তিনি বাড়ি ফিরিতেই তাঁহার খাস-চাকর ব্রজ আসিয়া নিবেদন করিল যে, অন্দরমহল হইতে রাণীমা তাঁহার সম্বন্ধে বারংবার খোঁজ করিয়াছেন।

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া সোজা অন্দরমহলে চলিয়া গেলেন। গিয়া দেখিলেন, রাণী বহ্নিকুমারী তাঁহার প্রত্যাশায় বসিয়া এস্রাজ আলাপ করিতেছেন, সম্মুখে অগ্নি জ্বলিতেছে। এস্রাজ দেখিয়া উগ্রমোহনের সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তিনি কিছু বলিলেন না, শুধু ভ্রূকুটি করিলেন। বহ্নিকুমারী এস্রাজ সরাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, আজ 'ঋতু-সংহার'-এর কথা মনে হচ্ছিল, "প্রিয়জনরহিতানাং চিত্তসন্তাপহেতুঃ"। কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

উগ্রমোহন কোন উত্তর না দিয়া পাগড়িটা নামাইয়া রাখিলেন এবং বহ্নিকুমারীর সম্মুখে বসিলেন। এস্রাজটার দিকে বারংবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া বহ্নিকুমারী বলিলেন, একখানা দেশের গান বাজাচ্ছিলাম অনেক দিন পরে। শুনবে? গানটা হচ্ছে—

বৈরন, কোয়লিয়া কুহুক ঘরি ঘরি কুহুক—

বলিয়া তিনি বাজাইতে উদ্যত হইলে উগ্রমোহন বলিলেন, দেখি তোমার যন্তরটা।

এস্রাজটা বহ্নিকুমারী উগ্রমোহনের হাতে দিতেই উগ্রমোহন বিনা বাক্যব্যয়ে উঠিয়া গিয়া জানালা দিয়া সেটি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। তাহার পর সংক্ষেপে বলিলেন, আমি আজ নীচের ঘরে শোব।

বহ্নিকুমারী কিছু বলিলেন না; কিন্তু শুধু চাহিয়া রহিলেন— সেই নিষ্পলক ভাষাময় চাহনি।

উগ্রমোহন আবার কথা কহিলেন। বলিলেন, গান গায় পাখিতে, মানুষে নয়।

বহ্নিকুমারী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, তোমার গায়ে বেশ জোর আছে তো।

তাঁহার চক্ষু দুইটিতে বিদ্রূপের বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন।

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন।

উগ্রমোহন নীচে নামিয়া গেলেন, নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু শয়ন করিলেন না। শয়নকক্ষের দ্বার ভিতর হইতে অর্গলবদ্ধ করিয়া দিয়া তিনি পদচারণা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে এক চিন্তা—চন্দ্রকান্তকে সমুচিত একটা জবাব দিতে হইবে।

একা অন্ধকার রজনীতে নির্জন শয়নকক্ষে উগ্রমোহন সিংহ পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কত কথা মনে হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়া দেওয়া কি এতই শক্ত ব্যাপার? সেদিন চন্দ্রকান্ত উগ্রমোহনের একটা জলকর লুণ্ঠন করিয়াছে। চন্দ্রকান্ত কি মনে করে যে, উগ্রমোহন তাহা পারেন না? মাছগুলা আবার পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে! সেইদিনই উগ্রমোহনের ইচ্ছা হইয়াছিল যে চন্দ্রকান্তের সমস্ত জলকরগুলা নির্মমভাবে বিধ্বস্ত করেন; কিন্তু কেন জানি না, সে প্রবৃত্তি বেশিক্ষণ থাকে নাই। তাহার কারণ বোধ হয় রাত্রে লুকাইয়া লুঠ করা তিনি চৌর্যবৃত্তি মনে করিতেন। উগ্রমোহন সিংহ আর যা হউন, তস্কর নহেন। যদি কাহারও কোন জিনিস কাড়িয়া আনিতেই হয়, তাহা অন্ধকারে লুকাইয়া লইয়া আসাটা পুরুষোচিত নহে। যদি লইতেই হয়, দিবালোকে ছিনাইয়া লইতে হইবে, তাহাতে বরং খানিকটা বীরত্ব আছে। ইহাই তিনি চন্দ্রকান্তকে দেখাইয়া দিতেন; কিন্তু রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ব্যাপারে তাঁহাকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে, তিনি এদিকে আর মনোযোগ দিবার অবসর পান নাই। কিন্তু আজ এই বাহার-অপহরণের ব্যাপারটা—বিশেষ করিয়া বাহারের আলাপটা, তাঁহার গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছিল। ইহার একটা রীতিমত প্রতিবিধান না করিলে উগ্রমোহন সিংহ পাগল হইয়া যাইবেন।

কি করা যায়? উগ্রমোহন গভীরভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন। অধীরভাবে পায়চারি করিতেছেন। তেমন কোন মনোমত উপায় মনে আসিতেছে না। আস্তাবল হইতে চন্দ্রকান্তের ঘোড়াগুলি সরাইয়া দিবেন? প্রস্তাবটা মনে হইতেই উগ্রমোহনের সমস্ত অন্তর সঙ্কুচিত হইয়া গেল। ছি, ছি, ঘোড়া চুরি! চন্দ্রকান্ত গরু চুরি করিতে পারে, কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ ভিন্ন ধাতুতে গড়া।

পায়চারি করিতে করিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সহসা উগ্রমোহন দাঁড়াইয়া পড়িলেন। ঠিক তো, একথাটা এতক্ষণ মনে পড়ে নাই কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মুখস্থ টেবিলের ড্রয়ার খুলিয়া একগোছা চাবি বাহির করিলেন। আলোর নিকট লইয়া গিয়া সেই চাবির গোছা হইতে মরিচা-পড়া একটা চাবি বাছিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন। কিছুদূর যাইতেই একজন দীর্ঘকায় আসাসোঁটাধারী লোক আসিয়া উগ্রমোহনকে আভূমি প্রণত হইয়া অভিবাদন করিল। হাবেলির নৈশপ্রহরী। উগ্রমোহন তাহাকে লক্ষ্যের মধ্যে না আনিয়া সিধা অন্দরমহলের দেউড়ী পার হইয়া খাজাঞ্চিখানার দিকে অগ্রসর হইলেন। খাজাঞ্চিখানার তোরণেও একজন বন্দুকধারী পাহারা ছিল। এই অসময়ে প্রভুকে দেখিয়া সে সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন খাজাঞ্চিখানার দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। ভিতরে গাঢ় অন্ধকার। তিনি বাহিরে আসিয়া

প্রহরীকে একটা আলো আনিতে বলিলেন। আলো আসিলে উগ্রমোহন ভিতর হইতে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। বিস্মিত প্রহরী প্রভুর এই অদ্ভুত আচরণে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। ঘণ্টা-ঘরে ঢং করিয়া একটা বাজিল।

উগ্রমোহন ভিতরে গিয়া বড় লোহার সিন্দুকটা খুলিলেন। সিন্দুক খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা বড়-গোছের ক্যাশ-বাক্স বাহির করিয়া নিকটস্থ তক্তাপোশের উপর রাখিলেন। তারপরে ক্যাশ-বাক্স খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা ছোট রূপার বাক্স বাহির করিলেন। রূপার বাক্সটা খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ বাহির করিয়া উগ্রমোহন সিংহ সাগ্রহে তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন। গোলাপী রঙের একখানি কাগজ। পাঠ করিতে করিতে তাঁহার মন নিমেষের মধ্যে দশ বৎসর পার হইয়া অতীতে ফিরিয়া গেল। তখন চন্দ্রকান্ত ও উগ্রমোহনের সবে যৌবনউন্মেষ হইয়াছে, চিঠি পড়িতে পড়িতে উগ্রমোহন যেন রেশমকে দেখিতে পাইলেন। আজ উগ্রমোহন সিংহ রেশমকে ভুলিয়াছেন বটে, কিন্তু একদিন এই রেশমের স্বপ্ন উগ্রমোহনের সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া

পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া উগ্রমোহনের সমস্ত মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। পত্রখানি সযত্নে মেরজাইয়ের পকেটে রক্ষা করিয়া তিনি রূপার বাক্স ক্যাশ-বাক্সের মধ্যে এবং ক্যাশ-বাক্সটি লৌহসিন্দুকে পুনরায় রাখিয়া সিন্দুকটি বন্ধ করিয়া দিলেন এবং খাজাঞ্চিখানার দ্বারদেশে যথারীতি তালা লাগাইয়া আবার নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। অজানা ফুলের গন্ধ বহিয়া তীব্র শীতের বাতাস তখন অন্ধকারে কৃষ্ণচূড়ার শাখা-প্রশাখায় আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন শয়নকক্ষে ফিরিলেন বটে, কিন্তু ভিন্ন মূর্তিতে। তাঁহার প্রথম যৌবনের প্রিয়া রেশমও যেন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের সমস্ত স্বপ্ন ফিরিয়া আসিল। প্রথম যৌবনের বাসন্তী-কুঞ্জে আবার পিক কুহরিয়া উঠিল।

এই গভীর নিশীথে উগ্রমোহনের মানস-পটে ছায়াছবির মত কত কি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। কে বলে, অতীত মৃত? অতীত চিরঞ্জীব। অতীতের প্রাণরসের অমৃতধারা পান করিয়া নিত্যপরিবর্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর বর্তমান বাঁচিয়া আছে। পরিবর্তনের দাবি মিটাইতে গিয়া বর্তমান মুমূর্ষু। স্মৃতির সুধা পান করিয়া অতীত অমরত্ব লাভ করিয়াছে, তাহার মৃত্যু নাই।

উগ্রমোহন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। রেশম কি আজও বাঁচিয়া আছে? বর্তমানে রেশম বলিয়া হয়তো কেহ বাঁচিয়া নাই, কিন্তু অতীতের রেশম যে জীবন্ত! হাসিতে গেলে তাহার গালে যে টোল খাইয়া যাইত, সেটুকু পর্যন্ত এখনও বাঁচিয়া আছে? চলিয়া যাইবার দিন রেশম যে কাঁদিয়াছিল, তাহার সেই অশ্রুধারা এখনও তো শুকায় নাই। তাহার সাবলীল নৃত্যভঙ্গীর নূপুর-গুঞ্জন এখনও যে উগ্রমোহনের অন্তরলোকে গুঞ্জরিয়া ফিরিতেছে। সবিস্ময়ে উগ্রমোহন দেখিলেন, নানা বেশে, নানা রূপে, নানা ভঙ্গিতে রেশম বাঈজী তাঁহার অন্তরের প্রচ্ছন্ন-লোকে লুকাইয়া ছিল, সহসা যাদুমন্ত্রে বর্তমানের যবনিকা সরিয়া গেল, রেশম বাঈজি সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইল—মুখে সেই মৃদু হাসি, সর্বাঙ্গ ঘেরিয়া সেই সবুজ ওড়না, সুর্মা-মাখানো ডাগর চোখ দুটিতে সেই রহস্যাভাস, অঙ্গে অঙ্গে নৃত্যচটুল সেই লীলাভঙ্গি। মুগ্ধ উগ্রমোহন দেখিতে লাগিলেন। মনে পড়িল গভীর রাত্রে অশ্বারোহণে সেই উন্মুখ অভিসার। সূর্যোদয়ের পূর্বে সুগোপন প্রত্যাবর্তন।

কিন্তু রেশম থাকে নাই। ভালবাসিয়াছিল বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিল, উগ্রমোহনের সমস্ত কল্পনা ও স্বপ্ন ব্যর্থ করিয়া। বহুকাল পরে আজ আবার সে ফিরিয়াছে। উগ্রমোহন একদৃষ্টে গোলাপী কাগজটির দিকে চাহিয়া রহিলেন। একটা মৃদু হাস্য তাঁহার অধরে ফুটিয়া উঠিল। সচ্চরিত্র চন্দ্রকান্তের চরিত্র সৌরভে আজিও সকলে পুলকিত!

রেশম যেদিন চলিয়া যায়, সেদিন এই পত্রখানি উগ্রমোহনকে দিয়া গিয়াছিল। তাহার হাতের স্পর্শ এখনও যেন ইহাতে লাগিয়া আছে। রেশমের মিনতিভরা চোখ দুইটি মনে পড়িল।— ইহা লইয়া তোমরা দুইজনে ঝগড়া করিও না, আমার অনুরোধ।—বলিয়া সে এই পত্র উগ্রমোহনের হস্তে দিয়াছিল। উর্দুতে লেখা চন্দ্রকান্তের পত্র—প্রেমপত্র। একটি আতর-সুগন্ধি গোলাপী কাগজে কবিত্বময় ভাবে ও ভাষায় চন্দ্রকান্ত উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে রেশমকে প্রেম নিবেদন করিয়াছে। পত্রের মধ্যে একটি ফার্সী বয়েৎও রহিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত লিখিয়াছে—হে সুন্দরী, কাননে গোলাপ ফোটে, সে কি কেবল একটি ভ্রমরের জন্য? পূর্ণিমার অপরূপ জ্যোৎস্না কি একটি চকোরের জন্যই ভগবান সৃষ্টি করিয়াছিলেন? তাহা যদি হইত, তাহা হইলে বিরহী অলিগণের উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাসে গোলাপ শুকাইয়া যাইত, হতাশ চকোরদের বিরহের কৃষ্ণমেঘে চন্দ্রমা অবলুপ্ত হইত। যাহা অনবদ্য, যাহা অসাধারণ, তাহা সকলের জন্য। আমার অন্তর পরিপূর্ণ। পরিপূর্ণ অন্তরের সমস্তটা উজাড় করিয়া না দিলে তৃপ্তি পাইতেছি না। তুমি এস। তোমার জন্য উন্মুখ আগ্রহে বসিয়া আছি। সম্রাট শাহজাহানের রচিত একটি বয়েৎ মনে পড়িতেছে—

আগর বে-খবর-ম্ জুদ্ দর আয়ি, চে শাওয়াদ্?
মানন্দ্-এ-নষীম্ এ সহর আয়ি, চে শাওয়াদ্?
হর-চন্দ্ কে বু-এ-গুল্ জে গুল্ আয়েদ পেশ
আর গুল্ তু জে-বু পেশতর, আয়ি, চে শাওয়াদ্?

প্রভাত-সমীরণের মত তুমি কোন খবর না দিয়েই এস। ফুলের গন্ধ ফুলের আগে আগে যায় বটে, কিন্তু ফুলই যদি আগে আসে তাতে ক্ষতি কি?

বিদায়কালে রেশমের চক্ষে যে অশ্রুবিন্দু টলমল করিতেছিল, তাহা যেন উগ্রমোহন এখনও দেখিতে পাইতেছেন। চন্দ্রকান্তের পত্র পাইয়াই রেশম চলিয়া গিয়াছিল, আর সে ফিরিয়া আসে নাই। রেশমের বিরহে উগ্রমোহন দশ দিক অন্ধকার দেখিয়াছিলেন। এই চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সঙ্গে তখন কলহ করার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় নাই। তাহার পর দশ বৎসর ধরিয়া কালের প্রবাহ বহিয়া গিয়াছে, কত ঘূর্ণাবর্ত কত কি ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, উগ্রমোহন রেশমকে ভুলিয়াছেন।

চন্দ্রকান্তের এই পত্র এতদিন উগ্রমোহনের কাছেই সযত্নে রক্ষিত ছিল। আজ সহসা উগ্রমোহনের এই পত্রখানার কথা মনে পড়িয়াছে। ঠিক করিয়াছেন, পত্রখানাকে এইবার কাজে লাগাইবেন। পত্রখানা প্রকাশ করিয়া দিলে চন্দ্রকান্তের সম্মানের প্রভূত ক্ষতি উগ্রমোহন করিতে পারেন। কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ সিংহই, শৃগাল নহেন। তৎক্ষণাৎ উগ্রমোহন চিঠি লিখিতে বসিলেন। লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

তুমি একদা রেশমকে যে প্রণয়লিপি লিখিয়াছিলে, তাহা এতদিন আমার কাছেই ছিল। পুরাতন বাক্স খুলিয়া অদ্য তাহা বাহির করিলাম। দশ বৎসর পূর্বে ইহা লইয়া আমি ও রেশম বহু হাসাহাসি করিয়াছি। এখন আর ইহাতে হাসিবার কিছু নাই। তাহা ছাড়া, তোমার উচ্ছ্বাস তোমার বাক্সে থাকাই শোভন বিবেচনা করি।

উগ্রমোহন

সীলমোহর করিয়া পত্রটি নৈশ প্রহরীর হস্তে দিয়া আদেশ করিলেন, খুব ভোরেই চিঠিখানি চন্দ্রকান্তবাবুকে দিয়া আসা চাই।

তাহার পর উগ্রমোহন খানিকক্ষণ অন্যমনস্কভাবে সামনের বাগানে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। রেশমের কথা, রেশমের মুখ, রেশমের ভঙ্গিমা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। কত কথাই না মনে হইল! রেশমের খোঁজ পান নাই। কলিকাতার সেই এক মাস প্রবাসের কথা মনে করিয়া উগ্রমোহনের সর্বদেহ ঘৃণায় শিহরিয়া উঠিল। এলোমেলো নানা চিন্তা মনে আসিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ একাকী পদচারণা করিয়া যখন তিনি শুইতে যাইবেন, তখন সবিস্ময়ে দেখিলেন যে, তাঁহার সমস্ত মন জুড়িয়া বসিয়া আছে, রেশম নয়,—রাণী বহ্নিকুমারী। উজ্জ্বল চক্ষু দুইটিতে সহাস্য কৌতুক-দীপ্তি।

আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, চাঁদ অস্ত যাইতেছে, স্বাতী পাশটিতেই আছে।

পরদিন প্রভাতে ভৃত্য ব্রজলাল প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ করিতে আসিয়া দেখিল যে, উগ্রমোহন অঘোরে ঘুমাইতেছেন এবং তাঁহার শয্যাপার্শ্বে একটি ভাঙ্গা এস্রাজ রহিয়াছে।

সে আর ঘুম ভাঙাইতে সাহস করিল না।

।। আট ।।

বেলা প্রায় দশটার সময় উগ্রমোহন সিংহ বহির্বাটীতে আসিয়া বসিলেন। মন বেশ প্রসন্ন। দুইজন প্রজার খাজনা মাফ করিয়াছেন। আর একজন প্রজা তাহার করুণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া চলিয়াছে, তিনি সহানুভূতির সহিতই তাহা শুনিতেছেন। প্রজাটি বলিতেছিল যে, শীঘ্রই তাহার কন্যার বিবাহ হইবে, হাতে টাকা কম, কনেও যে খুব সুবিধাজনক হইয়াছে তাহা নয়। তাহা

ছাড়া সম্প্রতি বাজার এমন মন্দা পড়িয়া গিয়াছে যে, ষোল-আনা ফসল হইলেও কোনক্রমে গ্রাসাচ্ছাদন মাত্র চলিতে পারে। এ অবস্থায় হুজুর দয়া না করিলে উপায় নাই।

উগ্রমোহন সটকায় একটা মৃদু-গোছের টান দিয়া বলিলেন, কবে তোর মেয়ের বিয়ে?

আর দিন কই হুজুর?

আমাকে নেমন্তন্ন করবি না?

দরিদ্র প্রজা একটু থতমত খাইয়া গেল। 'না' বলিতেও তাহার সাহসে কুলায় না, অথচ উগ্রমোহন সিংহকে নিমন্ত্রণ করিয়া সে কি খাইতে দিবে, কোথায় বসিতে দিবে, তাহাও সে ভাবিয়া পাইল না। তথাপি সাহসে ভর করিয়া বলিল, গরিবের কুঁড়েঘরে হুজুরের পায়ের ধুলো যদি পড়ে, সে তো আমাদের চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। নিমন্ত্রণ নিশ্চয়ই করব। করব কেন, করলাম, যাবেন দয়া করে।

কবে তোর মেয়ের বিয়ে? কোন্ তারিখে?

তেইশে মাঘ।

তারিখটা শুনিয়াই তাঁহার রুম্‌নি-ঝুম্‌নির কথা স্মরণ হইল।

দেওয়ানজীকে ডাকিয়া বলিলেন, দেওয়ানজী, গঙ্গাগোবিন্দ বাড়িতে আছে কি না, একবার খবর নিন তো।

তাহার পর প্রজাটির দিকে চাহিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তোর খাজনা কিছু মাপ করে দিলাম। বকেয়া বাকি যা আছে, তা আর দিতে হবে না। হালের যা বাকি পড়েছে, তাই দিলেই ফারক পাবি। ওহে অক্ষয়!

অক্ষয় নামক গোমস্তাটি আসিয়া দাঁড়াইতেই উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন, এর মেয়ের বিয়ের দিন আধ মন দই আর আধ মন মাছ এর বাড়িতে পাঠিয়ে দিও। তার সঙ্গে এক জোড়া ভাল শাঁখা, রূপোর সিঁদুরকৌটো, ভাল একখানা শাড়ি, কিছু ধান আর দূর্বা পাঠাবাব ব্যবস্থা করে দিও। নানা কাজে আমি ভুলে যেতে পারি।

এমন সময় একজন সিপাহী আসিল—চন্দ্রকান্তের সিপাহী।

সেলাম করিয়া একখানি পত্র সে উগ্রমোহনের হাতে দিল।

পত্র খুলিয়া উগ্রমোহন পড়িলেন—

বন্ধু,

তোমার পত্র পাইয়া পরম সুখী হইলাম। তোমার যে এমন সূক্ষ্ম রসবোধ এখনও আছে, তাহা বুঝিতে পারিয়া সত্যই পুলকিত হইয়াছি। কিছুদিন পরে সেতারী মীর সাহেবের আসিবার কথা আছে। লক্ষ্ণৌ হইতে একজন ভাল নর্তকীও আনাইব মনস্থ করিয়াছি। পুরাতন প্রসঙ্গ আবার আলোচনা করিবে নাকি? ভাল কথা, সেবার কলিকাতায় গিয়া রক্তদুষ্টির জন্য চিকিৎসাদি করাইয়াছিলে বোধ হয়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, তাহার ব্যবস্থাপত্রগুলি কি করিয়া আমার বাক্সে স্থান পাইয়াছে। এগুলি তোমারই কাছে থাকা সঙ্গত মনে করিয়া এই সঙ্গে পাঠাইলাম।

পত্রখানি পাঠ করিবামাত্র উগ্রমোহনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। যদিও তিনি নিজেকে সামলাইয়া সহাস্যমুখে সিপাহীটিকে বলিলেন, আচ্ছা যাও, বাবুজীকো হামারা সেলাম কহনা। কিন্তু তিনি উঠিয়া পড়িলেন। আত্মসংবরণ করিয়া সেখানে বসিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি খাস-কামরার মধ্যে চলিয়া গেলেন।

ক্রোধে ক্ষোভে আবার তাঁহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল।

কলিকাতা-প্রবাসের কথা তাঁহার মনে পড়িল। যৌবনের উন্মাদনায়, রেশমের বিরহে, হয়তো বা—। নাঃ, এতদিন পরে কার্যকারণের পারম্পর্য ঠিকমত আলোচনা করিবার মত মানসিক অবস্থা তাঁহার ছিল না তাঁহার সমস্ত মন ব্যাপিয়া কলিকাতার একটা বীভৎস স্মৃতি পচা পাঁকের মত ভটভট করিতে লাগিল। তাহা কেবল পাঁকই, পঙ্কজ সেখানে নাই—দুঃসহ গ্লানিকর পাঁক। উন্মত্ত আবেগে উগ্রমোহন একদা সেই পঙ্কস্নান করিয়াছিলেন। তাহার ফলভোগও করিয়াছিলেন, অত্যন্ত মোটা রকম দক্ষিণা দিয়া প্রায়শ্চিত্তও তিনি করিয়া আসিয়াছেন। এতদিন সেজন্য তাহার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। দুর্দান্ত যৌবনের ক্ষুধিত কামনা মিটাইতে গিয়া তিনি যাহা করিয়াছিলেন, তাহাতে অপুরুষোচিত বা কাপুরুষোচিত কিছু ছিল না। প্রথমে যখন ঘোড়ায় চড়া শিখিতে যান, তখনও তো পড়িয়া গিয়া কতবার কত আঘাত পাইয়াছেন। শূকর শিকার করিতে গিয়া ভ্রমক্রমে একটা মানুষকেই তিনি একবার গুলি করিয়াছিলেন। তাঁহার কলিকাতা-প্রবাসের দুষ্কৃতিগুলিও অনুরূপ ঘটনা।

কিন্তু আজ সহসা এই ব্যবস্থাপত্রগুলি চন্দ্রকান্তের নিকট হইতে পাইয়া তাঁহার সর্বাঙ্গে জ্বালা ধরিল। তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র চন্দ্রকান্ত পাইল কি করিয়া? নিষ্ফল আক্রোশে উগ্রমোহন ফুলিতে লাগিলেন। এমন সময় গলার মৃদু আওয়াজ করিয়া কে যেন দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল মনে হইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

আজ্ঞে হুজুর, আমি। — বলিয়া একটি খর্বাকৃতি লোক দ্বারদেশে দেখা দিল এবং অতিশয় ভক্তিভরে প্রণাম করিল।

ও, মানিক মণ্ডল! কি খবর? এস, ভেতরে এস।

মানিক মণ্ডল লোকটিকে উগ্রমোহন একটু অনুগ্রহ করেন, তাহার কারণ মানিক মণ্ডল তাঁহার গুপ্তচর—ইংরেজীতে যাহাকে বলে, স্পাই। এ খবর অবশ্য বাহিরের লোকে জানে না।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন নতুন খবর আছে নাকি? মানিক মণ্ডলের সহিত যদি কোন পশুর সাদৃশ্য থাকে, তবে তাহা মূষিকের। ক্ষুদ্র সূচালো মুখ। নাকটি ছোট, কিন্তু তীক্ষ্ণ। চক্ষু দুইটিও অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং অত্যন্ত চঞ্চল। উগ্রমোহনের কথায় সে পীতাভ এক পাটি দাঁত বাহির করিয়া কহিল, নতুন খবরটা কি হুজুরের এখনও কর্ণগোচর হয়নি? আমি কদিন একটু অসুস্থ ছিলাম বলে—

অধীরভাবে উগ্রমোহন বলিলেন, ভণিতা রাখ। খবরটা কি, তাই সোজা করে বল।

গোলোক সা চন্দ্রকান্তবাবুর জমিদারিতে উঠে গিয়ে বাস করছে।

তাই নাকি? চন্দ্রকান্তকে টাকা ধার দিয়েছে, জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ, জানি বইকি। রাধিকামোহন এসে টাকা নিয়ে গেছে, সে খবরও আমি পেয়েছি।

গোলোক সা কোথায় আছে এখন?

পীরপুরে। চন্দ্রকান্তবাবুরই একটা বাসা ছিল—

রাখালবাবু!—উগ্রমোহন গর্জন করিয়া উঠিলেন।

গতিক খারাপ দেখিয়া মানিক মণ্ডল কথা অর্ধসমাপ্ত রাখিয়াই ত্বরিতপদে বাহিরে চলিয়া গেল। রাখালবাবু আসিতেই উগ্রমোহন বলিলেন, যম-জঙ্গলে এখন কত সিপাহী মোতায়েন আছে?

পঞ্চাশজন।

এখানে এখন কতজন আছে?

এখানেও জনা-পঞ্চাশেক হবে।

দুধনাথ পাঁড়েকে ডেকে দিন।

রাখালবাবু চলিয়া গেলেন। উগ্রমোহন চক্ষু বুজিয়া খানিকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। দুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন হুকুম দিলেন, কাল সকালে বিশ-পঁচিশজন সিপাহী নিয়ে চন্দ্রকান্তবাবুর জলকর বাঘাড় বিল লুঠ করা চাই। খুন-জখম যা হয় কুছ-পরোয়া নেই। গায়ে পড়ে ঝগড়া করে ফৌজদারী দাঙ্গা-হাঙ্গামা করবে। মোট কথা, বাঘাড় বিলে কাল রক্তের স্রোত বয়ে যাওয়া চাই।

যো হুকুম।—বলিয়া দুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেল। দুধনাথ পাঁড়ের একখানি হাত নাই। জমিদারী ব্যাপারে কিছুদিন পূর্বে চন্দ্রকান্ত রায়ের সহিত উগ্রমোহনের ভীষণ দাঙ্গা হয়। সেই দাঙ্গায় দুধনাথ পাঁড়ের দক্ষিণ হস্তটি কাটা যায়, এবং সেই দাঙ্গাতেই স্বয়ং উগ্রমোহন একটি দাঁতাল হাতীর দাঁতে বড় বড় দুইটি বাঁশ বাঁধিয়া ডাঙশ মারিতে মারিতে সেই বিপুলকায় হস্তীকে চন্দ্রকান্তের বাহিনীর বিরুদ্ধে চালিত করিয়া যুদ্ধজয় করেন। দুধনাথ পাঁড়ে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন তাঁহার অশ্ব প্রস্তুত করিতে হুকুম দিয়া অন্দর-মহলের দিকে চলিয়া গেলেন।

।। নয় ।।

আদার ব্যাপারীর পক্ষে জাহাজের খবর রাখাটা যতদূর হাস্যকর, জাহাজের ব্যাপারীর পক্ষে আদার খবর রাখাটা ততদূর নহে। কাহারও কাহারও নিকট ইহাই হয়তো বিস্ময়ের বস্তু। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ লইয়া যাঁহার কারবার, আদা-জাতীয় সামান্য দ্রব্য সম্বন্ধে তাঁহার প্রগাঢ় জ্ঞানের পরিচয় পাইলে আমরা স্বভাবতই তাঁহার প্রতিভার সর্বতোমুখী প্রসার দেখিয়া মুগ্ধ এবং বিস্মিত হই।

চালভাজা খাওয়াটা এমন কোন বিশেষত্বের পরিচায়ক নহে; কিন্তু যখনই আমরা শুনি, অমুক মহারাজাধিরাজ চালভাজা খাইতে ভালবাসেন কিংবা আমেরিকার অমুক কোটিপতি সুন্দররূপে জুতা বুরুশ করিতে পারেন, অমনই চমৎকৃত হইয়া যাই।

সুতরাং জমিদার উগ্রমোহন সিংহের প্রকাণ্ড জমিদারির সুদক্ষ ম্যানেজার অঘোরবাবুকে রুম্‌নি-ঝুম্‌নির সহিত ছেলেমানুষের মত লুকোচুরি খেলিতে দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইতে পারেন।

অঘোরবাবুর শিশুমনস্তত্ত্বে যে এতখানি পারদর্শিতা ছিল, তাহা বোধ করি তিনি নিজেও জানিতেন না। কিন্তু 'ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে' নীতির অনুসরণ করিয়া তিনি শিশুমনোরঞ্জনে নিজেকে একান্তভাবে নিয়োগ করিয়াছেন এবং আবিষ্কার করিয়াছেন যে, জটিল মকদ্দমায় জয়লাভ করিতে হইলে যে ধরনের বুদ্ধিকৌশল প্রয়োজন, শিশুহৃদয় জয় করিতে হইলে সে সবের প্রয়োজন হয় না বটে; কিন্তু ইহাতেও কৌশলের প্রয়োজন আছে, যদিও তাহা বিভিন্ন জাতীয়। সুতরাং লুকোচুরি, কানামাছি প্রভৃতি খেলার আশ্রয় লইতে হইয়াছে এবং ইহাতে তিনি কৃতকার্যও হইয়াছেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অঘোরবাবুকে লইয়া সমস্ত দিন হৈ-চৈ করিতেছে।

অঘোরবাবু আয়োজনের কোনও ত্রুটি করেন নাই। সম্মুখস্থ তিনটি বড় বড় বৃক্ষে তিনটি দোলনা টাঙানো হইয়াছে। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি এবং অঘোরবাবু তিনজনে পাল্লা দিয়া তাহাতে দোল খাইয়া থাকেন। কোথা হইতে একটি বাঁদরছানাও তিনি যোগাড় করিয়াছেন, নিমগাছটার শিকড়ের সঙ্গে শিকল দিয়া বাঁধা আছে। এই জীবটির নানাবিধ মুখভঙ্গী রুম্‌নি-ঝুম্‌নির পক্ষে পরম কৌতুকের বস্তু হইয়া উঠিয়াছে। খরগোশটি তো আছেই। তাহার জন্য নূতন একটি খাঁচাও নির্মিত হইয়াছে। দুই জোড়া পারাবতও জুটিয়াছে। তাহাদের বক্‌বকম্ ধ্বনিতে কাছারি-বাড়ির প্রাঙ্গণ মুখরিত।

অঘোরবাবু লোকটিকে দেখিলে মনে হয় না যে, তাঁহার মধ্যে এতটা তরল মনোবৃত্তি প্রচ্ছন্ন ছিল। ভদ্রলোকের গায়ের বর্ণ ঘোর কালো। মুখখানা লম্বা-গোছের, হঠাৎ দেখিলে মনে হয়, পাথরের তৈয়ারি। অভিব্যক্তিবিহীন মুখের উপর মনের কোন ছাপ নাই। এক জোড়া ঝোলা তামাটে রঙের গোঁফ থাকাতে আপাতদৃষ্টিতে তাঁহাকে আরও ভয়ঙ্কর এবং বেরসিক বলিয়া বোধ হয়। অঘোরবাবু একজন তান্ত্রিক কালী-সাধক। এখনও মধ্যে মধ্যে চামাপ্রান্তরস্থিত মহাকালীর মন্দিরে গিয়া অমাবস্যায় তিনি কালীপূজা করেন। কিন্তু তিনি যে এমন নিখুঁতভাবে মোরগের ডাক ডাকিতে পারেন, তাহা এতকাল কেহ জানিত না। শুধু মোরগ কেন, মুখে চাদর ঢাকা দিয়া বিড়াল ও কুকুরের ঝগড়া তিনি এমন সুন্দরভাবে দেখাইতে পারেন যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিস্ময় সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

কিন্তু এত সত্ত্বেও রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অঘোরবাবুকে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতেছে, বাবার কাছে কবে ফিরে যাব, বল না। স্তোকবাক্যে অঘোরবাবু অপটু নহেন, সুতরাং দিন মন্দ কাটিতেছিল না। এত অজস্র আমোদপ্রমোদ রুম্‌নি-ঝুম্‌নির জীবনে এই প্রথম।

সেদিন প্রাতঃকালে কুমীর-কুমীর খেলা হইতেছিল। অঘোরবাবু প্রাঙ্গণের মাঝখানে হামাগুড়ি দিয়া কুম্ভীর সাজিয়া বসিয়া ছিলেন। চক্ষু দুইটি অর্ধমুদিত। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থিত একটি উচ্চ চৌতারাকে ডাঙা কল্পনা করিয়া তদুপরি দাঁড়াইয়া ছিল এবং সুযোগমত কুম্ভীর-রূপী অঘোরবাবুকে খোঁচা দিয়া ছুটিয়া পলাইতেছিল। অঘোরবাবুও তাহাদের ধরিতে না পারার ভান করিয়া ছদ্ম-ক্রোধে হাউ-মাউ করিয়া গর্জাইতেছিলেন, এবং তাহা দেখিয়া রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কলহাস্যে লুটাইয়া পড়িতেছিল। খেলা বেশ জমিয়াছে, এমন সময় ভিখন তেওয়ারী আসিয়া সংবাদ দিল যে, খরগোশটি পলাইয়াছে, খাঁচার দরজা খোলা ছিল।

অকস্মাৎ এই মর্মান্তিক সংবাদ শ্রবণে সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। অঘোরবাবু এমন একটা মুখভাব করিলেন, যেন জমিদারির একটা মৌজা বেদখল হইয়া গিয়াছে। তিনজনেই ঘটনাস্থলে অবিলম্বে গেলেন এবং আশেপাশে খুঁজিয়া দেখিতে লাগিলেন।

রুম্‌নি হঠাৎ বলিয়া উঠিল, এই যে, এই বাক্সটার পেছনে রয়েছে। ওই যা, আবার পালাল!

খরগোশ ঘর ছাড়িয়া প্রাঙ্গণে নামিয়া সোজা ছুট দিল। অঘোরবাবু, ভিখন তেওয়ারী, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি সকলেই দৌড়িয়া একটা ঝোপের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ভিখন তেওয়ারী অভিমত প্রকাশ করিল যে, উহাকে খুঁজিয়া পাওয়া এখন মনুষ্যের সাধ্যাতীত, সুতরাং সে চেষ্টা করা বৃথা। মংলু মাঝিকে খবর দিয়া সে মালকাইনদের জন্য আবার খর্‌হা সংগ্রহ করিয়া দিবে। এ জঙ্গলে খরগোশের অভাব নাই। অঘোরবাবুর দিকে ফিরিয়া সে অনুমতি ভিক্ষা করিল যে, হুজুর যদি হুকুম দেন, তাহা হইলে সে এখন ভান্‌সা-ঘরে অর্থাৎ রান্নাঘরে ফিরিয়া যায়, কারণ সে অধন্ অর্থাৎ ভাতের জল চড়াইয়া আসিয়াছে। অঘোরবাবু অনুমতি দিলেন। ভিখন তেওয়ারী চলিয়া গেলে রুম্‌নি বলিল, ও যাকগে। আমরা আর একটু খুঁজে দেখি চল।

ঝুম্‌নি তৎক্ষণাৎ তাহা সমর্থন করিয়া বলিল, ও নিশ্চয়ই এইখানে কোথাও আছে, অতটুকু বাচ্চা খরগোশ কি আর বেশিদূর দৌড়তে পারবে? নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে পড়ে কাছাকাছি কোন ঝোপেঝাপে লুকিয়ে আছে।

অঘোরবাবু প্রতিবাদ করিলেন না। কহিলেন, যা বলেছ দিদিমণি, আর একটু খুঁজেই দেখা যাক। কুম্ভীর সাজিয়া হামাগুড়ি দিয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা এ কার্য অধিক মনোরম বলিয়া বোধ হইল। সুতরাং তাঁহারা ইতস্তত ভ্রমণ করিতে করিতে নিবিড়তর জঙ্গলে প্রবেশ করিলেন। নিবিড় জঙ্গল মনুষ্য-বিরল হইলেও শব্দ-বিরল নহে। বনের নিজস্ব একটা ধ্বনি আছে। তাহা ছাড়া নানাবিধ পাখির ডাক। ঘুগ্-ঘুগ্-ঘুগ্—অজ্ঞাতনামা এক পাখি অবিশ্রান্ত ডাকিয়া চলিয়াছে। তাহার সঙ্গে তাল রাখিয়া আর একটি অজানা পাখি ভিন্ন গ্রামে ডাকিতেছিল, ক্রেকট্-ক্রেকট্-ক্রেকট্। বনের মধ্য হইতে সামান্য একটু ফাঁকা জায়গায় আসিতেই তাহারা দেখিল যে, চকিতে এক পক্ষী-দম্পতি দ্রুতধাবনে নিকটস্থ একটা ঝোপে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অঘোরবাবু বলিলেন, এক জোড়া তিতির

সহসা ঝুম্‌নি বলিয়া উঠিল, দেখ দেখ, কেমন সুন্দর ফুল!

রুম্‌নিও মুগ্ধকণ্ঠে কহিল, চমৎকার! কিসের ফুল ওগুলো?

অঘোরবাবু বলিলেন, ও একটা পরগাছার ফুল।

প্রকাণ্ড একটা বৃদ্ধ বৃক্ষের উপর একটা দুঃসাহসিনী পরগাছা-লতা উঠিয়া স্তবকে স্তবকে সুন্দর ফুল ফুটাইয়া হাসিতেছে, যেন বৃদ্ধ ঠাকুরদাদার কাঁধে চাপিয়া অলঙ্কৃতা নাতনী আবদার জুড়িয়া দিয়াছে।

ওখানে একটা সাদা রঙের কি?

বস্তুত একটা সাদা চুনকাম-করা ঘরের দেওয়ালের খানিকটা অংশ দেখা যাইতেছিল। রুম্‌নি জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি দাদু?

ওটা যম-ঘর।—বলিয়াই অঘোরবাবু বলিলেন, ও এমনই একটা ঘর, বনের মধ্যে করা আছে, ও এমন কিছুই নয়। চল এবার ফেরা যাক।

রুম্‌নি বলিল, চল না, ওটা দেখে আসি।

ঝুম্‌নি বলিল, হাঁ চল।

অঘোরবাবু মনে মনে প্রমাদ গণিলেন। কিন্তু মুখে বলিলেন, চল। ওতে দেখবার কি আছে? তার চেয়ে চল, গিয়ে এখন কুমীর-কুমীর খেলিগে।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কিন্তু ছাড়িল না। ঘর তাহাদের দেখাইতেই হইল। সত্যই ঘরটিতে দেখিবার বিশেষ কিছু ছিল না। ঘরের বিশেষত্ব শুধু এই যে, তাহার চারিদিকেই পাকা দেওয়াল দিয়া ঘেরা, খুব উঁচু দেওয়াল এবং ঘরের যে একটি দ্বার আছে তাহাও লৌহের এবং তালা-বন্ধ। জানালা একটিও নাই।

রুম্‌নি বলিল, এটাতে কি হয়?

কিছু নয়, তোমার দাদুর অমনি শখ হয়েছিল।

অঘোরবাবু এই ঘন জঙ্গলে অবস্থিত ঘরটির ইতিহাস গোপন রাখিলেন। স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ, অঘোরবাবু এবং ভিখন তেওয়ারী ছাড়া যম-ঘরের প্রকৃত পরিচয় কেহ জানিত না। জমিদারির অন্যান্য কর্মচারীগণ মনে করিত, উহাতে বাবুর শিকারের আসবাবপত্রাদি বন্ধ থাকে।

তাহারা তিনজনে ফিরিতেছিল, এমন সময় ভিখন তেওয়ারী আসিয়া খবর দিল যে, মৃন্ময় ঠাকুর আসিয়াছেন এবং অঘোরবাবুর মোলাকাৎ ভিক্ষা করিতেছেন।

।। দশ ।।

অঘোরবাবু আসিয়া মৃন্ময় ঠাকুরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। এতকাল অবশ্য মৃন্ময় ঠাকুরই অঘোরবাবুকে নমস্কার করিয়া আসিয়াছেন। কারণ অঘোরবাবু জমিদারের মহামান্য ম্যানেজার এবং মৃন্ময় ঠাকুর সামান্য একজন প্রজা মাত্র। চাকা কিন্তু ঘুরিয়া গিয়াছে।

উগ্রমোহনবাবুর নাতনীদ্বয়ের সঙ্গে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের বিবাহ হইবে, সুতরাং মৃন্ময় ঠাকুরকে এখন সামান্য প্রজারূপে গণ্য করা চলিবে না। অঘোরবাবু তাহা বুঝিতেন এবং বুঝিয়াই শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করিলেন। ইহার উত্তরে মৃন্ময় ঠাকুর কিন্তু যাহা করিলেন, তাহা এতই অপ্রত্যাশিত যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল। মৃন্ময় ঠাকুর অঘোরবাবুর পাদদেশে দড়াম করিয়া পড়িয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

অঘোরবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে ভিতরে যাইতে বলিয়া শশব্যস্তে মৃন্ময় ঠাকুরকে দুই হাত ধরিয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, ছি, ছি, এ কি করলেন আপনি!

বাঁচান আমাকে ম্যানেজারবাবু, আর তো বেশিদিন বাকি নেই। কোন উপায় আর ভেবে পাচ্ছি না।

কিসের উপায়?

বাঁচবার। এ বিয়ে আমি দিতে চাই না অঘোরবাবু। আপনি কোন উপায় করে এ থেকে উদ্ধার করুন আমাকে।

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া মৃন্ময় ঠাকুর আশা বা নিরাশা কিছুরই আভাস পাইলেন না।

অঘোরবাবু কেবল বলিলেন, মালিকের যখন এই অভিপ্রায়, তখন আমি আর কি করতে পারি? এস্টেটের যদি কোন ব্যাপার হত, আমি কিছু হয়তো করতে পারতাম। কিন্তু এসব বিবাহ-ব্যাপারে আমার কোনও কথা চলবে না। আপনার আপত্তিটা কি?

মৃন্ময় ঠাকুর মাথা চুলকাইতে লাগিলেন। তাঁহার বিস্ফারিত ও অবিস্ফারিত উভয় চক্ষেই সংশয়াকুল দৃষ্টি দেখিয়া অঘোরবাবু আবার বলিলেন, অবশ্য যদি আমাকে বলতে বাধা থাকে, শুনতে চাই না আমি; কিন্তু উগ্রমোহনবাবুর সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপন করা কোনও দিক থেকেই তো অবাঞ্ছনীয় মনে করি না।

মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের বংশপরিচয় সব জানেন আপনি? গঙ্গাগোবিন্দ নিজে অবশ্য লোক ভাল, পণ্ডিত সজ্জন লোক; কিন্তু গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ নাকি সমাজে পতিত হয়েছিলেন, তাঁর দুশ্চরিত্রা এক বিধবা মেয়েকে ঘরে স্থান দিয়েছিলেন বলে।

অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডল কঠিনতর হইল। তিনি সংক্ষেপে বলিলেন, আসল কথাটা কি বলুন? কোথা থেকে এসব গুজব আপনার কানে এল? গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহনবাবুর ভাগ্নীজামাই, তা জানেন?

মৃন্ময় ঠাকুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অসহায়ভাবে অঘোরবাবুর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইয়া রহিল।

অঘোরবাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথা থেকে এসব বাজে কথা শুনলেন আপনি?

একটা ঢোক গিলিয়া মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, কথাটা বলবেন না যেন উগ্রমোহনবাবুকে। পৃথ্বীশপুরের কালীপদ পুরোহিত আমাকে বলছিলেন। তিনি এদিককার একটা প্রাচীন লোক। তাঁর কথা সহজে অবিশ্বাস করা—

মৃন্ময় ঠাকুর কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

অঘোরবাবু মৃন্ময় ঠাকুরকে বলিলেন, আপনি বসুন ওখানে। ভিখন তেওয়ারী!

ভিখন তেওয়ারী আসিতেই তিনি হুকুম দিলেন, চারিজন সিপাহী এখনই পৃথ্বীশপুরে পাঠাইয়া কালীপদ পুরোহিতকে ডাকাইয়া আনিবার বন্দোবস্ত কর।

ব্যাপারটা যে এতদূর চট করিয়া গড়াইয়া যাইবে, মৃন্ময় ঠাকুর তাহা ভাবেন নাই। তিনি তাড়াতাড়ি অঘোরবাবুর হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন, আহা, পুরোহিত মশাইকে আবার কেন কষ্ট দেবেন এত বেলায়? আমার কথাটা শুনুন শেষ পর্যন্ত।

নিষ্পলক এক জোড়া চক্ষু মৃন্ময়ের মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ধীরকণ্ঠে অঘোরবাবু বলিলেন, আপনি বিষধর সাপ নিয়ে খেলা করছেন। বুঝে-সুঝে করবেন।

মৃন্ময় ঠাকুর এইবার তাঁহার শেষ চালটি চালিলেন অর্থাৎ পকেট হইতে একখানি একশত টাকার নোট বাহির করিয়া অঘোরবাবুর হাতে দিতে গেলেন।

বিস্মিত অঘোরবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, এর মানে কি?

মিনতি করিয়া মৃন্ময় ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, অতি দরিদ্র আমি। এর বেশি আর আমার সামর্থ্য নেই। দয়া করে ভেঙে দিন বিয়েটা। আপনি ইচ্ছে করলে সবই পারেন। উগ্রমোহনবাবু আপনার পরামর্শ কখনও অগ্রাহ্য করেন না।

কথাটা ঠিক। কিন্তু ইহাও ঠিক যে, অঘোর চক্রবর্তী উগ্রমোহন সিংহের সুযোগ্য ম্যানেজার। উগ্রমোহনের আত্মসম্মানলাঘবকারী কোন পরামর্শ আজ পর্যন্ত তিনি তাঁহাকে দেন নাই। মৃন্ময় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, আপনি আমাকে যে অপমান করলেন, এখনই তার উপযুক্ত জবাবদিহি আপনাকে সর্বাঙ্গ দিয়ে করতে হত। কিন্তু আপনি রুম্নি-ঝুম্নির শ্বশুর হবেন, আপনার শারীরিক অপমান আমি করব না। আপনি স্থির হয়ে বলুন দেখি, কি আপত্তি আপনার? সত্যই কি গঙ্গাগোবিন্দের পিতামহ সম্বন্ধে ও-কথা শুনেছিলেন আপনি?

মৃন্ময় ঠাকুর বলিলেন, হ্যাঁ, শুনেছিলাম বইকি। কালীপদ পুরোহিতের কাছেই শুনেছিলাম। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, আমার আসল আপত্তি তা নয়। আসল আপত্তিটা হচ্ছে গিয়ে যে, আমার ছেলেদের আমি অন্যত্র সম্বন্ধ করেছি, তারা হাজার পাঁচেক টাকা দেবে, গয়নাপত্তর দেবে, তাছাড়া দুশো বিঘে জমি লিখে দেবে বলেছে।

অঘোরবাবু শুনিয়া নীরব হইয়া রহিলেন, তাঁহার পাথরের মত মুখ পাথরের মত হইয়া রহিল, কোনরূপ ভাবান্তর ঘটিল না। তিনি দক্ষিণ করতল দিয়া কেবল তাঁহার তামাটে গোঁফ জোড়া অকারণে গুছাইতে লাগিলেন। তাঁহাকে এরূপভাবে নীরব থাকিতে দেখিয়া মৃন্ময় ঠাকুর মনে করিলেন, অঘোরবাবু বুঝি বা তাঁহার যুক্তির সারবত্তা উপলব্ধি করিয়াছেন। বিস্ফারিত চক্ষুটিতে আরও একটু মিনতির ভাব ফুটাইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, আপনি বুদ্ধিমান লোক। আমাদের গরিবের সুখ-দুঃখ বুঝবেন আপনি। উগ্রমোহনবাবুর কাছে মুখ ফুটে কিছু চাইতে পারব না তো আমি। তিনি যা দেবেন আমাকে মাথা পেতে নিতে হবে। অথচ কমলাক্ষবাবু—

কমলাক্ষ? কোন্ কমলাক্ষ? চন্দ্রকান্ত[illegible]?

তিনটি প্রশ্ন যেন তিনটি গুলির মত অঘোরবাবুর মুখ হইতে বাহির হইল। অন্যমনস্কতার জন্য অসাবধানে কমলাক্ষবাবুর নামটা মৃন্ময় ঠাকুরের মুখ দিয়া ফসকাইয়া বাহির হইয়া পড়াতে তিনি একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন এবং সামলাইবার জন্য বলিলেন, না না, এ অন্য কমলাক্ষ। অর্থাৎ—

অঘোরবাবু ব্যাপারটা আগাগোড়া বুঝিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু বাহিরে তিনি মাত্র বলিলেন, ও। এবং তাহার পর সস্মিতমুখে মৃন্ময় ঠাকুরের দিকে চাহিয়া আবার বলিলেন, এটা অবশ্য আপনি ওয়াজিব কথাই বলেছেন। মালিকের সঙ্গে দেখা হলে আমি এ প্রসঙ্গ উত্থাপন করব। আমার বিশ্বাস টাকার জন্যে আটকাবে না। টাকার জন্যে উগ্রমোহনবাবু কখনও পিছপাও হয়েছেন জানেন?

মৃন্ময় ঠাকুর সভয়ে বলিলেন, না না, অমন কাজও আপনি করবেন না। তাঁর কাছে মরে গেলেও আমি পণের কথা বলতে দেব না আপনাকে। উগ্রমোহনবাবু হলেন জমিদার, পিতৃতুল্য, তাঁর সঙ্গে কি আর পণ নিয়ে দর-কষাকষি করা সাজে আমার? আপনি বরং বাবুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে মতটা পালটে ফেলুন। বড়লোকের খেয়াল বই তো নয়, খড়ের আগুন, হু-হু করে জ্বলে ওঠে, আবার তখনই নিবে যায়। বুঝলেন? মানে, আপনি যদি মত দেন, তা হলে আমি সেই মেয়ে দুটিকে আজই সন্ধ্যের সময় আশীর্বাদ করি। সেই রকমই কথা আছে কিনা, অর্থাৎ—

অঘোরবাবু কেবল বলিলেন, আসুন আমার সঙ্গে।

উভয়ে উঠিয়া গেলেন। কাছারি-বাড়ির পিছন দিকে গিয়া অঘোরবাবু একটি ঘরের তালা উন্মোচন করিতে লাগিলেন।

মৃন্ময় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, এ ধারে এলেন যে?

অঘোরবাবু একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, গোপনীয় পরামর্শ সব অমন খোলা জায়গায় বসে করা ঠিক নয়। ভেতরে আসুন।

মৃন্ময় ঠাকুর ভিতরে গেলেন। ঘরের ভিতরটায় কেমন যেন একটা সোঁদা-সোঁদা গন্ধ—অনেকদিন অব্যবহৃত মাটির ঘরে সাধারণতঃ যেমন হয়। অঘোরবাবু বলিলেন, আপনি একটু বসুন। আসছি আমি।—বলিয়া তিনি বাহিরে আসিয়া চট করিয়া শিকলটা লাগাইয়া দিয়া তালা দিতে দিতে বলিলেন, চুপ করে বসে থাকুন। চেঁচাবেন না। মালিক না আসা পর্যন্ত একটু কষ্ট করতে হবে।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরের বিস্ফারিত চক্ষুটি অন্ধকারে আরও বিস্ফারিত হইয়া গেল।

।। এগারো ।।

অঘোরবাবু ফিরিয়া আসিতেই রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আসিয়া তাঁহাকে ধরিল, ও কে এসেছিল? সেদিন আমাদের আশীর্বাদ করে গেল ওই লোকটা, না দাদু, ও কে?

অঘোরবাবু সংক্ষেপে বলিলেন, ও শ্বশুর।

খরগোশ, পারাবত প্রভৃতির মত শ্বশুরও ঠিক সমজাতীয় একটি পোষ্য জীব কি না—ইহা বোধ হয় তাহারা ভাবিতেছিল, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শব্দে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইয় উঠিল এবং ঘর্মাক্তকলেবর ফেনায়িতমুখ একটি অশ্বোপরি উগ্রমোহন সিংহ প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আনন্দে কলরব করিয়া উঠিল। অঘোরবাবু প্রণাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সঙ্গে যে সহিস আসিয়াছিল, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, খেলনা, বাঁশী এসব কোথা রেখেছিস, বার কর। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন, কই তোদের চোখ তো ফোলা দেখছি না!

চোখ ফুলবে কেন শুধু শুধু?—বলিয়া তাহারা হাসিয়া ফেলিল। উগ্রমোহনবাবু বিরস-বদনে তাহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, আমি কত আশা করে আসছি যে, গিয়ে দেখব, আমার বিরহে কেঁদে কেঁদে তোদের চোখ ফুলে গেছে, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস পড়ছে—

ভারি বয়ে গেছে আমাদের। নিজে তো বেশ আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে পালিয়ে গেলেন সেদিন রাত্তিরে।

সহিস কয়েকটি সুদৃশ্য পুতুল, দুইটি বাঁশী প্রভৃতি আনিয়া রাখিতেই রুম্‌নি-ঝুম্‌নি তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িল, এবং সেই সুযোগে অঘোরবাবু উগ্রমোহনের নিকট নিম্নস্বরে কহিলেন, গোপনীয় কিছু নিবেদন করবার আছে আমার।

কি ব্যাপার?—বলিয়া পিছনের বারান্দার দিকে উগ্রমোহন ও অঘোরবাবু অগ্রসর হইয়া গেলেন।

সমস্ত কথা আনুপূর্বিক শুনিয়া উগ্রমোহন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া গেল এবং বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে তিনি ম্যানেজরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কার হুকুমে তুমি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির ভাবী শ্বশুরকে এত বড় অপমান করবার সাহস করলে?

মৃতা কমলার বৈবাহিকের এই দুর্দশায় তাঁহার নিজেরই যেন আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতেছিল। অঘোরবাবু যেন এইরূপ একটা প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিলেন। তিনি উগ্রমোহনকে চিনিতেন। তাই মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, আমার অপরাধ হয়েছে, তা স্বীকার করছি। কিন্তু ওঁকে অপমান আমি করিনি। ওঁকে আটকে রাখতে বাধ্য হয়েছি এইজন্যে যে, তা না হলে আজই সন্ধ্যায় উনি কমলাক্ষের নির্বাচিত দুটি পাত্রীকে আশীর্বাদ করে আসতেন। হুজুরই আমাকে হুকুম দিয়ে গিয়েছিলেন যে, মৃন্ময় ঠাকুর যদি আসেন, তা হলে তাঁর ব্যবহার অনুযায়ী যথোচিত ব্যবহার যেন আমি করি। আপনি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতা আমাকে দিয়েছিলেন বলেই—

উগ্রমোহনের যদিও সত্যই কিছু বলিবার ছিল না, তথাপি তিনি তিক্তকণ্ঠে বলিলেন, হ্যাঁ, যথোচিত ব্যবহারই করেছ দেখছি। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের স্পর্ধায় এবং তাহাতে চন্দ্রকান্তের গন্ধ পাইয়া উগ্রমোহন যেন ক্ষেপিয়া গেলেন। বিস্ফারিতচক্ষু ওই ব্রাহ্মণটাকে আছড়াইয়া মারিয়া ফেলিলে যেন তিনি শান্ত হন।

অঘোরবাবুকে বলিলেন, এতই করেছ যখন, তখন বাকিটুকুও সেরে ফেল। ওই শালগাছের গুঁড়িতে ওকে বেঁধে আগাপাছতলা চাবকে দূর করে দাও। ঘাড়-ধাক্কা দিয়ে দূর করে দাও। ও-রকম অন্ত্যজের ছেলেদের সঙ্গে আমি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিয়ে দেব না।

অঘোরবাবু একবার নিষ্পলকনেত্রে প্রভুর দিকে তাকাইলেন এবং মৃদুস্বরে বলিলেন, আপনি কিন্তু ছেলে দুটিকে আশীর্বাদ করে পাকা কথা দিয়ে এসেছেন।

এমন সময় রুম্‌নি-ঝুম্‌নি কলরব করিতে করিতে আসিয়া কহিল, ও দাদু, দেখবে এস, কে এসেছে!

উগ্রমোহন গিয়া দেখিলেন, স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া আছেন।

গঙ্গাগোবিন্দের এই আগমন আকস্মিক হইলেও অপ্রত্যাশিত নয়। তাহার কারণ, স্বয়ং উগ্রমোহনই গঙ্গাগোবিন্দকে খবর পাঠাইয়াছিলেন যে রুম্‌নি-ঝুম্‌নির জন্য চিন্তা নাই, তাহারা যম-জঙ্গলে অঘোরবাবুর কাছে সুখেই আছে। বিবাহের প্রসঙ্গটা অবশ্য তিনি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন। শুভকর্ম একেবারে সম্পন্ন করিয়া তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে খবর দিবেন, ইহাই স্থির ছিল। গঙ্গাগোবিন্দ উগ্রমোহনের পদধূলি লইয়া হাসিমুখে কহিল, এরা এখানে বেশ আমোদেই আছে দেখছি। কিন্তু আমার আর একা থাকতে ভাল লাগছে না; এদের আজ নিয়ে যাব ভাবছি।

রুম্‌নি-ঝুম্‌নি প্রাঙ্গণস্থ পারাবতগুলিকে খাদ্য বিতরণ করিবার নিমিত্ত ছুটিয়া চলিয়া গেল। তাহারা চলিয়া গেলে উগ্রমোহন বলিলেন, হ্যাঁ, নিয়ে যাবে বইকি। তবে আজ নয়, একেবারে চব্বিশে মাঘ নিয়ে যেও।

গঙ্গাগোবিন্দ স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তাহার পর গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, একটা কথা শুনলাম—খুব সম্ভবত গুজব ওটা, কিন্তু শুনলাম যখন, তখন আপনাকে বলাই ভাল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি কথা?

একটু ইতস্তত করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ শেষে বলিয়াই ফেলিলেন, শুনলাম আপনি নাকি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ ঠিক করে ফেলেছেন নিমাইনগরের মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে? এটা এতই অসম্ভব ব্যাপার—

তাঁহার কথা শেষ না করিতে দিয়া উগ্রমোহন বলিলেন, অসম্ভব মোটেই নয়। যা শুনেছ, তা ঠিক। আগামী তেইশে মাঘ বিবাহ হবে। আশীর্বাদ করা হয়ে গেছে।

গঙ্গাগোবিন্দ কথাগুলি শুনিয়া কি যে বলিবেন, তাহা ভাবিয়া না পাইয়া অসংলগ্নভাবে বলিলেন, আমি কিছু—তার মানে—

উগ্রমোহন শুধু বলিলেন, আমি যা ভাল বুঝেছি, তা করেছি। এখন তুমি যা বোঝ, করতে পার।

গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ নির্বাক হইয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, আমার এ বিবাহে অমত আছে।

বেশ। তোমার অমতেই বিবাহ হবে, তার কারণ এতে আমার মত আছে। মৃন্ময় ঠাকুরের অবস্থা ভাল, তার ছেলে দুটিও ভাল, আমার বিচারবুদ্ধি অনুসারে এ বিবাহ মঙ্গলেরই হবে।

গঙ্গাগোবিন্দ তবু কিছু বলেন না দেখিয়া উগ্রমোহন আবার বলিলেন, মঙ্গলেরই হোক আর অমঙ্গলেরই হোক, যখন কথা দিয়েছি, তখন এ বিবাহ হবেই।

গঙ্গাগোবিন্দ এইবাব কথা বলিলেন, আপনি বেশি বলশালী, আমি দুর্বল। সুতরাং শক্তি সংগ্রহ না করে আপনার সঙ্গে তর্ক করা বৃথা, কারণ আপনার একমাত্র যুক্তি দেখছি শক্তি। তা হলে এইবাব আমি উঠি। যদি পারি, আপনার কথার জবাব আর একদিন দেওয়া যাবে।

উগ্রমোহন বলিলেন, তোমাকে যদি এখন যেতে না দেওয়া হয়?

গঙ্গাগোবিন্দের মুখে একটু হাসি ফুটিল। ধীরভাবে তিনি বলিলেন, এই ধরনের একটা কিছু আপনার নিকট প্রত্যাশা করছিলাম। আপনি আমাকে বলপ্রয়োগ করে ধরে রাখবার চেষ্টা করতে পারেন, কিন্তু আমিও যতক্ষণ প্রাণ থাকবে চলে যাওয়ার চেষ্টা করব। আমি দুর্বল, অবশ্য মবে যেতে পারি; কিন্তু প্রাণপণ চেষ্টা করব এখানে না থাকার।

বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ উঠিয়া দাঁড়াইতে উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, আমার হুকুম, একে যেন কোনক্রমে এখান থেকে যেতে না দেওয়া হয়।

বজ্রাহতের ন্যায় গঙ্গাগোবিন্দ দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল এবং তিনি দাঁত দিয়া নীচের ঠোঁটটাকে কামড়াইয়া ধরিলেন।

ঠিক এমনই সময় রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ছুটিয়া আসিয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, ও দাদু, ও বাবা, দেখবে এস, দুটো পায়রা কেমন মারামারি করছে! কালো পায়রাটা কি ভয়ঙ্কর রাগী!

তাই নাকি?—বলিয়া উগ্রমোহন নাতনীদ্বয়ের সহিত বাহিরের দিকে চলিয়া গেলেন। বাহিরে গিয়া তিনি ডাকিলেন, অঘোর, শুনে যাও। অঘোরবাবুও বাহিরে গেলেন।

নিম্নস্বরে অঘোরবাবু একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, মনে করুন, উনি যদি জোর করে চলে যেতে চান, তা হলে—

উগ্রমোহন উত্তর দিলেন, জোর করে তুমি ধরে রাখবে। এখানে পঞ্চাশজন সিপাহী আছে।

অঘোরবাবু চুপ করিয়া রহিলেন।

উগ্রমোহন আরও বলিলেন, ওকে দিয়েই আমি সম্প্রদান করাব।

রুম্‌নি আসিয়া বলিল, দাদু আমাদের খরগোশটা পালিয়ে গেছে, জান?

উগ্রমোহন হাসিয়া বলিলেন, বাঁচা গেছে।

ঝুম্‌নি বলিল, মংলুকে বলে আর একটা আনিয়ে দাও।

উগ্রমোহন বলিলেন, মংলু কে?

অঘোরবাবু উত্তর দিলেন, মংলু একজন সাঁওতাল মাঝি। তাকে আর দরকার হবে না, আমাদের সহিসকে বলে দিলেই হবে। এই এখনই বলে দিচ্ছি। ওরে পচ্‌না!

পচ্‌না সহিস আসিয়া সেলাম করিয়া সসম্ভ্রমে দাঁড়াইতেই অঘোরবাবু বলিলেন, একটা খরগোশের বাচ্চা চাই। ঘোড়াকে দানাপানি দিয়েছিস?

পচ্‌না সসম্ভ্রমে উত্তর দিল যে, জামাইবাবু ঘোড়া লইয়া এইমাত্র একটু হাওয়া খাইতে গিয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ মেধাবী লোক এবং চন্দ্রকান্তের বন্ধু। উগ্রমোহনের অশ্ব লইয়াই সে বনত্যাগ করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়া গিয়াছে, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। অঘোরবাবু ও উগ্রমোহন পরস্পর পরস্পরের দিকে চাহিয়া রহিলেন। উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, এইবার তুমি পেন্‌শন নাও। তোমার বুদ্ধিসুদ্ধি ক্রমশই কমে যাচ্ছে।

অঘোরবাবু কিছুই বলিলেন না। তাঁহার প্রস্তরবৎ মুখ প্রস্তরবৎ রহিল। মনে মনে কিন্তু তিনি গঙ্গাগোবিন্দের এই পলায়নে খুশীই হইলেন। তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন।

পিতার আকস্মিক অন্তর্ধানে রুম্‌নি-ঝুম্‌নি অবাক হইয়া গেল। অঘোরবাবু তাহাদের বুঝাইলেন যে, একটা জরুরি দরকারে তিনি গিয়াছেন, কাল হয়তো আসিবেন।

ক্রমশ সন্ধ্যা হইল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি ঘুমাইল।

উগ্রমোহন তখন বলিলেন, মৃন্ময়কে ডাক, চল, ওই উত্তর দিকের ঘরটায় যাওয়া যাক।

মৃন্ময় ঠাকুর যখন আসিলেন, তখন তিনি ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছেন। তাঁহার দুই চক্ষুতে দরবিগলিত অশ্রুধারা। উগ্রমোহন তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, তুমি যা করেছ, তোমাকে কেটে পুঁতে ফেলা উচিত। তা আমি করব না। যা বলছি, তাই কর।—বলিয়া তিনি অঘোরবাবুকে দোয়াত কলম এবং কাগজ আনিতে বলিলেন। দোয়াত কলম এবং কাগজ আসিলে তিনি বলিলেন, মায়াকান্না ছেড়ে এখন যা বলি, তাই লেখ। জোচ্চোর বদমায়েশ কোথাকার! কলম নাও, লেখ।

মৃন্ময় ঠাকুর লেখনী ধারণ করিয়া উগ্রমোহনের নির্দেশ অনুযায়ী লিখিলেন—

কল্যাণবরেষু,

বাবা, অজয়, বিজয়, তোমরা আমার আশীর্বাদ জানিবা। অত্র যম-জঙ্গল কাছারিতে আসিয়া আমি বিশেষ অসুস্থ হইয়া পড়া বিধায় বাটী ফিরিতে পারি নাই। এখনও চলচ্ছক্তিরহিত অবস্থায় আছি। তোমরা অতি শীঘ্র এই পত্রবাহকের সহিত চলিয়া আসিবা। তোমার মাতাঠাকুরাণীর আসিবার দরকার নাই। তোমরা আসিলে আমি তোমাদের সঙ্গে ফিরিয়া যাইব। আসিতে কদাচ অন্যমত করিবা না। আশীর্বাদ জানিবা। ইতি

আশীর্বাদক মৃন্ময় ঠাকুর

পত্র লইয়া আটজন সিপাহী নিমাইনগর যাত্রা করিল।

।। বারো ।।

সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে। সমস্ত বন পূর্ণ করিয়া ঝিল্লিধ্বনি দুই-একটা নিশাচর পাখির ডাক তীব্র তীক্ষ্ণ শব্দে অন্ধকারকে যেন চিরিয়া ফেলিতেছে। ব্রহ্মহৃদয় নক্ষত্রটি শিরীষ-গাছের মাথার উপর দপদপ করিয়া জ্বলিতেছে। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটি অগ্নিকুণ্ড। তাহার

চতুর্দিকে কয়েকজন সিপাহী বসিয়া অগ্নি-সেবা করিতেছে। অঘোরবাবু নিজ ঘরে বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেছেন। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি নিদ্রামগ্ন। মৃন্ময় ঠাকুরের দুর্দশা ঘুচাইয়া উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে উত্তর দিকের ঘরটায় শুইতে দিয়াছেন। ভদ্রভাবে বিছানা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, দ্বারে কিন্তু সশস্ত্র প্রহরী। মৃন্ময় ঠাকুর ঘুমাইতেছেন কি না ভগবান জানেন, তাঁহার কিন্তু উভয় চক্ষুই মুদ্রিত।

মাঝের ঘরটায় উগ্রমোহন সিংহ রহিয়াছেন। তাঁহার নগ্নকায়, পরিধানে শুধু কৌপীন। ভিখন তেওয়ারীর সহিত তিনি কুস্তি লড়িতেছিলেন। এই শীতের সন্ধ্যাতেও তাঁহার সর্বাঙ্গ দিয়া দরদর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে। উগ্রমোহনের ইহা একটি বিলাস। তাঁহার সিপাহীদের মধ্যে অন্তত পঁচিশ-ত্রিশজন কুস্তিগীর পালোয়ান আছে, এবং তাহারা প্রভুর সহিত কুস্তি লড়িতে পাইলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করে। অদ্য সন্ধ্যায় তিনি ভিখন তেওয়ারীকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিয়াছেন। দুইজনে বীরবিক্রমে মল্লযুদ্ধে উন্মত্তপ্রায়। বাহিরে বনানীশীর্ষে শুক্লা-চতুর্থীর চাঁদ অস্তাচলগামী। অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর উগ্রমোহন ভিখন তেওয়ারীকে চিত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। চিত মানেই জিত। ভিখন তেওয়ারী উঠিয়া প্রভুর পদধূলি লইল, উগ্রমোহন তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, সাবাস!

বাহিরে কে মৃদুস্বরে ডাকিল, হুজুর!

উগ্রমোহন গায়ে একটা কম্বল চাপা দিয়া ভিখন তেওয়ারীকে দ্বার খুলিতে আদেশ দিলেন। দ্বার খুলিলে উগ্রমোহন সিংহ দেখিলেন যে, নিমাইনগরে যে আটজন সিপাহী গিয়াছিল, তাহারা ফিরিয়াছে। তাহাদের বার্তা এই, আজ সকাল হইতে মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়কে পাওয়া যাইতেছে না।

সেতারের কানে মোচড় দিতে দিতে হাসিমুখে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, তারপর? ছেলে দুটো গিয়ে পালকিতে উঠল?

কমলাক্ষবাবু উত্তর দিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

সেতারের জুড়ি তার দুইটিতে মেজ্‌রাপের মৃদু আঘাত দিতে দিতে চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, আমাদের বিশ্বাসমশাইয়ের ছেলে বেশ ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তা হলে বল?

কমলাক্ষবাবু কোন উত্তর দিলেন না। কমলাক্ষবাবু লোকটির কমলাক্ষ নাম এই হিসাবে সার্থক যে, তাঁহার চোখ দুইটি রক্তাভ এবং বেশ ভাসা-ভাসা। আঁটসাঁট গড়নের নাতিদীর্ঘ লোকটি। অত্যন্ত স্বল্পভাষী। মামলা-মকদ্দমা করার দিকে একটু ঝোঁক বেশি। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়—এই ভাবটি কমলাক্ষবাবুর চোখে মুখে এবং সর্বাঙ্গ দিয়া যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। কমলাক্ষবাবু কিন্তু চন্দ্রকান্তকে অর্থাৎ চন্দ্রকান্তের বুদ্ধিকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। সেজন্য চন্দ্রকান্তের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। অকুণ্ঠিত চিত্তে তিনি চন্দ্রকান্তের সকল আদেশ পালন করিতেন। তাঁহার সর্বদা ভয় হইত যে, চন্দ্রকান্ত যেরূপ

বুদ্ধিমান তাহাতে তাঁহার কোন কার্যই হয়তো চন্দ্রকান্তের মনোমত হইতেছে না। ইহা লইয়া চন্দ্রকান্ত অবশ্য কখনও কিছু বলেন নাই। কিন্তু এই ধারণা বদ্ধমূল থাকাতে কমলাক্ষ যখনই কোন কার্য-উপলক্ষ্যে চন্দ্রকান্তের সমীপবর্তী হইতেন, তখনই তাঁহার আচারব্যবহারে কথাবার্তার কেমন যেন একটা ভিজা-বিড়াল-গোছ ভাব ফুটিয়া উঠিত।

ম্যানেজারকে নীরব থাকিতে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত চোখ তুলিয়া তাঁহার দিকে তাকাইলেন এবং বলিলেন, অর্থাৎ সংক্ষেপে এই দাঁড়াচ্ছে যে, আমাদের গোমস্তা বিশ্বাস মশায়ের ছেলে—ছেলে দুটোকে রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে দেখাবার নাম করে গঙ্গাগোবিন্দের বাড়িতে নিয়ে আসে এবং সেখানে তুমি তাদের বল যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি এখানে নেই—যম-জঙ্গলে আছে। তুমি পালকির বন্দোবস্ত করে দেবার প্রস্তাব কর এবং তারা সে প্রস্তাবে রাজী হওয়াতে তুমি তাদের পালকিতে করে তুলে নিয়ে টাল-জঙ্গলের কাছারিতে চালান করে দিয়েছ। এই তো?

কমলাক্ষ নীরবে মাথা নাড়িলেন। সেতারের ঘরগুলিতে একবার হাত চালাইয়া চন্দ্রকান্তের সন্দেহ হইল, উদারার নি পর্দাটা ঠিক মনোমত আওয়াজ দিতেছে না। তিনি ঘাটটা একটু সরাইয়া দিতে দিতে বলিলেন, আমাদের বিশ্বাস গোমস্তার ছেলের সঙ্গে যে অজয়-বিজয়ের আলাপ আছে, তুমি জানলে কি করে?

ওরা শ্যামগঞ্জ স্কুলে একসঙ্গে পড়ে কিনা।

ও।

চন্দ্রকান্ত কাফির একটা গৎ আস্তে আস্তে বাজাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল, যেন তিনি অন্য কিছু চিন্তা করিতেছেন। হঠাৎ তিনি আদেশ করিলেন, বিশ্বাসকে ডাক।

রাধামাধব বিশ্বাস এই এস্টেটের প্রাচীন কর্মচারী। মলিন ক্যাম্বিসের জুতা জোড়াটা বাহিরে ছাড়িয়া আসিয়া ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই চন্দকান্ত বলিয়া উঠিলেন, আপনার ছেলে এক কাণ্ড করে বসে আছে। মৃন্ময় ঠাকুরের দুই ছেলে অজয়-বিজয়ের সঙ্গে আমাদের রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিয়ের সম্বন্ধ বুঝি হচ্ছিল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লুকিয়ে দেখাবে বলে আপনার ছেলে আজ তাদের গঙ্গাগোবিন্দের বাড়িতে এনেছিল। যত সব ছেলেমানুষী বুদ্ধি! তার ওপর কমলাক্ষ করেছে আর এক কাণ্ড। রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আছে উগ্রমোহনের বনকর কাছারিতে, কমলাক্ষ ব্যাপারটা ঠিক জানত না, এক পালকি করে দিয়েছে পাঠিয়ে তাদের টালে। দেখুন দিকি কাণ্ড।

কমলাক্ষ এবং বিশ্বাস উভয়েই বিস্মিত হইল।

চন্দ্রকান্ত আবার কাফির গতে মন দিলেন। একটু বাজাইয়া আবার বলিলেন, আপনি এক কাজ করুন বিশ্বাস মশায়। আপনি এখনই কিছু খাবার-টাবার নিয়ে আর আপনার ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে টালে রওনা হয়ে যান। ছেলে দুটোর তা না হলে সেখানে কষ্টের অবধি থাকবে না। আর কমলাক্ষ ততক্ষণ তাদের বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে দিক। গঙ্গাগোবিন্দও আবার বাড়িতে নেই।

বিশ্বাস মহাশয় মনে মনে ছেলের মুণ্ডপাত করিতে করিতে প্রভুর আদেশ পালন করিতে বাহির হইয়া গেলেন। এই সময় টালে যাওয়া কি সোজা কথা!

বিশ্বাস চলিয়া যাইতে কমলাক্ষের ভিজা-বিড়াল-ভাবটা আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রভুর কথাবার্তা সে বেশ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছিল না। কাফির গৎটা মৃদু মৃদু বাজাইতে বাজাইতে চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বিশ্বাসের ছেলেটাকেও টালে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তা না হলে সব কথা প্রকাশ হয়ে যাবে যে! বুঝলে না চালটা? তুমি এক কাজ কর। মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে তবে তো টালে যেতে হয়? বিশ্বাস মশায় নদী পার হয়ে গেলে তুমি কোন অজুহাতে ঘাটের মাঝি-মাল্লা সবাইকে সদরে তলব করে ডাকিয়ে আনাও, অর্থাৎ আজ রাত্তিরে যেন কেউ মোহানিয়া ঘাট পেরিয়ে ওপারে যেতে না পারে, ওপার থেকে আসতেও না পারে। বুঝলে?

এইবার কমলাক্ষ বুঝিয়াছিলেন। প্রভুর এবং প্রভুর বুদ্ধির পদে ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যেন কিছুই হয় নাই। চন্দ্রকান্ত চক্ষু বুজিয়া কাফি গৎ বাজাইতে লাগিলেন। তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন, বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায়। খানিকক্ষণ পরে মৃদু পদশব্দে চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কে?

ভজনা খানসামা আগাইয়া আসিয়া কহিল, ম্যানেজারবাবু বাহিরে অপেক্ষা করিতেছেন, এক মিনিটের জন্য দেখা করিবেন কি?

কমলাক্ষ আসিলে চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, আবার কি?

মোহানিয়া ঘাটে লোক পাঠালাম। আমি ভাবছি, রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে কিড্‌ন্যাপ করার জন্যে এক নম্বর নালিশ ঠুকে দিলে কেমন হয়, গঙ্গাগোবিন্দকে ফরিয়াদী খাড়া করে?

চন্দ্রকান্ত একটু মৃদু হাসিলেন। বলিলেন, তখন তোমাকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছলাম। আমার নামে খরচ লিখে তহবিল থেকে শতখানেক টাকা তুমি নিয়ে নাও গিয়ে, বকশিশ দিলাম তোমাকে। তোমার আজকের কাজে আমি খুব খুশী হয়েছি। কিড্‌ন্যাপের মকদ্দমা এখন থাক, পরে ভেবে দেখা যাবে।

কমলাক্ষবাবু ভিজা বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিতে লাগিলেন, বকশিশ আবার কেন, আপনারই তো খাচ্ছি পরছি। তহবিলে এখন মজুত বেশি নেই, তা ছাড়া কাল শ্রীপঞ্চমী—

সেদিকে কর্ণপাত না করিয়া চন্দ্রকান্ত আবার সেতারে মন দিলেন। কমলাক্ষবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া যাইতেই সেতার রাখিয়া চন্দ্রকান্ত একটু মুচকি হাসিলেন এবং গা ভাঙিয়া হাঁকিলেন, ওরে ভজনা, তামাক দিয়ে যা, আর মিশিরজীকে একটু খবর দে।

কাফি রাগিণীর গৎ ও গীত সমস্ত আলাপ করিয়া মিশিরজী যখন বিদায় হইলেন, তখন সন্ধ্যা আসন্ন। রাধাকিষণজীউর মন্দিরে ঘণ্টা বাজিতে শুরু করিয়াছে। নহবৎখানায়

বাঁশীতে পূরবী বাজিতেছে। চন্দ্রকান্তের সমস্ত হৃদয় সহসা কেমন যেন বিষাদময় হইয়া উঠিল। আলবোলার নলটা মুখে দিয়া নিতান্ত অসহায়ের মত তিনি তাকিয়া ঠেস দিয়া একা বসিয়া রহিলেন। অকারণে কেন যেন তাঁহার মনে হইল, পৃথিবীতে কিছুরই কোন অর্থ নাই।

অকস্মাৎ বাহিরে মাদলের শব্দ শুনিয়া তাঁহার আচ্ছন্ন ভাবটা কাটিয়া গেল, তিনি জানালা দিয়া গলা বাড়াইয়া দেখিলেন, একদল বেদে-বেদেনী আসিয়া কাছারি-বাড়িতে নাচ-গান জুড়িয়া দিয়াছে। একটি উদগ্র-যৌবনা নারী আধ-ময়লা একটা লাল রঙের ঘাগরা এবং নীল রঙের কাঁচুলি পরিয়া নানাবিধ অঙ্গভঙ্গীসহকারে নৃত্য করিয়া সকলকে লোলুপ করিয়া তুলিয়াছে।

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিলে তিনি ম্যানেজারবাবুকে একবার ডাকিয়া দিতে বলিলেন। ভজনা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া উঠিয়া বেদেনীর নাচ দেখিতে লাগিলেন। মাথায় বাবরি-চুলওয়ালা তাহার দুইজন সঙ্গী মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বিভোর হইয়া মাদল বাজাইতেছে। বেশ নাচে তো মেয়েটি! চমৎকার স্বাস্থ্য!

কমলাক্ষবাবু আসিতেই তিনি বলিলেন, ওই বেদে-বেদেনীর দলকে এখনই গ্রাম তেকে দূর করে দাও।

যে আজ্ঞে।

কমলাক্ষ চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত নিজের ব্যবহারে নিজেই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। তিনি কমলাক্ষকে ডাকাইয়াছিলেন জানিবার জন্য যে, সমস্ত রাত নাচিলে মেয়েটি কত লইবে। অথচ তিনি এ কি বলিয়া বসিলেন!

ম্যানেজারের আদেশক্রমে বেদে-বেদেনীর দল চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত দাঁড়াইয়া দেখিলেন। তাহারা যতক্ষণ দৃষ্টি-পথবহির্ভূত না হইয়া গেল, চন্দ্রকান্ত নিমেষহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অনেক কথাই তাঁহার মনে হইল। কি বিচিত্র সৃষ্টি এই নারী! তাঁহার জীবনেও নারী বার কয়েক আসিয়াছিল। অতি বাল্যকালে তিনি ভালবাসিয়াছিলেন উগ্রমোহনের ভাগিনেয়ীকে। কিন্তু কোষ্ঠী অন্তরায় হইল। গঙ্গাগোবিন্দের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। ক্রমশ তাঁহার যৌবন বিকশিত হইল বটে, কিন্তু চন্দ্রকান্ত লেখাপড়া গান-বাজনা ছবি-আঁকা প্রভৃতি লইয়া এত ব্যস্ত রহিলেন যে, অন্য কিছু ভাবিবারই অবসর পাইলেন না। মূর্খ উগ্রমোহনের ধারণা যে, রেশমকে তিনি লুকাইয়া ভালবাসিয়াছিলেন। যে রমণীর প্রেম রজতমূল্যে ক্রয় করা যায়, তাহাকে চন্দ্রকান্ত ভালবাসিতে পারেন না। যে পত্রখানা তিনি রেশমকে লিখিয়াছিলেন এবং যাহা উগ্রমোহন বাহাদুরি করিয়া সেদিন তাঁহাকে ফিরাইয়া দিয়াছেন, তাহা যে একটা ছদ্ম-প্রেমপত্র, তাহা বুঝিবার শক্তি উগ্রমোহনের থাকিলে আর ভাবনা কি ছিল! উগ্রমোহনের প্রণয়লীলায় বিঘ্ন জন্মাইবার জন্যই তিনি ইচ্ছা করিয়া চিঠিখানা লিখিয়াছিলেন এবং কৃতকার্যও হইয়াছিলেন। রেশম বাঈজী দুই দিন পরই দেশত্যাগ করিয়াছিল।

চন্দ্রকান্তের অধরে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তাহার পর অবশ্য জমাটী রকম প্রেমে তিনি পড়িয়াছিলেন, তাহা কলিকাতায়। তাঁহার এক বন্ধুর ভগ্নীর সহিত। সুজাতা তাহার নাম। সুজাতার পিছনে অনেক টাকা খরচ করিয়াছেন তিনি, কিন্তু বিলাতী জাহাজ যেই এক ব্যারিস্টার আনিয়া ভারতের তীরে নামাইয়া দিল, অমনই সুজাতার সমস্ত প্রেম উবিয়া গেল। পাড়াগাঁয়ে জমিদারের ছেলে আর বিলাতী-আমদানী ফ্যাশন-দুরস্ত ঝকঝকে ব্যারিস্টার। আকাশ-পাতাল তফাত! সুজাতার নির্বাচনকে দোষ দেওয়া যায় না। মোটের উপর, চন্দ্রকান্ত ভাবিয়া দেখিয়াছেন যে, নারীজাতির সঙ্গে তাঁহার পোষাইবে না। নারীজাতির প্রতি চন্দ্রকান্তের আকর্ষণ যে নাই তাহা নহে, কিন্তু বিতৃষ্ণাও প্রবল। এত ক্ষুদ্র! টাকা দিয়া কেনা যায়। সত্যই টাকা দিয়া কেনা যায়! কই, এমন স্ত্রীলোক একজনও তো তাঁহার চোখে পড়িল না, যে ঐশ্বর্যের মোহে না মুগ্ধ হয়! দরিদ্র স্বামীর যাহারা সতী স্ত্রী, তাহারাও অপরের ঐশ্বর্য দেখিয়া লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকে, আর স্বামীদের বাক্য-যন্ত্রণা দেয়। নাঃ, অতি নীচ এই স্ত্রীজাতিটা। হায় ভগবান, প্রেমাস্পদা মানসীকে এত হীন অকিঞ্চিৎকর করিয়া সৃষ্টি করিলে কেন? নাঃ, সেতারের সঙ্গে প্রেম করাই ভাল।

ওই বেদেনী মেয়েরাও কি এত নীচ? ভৃত্য ঘরে আলো লইয়া প্রবেশ করাতে চন্দ্রকান্তের চমক ভাঙিল। তিনি বলিলেন, ওরে, জুতো আর ছড়িটা আন্ তো, একটু বেড়াতে বেরুই।

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার নজরে পড়িল যে, নৌকা করিয়া সেই বেদের দল নদী পার হইতেছে। ওপারে তাহাদের তাঁবু রহিয়াছে, তাহাও দেখা গেল।

বেড়াইয়া চন্দ্রকান্ত যখন ফিরিলেন, তখন নহবৎখানায় সানাই ইমন ধরিয়াছে।

।। তেরো ।।

মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের আকস্মিক অন্তর্ধান-বার্তা শুনিয়া উগ্রমোহন সহসা যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। মনের মধ্যে তাঁহার রাগ যতই হউক, সিপাহীদের সম্মুখে তাহা প্রকাশ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ হইল। পরাজিত হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করাটা আত্মসম্মান-হানিকর। উগ্রমোহন ভিতরে ভিতরে পুড়িতে লাগিলেন। তাঁহার নাসারন্ধ্রের স্ফীতি দেখিয়া অঘোরবাবু তাহা বেশ বুঝিতেছিলেন, অঘোরবাবুর পাষাণ-মুখচ্ছবির একটি পেশীও বিকম্পিত হইল না। তিনি মৃদুস্বরে উগ্রমোহনকে বলিলেন, মৃন্ময়কে ডেকে একবার জিজ্ঞাসা করা উচিত, সে কিছু জানে কি না!

উগ্রমোহন বলিলেন, আমি আগে চলে যেতে চাই। তুমি মৃন্ময়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করো এবং বলো যে যদি তার ছেলেদের সঙ্গে কোন কারণে রুম্নি-ঝুম্নির বিবাহ না হয়, তা হলে সামান্য কুকুরের মত ঠেঙিয়ে তাকে মেরে ফেলব আমি।

তাঁহারা ঘরের মধ্যে বসিয়া কথাবার্তা কহিতেছিলেন। বাহিরে গলার মৃদু শব্দ করিয়া পচ্‌না সহিস ডাকিল, হুজুর।

কে?—অঘোরবাবু গিয়া দ্বার খুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি চাস তুই?

পচ্‌না উত্তর দিল, ঘোড়াটা হুজুর ফিরে চলে এসেছে। জামাইবাবু আসেননি। কোথাও পড়ে-টড়ে যাননি তো? বলেন তো খোঁজ করি।

বস্তুত উগ্রমোহনের ঘোড়ায় চড়িয়া গঙ্গাগোবিন্দ অধিক দূর যান নাই। ঘোড়া ছাড়িয়া দিয়া পদব্রজেই তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন। ঘোড়াটা ফিরিয়াছে শুনিয়া উগ্রমোহনের আনন্দ হইল। তিনি এখনই বাড়ি ফিরিতে চান। এতটা পথ অশ্বারোহণে গিয়া বাড়ি পৌঁছিতে তাঁহার অবশ্য রাত্রি হইয়া যাইবে। তা হউক, তাঁহার বাড়ি ফেরা একান্ত দরকার। এস্রাজ ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়ার পর হইতে বহ্নির সহিত তাঁহার ভাল করিয়া কথাই হয় নাই। বাহিরে বাহিরে তিনি ফিরিতেছিলেন। সন্ধিকামনায় তাঁহার সমস্ত অন্তর আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। দ্বিতীয়ত, মানিক মণ্ডলকে দিয়া ছেলে দুইটার খোঁজখবর করিতে হইবে, বিবাহের আর দিন নাই। তৃতীয়ত, গঙ্গাগোবিন্দ গিয়া পুলিসের শরণাপন্ন হইতে পারে। তাহারও একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। বাড়ি তাঁহাকে ফিরিতেই হইবে। পুলিসের কথা মনে হইতেই তিনি অঘোরবাবুকে বলিলেন, আমি এখন চলে যাচ্ছি। যদি পুলিস আসে আজ রাত্রেই, মারপিট করে হাঁকিয়ে দেবে। পঞ্চাশজন সিপাহী তো আছে। আর রাত্রে যদি কোন গোলমাল না হয়, রুম্‌নি-ঝুম্‌নি আর মৃন্ময় ঠাকুরকে কাল ভোরেই এখান থেকে সরিয়ে বাথানে নিয়ে রেখে এসো। ওদের রেখে তুমি ফিরে এসো কিন্তু। কাল তোমার এখানে থাকা চাই। সিপাহীদের সব বাথানে পাঠিয়ে দিও। এক ভিখন তেওয়ারী ছাড়া কারও থাকার দরকার নেই।

অন্ধকারে বন-পথটা সাবধানে পার হইয়া উগ্রমোহন মাঠে পড়িলেন এবং অশ্বের বেগ বাড়াইয়া দিলেন। অন্ধকার ভেদ করিয়া উগ্রমোহনের ঘোড়া ছুটিতে লাগিল।

শীতের নির্মেঘ আকাশে অগণ্য-নক্ষত্র। ক্ষুরধার তীক্ষ্ণ তীব্র বাতাস বহিতেছে। দৃঢ় বজ্রমুষ্টিতে উগ্রমোহন অশ্বের বল্‌গা ধরিয়া বসিয়া আছেন।

তাঁহার মনের মধ্যে দুইটি মুখচ্ছবি জাগিতেছে—বহ্নি ও চন্দ্রকান্ত—ভগ্নী ও ভ্রাতা।

উগ্রমোহনের অশ্ব যখন গ্রামে প্রবেশ করিল, তখন গ্রাম নিষুপ্ত। গ্রামের ভিতর কতকগুলি কুকুর অকারণে চীৎকার করিতেছে। একদল শৃগাল ডাকিতে ডাকিতে হঠাৎ একযোগে চুপ করিয়া গেল। তারার আলোয় গ্রামপ্রান্তের তালগাছগুলি রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে। কর্কশরবে ডাকিতে ডাকিতে একটা পেচক উড়িয়া গেল। রাত্রির অন্ধকার ঘনতর হইয়া উঠিল। ঘোড়ার উপর হইতে উগ্রমোহন দেখিতে পাইলেন, চন্দ্রকান্তের খাস-কামরায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। চন্দ্রকান্ত এখনও জাগিয়া আছে নাকি? একদান দাবা খেলিয়া গেলে কেমন হয়? উগ্রমোহন অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। চন্দ্রকান্তের বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া দেখিলেন, দেউড়ি

তখনও বন্ধ হয় নাই। উগ্রমোহনের অশ্ব আসিয়া দেউড়ির ভিতর প্রবেশ করিতে গুর্খা প্রহরী আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, চন্দ্রকান্ত কোথায়?

বাবুসাব আভি বাহার নিক্‌লে হেঁ।

সওয়ারি পর?

জী নেহি। পয়দল।

হামারা সেলাম কহ দেনা।

জী হুজুর।—গুর্খা সেলাম করিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। উগ্রমোহন আবার অশ্বের মুখ ফিরাইলেন। উগ্রমোহনের অশ্ব যখন চন্দ্রকান্তেব বাড়ির সীমানা ছাড়াইতেছে, চন্দ্রকান্ত তখন নিজের বাগানের অর্কিড-হাউসে গোপনে বসিয়া ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতেছিলেন। ছদ্মবেশ-গ্রহণে চন্দ্রকান্তের অসাধারণ পারদর্শিতা। সঙ্গীতবিদ্যার মত এই বিদ্যাটিও তিনি বহু কৌশলে ও বহু অর্থব্যয় করিয়া আয়ত্ত করিয়াছেন। যখনই সকলের অগোচরে কোন কার্য করার তাঁহার প্রয়োজন হয়, তিনি ছদ্মবেশ ধারণ করেন। অর্কিড-হাউস হইতে সহজভাবে বাহিরে আসিলেন। গেটে প্রবেশ করিতেই গুর্খা আসিয়া অভিবাদন করিয়া জানাইল যে, উগ্রমোহনবাবু আসিয়াছিলেন এবং সেলাম জানাইয়া গিয়াছেন। আচ্ছা।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত ভিতরে চলিয়া গেলেন। তখনও তাঁহার রাগের শির দুইটা দপদপ করিতেছে। তিনি ওপারে গিয়াছিলেন।

বেদেনীর নাম ফুলকি। সত্যিই আগুনের ফুলকি। ওপারেও সে একদল দর্শকের সম্মুখে নৃত্য করিতেছিল, যেন এক সর্পিণী ফণা বিস্তার করিয়া আবেগে কাঁপিতেছে। তাহার খিলখিল হাসি চন্দ্রকান্ত এখনও যেন শুনিতে পাইতেছেন।

টেবিলের উপর নীল রঙের ডোম-দেওয়া একটি সুদৃশ্য বাতি কমানো আছে। ধূপাধারের ধূপ তখনও পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায় নাই। ক্ষীণ ধূম্ররেখায় অগুরুর গন্ধ তখনও পুড়িয়া পুড়িয়া আপনাকে বিলাইতেছে। চন্দ্রকান্ত এস্রাজটি নামাইয়া কানাড়ায় গান ধরিলেন, আনন্দন আনন্দ ভয়ো—

উগ্রমোহন যখন বাড়ি পৌঁছিলেন, তখন তাঁহার খাস-চাকর ব্রজ ছাড়া আর কেহ জাগিয়া ছিল না। ঘোড়া হইতে নামিতেই ব্রজ আসিয়া ঘোড়া ধরিল। ঘোড়া হইতে নামিয়া সোজা তিনি অন্দর-মহলে চলিয়া গেলেন। নৈশ প্রহরী তাঁহাকে অভিবাদন করিল, তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন না।

ভিতরে গিয়া তিনি দেখিলেন, বহ্নির ঘরে তখনও আলো জ্বলিতেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। দালানের ঘড়িটা হইতে শুধু টক-টক-টক শব্দ হইতেছে।

নিঃশব্দপদসঞ্চারে উগ্রমোহন বহ্নি দেবীর ঘরের সম্মুখে উৎকর্ণ হইয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। দ্বার ভেজানো ছিল। ভিতর হইতে কোনও শব্দ নাই। মৃদু করাঘাত করিয়া তিনি দ্বার খুলিয়া ভিতরে গেলেন। দেখিলেন, বহ্নি দেবী কার্পেটে কি যেন বুনিতেছেন।

উগ্রমোহন কহিলেন, এখনও জেগে আছ দেখছি। বুনছ কি?

জুতো।

লেখাপড়া সঙ্গীত-চর্চা সব ছেড়ে হঠাৎ এ কি?

বহ্নি দেবীর নয়নে একটা ক্ষণিক দীপ্তি ফুটিয়া নিবিয়া গেল। তিনি উত্তর দিলেন, যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।

উগ্রমোহন পাগড়িটা খুলিয়া রাখিতে রাখিতে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, একটা গান শুনতে ইচ্ছে করছে এখন।

বহ্নিকুমারীর গম্ভীর মুখে একটা হাসির আভা ফুটি-ফুটি করিতে লাগিল। তিনি কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে বুনিয়া যাইতে লাগিলেন।

উগ্রমোহন আবার কথা কহিলেন, কতক্ষণ বুনবে?

বহ্নিকুমারী হাসিয়া কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় শব্দ হইল—হুম ব্রো, হুম ব্রো, হুম ব্রো।

এ কি, চন্দ্রকান্ত এল নাকি?

উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, তুমি গিয়ে ফিরে এসেছ শুনলাম। এস, একদান বসা যাক!

দুইজনে দাবার ছক লইয়া মুখোমুখি বসিলেন।

বহ্নি দেবী অন্দর-মহলে একা বসিয়া বুনিতে লাগিলেন।

তাঁহার মুখের উদীয়মান হাসিটি নিবিয়া গেল।

।। চৌদ্দ ।।

অতি প্রত্যুষেই উগ্রমোহন অশ্বারোহণে বাহির হইয়া গিয়াছেন। কোথায় গিয়াছেন, কেহ জানে না। রাণী বহ্নিকুমারী প্রভাতে উঠিয়া স্নানাদি সমাপনান্তে একখানি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া এবং দুই ডালা পদ্মফুল লইয়া চন্দ্রকান্তের বাড়ির উদ্দেশে পালকিযোগে যাত্রা করিলেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি পিতৃগৃহে গমন করিতেছেন। তাঁহার পালকি আবৃত করিয়া লাল মখমলের একটি আস্তরণ। তাহার সোনালী ঝালর প্রভাতের স্বর্ণ-কিরণে ঝলমল করিতে লাগিল। তাঁহার পশ্চাতে একটি সাধারণ পালকিতে তাঁহার দুইজন দাসীও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের বাড়িতে সরস্বতী-পূজার একটু বৈচিত্র্য আছে। চন্দ্রকান্ত রায়ের অন্দর-মহলে এক প্রকাণ্ড ফুলের বাগান। অনেক রকম ফুল। জাতী, যূথী, জবা, টগর হইতে আরম্ভ করিয়া গোলাপ, রজনীগন্ধা, ক্রিসান্থিমান, এমন কি পিটুনিয়া, ডালিয়া, ভায়োলেট, সুইট পি প্রভৃতি বিলাতী মরসুমী ফুলেরও প্রাচুর্য সেখানে। এই সুবৃহৎ উদ্যানের মধ্যস্থলে বিশাল এক দীর্ঘিকা।

ঘন কালো তাহার জল পদ্মফুলে ভরা। সেই দীঘির মধ্যে শ্বেতপ্রস্তরের প্রকাণ্ড একটি মঞ্চ এবং সেই মঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া সুন্দর শ্বেত-মর্মরের প্রকাণ্ড এক পদ্মফুল, তাহার মর্মর-নির্মিত মনোরম মৃণালটি জলের ভিতর হইতে বাঁকিয়া উঠিয়াছে।

চন্দ্রকান্তের সরস্বতীর প্রতিমা দীর্ঘিকা-মধ্যবর্তী এই মঞ্চে স্থাপিত হয়। কৃষ্ণনগরের অনিন্দ্যকান্তি প্রতিমা। কিন্তু পূজার দিন মঞ্চে শুধু প্রতিমাই থাকে না। পৃথিবীর যেখানে যত জ্ঞানী, গুণী, বিদ্যানুরাগী আছেন বা ছিলেন, সকলেরই ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রতিকৃতির সমাবেশ সেখানে হয়। তাহা ছাড়া পূজার দিন সকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সেই মঞ্চের চতুর্দিকে প্রসিদ্ধ সেতারী, বীণকার, এস্রারী রাগ-রাগিণীর আলাপে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া তোলেন। সরস্বতীর পূজারী চন্দ্রকান্ত স্বয়ং। চন্দ্রকান্তের হুকুম, পারতপক্ষে কোন বৈষয়িক ব্যাপারে সেদিন যেন তাঁহাকে বিরক্ত করা না হয়। আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই বাণী-অর্চনায় তিনি যাহাকে-তাহাকে নিমন্ত্রণ করেন না। এই উপলক্ষ্যে বাণীর একনিষ্ঠ সাধকগণকেই তিনি প্রতি বৎসর আহ্বান করিয়া থাকেন। আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কেবল গঙ্গাগোবিন্দ এবং রাণী বহ্নিকুমারী নিমন্ত্রিত হন, কিন্তু উগ্রমোহন সিংহ নয়। বাণীর সাধনায় সত্যকার আগ্রহের পরিচয় না থাকিলে চন্দ্রকান্তের আয়োজিত বাণীপূজায় নৈবেদ্য সাজাইবার আহ্বান মেলে না।

বাতাসপুর গ্রামের দরিদ্র সারেঙ্গী-বাদককে চন্দ্রকান্ত সসম্ভ্রমে আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু হাইস্কুলের হেডমাস্টারকে নয়। ইহা লইয়া বহু নিন্দা সমালোচনা হইয়া গিয়াছে, কিন্তু চন্দ্রকান্তের মত পরিবর্তিত হয় নাই।

আজ সকাল হইতে তিন-চারটি ছোট ছোট হালকা পানসি দীঘিতে ভাসিতেছে, অতিথিগণ আসিলে সেই পানসি করিয়া তাঁহাদিগকে পূজামঞ্চে লইয়া যাওয়া হইতেছে। তাঁহারা অঞ্জলি দিয়া ফিরিয়া আসিতেছেন, কেহ বা পানসি লইয়া দীঘিতে বেড়াইতেছেন। রাণী বহ্নিকুমারী আসিয়া ঘাটে দাঁড়াইতেই গঙ্গাগোবিন্দ একখানি পানসি বাহিয়া হাসিমুখে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণী বহ্নিকুমারীও স্মিতমুখে গঙ্গাগোবিন্দের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। আকাশে বাতাসে শ্রীপঞ্চমীর শ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। ধূপ ধূনা ফুলের গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। গঙ্গাগোবিন্দ পানসি বাহিয়া আসিতে আসিতে দেখিতে লাগিলেন, মহিমময়ী মূর্তিতে বাণী দাঁড়াইয়া আছেন। পট্টবস্ত্রের টকটকে লাল পাড়, সীমন্তে রক্তবর্ণ সিন্দূর, হস্তে কমলকলি। বহ্নিকুমারী ভাবিতেছিলেন, আহা, গঙ্গাগোবিন্দ রোগা হইয়া গিয়াছেন। পানসি ঘাটে লাগাইয়া গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, বাণী এস। বহ্নিকুমারী হাসিয়া উত্তর দিলেন, বাণী মারা গেছে। আমি এখন বহ্নি।

তোমার নূতন নামটা মনেই থাকে না।

পরস্ত্রীর নাম মনে না থাকাই ভাল।

বহ্নিকুমারীর পানসিতে উঠিলেন। পানসি মঞ্চের দিকে ভাসিয়া চলিল। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। গঙ্গাগোবিন্দ ধীরে ধীরে বলিলেন, আমাকে কি এখনও ক্ষমা করনি বীণা?

বহ্নিকুমারীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু হাসিয়া উত্তর দিলেন, আজও সে কথা ভোলনি দেখছি! আশ্চর্য তোমার স্মরণশক্তি!

না, ভুলিনি।—বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর একটু হাসিয়া বলিলেন, তোমাদের কাউকেই ভুলতে পারছি না। ভুলতে দিচ্ছ কই তোমরা!

বহ্নিকুমারীর ভ্রূলতা কুঞ্চিত হইল। কানের হীরার দুল দুইটি সূর্যকিরণে জ্বলিয়া উঠিল। ঘাড় ফিরাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ?

তুমি জান না?

কি জানি না?

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া নীরবে দাঁড় বাহিতে লাগিলেন। তাহার পর বহ্নির মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এ কথা তোমার তো না জানবার নয় যে, তোমার স্বামী আমার মেয়ে দুটিকে জোর করে নিয়ে গিয়ে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

এ কথা বহ্নিকুমারী সত্যই শোনেন নাই। স্বামীর এই কার্য তাঁহার নিকট অত্যন্ত হীন বলিয়া ঠেকিল। তাঁহার আত্মসম্মানে যেন আঘাত লাগিল, গঙ্গাগোবিন্দের কাছে নিজেকে অত্যন্ত হীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। মুখে তিনি কিন্তু বলিলেন, সবলের কাছে বলই একমাত্র যুক্তি। দুর্বলের যুক্তি ক্রন্দন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, আমি দুর্বল নই, ক্রন্দন আমি করছি না, গল্পটা তোমায় শোনালাম।

বহ্নিকুমারী অকস্মাৎ বলিয়া বসিলেন, এই কি তোমার গল্প শোনানো? আড়লে স্বামীর নিন্দা করে স্ত্রীর কাছে বাহাদুরি নেওয়ার বাসনা! মেয়ের বিয়ে একদিন তোমায় দিতেই হবে। আমার স্বামী সৎপাত্র দেখে সেই বিবাহ ঘটিয়ে দিচ্ছেন, এত বড় তোমার গর্ব যে, তাতে কৃতজ্ঞতা বোধ না করে তুমি রাগ করছ। স্পর্ধারও সীমা থাকা উচিত।

গঙ্গাগোবিন্দ এই তেজস্বিনীকে চিনিতেন। বাণী যে তাঁহার বাল্যসহচরী। গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, রাগ করো না বাণী। আমার কথাটা ভেবে দেখ।

বহ্নিকুমারী বলিলেন, তুমিও ভেবে দেখ, তিনি আমার স্বামী।

পানসি আসিয়া পূজামঞ্চে ভিড়িল।

বাণী ও গঙ্গাগোবিন্দ নামিয়া অঞ্জলি দিতে গেলেন।

অঞ্জলি দেওয়া শেষ হইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্ত বিভোর হইয়া সারেঙ্গীর আলাপ শুনিতেছেন। বহ্নিকুমারী পূজা সমাপন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছেন। গঙ্গাগোবিন্দ একা বসিয়া ভাবিতেছেন, বাণীর সহিত কত কাল পরে দেখা! সেই বাণী, যিনি একদিন তাঁহার গলায় জোর করিয়া একছড়া ফুলের মালা পরাইয়া দিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি আমার বর, সেই বাণী আজ প্রবলপরাক্রান্ত উগ্রমোহনের স্ত্রী রাণী বহ্নিকুমারী। বাণী গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রথ প্রেম।

নিষ্কলঙ্ক শুভ্র। আজ এতদিন পরে তাঁহার সহিত দেখা হইল বটে, কিন্তু তিনি ঝগড়া করিয়া বসিলেন। ছি ছি, কাজটা অন্যায় হইয়া গিয়াছে। আর জীবনে হয়তো তাঁহার সহিত দেখাই হইবে না। গঙ্গাগোবিন্দও যে বাণীকে ভালবাসেন, তাহা কি বাণী জানেন? কোন দিনও তো তিনি তাহা জানান নাই। বাণী তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু বড়লোকের মেয়ে বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। বড়লোকের মেয়ে হওয়াটা কি অপরাধ? হঠাৎ গঙ্গাগোবিন্দের চিন্তাধারা ব্যাহত করেন নাই। বড়লোকের মেয়ে হওয়াটা কি অপরাধ? হঠাৎ গঙ্গাগোবিন্দের চিন্তাধারা ব্যাহত হইল। ভজনা খানসামা ঘাটের উপর হইতে তাঁহাকে ডাকিতেছে দেখা গেল। কেন? কি হইল?

পানসি বাহিয়া ঘাটের কাছে গিয়া শুনিলেন যে, বাহিরে কমলাক্ষবাবু বড় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বাঘাড় বিল জলকর উগ্রমোহনের সিপাহীরা নির্মমভাবে লুণ্ঠন করিতেছে। দশজন লোক গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া চন্দ্রকান্তকে খবর দিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আঃ, আজকের দিনেও জ্বালাবে উগ্রমোহন? থানায় খবর দিতে বল। আমি কি করব?

কমলাক্ষবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন।

।। পনেরো ।।

বাঘাড় বিল জঙ্গলে ভীষণ দাঙ্গা। উভয় পক্ষে প্রায় পঁচিশজন আহত হইয়াছে। দুধনাথ পাঁড়ে মাথায় গুরুতর আঘাত পাইয়াছে; অচেতন অবস্থায় তাহাকে সদর হাসপাতালে ডুলি করিয়া লইয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্তের প্রায় পঞ্চাশজন সিপাহী, থানার দারোগা, কন্স্টেবল, চৌকিদার—সকলে ঘটনাস্থলে উপস্থিত। দাঙ্গা তথাপি চলিতেছে। নানারূপ সত্য মিথ্যা গুজব আশেপাশে ছড়াইয়া পড়িতেছে। কেহ বলিতেছে, উগ্রমোহনবাবু স্বয়ং বর্শা-হস্তে ঘোড়ায় চড়িয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ লোকেরই মত যে, সম্পত্তিটা আসলে উগ্রমোহন সিংহেরই পূর্বপুরুষদের ছিল। চন্দ্রকান্তের পিতামহ কি কৌশলে জলকরটাকে অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন, উগ্রমোহন সিংহ হঠাৎ তাহা জানিতে পারিয়াছেন, তাই এই কাণ্ড। তিনি মরদ্কা বাচ্চা, ছাড়িবেন কেন? কথাটা হইতেছিল পীরপুরের গোলোক সার বাসায়। গোলোক সা লোকটি নিঃসন্তান। দুই বার বিবাহ করিয়াও সংসার স্থাপন করিতে পারে নাই। তাহার দ্বিতীয়া পত্নীটিও বৎসর দুই আগে মারা গিয়াছে। গোলোক সার থাকিবার মধ্যে আছে তেজারতি-কারবার, তাহা প্রায় লাখ খানেক টাকার। আর আছে এক যমজ ভাই, কিন্তু সেও বহুদিন হইল গোলোকের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছে। অনেকেরই ধারণা, সে মারা গিয়াছে। এখন গোলোক সার চড়া সুদে জমিদারগণকে টাকা ধার দেওয়া জীবিকা। ইহাই তাহার জীবনের বন্ধন এবং কর্মের প্রেরণা। চন্দ্রকান্ত রায়কে টাকা ধার দিবার সুবিধা হইয়াছে বলিয়া সে পীরপুরে আসিয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে।

উগ্রমোহন সিংহকে মরদ্‌কা বাচ্চা বলিয়া যে লোকটি সম্মান প্রদর্শন করিতেছিল, সে বৃন্দাবন মোদক। গোলোক সার বাসার সম্মুখে তাহার মুদীখানার দোকান।

গোলোক সা বলিল, মরদ্‌কা বাচ্চা—তুমি তো ফট্ করে বলে বসলে! কথা বলতে তো আর পয়সা খরচ হয় না! হোঁৎকা হলেই মরদ্‌কা বাচ্চা হল? বেশ যা হোক!

বৃন্দাবন মোদক গোলোক সাকে ঈর্ষার চক্ষে দেখিত। সে উত্তর করিল, মরদ্‌কা বাচ্চা যদি কেউ থাকে এ তল্লাটে সে হচ্ছে উগ্রমোহন সিং। এক কথায় বলে দিলাম তোমায় সা-জী।

গোলোক সা মস্তকে হাত বুলাইয়া বলিল, খালি গোঁয়ারের মত মারামারি করলেই মরদ্‌কা বাচ্চা হয় না, বুঝলে? ওর চেয়ে ঢের বেশি মরদ্‌কা বাচ্চা আমাদের চন্দ্রকান্তবাবু।

বৃন্দাবন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, কিসে আর কিসে, সোনা আর সীসে—একটা কথা আছে না? এ হল গিয়ে তাই। সেতারের টুং-টাং করে বলে হয়তো তুমি ওকে পছন্দ কর, কিন্তু মরদ্‌কা বাচ্চার জাত ও নয়। হেলে কি কখনও কেউটে হতে পারে?—বলিয়া বৃন্দাবন মোদক ফু-ফু করিয়া ধোঁয়াটা ছাড়িল। সে তামাক খাইতেছিল।

গোলোক সা বলিল, দাও, কলকেটা দাও। ভেতরের কথা তুমি তো আর জান না, আমি জানি। আমি বলছি শোন, আসল মরদ্‌কা বাচ্চা চন্দ্রকান্তবাবু।

এমন সময় অকস্মাৎ দশ-বারোজন সশস্ত্র অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল—হাতে খোলা তলোয়ার। বৃন্দাবন ও গোলোক উভয়েরই চক্ষুস্থির হইয়া গেল। এ কি কাণ্ড!

বজ্রগর্জনে একজন অশ্বারোহী বলিল, বাঁধো। অমনই তিন-চারিজন লোক আসিয়া গোলোক সাকে ধরিল। তাহার হাত বাঁধিল, পা বাঁধিল, মুখও বাঁধিল এবং পরিশেষে বাঁধা হাত-পায়ের ভিতর দিয়া একটি বংশদণ্ড প্রবেশ করাইয়া দিল।

আবার আদেশ হইল, চল।

আটজন লোক গোলোক সাকে শূকরের মত টাঙাইয়া লইয়া চলিয়া গেল।

বৃন্দাবন মোদক ভয়ে ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিল। থানা পুলিস সব বাঘাড় বিলের জঙ্গলে, বাধা দিবার কেহ নাই।

সকল জিনিসেরই একটা শেষ আছে। সুতরাং কিছুক্ষণ কাঁপিয়া বৃন্দাবন মোদকও প্রকৃতিস্থ হইল এবং কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিল। আশেপাশে আরও দুই-চারিজন লোক এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাহারাও আসিয়া জুটিল এবং নানাভাবে জিনিসটা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল— কেহ উত্তেজিতভাবে, কেহ মৃদুস্বরে, কেহ সহানুভূতি করিয়া। এ ব্যাপারে যে উগ্রমোহন সিংহের হাত আছে, তাহা কাহারও মাথায় আসিল না। একটি রোগা-গোছের ছোকরা আসিয়া বৃন্দাবন মোদককেই সমস্ত ব্যাপারটার জন্য দোষী সাব্যস্ত করিয়া বসিল। তাহার যুক্তি এই, বৃন্দাবন মোদক চেঁচাইল না কেন? উত্তেজিত স্বরে যুবকটি বলিতে লাগিল, চেঁচাইলে আমরা সবাই বেরিয়ে পড়তাম। তা হলে কি আর সা-জীকে অমনধারা তুলে নিয়ে

যেতে পারে? দিন-দুপুরে একটা জলজ্যান্ত লোককে বেঁধে তুলে নিয়ে গেল, আর আপনার মুখ দিয়ে একটা বাক্যি বেরুল না!

একজন বৃন্দাবন মোদককে জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, লোকগুলো দেখতে কি রকম বল তো?

সবারই চেহারা তো একই রকম, মুখোশ পরে ছিল, হাতে সব খোলা তলোয়ার।

সেই রোগা-গোছের ছোকরাটি হাসিয়া বলিল, ওই তলোয়ার-টলোয়ার দেখেই আপনি ঘাবড়ে গেছেন, বুঝেছি। একবার যদি একটা হাঁক দিতেন, তা হলে—

বৃন্দাবন মোদক এইবার চটিয়াছিল, তুমি থাম তো হে বাপু। সেদিন তো জ্বর থেকে ভুগে উঠলে, পেটে এখনও দিগ্‌গজ পিলে মজুত হয়ে রয়েছে। তোমার এত ফড়ফড়ানি কিসের?

যুবকটি প্রত্যুত্তর দিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়াছিল, কিন্তু হঠাৎ তাহার বাক্‌রোধ হইয়া গেল। হঠাৎ একজন লোক অশ্বপৃষ্ঠে চীৎকার করিতে করিতে বলিয়া গেল, সাবধান! হঠাৎ একদল ডাকাত এসে চারিদিকে লুঠপাট করছে, উগ্রমোহন সিংহের রতনপুর-কাছারি এইমাত্র লুঠ হয়ে গেল। সাবধান!

আকস্মিক এই বার্তায় প্রথমে সকলে একেবারে নির্বাক হইয়া গেল। বাক্যস্ফূর্তি হইল প্রথমে বৃন্দাবন মোদকের। সে সেই রোগা-গোছের ছোকরাকে বলিল, কই হে বীরপুরুষ, তোমার যে আর সাড়াশব্দ পাচ্ছি না? যাও, ডাকাতের দলকে ঠেকাও গিয়ে, যাও।

যুবকটি চোখ-মুখের এমন একটা ভাব করিল, যেন সে এখনই রতনপুর অভিমুখেই রওনা হইয়া পড়িবে; কিন্তু নিকটেই যুবকটির মাতুল রামকান্ত থাকিতে বোধ করি তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না।

রামকান্ত যুবককে ডাকিয়া বলিল, ওরে, তুই বাজে কথা ছেড়ে, একবার বাড়ির ভেতর যা দিকিন, তোর মামীকে গয়না-পত্তর সব সিন্দুকে পুরে ফেলতে বল্, আর দেখ্, শোন্।—বলিয়া সে যুবকটিকে একটু দূরে ডাকিয়া লইয়া নিম্নস্বরে কি বলিতে লাগিল।

বৃন্দাবন মোদক দেখিল, রামকান্ত নিজের ঘর সামলাইবার ব্যবস্থা করিতেছে এবং তাহা অনুকরণীয়। সে কোমর হইতে চাবিটা বাহির করিয়া দোকান অভিমুখে পা চালাইয়া দিল।

অন্যান্য সকলেও বুঝিল, এখন আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই উচিত, এবং নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল।

যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন অঘটন ঘটিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায় চতুর্দিক থমথম করিতে লাগিল।

দুই পক্ষ গিয়াই থানায় এজাহার দিল। দুই পক্ষ মানে দুই পক্ষের সিপাহীবৃন্দ। দুধনাথ পাঁড়ে অর্থাৎ উগ্রমোহন সিংহের দল গিয়া বলিল যে, তাহারা প্রভু-কর্তৃক প্রেরিত হইয়া রতনপুর-কাছারি যাইতেছিল। কিন্তু পথে বাঘাড় বিল পড়ায় তাহারা স্নানাদি সারিয়া লওয়ার উদ্দেশ্যেই নিতান্ত ভালমানুষের মতই বিলে নামিয়াছিল। কিন্তু চন্দ্রকান্তবাবুর এক সিপাহী রামবৃচ্ছ্ সিং তদ্দর্শনে অনর্থক তাহাদের গালিগালাজ করিতে থাকে এবং অকারণে লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করে।

ঠিক অকারণেও বলা যায় না। রামকৃষ্ণ সিং কিছুদিন পূর্বে উগ্রমোহন সিংহের নিকট চাকরির আশায় গিয়াছিল, কিন্তু দুধনাথ পাঁড়ের জন্য তাহার সে আশা পূর্ণ হয় নাই। দুধনাথ পাঁড়ের উপর তাই তাহার আক্রোশ ছিল। রামবৃছ্ লোষ্ট্রখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া একটি সিপাহীকে আঘাত করে, ইহাই দাঙ্গার সূত্রপাত। রামবৃছ্ সিং প্রতিবাদ করিয়া কহিল যে, ব্যাপার একেবারে অন্যরূপ। জলকরে মাছ ধরানো হইতেছিল, দুধনাথ পাঁড়ের আদেশক্রমে কয়েকজন সিপাহী গিয়া ধীবরদের জাল ছিঁড়িয়া দেয় এবং রামবৃছ্ সিং তাহার প্রতিবাদ করিতে গেলে স্বয়ং দুধনাথ পাঁড়ে তাহাকে শ্যালক সম্বোধন করিয়া গণ্ডদেশে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করে। সুতরাং দাঙ্গা হয়।

দারোগা সাহেব উভয় পক্ষের বিবৃতি টুকিয়া লইলেন এবং উভয় পক্ষেরই ধৃত দাঙ্গাকারিগণকে চালান দিলেন।

গোলোক-সাহা-হরণ ব্যাপারটা কতকগুলি দুর্ধর্ষ ডাকাতের কার্য বলিয়াই অনুমিত হইল। উগ্রমোহনের রতনপুরকাছারিতে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটিয়া যাওয়াতে এই বিষয়ে দারোগা সাহেবের অন্য সন্দেহ হইল না। তিনি চৌকিদার, দফাদার, কন্‌স্টেবল—সকলকেই এ বিষয়ে অবহিত থাকিতে বলিয়া ব্যাপারটা সদরে রিপোর্ট করিলেন এবং সেই বেদে-বেদেনীর দলকে গ্রেপ্তার করিলেন।

ফুলকি থানার হাজত-ঘরে গিয়া হাজির হইল।

।। ষোল ।।

উগ্রমোহন সিংহ বাহিনী-নদীর উপর বজরার ছাদে বসিয়া পশ্চিম দিগন্তের দিকে একাগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিলেন। সূর্য অস্ত যাইতেছে। অস্তরবির কিরণে বন্য স্রোতস্বিনী বাহিনী অপূর্ব শোভায় সাজিয়াছে। নদীর জলে একদল চক্রবাক ভাসিতেছিল। তাহাদের গৈরিক অঙ্গে, বাহিনী-তীরবর্তী শীত-রিক্ত বনশ্রীর পর্ণ-পল্লবে অস্তগামী সূর্যের স্বর্ণারুণরাগ স্বপ্নলোক সৃজন করিয়াছিল। চিত্রার্পিতবৎ বসিয়া উগ্রমোহন এই চিত্র দেখিতেছিলেন। সুদূর আকাশে শুভ্র বকের সারি উড়িয়া চলিয়াছে—যেন সন্ধ্যার কুন্তলে শ্বেত-পুষ্পের একগাছি মালা।

পদশব্দ শুনিয়া উগ্রমোহন পিছন ফিরিয়া দেখিলেন, অঘোরবাবু আসিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, কি খবর?

মানিক মণ্ডল এসেছে।

ডেকে আন এখানে।

মানিক মণ্ডল মূষিকবৎ আসিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খবর পেলে?

আজ্ঞে সঠিক কোনও খবর এখন পর্যন্ত পাইনি। তবে আমার আন্দাজ, ছেলে দুটি টাল-জঙ্গলেই আছে।

কি করে বুঝলে?

মানিক মণ্ডল চঞ্চল চক্ষু দুইটিতে একটু বুদ্ধির জ্যোতি ফুটাইয়া কহিল, মোহানিয়া ঘাটটা হঠাৎ বন্ধ করে দিয়েছেন কি না, মাঝি-মাল্লা কেউ নেই সেখানে।

ঘাট বন্ধ আছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

উগ্রমোহনের ভ্রূ কুঞ্চিত হইল।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, পাগলী নদী পেরোবার উপায় কি তা হলে? লোক যাচ্ছে কোন্ দিক দিয়ে?

অঘোরবাবু বলিলেন, মোহানিয়া ঘাট দিয়ে এক টাল ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়া যায় না। ওটা ও-তরফের খাস-ঘাট, সরকারী নয়। টাল বনকর তো চন্দ্রকান্তবাবু কাউকে বন্দোবস্ত করেন নি, ওটা খাসেই আছে। সেইজন্যে মোহানিয়া ঘাট বন্ধ করলে সাধারণের কোন অসুবিধা নেই। সাধারণত লোকে পাগলী নদী পার হয় ছর্‌রামারি ঘাটে, এখান থেকে প্রায় আট ক্রোশ দূরে।

উগ্রমোহন সিংহ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়াই রহিলেন।

হঠাৎ তিনি বলিলেন, মানিক মণ্ডল, তুমি আজ এখানেই থাক। আমি সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি। সিপাহীর মারফত তোমার বাড়িতেও খবর পাঠাও যে, তুমি আজ ফিরবে না। এখন তুমি নীচে গিয়ে বস।

মানিক মণ্ডল এইরূপ আদেশের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া একটু আমতা-আমতা করিয়া কহিল, হুজুর, আমার মেজো ছেলেটার জ্বর দেখে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, তা না হলে—

উগ্রমোহন বলিলেন, তুমি যে খবর এনে দিচ্ছ, তা ঠিক কি না, তা না জানা পর্যন্ত তোমাকে ছাড়ব না। সিপাহীরা যদি ফিরে এসে বলে যে, মোহানিয়া ঘাট বন্ধ আছে, তা হলে তুমি ছাড়া পাবে, তার আগে নয়। যাও, বিরক্ত করো না।

মানিক মণ্ডল সভয়ে নীচে নামিয়া গেল।

উগ্রমোহন অঘোরবাবুকে বলিলেন, তুমি বিশজন সিপাহী পাঠাও। তারা প্রথমে মোহানিয়া ঘাটে যাবে। ঘাট যদি বন্ধ থাকে, একজন ফিরে এসে খবর দেবে। বন্ধ যদি না থাকে, তা হলেও এসে খবর দেবে। ঘাট বন্ধ থাকলে ছর্‌রামারি ঘাট দিয়ে পাগলী পেরিয়ে আজ রাত্রেই তারা চন্দ্রকান্তের টাল-কাছারিতে যেন পৌঁছয়। সেখানে যদি মৃন্ময়ের ছেলেরা থাকে, তাদের ছিনিয়ে কেড়ে আনতে হবে। যদি আনতে পারে প্রত্যেককে ভাল করে বকশিশ দেব—বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অঘোরবাবু নীচে নামিয়া গেলেন।

উগ্রমোহন পশ্চিম দিগন্তের দিকে আবার চাহিয়া দেখিলেন। সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া আসিতেছে, কিন্তু অস্তরবির আলোক নিবিয়াও যেন নিবে না।

।। সতেরো ।।

মিশিরজী মল্লারে গান ধরিয়াছিলেন—

বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে—

একজন তবলায় ঠেকা দিতেছিল। চন্দ্রকান্ত তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। তাঁহার চক্ষু দুইটি মুদিত। অঙ্গে একখানি সুকোমল বালাপোশ, হাতে আলবোলার নল। চতুর্দিকে অম্বুরি-তামাকের গন্ধ। চন্দ্রকান্ত মাঝে মাঝে আলবোলায় মৃদু টান দিতেছেন। গান বেশ জমিয়া উঠিয়াছে।

এমন সময় রসভঙ্গ করা ঠিক হইবে না ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু ম্যানেজার বাহিরে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন। গান যত জমিয়া উঠিতেছে, কমলাক্ষবাবুর অধীরতা ততই বাড়িতেছে। মালিকের সঙ্গে দেখা করা নিতান্ত প্রয়োজন। বাঘাড় বিল দাঙ্গা সম্পর্কে উগ্রমোহনবাবুকে আসামী করা সমীচীন কি না, তাহা চন্দ্রকান্তকে একবার জিজ্ঞাসা করা দরকার। গানটা থামিলেই তিনি কাজটা সারিয়া লইবেন। এদিকে মিশিরজীর গান আর থামে না; তিনি উচ্ছ্বাসভরে গাহিয়া চলিলেন—

বাদর ঝুমি ঝুমি আয়ে
বরণ বরণ বরষণ প্রাণ প্যারে—

চন্দ্রকান্তবাবু চক্ষু বুজিয়া গান শুনিতেছেন, চিন্তাও করিতেছেন। থানার দারোগা বুঝিতে না পারুক, চন্দ্রকান্ত রায় ইহা নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিলেন যে, গোলোক সাকে উগ্রমোহনই ধরিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং পুলিসের দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটাইবার জন্য নিজেই নিজের রতনপুর-কাছারি লুণ্ঠন করাইয়াছেন। সাধারণ লোক হইলে চন্দ্রকান্ত রায় ভিতরকার ব্যাপারটা নানা বর্ণসমাবেশ-সহকারে এতদিন পুলিসকে জানাইয়া দিতেন। কিন্তু তিনি ভিন্ন জাতের মানুষ। প্রসিদ্ধ দাবা-খেলোয়াড়। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' নীতির অনুসরণ করিয়া এ ব্যাপারের কোন সুরাহা হইতে পারে কি না, তাহাই তিনি ভাবিতেছিলেন। টালজঙ্গলে মৃন্ময় ঠাকুরের দুই পুত্রকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহাদেরও অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা করা দরকার। দুইটি সমস্যাই জটিল। সুতরাং যদিও মিশিরজী প্রাণ ঢালিয়া গাহিতেছিলেন এবং তবলাবাদক নিখুঁতভাবে ঝাঁপতাল বাজাইতেছিল, তথাপি চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ মন দিতে পারিতেছিলেন না। বরং সঙ্গীতের অন্তরালে ব্যাপারটাকে আগাগোড়া ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। গান বন্ধ হইল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, বহুৎ আচ্ছা।

কমলাক্ষবাবু ওত পাতিয়া ছিলেন। দ্বারদেশে গলা বাড়াইলেন। গলা বাড়াইতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে একেবারে এস, তোমাকে একবার বেরুতে হবে। বিরিঞ্চিকে হাতীটা কষতে বল। আর দেখ, রাধিকামোহনকে একবার খবর দাও তো। কোথা হইতে কি হইল ভাবিয়া কমলাক্ষবাবু নির্বাক হইয়া রহিলেন।

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত মিশিরজীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আর একটা হোক মিশিরজী।

মিশিরজী হাসিয়া বলিলেন, জী হুজুর।

তৎপরে একটু ভাবিয়া বলিলেন, তব্ এক সুরদাসী মল্লার শুনিয়ে। গান্ধার-বর্জিত সুরট্। তবলাবাদককে বলিলেন, বাজাও চৌতাল। সুরদাসী মল্লারে মিশিরজী গান ধরিলেন—

আধো মুখ নীলাম্বর সোঁ ঢাকি
বিথুরী অলক কৈসি হৈ।
এক দিশা মানো মকর চাঁদনী
এক দিশা ঘন বিজুরী ঐসে হরি মন মো হৈ।

মিশিরজীর সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে তাঁহারা বিদায় লইলেন। চন্দ্রকান্ত তথাপি এক ভাবেই বসিয়া রহিলেন। রাধিকামোহন আসিয়া দেখিল যে, চন্দ্রকান্ত নিমীলিত নয়নে ধূমপান করিতেছেন। তাহার পায়ের শব্দ পাইয়াও তিনি চোখ খুলিলেন না দেখিয়া রাধিকামোহন কথা কহিল, হুজুর কি আমায় ডেকেছেন?

চন্দ্রকান্ত চক্ষু খুলিয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বস।

রাধিকামোহন উপবেশন করিলে তিনি বলিলেন, আচ্ছা, সেদিন যখন তুমি গোলোক সার কাছে টাকা আনতে যাও, তখন আর কেউ কি ছিল সেখানে?

কোন্‌খানে?

গোলোক সার বাড়িতে।

আজ্ঞে না।

চন্দ্রকান্ত একটু ভাবিয়া বলিলেন, তা হলে কথাটা প্রকাশ পেল কি করে? গোলোক সা কাউকে বলবে বলে তো মনে হয় না।

তখন রাধিকামোহন একটু চিন্তা করিয়া কহিল, কেন, কথাটা কি প্রকাশ পেয়েছে? আমি যখন টাকাটা জমা করি, তখন আমাদের মাধব গোমস্তা জিজ্ঞেস করেছিল আমাকে— কোথা থেকে টাকা এল? তাকে অবশ্য আমি বলেছিলাম। হুজুরের তো কোন নিষেধ ছিল না।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তুমি সেই গোমস্তাকে ডেকে দিয়ে যাও।

একটু পরে মাধব ঘোষাল গোমস্তা আসিল। তাহাকে প্রশ্ন করিয়া চন্দ্রকান্ত জানিতে পারিলেন যে, মানিক মণ্ডলের কাছে সে গল্পটা করিয়াছিল বটে। তাহাকে বিদায় দিয়া চন্দ্রকান্ত আপন মনে একটু হাসিলেন। সে হাসির অর্থ—ব্যাপারটা এইবার বোঝা গিয়াছে।

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিলেন। তিনি আসিতেই চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, তুমি এখনই সোজা টালে চলে গিয়ে ছেলে দুটোকে নিয়ে আমাদের নবিপুর কাছারিতে এনে রাখ আজ রাত্তিরেই। মোহানিয়া ঘাট কি বন্ধ আছে এখনও?

হ্যাঁ।

বেশ, তুমি হাতীসুদ্ধ সাঁতরে ওপারে যাবে। বুঝলে? সেখানে গিয়ে ছেলেদের কাছে বলবে যে, ভুল করে তাদের তুমি টালে পাঠিয়ে দিয়েছিলে বলে লজ্জিত। মাঝির অসুখ করার জন্যে ঘাট দু'দিন বন্ধ ছিল বলে তাদের ফেরবারও বন্দোবস্ত করতে পারনি। এখন তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে হাতী এনেছ। তারপর তারা হাতীতে চড়লে কিছুদূর গিয়ে বলবে যে, মহা মুশকিল, হাতী নবিপুর কাছারির রাস্তা ধরেছে, নিমাইনগরের দিকে কিছুতেই যাবে না। বিরিঞ্চিকে দিয়ে এটা বলাবে। আগে থাকতে শিখিয়ে রেখো তাকে। বিশ্বাস আর তার ছেলেকেও সঙ্গে নিয়ে যেও। বুঝলে?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ঠিক পারবে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়ালের মত প্রভুর দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, হাতী তৈরি হল কি না! হ্যাঁ, আর এক কাজ কর। যাবার সময় তুমি থানা হয়ে যাও। দারোগার সঙ্গে আলাপ আছে?

আছে।

তা হলে শোন।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত তাঁহার কানে কানে চুপিচুপি কি একটা বলিয়া দিয়া আবার বলিলেন, বেশি কিছু নয়, মানিক মণ্ডলকে যেন একটু কড়কে দেয়।

আচ্ছা।—বলিয়া কমলাক্ষবাবু বিদায় লইলেন। একটু পরে ঘণ্টার ঢং-ঢং শব্দ করিতে করিতে চন্দ্রকান্ত রায়ের হস্তী মোহানিয়া ঘাট অভিমুখে চলিয়া গেল।

ম্যানেজার চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত সেতারটা পাড়িয়া একটা বেহাগের গৎ আলাপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ আলাপ করিবার পর হঠাৎ তিনি বাজনা থামাইয়া হাঁক দিলেন, ওরে ভজনা! ভজনা আসিলে তাহাকে বলিলেন, একটা কাগজ কলম আর দোয়াত নিয়ে আয় তো। ভজনা দপ্তরখানায় কাগজ কলম এবং দোয়াতের সন্ধানে চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত আবার বেহাগে মন দিলেন। ভজনা ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, প্রভু তন্ময় হইয়া বাজাইতেছেন। সে সন্তর্পণে কাগজ কলম দোয়াত প্রভুর নিকটে রাখিয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। চন্দ্রকান্ত জানিতে পর্যন্ত পারিলেন না।

বেহাগ রাগিণীকে নিঙড়াইয়া ছাড়িয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত যখন চক্ষু খুলিলেন, তখন তিনি সম্মুখে কাগজ কলম এবং দোয়াত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার মুখে মৃদু একটি হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। দুষ্ট বালকের মত তিনি বাম হস্তে লেখনী ধারণ করিয়া লিখিলেন, গোলোক সাকে ছাড়িয়া না দিলে অজয়-বিজয়কে পাইবে না। চিঠিটা লিখিয়া তিনি আবার ভজনাকে ডাকিলেন। বলিলেন, জমাদার সীতারাম পাঁড়েকে ডেকে আন্।

বৃদ্ধ জমাদার সীতারাম পাঁড়ে আসিলে তিনি বলিলেন, এই চিঠিখানা উগ্রমোহনবাবুর চাকর ব্রজকে দিয়ে আসতে হবে। অথচ ব্রজ যেন জানতে না পারে যে, চিঠিটা আমি লিখেছি। তুমি

যেও না, অন্য কোন লোক মারফৎ পাঠাও, সে যেন বলে আসে যে, উগ্রমোহনবাবু এলেই যেন চিঠিটা দেওয়া হয়। বুঝলে? সীতারাম পাঁড়ে চন্দ্রকান্তের দিকে মিটিমিটি একবার চাহিয়া হাসিয়া পত্রটি লইয়া প্রস্থান করিল।

সকলে যখন চলিয়া গেল, তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত একাকী বসিয়া রহিলেন। গান-বাজনা আর ভাল লাগিতেছে না। উগ্রমোহন এখনও ফেরেন নাই, দাবা-খেলা বন্ধ। সহসা চন্দ্রকান্তের মনে হইল, উগ্রমোহন না থাকিলে তাঁহাকে এতদিন বোধ হয় বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইত। উগ্রমোহনই তাঁহার জীবনের একমাত্র আশ্রয়—তাঁহার প্রতিভার প্রেরণা। উগ্রমোহন-রূপ কঠিন প্রস্তরখণ্ডে বারংবার ঘর্ষিত না হইলে চন্দ্রকান্তের বুদ্ধির ছুরিকায় মরিচা ধরিয়া যাইত।

সত্যই চন্দ্রকান্ত পৃথিবীতে একা। পিতা মাতা মারা গিয়াছেন, ভগ্নীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। নিজে বিবাহ করেন নাই, সুতরাং আপনার বলিতে আর কে আছে? কেহ নাই। থাকিবার মধ্যে আছে প্রকাণ্ড জমিদারি এবং তাহার প্রকাণ্ড আয়োজন। কিন্তু তাহাতে কি অন্তর ভরে? অন্তরের ক্ষুধা মিটাইবার জন্য যে সুধা প্রয়োজন, তাহা চন্দ্রকান্তের নাই। তাঁহার জীবনে যে কয়জন নারী দেখা দিয়াছিল, সকলেরই মধ্যে তিনি পণ্য-রমণীর মূর্তি দেখিয়াছেন। সকলেই নিজেকে যেন নিলামে বিক্রয় করিতে চায়, যে ক্রেতা বেশি দাম দিবে ইহারা তাহারই। সভ্য-সমাজে তিনি যতটা দেখিয়াছেন, টাকা দিয়া যেমন জামা কেনা যায়, জুতা কেনা যায়, হাতী কেনা যায়, প্রেমও কেনা যায়।

জামা, জুতা, হাতী, প্রেম—কোনটার সম্বন্ধেই তাঁহার আর মোহ নাই। অন্তরলোকের নির্জন মহাশূন্যে তাঁহার নিঃসঙ্গ আত্মা নিঃসঙ্গ নক্ষত্রের মতই একা জ্বলিতেছে।

কিছুক্ষণ নীরবে বসিয়া থাকিয়া চন্দ্রকান্ত ভজনাকে ডাকিলেন। ভজনা আসিল। চন্দ্রকান্ত বলিলেন, ওরে জুতো আর ছড়িটা আন্ তো।

চন্দ্রকান্ত অন্ধকারে একাকী বাহির হইয়া গেলেন। দেউড়ীর সিপাহী ঢং ঢং করিয়া বারোটার ঘণ্টা বাজাইল।

দিনের পৃথিবী ঘুমে মগ্ন, রাত্রির পৃথিবী জাগিয়াছে। দিনের পৃথিবীর সমস্ত আলোক লইয়া সূর্য অস্ত গিয়াছে। রাত্রির আকাশে কোটি কোটি সূর্য উঠিয়াছে, অন্ধকার তবু যায় না। রাত্রির পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যাইতেছে, অতি মৃদু অব্যক্ত সে ধ্বনি—শব্দহীন অথচ সুস্পষ্ট। দিবসের পৃথিবীতে মানুষের কোলাহল, পৃথিবীর প্রাণের স্পন্দন শোনা যায় না।

নদীর তীরে তীরে চন্দ্রকান্ত একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। কত কথাই মনে হইতেছে! কত ভাব মনে আসিতেছে, যাহার ভাষা নাই। যাহার ভাষা আছে, তাহা বলিতে ইচ্ছা করে না। গভীর নিশীথে আকাশের দিকে চাহিয়া সমস্ত ভাষা স্তব্ধ হইয়া যায়। বিস্মিত অন্তরে শুধু দুইটি কথা জাগে, আমি কত ক্ষুদ্র, আমি কত বৃহৎ।

সহসা অকারণে চন্দ্রকান্তের সুজাতার কথা মনে হইল। সুজাতার চক্ষু দুইটি যেন তাঁহার দিকে চাহিয়া আছে, নীরব বেদনা তাহা হইতে ক্ষরিয়া পড়িতেছে। তাহার অশ্রুজলে চন্দ্রকান্তের সমস্ত অন্তর যেন পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সুজাতা গেল, আসিল কমলা। সেই দুরন্ত হাস্যমুখী কমলা। চন্দ্রকান্তের ক্ষুধিত আত্মা অতীতের অন্ধকারে কাহাকে যেন খুঁজিয়া ফিরিতেছে। বেহাগের পদটা মনের মধ্যে আসা-যাওয়া করিতেছে—

শ্যাম মোরি আঁখন বীচ সমায় রহো
লোগ জানে কজরারে!

মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা—সব মিথ্যা। কবির কল্পনা। রাধিকা কল্পনা, কৃষ্ণ কল্পনা, প্রেম কল্পনা। সত্য শুধু কবিত্বটুকু। সত্য শুধু সঙ্গীত, সুরের উন্মাদনা। সেই উন্মাদনায় মাতিয়া পৃথিবীসুদ্ধ লোক রাধার বিরহে কাঁদিয়া মরিতেছে।

মেঘের স্তর ভেদ করিয়া কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠিল। অন্ধকারের যবনিকা সরিয়া গেল। রঙ্গমঞ্চে নূতন নট-নটীর সমাগম হইল। স্বচ্ছসলিলা চন্দনা-নদী ও ওপারের শুভ্র বালুচর। ক্ষিপ্রস্রোতা তন্বী চন্দনা যেন কাহার অভিসারে ছুটিয়া চলিয়াছে, ব্যর্থ-প্রেমিক শুভ্র বালুচর স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। বালুচর অনন্ত স্বপ্নে নিমগ্ন। স্বপ্নই তাহার সম্বল। সে প্রতীক্ষা করিয়া আছে, কবে বর্ষার বান আসিবে! কূলের বাঁধন ভাঙ্গিয়া আকুল চন্দনা কবে তাহাকে আবিল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্লাবিত করিয়া দিবে! বর্ষা আসে, কিন্তু থাকে না। চন্দনার স্রোতে কত বর্ষা আসিল, কত বর্ষা গেল। বালুচর কতবার ডুবিল, কতবার উঠিল। চন্দনা আজও বহিতেছে, বালুচর আজও জাগিয়া আছে। চিরন্তন কাহিনী।

চন্দ্রকান্ত নদীর ধারে গেলেন। কাছেই একটা জেলেডিঙি হইতে কে গাহিয়া উঠিল—

আধি রাতি রে পাপিহারা
পিয়া পিয়া বোলে—!
পিয়া পিয়া বোলেরে পিয়া
পিয়া গিয়া বিদেশে
কৈসে ভেজু রে সন্দেশ।

সেই চিরন্তন বিরহের গান। আকাশ, বাতাস, নদী, বালুচর, মানব-মানবী—সকলের মনে সেই এক সুর, পাইলাম না। যাহাকে চাই, ঠিক লগ্নটিতে তাহাকে পাইলাম না। সে দূরেই রহিয়া গেল। সহসা চন্দ্রকান্তের ফুলকির কথা মনে পড়িল। মেয়েটির সহিত পরিচয় করিয়া দেখিলে হয়। কিন্তু তখনই আবার তাঁহার সমস্ত অন্তর বলিয়া উঠিল, কাছে যাইও না। কাছে গেলেই মোহ টুটিয়া যাইবে। মোহ টুটিয়া গেলেই ফুলকি নিবিয়া যাইবে। সুজাতার কাছে গিয়াছিলে, লাভ কি হইয়াছে? তাহার বণিকবৃত্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছ মাত্র। পৃথিবীসুদ্ধ নারীর মনোবৃত্তি হয়তো ওই। কি হইবে এই সার সংগ্রহ করিয়া? তাহার চেয়ে দূর হইতে দাঁড়াইয়া স্বপ্ন দেখাই কি ভাল নয়?

ওই ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি জ্বলিতেছে। জ্বলিতেছে এবং নিবিতেছে, দাঁড়াইয়া দেখ। পার তো উহাদের লইয়া কবিতা রচনা কর, সুখ পাইবে। কিন্তু জোনাকিকে ধরিয়া যদি বিশ্লেষণ করিতে যাও, দেখিবে উহা কীটমাত্র। কবিত্ব তখন আর থাকিবে না।

খানিকটা আবছা, খানিকটা অন্ধকার প্রয়োজন। অস্পষ্ট অজানাকে লইয়া মন স্বপ্ন-রচনা করিতে চায়। সমস্ত জানিতে চাহিও না। সমস্ত জানিতে পারিবে না। সবজান্তা হইবার ব্যর্থ চেষ্টায় জীবনটা শুধু বিফল হইয়া যাইবে। কত কথাই চন্দ্রকান্তের মনে হইতে লাগিল। একাকী তিনি অন্ধকারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

যখন তিনি বাড়ি ফিরিলেন, তখন রাত্রি আর বেশি বাকি নাই। পূর্বাকাশে অরুণাভাস দেখা যাইতেছে। দ্বিধাভরে দুই-একটা পক্ষী ডাকিয়া আবার থামিয়া যাইতেছে। শুইবেন কি না চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, গেটের ভিতর দিয়া গঙ্গাগোবিন্দ প্রবেশ করিতেছেন।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, এত ভোরে বেরিয়েছ আজ?

গঙ্গাগোবিন্দ কিছু না বলিয়া একটু হাসিলেন। তাহার পর বলিলেন, কিছুদিন আগে উপনিষদে পড়েছিলাম—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো।
রূপং রূপং প্রতিরূপং বভুব
একস্তথা সর্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, অর্থাৎ?

অর্থাৎ, একই অগ্নি দাহ্যবস্তুর রূপভেদে যেমন ভিন্ন রূপ ধারণ করে, একই অন্তরাত্মা তেমনই বস্তুভেদে নানা মূর্তিতে প্রকাশিত হন। এর সত্যতা আজ উপলব্ধি করছি।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, হেঁয়ালি বুঝতে পারছি না।

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিলেন। বলিলেন, জাগরণের জগতে যে ব্যক্তি অতি রূঢ়, স্বপ্নের জগতে সে অতি কোমল। আজ তার প্রমাণ পেয়েছি।

কি প্রমাণ?

এইমাত্র একটা স্বপ্ন দেখে উঠে আসছি।

কি স্বপ্ন?

বাণীকে স্বপ্ন দেখলাম, অর্থাৎ রাণী বহ্নিকুমারীকে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই না কি?

।। আঠারো ।।

উগ্রমোহন সিংহ এত বিস্মিত জীবনে আর কখনও হন নাই।

মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয় হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে, কিছুতেই তাহাদের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। নানাবিধ চেষ্টার ত্রুটি নাই, কিন্তু সাফল্যের চিহ্নমাত্র দেখা যাইতেছে না। গতকল্য তাঁহার

সিপাহীগণ আসিয়া খবর দিয়াছে যে, টাল জঙ্গলে কেহ নাই। চন্দ্রকান্তবাবুর একজন সিপাহীর মুখে তাহারা শোনে যে, মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদের লইয়া কমলাক্ষবাবু হস্তী-পৃষ্ঠে নিমাইনগরে যাত্রা করিয়াছেন। এই শুনিয়া সিপাহীরা নিমাইনগরে গিয়াছিল, কিন্তু সেখানেও কেহ নাই।

মৃন্ময় ঠাকুর কিছুক্ষণ পূর্বে দুইজন সিপাহী সমভিব্যাহারে পুত্র-অপহরণের জন্য কমলাক্ষবাবুর নামে নালিশ করিতে থানায় গিয়াছেন। থানার শরণাপন্ন হওয়া উগ্রমোহন সিংহের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের আগ্রহাতিশয্যে এবং গত্যন্তর না থাকায় অগত্যা তিনি রাজী হইয়াছিলেন।

যম-জঙ্গল কাছারির পার্শ্ববর্তী বনপথে উগ্রমোহন সিংহ তাঁহার প্রাত্যহিক প্রাতঃকালিক ব্যায়ামান্তে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার মনে সুখ নাই, মুখে চিন্তার রেখা।

তিন দিন তিনি বাড়ি ফেরেন নাই। বজরায়, অশ্বপৃষ্ঠে, বাথানে, যম-জঙ্গলে ঝটিকার মত তিনি ছুটিয়া ফিরিয়াছেন। কিন্তু মৃন্ময় ঠাকুরের পুত্রদ্বয়ের নাগাল পান নাই।

অঘোরবাবুরও পরামর্শ তিনি পাইতেছেন না। দিনের বেলা বাথানে অঘোরবাবু রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে লইয়া ব্যস্ত থাকেন। রাত্রে তাঁহাকে গোলোক সার রক্ষণাবেক্ষণ করিতে হয়। গোলোক সা চামা-প্রান্তরের কালীবাড়িতে বন্দী অবস্থায় বাস করিতেছে। চামা একটি চারক্রোশব্যাপী বিরাট মাঠ। যতদূর দৃষ্টি যায়, ঊষর প্রান্তর ছাড়া সেখানে আর কিছুই চোখে পড়ে না, দৃষ্টি চক্রবালরেখায় থামিয়া যায়। চামাপ্রান্তরে লোক-চলাচল নাই। এই মাঠ সম্বন্ধে এমন সব অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে, যাহা শুনিলে যে-কোন সাধারণ লোকেরই হৃৎকম্প হইবার কথা। ভূত, প্রেত, পিশাচ অহরহ নাকি ওই প্রান্তরে ঘুরিফ বেড়ায়! কত লোক পথহারা হইয়া এই প্রান্তরে প্রাণ বিসর্জন দিয়াছে! এই প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—মহাকালী। মাঠের ঠিক মধ্যস্থলে মহাকালীর একটি মন্দির। মন্দিরটি বহু প্রাচীন, মহাকালীর মূর্তিটিও ভীষণদর্শনা। কে এই মন্দির নির্মাণ করিয়া এই নির্জন প্রান্তরে কালীমূর্তি স্থাপিত করিয়াছিল, তাহা জানা নাই। চামা-প্রান্তর বর্তমানে উগ্রমোহন সিংহের জমিদারির অন্তর্ভুক্ত। একজন বিশ্বাসী ব্রাহ্মণ-সিপাহী এই মন্দিরের রক্ষক এবং কালীর পূজারী। এই মন্দিরের সংলগ্ন একটি কক্ষে উপাস্থিত গোলোক সা বন্দী অবস্থায় আছে।

উগ্রমোহন সিংহ একাকী বনের মধ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে নানা উদ্ভট ও অসম্ভব কল্পনা জাগিতেছিল। তিনি ভাবিতেছিলেন যে, যদি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির সহিত অজয়-বিজয়ের বিবাহ না হয়, তাহা হইলে তিনি ওই বিস্ফারিত-চক্ষু মৃন্ময়কে হত্যা করিয়া তাঁহার ছিন্ন মুণ্ডটা চন্দ্রকান্তকে উপহার পাঠাইয়া দিবেন। আবার তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইতেছিল, মৃন্ময়ের দোষ কি? তিনি তো কোন আপত্তি আর করিতেছেন না! বরং স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থানায় গিয়াছেন পুত্রদের সন্ধান-কামনায়।

কমলাক্ষ লোকটিকে গুম করিয়া দিলে কেমন হয়? ভিখন তেওয়ারী আসিয়া তাঁহার

চিন্তাধারা বিঘ্নিত করিল। কহিল, চন্দ্রকান্তবাবুর নিকট হইতে এই খত অর্থাৎ চিঠি আসিয়াছে। পত্র পড়িয়া উগ্রমোহন অবাক হইয়া গেলেন। পত্রে আছে—

বন্ধু,

তোমার ভাবী নাতজামাইগণ তোমার নাতিনীদ্বয়কে দেখিবার সদিচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া বাড়ি হইতে যাত্রা করিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমক্রমে তাহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছে। ভ্রমণ-কাহিনীটা উহাদের মুখেই শুনিতে পাইবে। বিবাহ শুনিয়াছি তেইশে মাঘ। এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই লক্ষ্ণৌ হইতে বাইজী আনাইবার বন্দোবস্ত করিলাম। মীর সাহেবও আসিবেন। এই সুযোগে একটু আমোদ-আহ্লাদ করা মন্দ কি? তুমি কবে ফিরিতেছ? বহুদিন দাবা-খেলা বন্ধ আছে।

চন্দ্রকান্ত

উগ্রমোহন আসিতেই অজয়-বিজয় আসিয়া তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি দেখিলেন, চন্দ্রকান্তের পালকি করিয়া তাহারা আসিয়াছে। বিস্মিত উগ্রমোহন বুঝিতেই পারিলেন না, কেমন করিয়া কি ঘটিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত রায়ও কম বিস্মিত হন নাই। গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া তাঁহাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছেন, মৃন্ময় ঠাকুরের ছেলেদের যেন ফিরাইয়া দেওয়া হয়। উহাদের হস্তেই তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে সম্প্রদান করিবেন মনস্থ করিয়াছেন। সেদিন ভোরে স্বপ্ন দেখিবার পর অকস্মাৎ তাঁহার মত বদলাইয়া গিয়াছে।

মানুষের মতামত কখন কোন্ কারণে যে কি করিয়া বদলায়, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

উগ্রমোহন অজয়-বিজয়কে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিলেন। তাহাদের বসাইয়া তিনি চন্দ্রকান্তকে একখানি পত্র লিখিলেন—

ভাই চন্দ্রকান্ত,

অজয়-বিজয় নির্বিঘ্নে পৌঁছিয়াছে। তাহাদের ভ্রমণকাহিনী আমি জানি। নাচগানের বন্দোবস্ত করিয়া ভালই করিয়াছ। আজই রাত্রে ফিরিব।

উগ্রমোহন

পুনশ্চ। তুমি বাইজী আনাইবার বন্দোবস্ত কর, আমি আসর সাজাইবার ভার লইলাম।

চিঠি লইয়া চন্দ্রকান্তের সিপাহী ফিরিয়া গেলে পালকি করিয়া অজয়-বিজয়কে তিনি সদরে, অর্থাৎ নিজের বাটিতে পাঠাইলেন। সকলে চলিয়া গেলে উগ্রমোহন দেহে ও মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

অজয়-বিজয়কে শেষকালে চন্দ্রকান্ত ফিরাইয়া দিল। ভয় খাইয়া, না, অনুগ্রহ করিয়া?—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কিছুতেই ঠিক করিতে না পারিয়া অশ্বারোহণে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন।

সেইদিন রাত্রে উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত দাবা লইয়া বসিলেন। বহুকাল এরূপ খেলা তাঁহারা খেলেন নাই। রাত্রি দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে, দাবার ছকের উপর দৃষ্টি রাখিয়া নিস্পন্দভাবে দুই জনে বসিয়া আছেন।

।। উনিশ ।।

রুমনি-ঝুমনির বিবাহকে কেন্দ্র করিয়া দুই পরাক্রান্ত জমিদার উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত মাতিয়া উঠিয়াছেন। কলিকাতা হইতে গোরার বাদ্য, লক্ষ্ণৌ হইতে হাসীনা বাইজী, আগ্রা হইতে সেতারী মীর সাহেব এবং কাশী হইতে কয়েকজন বিখ্যাত কুস্তিগীর পালোয়ান আসিয়াছেন। দুই জমিদারের এলাকায় যত ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বাঁশী ও খঞ্জনী ছিল—সব আসিয়া জুটিয়াছে এবং বিচিত্র শব্দসমন্বয়ে চতুর্দিক সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। গ্রামের মধ্যে এবং গ্রামের ঠিক বাহিরে যত ফাঁকা জায়গা ছিল, তাঁবুতে ভরিয়া গিয়াছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্তের সম্মানিত অতিথিবর্গ তাঁবুগুলিতে অবস্থান করিতেছেন। প্রত্যেক তাঁবুতে পৃথকভাবে পাচক, ভৃত্য এবং রন্ধনের বন্দোবস্ত আছে। অতিথিদের অভিরুচিমত স্নানাহারের যেন ত্রুটি না হয়। ভাণ্ডারীগণ প্রয়োজন ও ফরমায়েশ মত প্রতি তাঁবুতে সিধা দিয়া ফিরিতেছে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত নিজেরা প্রতি তাঁবুতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আলাপ-আপ্যায়ন করিতেছেন। উভয়েরই কাছারি-বাড়িতে প্রকাণ্ড আটচালার নীচে সারি সারি ভিয়ান বসিয়া গিয়াছে। দিবারাত্র আহারের আয়োজন। চতুর্দিকেই দীয়তাং ভুজ্যতাং। উভয় পক্ষেই নায়েব গোমস্তা হইতে আরম্ভ করিয়া চাকর ঠাকুর সকলেরই গলা ভাঙিয়াছে। একদল সাঁওতাল যুবক-যুবতী মহানন্দে নাচ জুড়িয়া দিয়াছে। সারি বাঁধিয়া মাদলের তালে তালে গান গাহিয়া তাহারা একদল অতিথিকে সন্তুষ্ট করিতেছে। কোনখানে আবার মহাসমারোহে ঝুমুর জমিয়া উঠিয়াছে। সেখানেও একদল মুগ্ধ দর্শক। সুখপুর গ্রামের রামলীলার দলও এ সুযোগে নিজেদের কৃতিত্ব দেখাইতে ছাড়ে নাই। হনুমানের অভিনয় সত্যই উপভোগ্য। বহু লোক সেখানে ভিড় করিয়াছে। উগ্রমোহন সিংহ এবং চন্দ্রকান্ত রায়ের সর্বসুদ্ধ ছয়টি হস্তী-হস্তিনী আছে। রুমনি-ঝুমনির বিবাহ উপলক্ষ্যে তাহারা বিচিত্র সাজে সাজিয়াছে। কাহারও পিঠে হাওদা, কাহারও পিঠে সোনার কাজ-করা মখমলের বিস্তৃত আস্তরণ দুলিতেছে। কেহ বাজনার তালে তালে গা দোলাইতেছে, কেহ বিশাল দন্ত-গৌরবে সকলকে ভীত-চমৎকৃত করিতেছে। তাহাদের মাথায় কপালে তৈল ও বর্ণ সহযোগে নানাপ্রকার চিত্রাঙ্কন করা হইয়াছে।

মাহুতগণেরও পোশাকের আজ পারিপাট্য। হেই-ধেৎ-বিরি প্রভৃতি বিচিত্র শব্দ উচ্চারণ করিয়া তাহারা কাজে অকাজে হস্তীদলকে লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

নানা বর্ণের বিশালকায় অশ্বগুলি সুসজ্জিত। রামপ্রসাদ নামক সিপাহী একটি কৃষ্ণবর্ণ অশ্বিনীপৃষ্ঠে চড়িয়া ব্যাণ্ডবাদকদের নিকট গিয়া নিজের পারদর্শিতা দেখাইতেছে। ব্যাণ্ডের তালে তালে অশ্বিনী গ্রীবাভঙ্গীসহকারে এমন নৃত্য করিতেছে যে, সকলের তাক লাগিয়া গিয়াছে।

উগ্রমোহন সিংহের বাড়ির সম্মুখস্থ ময়দানে কাশী হইতে সমাগত পালোয়ানবৃন্দ মহা-উৎসাহে কুস্তি শুরু করিয়াছে। দুইজন ভীমকায় পালোয়ান মহাপরাক্রমে মল্লযুদ্ধে ব্যাপৃত। যুযুধান বীরগণকে ঘিরিয়া একদল বিস্মিত

কিছুদূরে উগ্রমোহন সিংহের নির্দেশমত প্রকাণ্ড একটি সামিয়ানা টাঙাইবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। অক্ষয় গোমস্তা পনরো-কুড়িজন মজুর লইয়া চেঁচামেচি জুড়িয়া দিয়াছে। যদিও রাত্রি বারোটার পর এই সামিয়ানাতলে হাসীনা বাইজী অবতীর্ণা হইবে, কিন্তু মালিকের হুকুম যে, সন্ধ্যার মধ্যেই যেন সামিয়ানা টাঙানো শেষ হইয়া যায়। সুতরাং অক্ষয় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

চন্দ্রকান্ত টিয়াডাঙ্গার জমিদারের তাঁবুতে বসিয়া আছেন।

টিয়াডাঙ্গার জমিদার গীতবাদ্যের একজন গুণী সমঝদার। সুবিখ্যাত সেতারী মীর সাহেবের সেতারের বৈঠক তাঁহারই তাঁবুতে বসিয়াছে। গ্রামের তবলাবাদক বিষ্ণুপদ বাহাদুরি করিয়া মীর সাহেবের সহিত বাজাইতে গিয়া নাস্তানাবুদ হইয়া পড়িয়াছে। মীর সাহেব কৃপা-মিশ্রিত হাস্যের সহিত তাহাকে সংশোধন করিয়া লইতেছেন। মীর সাহেবের খাস তবলচী করিম খাঁ বিষ্ণুপদর এতাদৃশ অবস্থাসঙ্কট দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

পার্শ্ববর্তী একটি তাঁবুতে তাস-খেলা চলিতেছে। খেলাত গঞ্জের চৌধুরীবাবুদের বাড়ির ছেলেরা আসিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সমাগত তাঁহাদের জামাইবাবুকে তাস-খেলায় কোণঠেসা করিয়া তাঁহারা মহা উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন। একজন খেলোয়াড় একখানা হরতনের আটা চাপড়াইয়া ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, নহলাখানা কেমন আটকাচ্ছেন এবার দেখি— হ্যাঁ, হ্যাঁ—

হাস্যের কলরব উঠিতেছে।

নিকটবর্তী আর একটি তাঁবুতে স্বয়ং উগ্রমোহন সিংহ চিকনহাটির চিকিৎসক বিশ্বম্ভরবাবুর সহিত পাঞ্জা ধরিয়াছেন। বিশ্বম্ভরবাবু নাকি পাঞ্জাতে অজেয়। কেহ কাহাকেও এখনও হারাইতে পারেন নাই। দম বন্ধ করিয়া দুই-চারিজন অতিথি তাহাই দেখিতেছেন।

মিশিরজী আসর জমাইয়াছেন আর একটি তাঁবুতে। সেখানে কাঁটাগাছির জমিদার স্বয়ং তবলা ধরিয়াছেন, এবং তাঁহার মোসাহেব মুরারিমোহন অতিরিক্ত মাত্রায় কেয়াবাৎ কেয়াবাৎ করিতেছে।

বিবাহ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। দুই জন প্রবল জমিদারের কুটুম্বিতা লাভ করিয়া মৃন্ময় ঠাকুর মনে মনে মহা খুশী হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু একটু রসভঙ্গ হইয়া গেল। উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাকে নগদ পাঁচ হাজার টাকা পণের সহিত এক পাটি ছেঁড়া চটিজুতাও দান করিয়া বসিলেন। মৃন্ময় ঠাকুর ব্যাপারটা নাতজামাইদের প্রতি রসিকতা হিসাবে ধরিয়া লইয়া যদিও দুই পাটি দাঁত বাহির করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া ফেলিলেন এবং অন্তর্নিহিত তীব্র খোঁচাটাকে লঘু করিয়া দিবার প্রয়াস পাইলেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রয়াসটা যে সফল হইল না, তাহা তাঁহার দন্তসর্বস্ব হাসিই প্রকাশ করিয়া দিল।

দ্বিতীয় বার রসভঙ্গ হইল বাইজীর আসরে। আসর সাজাইবার ভার ছিল উগ্রমোহনের উপর। তিনি প্রকাণ্ড সামিয়ানা টাঙাইয়াছেন—ঝালর-দেওয়া চমৎকার সামিয়ানা। বংশদণ্ডগুলি রূপালী জরির কাজ-করা লাল কাপড় দিয়া মোড়া। আসরে আতরদান, গোলাপপাশ, ফুলের

তোড়া, পানের দোনা, শাখা-প্রশাখাময় বড় বড় ঝাড়-লণ্ঠন, সুদৃশ্য মকমলের তাকিয়া, সুকোমল গালিচা—কোন কিছুরই অভাব ছিল না।

কিন্তু বাইজী গান জমাইতে পারিল না। তাহার কারণ, আসরের চারিদিকে উগ্রমোহন পাখী টাঙাইয়া দিয়াছিলেন। উগ্রমোহনের পাখী পোষার প্রচণ্ড শখ। বহু খরচ করিয়া বহুপ্রকার পক্ষী তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার এত পাখী আছে যে, তাহাদের তত্ত্বাবধানের জন্য তাঁহাকে একজন পাখীর দারোগাই রাখিতে হইয়াছে। সেই সব পাখীকে আজ তিনি আসরের চারিদিকে টাঙাইয়া দিয়াছেন। সুদৃশ্য বহু পিঞ্জর চতুর্দিকে দুলিতেছে। সেই পিঞ্জরের কোনটাতে শ্যামা, কোনটাতে ভিংরাজ, কোনটাতে তোতা, নুরি, হীরামন, কিরকিচ, খাক্‌নুর, কাকাতুয়া, কেনেরি, বুলবুল-হাজার-দস্তা—নানাবিধ পাখী। বাজ্‌ড়ি, ময়না, তিলোরা, লাল, ময়তাবি, মুনিয়া, দোহিয়াল, কোকিল, জরদপিলক—পাখীর হাট। সারেঙ্গী যেই বাজনা শুরু করে, পাখীর দল তখন আর এক পর্দা উচ্চে শিস দিতে থাকে। পাখীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া মানুষ পর্দা চড়াইতে পারে না। হাসিনা বাইজী একটু হাসিয়া নিবেদন করিল যে, পাখীদের না সরাইলে সে গান গাহিতে পারিবে না। উগ্রমোহন সিংহ জবাব দিলেন, পাখী তো এখন সরানো সম্ভব নয়। হাসীনা বিবি যদি গান গাহিতে অসমর্থা হন, তাহা হইলে তাহার জন্য দায়ী পাখীও নহে, বিবিসাহেবাও নহেন। দায়ী আমাদের দূরদৃষ্ট।

হাসিনা বিবি আরও দুই-একবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গান জমিল না। কোকিল, দোহিয়াল, কাকাতুয়া ময়না আসর জমাইয়া রাখিল।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আজ থাক্ তা হলে। কাল পাখীগুলো সরিয়ে রেখো উগ্রমোহন। পাখী সরিয়ে মহিষগুলো এনে হাজির করো না যেন আবার।

উগ্রমোহন বলিলেন, আমরা ক্ষেপেছি, এই যথেষ্ট চিন্তার কারণ। মহিষগুলোকে সুদ্ধ ক্ষেপিয়ে লাভ হবে না, তা তো বুঝছি।

গান হইল না। চন্দ্রকান্তকে জব্দ করিয়াছেন ভাবিয়া উগ্রমোহন কিন্তু ভারি সন্তুষ্ট হইলেন।

কন্যা-সম্প্রদান করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ নিজ শয়নগৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। সমস্ত দিনের উপবাসে দেহ-মন ক্লান্ত।

কমলার মুখখানা তাঁহার বারংবার মনে পড়িতেছে। সে বাঁচিয়া থাকিলে এই বিবাহ হইত কি? রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বয়স এই তো সবে নয় বৎসর। গঙ্গাগোবিন্দ ভাবিতেছিলেন, ইহারই মধ্যে রুম্‌নি-ঝুম্‌নিকে পর করিয়া দিলাম। এত তাড়াতাড়ি বিবাহ দেবার কোন প্রয়োজন ছিল না তো। সামান্য একটা স্বপ্ন দেখিয়া এই দুর্বলতা প্রকাশ না করিলেই পারিতাম। রাণী বহ্নিকুমারী আমার কে?

রাত্রি পোহাইতেছে। পূর্বাকাশে উষাভাস দেখা যাইতেছে। ক্লান্ত গঙ্গাগোবিন্দ চক্ষু মুদিয়া শয়ন করিলেন।

ঠিক সেই সময় রাণী বহ্নিকুমারীও একাকিনী অলিন্দে দাঁড়াইয়া ছিলেন। এই বিরাট উৎসবে তিনিও যোগ দিয়াছিলেন,—কিন্তু অন্তরের সহিত নয়, লৌকিকতার খাতিরে। তাঁহার

অন্তরে যাহা হইতেছিল, তাহা এতই বিচিত্র ও জটিল, এতই মধুর ও তিক্ত যে, তাহা বর্ণনাসাপেক্ষ নহে। বহ্নিকুমারী দেখিতেছিলেন, তাঁহাদের উদ্যান-মধ্যবর্তী দীর্ঘিকার কালো জলে এক জোড়া রাজহংস ভাসিতেছে। এই হংসদম্পতিকে দেখিয়া তাঁহার হিংসা হইতেছিল। নির্নিমেষনেত্রে তাহাদের দিকে চাহিয়া তিনি ভাবিতেছিলেন, সৃষ্টির নিকৃষ্ট জীব মানুষ এবং মানুষের মধ্যে নিকৃষ্টতম এই ধনীরা।

নহবৎখানায় সানাই তখন ভৈরবী ধরিয়াছে।

।। কুড়ি ।।

বিরাট উৎসবের পর বিরাট অবসাদ আসে। উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত উভয়েরই মন অবসন্ন। ইহার আরও একটা কারণ ছিল। যদিও উগ্রমোহনের জিদই বজায় থাকিয়া গিয়াছে কিন্তু এই জয়লাভের মধ্যে যে চন্দ্রকান্তের অনুগ্রহবর্ষণ আছে—এ কথা উগ্রমোহন কিছুতে ভুলিতে পারিতেছিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার অন্তরাত্মা নিঃশব্দে বলিয়া উঠিতেছিল, চন্দ্রকান্ত ছেলে দুইটিকে ফিরাইয়া না দিলে এ বিবাহ হইত কি না সন্দেহ। অন্তরাত্মার এই উক্তি উগ্রমোহনের পক্ষে সুখকর নহে।

চন্দ্রকান্তের মনে সুখ ছিল না। তাহার কারণ গোলোক সা। সা-জীর কোন সন্ধানই তিনি পাইতেছেন না। কমলাক্ষবাবু জমিদারির সমস্ত কাজকর্ম পরিত্যাগ করিয়া এই কর্মেই নিযুক্ত আছেন। কিন্তু অদ্যাবধি কোন খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়া উঠিতে পারেন নাই। অথচ গোলোক সাকে মুক্ত করিতে চন্দ্রকান্ত ধর্মত বাধ্য। তাঁহারই কথার উপর বিশ্বাস করিয়া গোলোক সাহা তাঁহাকে টাকা দিয়া বিপন্ন হইয়াছে। যেমন করিয়া হউক, লোকটাকে উদ্ধার করিতে হইবে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় উগ্রমোহন ও চন্দ্রকান্ত যথারীতি দাবার ছক লইয়া বসিয়া ছিলেন। অনেকক্ষণ ধরিয়া খেলা চলিতেছে। এমন সময় চন্দ্রকান্তের বাড়ির সম্মুখস্থ পথ দিয়া বাজনা বাজাইয়া একদল লোক যাইতেছে শোনা গেল।

উগ্রমোহন জিজ্ঞাসা করিলেন, বাজনা কিসের?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিল।

দেখে আয় তো, কিসের বাজনা বাজিয়ে যাচ্ছে।

ভজনা চলিয়া গেল। উভয়ে আবার দাবার ছকে মন দিলেন।

একটি বড়ে আগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইবার তোমার হয় গজ, না হয় নৌকো—একটা যাবেই—

আচ্ছা, এই নাও। তোমার মন্ত্রীকে সামলাও।

আবার দুইজনে নীরব। ভজনা আসিয়া খবর দিল যে, আনন্দপুরের দোল-পূর্ণিমার মেলায় একদল বাজিকর যাইতেছে, তাহাদেরই বাদ্যভাণ্ড।

উগ্রমোহন বলিলেন, আনন্দপুরে মেলা বসেছে নাকি? গেলে মন্দ হত না।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, এইবার তোমার মন্ত্রীটি বাঁচাও দেখি।

মুমূর্ষু মন্ত্রীকে উগ্রমোহন একটি ঘোড়া দিয়া বাঁচাইলেন। ঘোড়াটি অবশ্য তৎক্ষণাৎ মারা গেল।

চন্দ্রকান্ত আবার হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিলে তিনি আদেশ দিলেন, আসব নিয়ে আয় তো। আজ শীতটা একটু বেশি অন্য দিনের চেয়ে।

দুইটি সুদৃশ্য স্ফটিকাধারে করিয়া ভজনা আসব আনিয়া দিল। দুইজনে নিঃশব্দে তাহা পান করিয়া আবার খেলায় মন দিলেন।

খেলা শেষ করিয়া উগ্রমোহন যখন গৃহাভিমুখে রওনা হইলেন, তখন শুক্লা-একাদশীর চন্দ্র মধ্যগগনে উঠিয়াছে।

উগ্রমোহন চলিয়া গেলে কমলাক্ষবাবু আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর পেলে কিছু?

কমলাক্ষবাবু কহিলেন এইটুকু শুধু নিট খবর পেয়েছি যে, গোলোক সা যম-জঙ্গলে কোথাও নেই।

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, এসব খবর তুমি সংগ্রহ করছ কি উপায়ে?

প্রশ্ন শুনিয়া কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, উপায়টা কি তোমার?

কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া কমলাক্ষবাবু বলিলেন, আমাদের সিপাহী পাঠিয়ে খবর নিচ্ছি।

এসব খবর ঠিকমত নেওয়া ওসব ভোজপুরী সিপাহীর কর্ম নয়। দাঙ্গা করতেই ওরা মজবুত, এসব সূক্ষ্ম ব্যাপার ওদের দ্বারা হবে না। তুমি এক কাজ কর, মানিক মণ্ডলকে লাগাও।

কমলাক্ষবাবু ভিজা-বিড়াল-চাহনি চাহিতে লাগিলেন। চন্দ্রকান্ত বলিয়া চলিলেন, লোকটা খুব কাজের। আমার বিশ্বাস, কিছু টাকা ঢাললেই রাজী হয়ে যাবে। বুঝলে?

কমলাক্ষবাবু চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, কার্পণ্য করো না এসব ব্যাপারে। টাকা ঢাল, ঠিক হয়ে যাবে। মানিক মণ্ডলের কাছে লোক পাঠাও আজ। আমি হয়তো দু-এক দিনের জন্যে বেরুতে পারি, আনন্দপুরের মেলায় যাবার ইচ্ছে আছে, ইতিমধ্যে গোলোক সার খবরটা যোগাড় করো।

কমলাক্ষবাবু চলিয়া গেলে তিনি সেতারটা পাড়িয়া বসিলেন এবং মীর সাহেবের কাছে হিন্দোলের যে গৎটা শিখিয়াছিলেন তাহা বাজাইতে লাগিলেন।

পরদিন লোক-লস্কর বরকন্দাজ সমভিব্যাহারে জমিদার উগ্রমোহন সিংহ আনন্দপুর মেলা অভিমুখে রওনা হইলেন দেখা গেল। রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহের পর জীবনটা তাঁহার নিতান্তই একঘেয়ে ঠেকিতেছিল। আনন্দপুর মেলায় কিছু বৈচিত্র্যের সন্ধানে তিনি যাত্রা করিলেন।

দশ ক্রোশ দূরবর্তী আনন্দপুর গ্রামে প্রতি বৎসর দোল-পূর্ণিমার সময় একটি প্রকাণ্ড মেলা হয়। আনন্দপুর উগ্রমোহনের বা চন্দ্রকান্তের জমিদারির অন্তর্গত নহে। ক্ষুদ্র জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের ইহা জমিদারি। মেলাটি বেশ বড় মেলা। বহুস্থান হইতে লোকজন দোকানী ব্যবসায়ী এই মেলায় আসিয়া থাকে। অনেক গণ্যমান্য ধনী জমিদারও এই মেলায় পদার্পণ করেন। গরু, ঘোড়া, পাখী পর্যন্ত এই আনন্দপুর মেলায় বিক্রয় হয়—এত বড় এই মেলা। উগ্রমোহনের পশু-পক্ষী কেনার শখ খুব বেশি, তাই প্রতি বৎসর তাঁহার এই মেলায় যাওয়াটা একটা কর্তব্যের মধ্যে গণ্য। সুতরাং উগ্রমোহনের পালকি পরদিন আনন্দপুর অভিমুখে যাত্রা করিল।

চন্দ্রকান্ত বাতায়ন-পথে দেখিলেন, উগ্রমোহনের পালকি চলিয়া গেল। তিনিও পালকি-যোগে একটু পরে যাত্রা করিলেন। তাঁহার সঙ্গে অবশ্য লোকজন বিশেষ কিছু গেল না। আটজন পালকির বেহারা এবং একটি ক্ষুদ্র পেঁটরা তাঁহার সঙ্গী হইল।

।। একুশ ।।

আনন্দপুর মেলায় উগ্রমোহন সিংহের তাঁবু পড়িয়াছে। উগ্রমোহন পৌঁছিবার কিছু পরেই চন্দ্রকান্তের পালকিও আনন্দপুরে পৌঁছিল। নিজের আগমন উগ্রমোহনকে জানাইবার ইচ্ছা চন্দ্রকান্তের ছিল না। সুতরাং প্রকাণ্ড একটি বৃক্ষতলে পালকিটা তিনি নামাইতে বলিলেন। পালকি হইতে বাহির হইয়া চন্দ্রকান্ত বেহারাদের বিদায় দিলেন। বলিলেন, তোরাও মেলা দেখ্ গিয়ে, যা।—বলিয়া প্রত্যেক বেহারাকে কিছু অর্থ দিলেন। বেহারাগণ আভূমি প্রণত হইয়া সেলাম করিল এবং খুশী হইয়া মেলার জনতার মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিল। তাহারা চলিয়া গেলে চন্দ্রকান্ত আবার পালকির ভিতর প্রবেশ করিলেন। একটু পরে পুনরায় যখন তিনি পালকি হইতে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তাঁহাকে চেনা শক্ত। সামান্য একজোড়া গোঁফ এবং একটি রঙিন চশমার সহায়তায় চন্দ্রকান্ত একেবারে ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছেন।

ছদ্মবেশ ধারণ করা চন্দ্রকান্ত রায়ের একটি গোপন শখ। এ বিষয়ে বহু পুস্তক তিনি পড়িয়াছেন এবং বহু অর্থ তিনি ব্যয় করিয়াছেন। চন্দ্রকান্ত জীবন-রসের রসিক। তিনি ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়াছিলেন, এক বেশে জীবনের বৈচিত্র্য উপভোগ করা যায় না। জীবনের বিভিন্ন স্তরের বিচিত্র প্রাণবস্তুর সম্যক্ পরিচয় লাভ করিতে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় একা অপারগ। জমিদার চন্দ্রকান্ত রায় জমিদার-মহলেই স্বচ্ছন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে পারেন এবং অভিজাতসম্প্রদায়সুলভ খানিকটা আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন। কিন্তু জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের পক্ষে বেদের তাঁবুতে গিয়া ফুলকির নৃত্যলীলা দর্শন করা সম্ভব নয়। মানব-সমাজের নানা বিভাগ। এক বিভাগের আচারব্যবহার পোশাক-পরিচ্ছদ অন্য বিভাগে অচল। সুতরাং সর্ব-

বিভাগের রসাস্বাদন করিতে হইলে ছদ্মবেশ প্রয়োজন। বৈচিত্র্য পাইতে হইলে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ের স্বরূপত্ব মাঝে মাঝে লোপ করিয়া দেওয়া দরকার। গভীর নিশীথে চন্দ্রকান্ত রায় কতবার কত দেশে কত স্থানে গিয়াছেন! এই সেদিনই তো নিজেরই একটা জলকরে ধীবরের বেশে জেলে-ডিঙিতে মাছ ধরিয়া তিনি রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

আজও তাঁহার শখ হইয়াছে—ছদ্মবেশে মেলাটা দেখিবেন। সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছে—নিকটেই দেখিলেন মেলার জমিদার রামপ্রতাপ চৌবের তাঁবু পড়িয়াছে। তাঁবুর মধ্যে নৃত্য-গীতের আয়োজন। চন্দ্রকান্ত সেই দিকেই অগ্রসর হইলেন।

উগ্রমোহনও মেলায় ইতস্তত ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে ছিলেন। মেলার যে অংশে ঘোড়া বিক্রয় হইতেছিল, উগ্রমোহন সেই দিকে গেলেন। একটি ঘোড়া দেখিয়া তাঁহার ভারি পছন্দ হইয়া গেল। কালো কুচকুচে ঘোড়াটি, পায়ের চারটি খুর সাদা, কপালে সাদা তিলক, রেশমের মত কোঁকড়ানো ঘাড়ের চুলগুলি। অশ্ব ঘাড় বাঁকাইয়া আছে। সুন্দর সুলক্ষণ ঘোড়া। উগ্রমোহনের কিনিবার শখ হইল। তিনি তাঁবুতে ফিরিয়া অক্ষয় গোমস্তাকে দরদস্তুর করিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন। অশ্বটি অধিকার করিবার জন্য তাঁহার সমস্ত হৃদয় প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ক্রীড়নকলুব্ধ বালকের ন্যায় উগ্রমোহন সিংহ নিজে তাঁবুতে অক্ষয়ের প্রত্যাগমন-প্রত্যাশায় বসিয়া রহিলেন। একটু পরেই অক্ষয় ফিরিল এবং কহিল, ঘোড়া তো হুজুর আগেই বিক্রি হয়ে গেছে।

তাই নাকি? কে কিনেছে?

রামপ্রতাপবাবু।

ও।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া উগ্রমোহন সিংহ বলিলেন, আচ্ছা, তুমি রামপ্রতাপবাবুর কাছেই যাও। তাঁকে আমার নমস্কার জানিয়ে বল যে, ঘোড়াটি আমার ভারি পছন্দ হয়েছে, তিনি যদি ঘোড়াটি আমাকে বিক্রী করেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। তিনি যে দামে কিনেছেন, তার চেয়ে দাম আমি বেশি দিতেও রাজী আছি। সঙ্গে টাকা কত আছে?

অক্ষয় সংক্ষেপে কহিল, টাকা আছে। শুনলাম তিন শো পঁচিশ টাকায়—

আচ্ছা, তুমি যাও, গিয়ে বলগে যে, আমি পাঁচ শো পর্যন্ত দিতে রাজী আছি। ঘোড়াটা আমার চাই।

অক্ষয় চলিয়া গেল। অবুঝ বালকের মনোবৃত্তি লইয়া উগ্রমোহন নিজ তাঁবুতে বসিয়া অধীরভাবে গুম্ফপ্রান্তে চাড়া দিতে লাগিলেন।

রামপ্রতাপ চৌবে তরুণবয়স্ক জমিদার। মেলায় একটু স্ফূর্তি করিতে আসিয়াছেন। তিনি উগ্রমোহনের মত ঘোড়ার সমঝদার ন[illegible]জারের সেরা ঘোড়াটা দেখিয়া কিনিয়া

ফেলিয়াছেন মাত্র। ঘোড়ার অপেক্ষা তাঁহার বাইজীর শখই বেশি। দুইজন সুন্দরী বাইজী ইতিমধ্যে আসিয়া তাঁহার তাঁবুতে আসরও জমাইয়াছে। ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত রামপ্রতাপ চৌবের মোসাহেব সাজিয়া বাঁয়া-তবলা লইয়া জাঁকাইয়া বসিয়াছেন। রামপ্রতাপ চৌবে যদি ঘুণাক্ষরেও চন্দ্রকান্তের আসল পরিচয় জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে অবশ্য এ রস আর জমিত না। এ অঞ্চলের ছোট বড় সকল জমিদারই চন্দ্রকান্তকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। শ্রদ্ধাস্পদকে লইয়া আর যাই হোক, বাইজীর আসর জমে না। চন্দ্রকান্ত মতিলাল নামে নিজের পরিচয় দিয়া বেমালুমভাবে দলে ভিড়িয়া গিয়াছেন এবং আসর জমাইয়া তুলিয়াছেন।

অক্ষয় যখন আসিয়া হাজির হইল, তখন চৌবেজীর বেশ একটু রসাবিষ্ট ভাব। সিদ্ধির নেশাটি ধরিয়াছে, সম্মুখে সুন্দরী বাইজী গাহিতেছে—

উমড় ঘুমড় ঘন গরজে
মেরো পিয়া পরদেশ—

গান থামিতে অক্ষয় উগ্রমোহনের প্রস্তাব চৌবেজীকে নিবেদন করিল। চৌবেজী প্রথমটা বুঝিতেই পারেন না। ঘোড়া কেনার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। স্মৃতিশক্তি ফিরিয়া আসিলে তিনি বলিলেন, ও, উগ্রমোহনবাবু ঘোড়া নেবেন? বেশ তো।

চকিতের মধ্যে চন্দ্রকান্ত দেখিলেন, একটি সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে; তিনি চৌবেজীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, দিয়ে দিন ঘোড়া। কিন্তু উগ্রমোহন দাম দিতে চাইছেন, এইটে আমার ভাল লাগছে না। সামান্য একটা ঘোড়ার দাম নেওয়াটা কি হুজুরের ইজ্জতের পক্ষে ক্ষতিকর নয়? ঘোড়া আপনি দিয়ে দিন, দাম নেবেন না।

সিদ্ধির ঝোঁকে চৌবেজী ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, না, দাম নেব না।

ছদ্মবেশী চন্দ্রকান্ত তখন অক্ষয়ের দিকে ফিরিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিলেন, বাবু সাহেব বলিতেছেন যে, তিনি ঘোড়টিকে বিক্রয় করিবেন না। তবে সিংহ মহাশয়ের যদি এই সামান্য অশ্বটিকে পছন্দ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সানন্দে ইহা তাঁহাকে দান করিতে প্রস্তুত আছেন।

অক্ষয় এই বার্তা লইয়া ফিরিয়া গেল।

উগ্রমোহন অধীরভাবে পায়চারি করিতেছিলেন।

অক্ষয় গিয়া চৌবেজীর বার্তা নিবেদন করিতেই বারুদের স্তূপে যেন আগুন পড়িল। উগ্রমোহন চীৎকার করিয়া উঠিলেন, কি বললে? দান? অর্বাচীনটার স্পর্ধা কম নয় তো। একটা চুনো-পুঁটি পত্তনিদার, তার এত বড় লম্বা কথা! সাড়ে পাঁচ শো টাকা আন। আর হরনন্দন সিপাহীকে ডেকে দাও।

অক্ষয় একটি থলি করিয়া সাড়ে পাঁচশত টাকা আনিয়া প্রভুর হাতে দিল। হরনন্দন সিপাহী আসিলে উগ্রমোহন বলিলেন, তুম লোগ [illegible]?

পঁচিশ।

মারপিট করনেকো লিয়ে তৈয়ার রহো। ঔর দো সিপাহী হামরা সাথ চলো।

দুইজন সিপাহী সমভিব্যাহারে উগ্রমোহন সিংহ শঙ্করমাছের হান্টারগাছটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

চৌবেজীর তখন বেশ তন্ময় ভাব। সম্মুখে নৃত্যপরা বাইজী। মতিলাল ওরফে চন্দ্রকান্ত সঙ্গত করিয়া চলিয়াছেন। তবলা সারেং নূপুরের ঐকতানে অপূর্ব রসলোক সৃষ্ট হইয়াছে। এমন সময় মূর্তিমান রস-ভঙ্গের মত উগ্রমোহন আসিয়া উপস্থিত। তিনি সোজা চৌবেজীর কাছে গিয়া সপাসপ ঘা কয়েক চাবুক বসাইয়া দিয়া বলিলেন, উগ্রমোহন সিং কারও দান নেয় না কখনও। মানীর মান রেখে কথা বলতে শিখুন। টাকার তোড়াটা ঝনাৎ করিয়া আসরে ফেলিয়া দিয়া বলিতে বলিতে চলিয়া গেলেন, ঘোড়া নিয়ে চললাম। সাধ্য থাকে আটকান।

হাল্লা হৈ-হৈ মারামারির মধ্যে সেই রাত্রেই উগ্রমোহন অশ্বপৃষ্ঠে মেলা ত্যাগ করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে জমিদার চন্দ্রকান্ত রায়ও আসিয়া পালকিতে আরোহণ করিলেন। তাঁহার মুখে একটি মৃদু হাস্যরেখা। এত সহজে কার্যসিদ্ধি হইবে তিনি ভাবেন নাই। গোলোক সাকে উদ্ধার করিতে হইলে উগ্রমোহনকে অন্য কোন ব্যাপারে ব্যাপৃত করিয়া অন্যমনস্ক রাখা দরকার। গতকল্য হইতে চন্দ্রকান্ত চিন্তা করিতেছিলেন, কি করিয়া তাহা সম্ভবপর হইবে! উগ্রমোহন একটু অন্যমনস্ক না থাকিলে গোলোক সার অনুসন্ধান করা অসম্ভব, অন্তত কমলাক্ষ তাহাই বলিতেছে।

মতিলাল-বেশে আন্দাজে যে দাবার চালটা তিনি চালিয়াছিলেন, তাহা অব্যর্থ হইয়াছে দেখিয়া চন্দ্রকান্ত অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন।

।। বাইশ ।।

উক্ত ঘটনার প্রায় পনেরো দিন পরে একদিন সন্ধ্যায় অঘোর চক্রবর্তী আসিয়া উগ্রমোহনকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইলেন।

উগ্রমোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি হল?

অঘোরবাবু শান্তভাবে উত্তর দিলেন, মকদ্দমা ডিসমিস হয়ে গেল।

তাই নাকি?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

যাক। ঘোড়াটা চড়ার শখও মিটে গেছে আমার! এবার ওটা চৌবেজীকে ফেরত দিয়ে দাও।

যে আজ্ঞে।

থাম, একটা চিঠিও আমি দিয়ে দেব ওর সঙ্গে।—বলিয়া উগ্রমোহনবাবু নিজে খাস-কামরায় প্রবেশ করিলেন। অঘোরবাবু বাহিরে দাঁড়াইয়া নীরবে তামাটে গোঁফ জোড়াটাকে দক্ষিণ করতল দিয়া অকারণে মুছিতে লাগিলেন। যখনই অঘোরবাবু এরূপ করেন তখনই বুঝিতে হইবে, অঘোরবাবু মনে মনে কোন কিছু চিন্তা করিতেছেন। অঘোরবাবুর পরিচ্ছদও আজ একটু অসাধারণ ধরনের। অঙ্গে একটি কালো চাপকান-গোছের লম্বা কোট, গলায় পাকানো সাদা চাদর এবং মাথায় পাগড়ি-জাতীয় শিরস্ত্রাণ। তিনি সদর হইতে ফিরিয়াছেন; আনন্দপুর মেলায় যে দাঙ্গা হইয়াছিল, সেই সম্পর্কে মকদ্দমার তদ্বির করিতে তিনি জিলা-কোর্টে গিয়াছিলেন। এত বড় একটা মকদ্দমা কি উপায়ে যে সহসা ডিসমিস হইয়া গেল, তাহা অঘোরবাবুই জানেন।

উগ্রমোহন সিংহ ঘরে বসিয়া পত্র লিখিলেন—

প্রিয় চৌবেজী,

আমার শখ মিটিয়াছে। এইবার আপনার শখ মিটাইতে পারেন। ঘোড়াটি ফেরত পাঠাইতেছি। মামলা করিয়া কোন সুবিধা হইবে না, তাহা আশা করি বুঝিয়াছেন।

উগ্রমোহন সিংহ

বাহিরে আসিয়া পত্রখানি অঘোরবাবুর হস্তে দিয়া তিনি বলিলেন, এই চিঠির সঙ্গে ঘোড়াটা পাঠিয়ে দাও।

যে আজ্ঞে।—বলিয়া অঘোরবাবু পত্রখানি লইলেন। তাহার পর তিনি বলিলেন, সদরে গিয়ে শুনলাম, শ্যামাঙ্গিনী-দাতব্য-চিকিৎসালয় হচ্ছে। রাণীমার নাম করে সেখানে হাজার খানেক টাকা দান করে এসেছি।

শ্যামাঙ্গিনী কে?

শ্যামাঙ্গিনী দেবী হচ্ছেন বর্তমান সদরালার স্ত্রী। অতি সদাশয় মহিলা ছিলেন তিনি। তাঁরই স্মৃতিরক্ষার জন্যে চিকিৎসালয় হচ্ছে শুনলাম। অঘোরবাবুর প্রস্তরবৎ মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য একটু হাসির আভাস যেন জাগিয়া মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন বলিলেন, বেশ করেছ।

তাহার পর অঘোরবাবু বলিলেন, গোলোক সা সম্বন্ধে একটা কোন ব্যবস্থা করা দরকার। তাকে এ রকম ভাবে লুকিয়ে আর কতদিন রাখা যাবে?

কোথায় আছে এখন?

কালীর মন্দিরে, চামা মাঠে।

উগ্রমোহন খানিকক্ষণ ভাবিলেন, তাহার পর বলিলেন, আচ্ছা, আগামী কালীপূজার দিন আমি রাত্রে সেখানে যাব। মায়ের পূজার ভাল করে আয়োজন করো।

যে আজ্ঞে।

উগ্রমোহন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, গোলোক সার ব্যাপারে একদল নিরীহ বেদে-বেদেনী যে ধরা পড়েছিল শুনেছিলাম, তাদের কোন ব্যবস্থা করেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ। তারা ছাড়া পেয়ে গেছে। আমাদের সদর নায়েব কুঞ্জবাবু সে বন্দোবস্ত করে এসেছেন।

তাদের কিছু দিয়ে দেওয়া হয়েছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ। প্রত্যেককে দশ টাকা করে নগদ আর একখানা করে কাপড় দেওয়ার হুকুম দিয়েছি।

কি করে ব্যবস্থা হল?

তারা ছাড়া পাবার পর শিয়ালমারি কাছারিতে তাদের নাচ-গান করবার জন্যে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

ম্যানেজারের এতাদৃশ দূরদর্শিতায় উগ্রমোহন সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, সবাই সব পেলে, তুমিই কিছু পেলে না!

অঘোরবাবুর পাষাণ-মুখচ্ছবি কোন ভাব প্রকাশ করিল না। কেবল কহিলেন, আপনার অনুগ্রহই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

উগ্রমোহন বলিলেন, আচ্ছা, এখন তা হলে যাও। আগামী কালীপূজার দিন গোলোক সার ব্যবস্থা করে ফেলা যাবে।

অঘোরবাবু নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অঘোরবাবু চলিয়া যাইতেই উগ্রমোহনের মনে হইল, ওদিকের জানালাটার দিক হইতে ঝপ করিয়া কি একটা শব্দ হইল। উগ্রমোহন বলিলেন, কে?—বলিয়া জানলার দিকে আগাইয়া গেলেন। মনে হইল, অন্ধকারে কে যেন দ্রুতবেগে চলিয়া যাইতেছে। আবার তিনি ডাকিলেন, এই, কে?

আজ্ঞে, আমি—বলিয়া মূর্তিটি ফিরিয়া আসিয়া নমস্কার করিল।

মানিক মণ্ডল যে! ওখানে কি করছিলে তুমি?

আজ্ঞে, সিকি আমার একটা পড়ে গিয়েছিল হুজুর, তাই খুঁজছিলাম।

সিকি? ওখানে হঠাৎ সিকি গেল কি করে?

বেলতলাটায় একটা বেল পড়ল কিনা, তাই কুড়োতে গিয়ে সিকিটা গেল পড়ে।

তাই নাকি?

হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো, হুম্‌ব্রো।—চন্দ্রকান্তের পালকি আসিল। উগ্রমোহন সেই দিকে আগাইয়া গেলেন। মানিক মণ্ডল পলাইয়া বাঁচিল।

তাহার পরদিন অঘোরবাবু আসিয়া আবার প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার সংবাদ এই যে, শ্রীযুক্ত রামপ্রতাপ চৌবের নিকট যে সিপাহী অশ্বটি লইয়া গিয়াছিল, তাহাকে চৌবেজী অপমান করিয়া দূর করিয়া দিয়াছেন এবং ঘোড়াটাকেও গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিয়াছেন। এ অবস্থায় কি কর্তব্য, তাহাই তিনি জানিতে আসিয়াছেন। অঘোরবাবু ইহাও বলিলেন, কথাটা শুনলাম বলে হুজুরকে জানিয়ে গেলাম। কিন্তু আমার মনে হয়, এ সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে

বেশি আর ঘাঁটাঘাঁটি করা আমাদের পক্ষে সম্মানজনক হবে না। সিপাহীটা কিন্তু বড় মর্মাহত হয়েছে।

উগ্রমোহনবাবু সংক্ষেপে আদেশ দিলেন, সিপাহীটাকে এখনই দূর করে দাও। বুঝলে?

অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার মুখের একটি পেশীও বিচলিত হইল না। উগ্রমোহন সিংহ আবার বলিলেন, যে সিপাহী অপমানিত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করে না, বাড়িতে ফিরে এসে মর্মাহত হয়, তাকে এখনই বিদেয় কর। ও-রকম পিষ্ট সিপাহী রাখতে চাই না আমি। চৌবেজীকে আর একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি, নিয়ে যাও। দুধনাথ পাঁড়ের মারফৎ এটা পাঠিও। সে হাজত থেকে খালাস হয়ে এসেছে তো? সে যেন হাতিয়ারবন্দ্ হয়ে যায়।—বলিয়া উগ্রমোহন খাস-কামরায় চিঠি লিখিতে চলিয়া গেলেন। অঘোরবাবু নীরবে দাঁড়াইয়া গোঁফের উপর অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

উগ্রমোহন লিখিলেন—

চৌবেজী,

আপনার রামপ্রতাপ নাম সার্থক। সত্যই রামের ন্যায় প্রতাপ আপনার। আপনার বীরত্বের পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছি। কথিত আছে, আপনার প্রপিতামহ স্বর্গীয় প্রিয়প্রতাপ চৌবে মহাশয় সুন্দরবন অঞ্চলে বন্য ব্যাঘ্র শিকার করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। আপনি বংশের মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবেন বলিয়া মনে হইতেছে। আমার সিপাহীর প্রতি আপনার বিনম্র ব্যবহারের কথা শুনিয়া দুধনাথ পাঁড়েকে এই পত্রের বাহক-স্বরূপ পাঠাইতেছি। আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এই ব্যক্তি একদা একখানি হস্ত বিসর্জন দিয়াছিল। মস্তক বিসর্জন দিতেও তাহার আপত্তি নাই। কিন্তু আত্মসম্মান সে ক্ষুণ্ণ হইতে দিবে না। আশা করি, আপনি সুস্থ হইয়াছেন।

শ্রীউগ্রমোহন সিংহ

কিছুক্ষণ পরে দুধনাথ পাঁড়ে পত্রের জবাব লইয়া আসিল। রামপ্রতাপ চৌবে লিখিয়াছেন—

সিংহ মহাশয়,

এই সামান্য ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া করিতে আর প্রবৃত্তি নাই। ক্ষেত্রান্তরে আপনার দর্শন লাভের আশায় রহিলাম।

শ্রীরামপ্রতাপ চৌবে

।। তেইশ ।।

রাণী বহ্নিকুমারী একাকিনী বসিয়া ছিলেন। তাঁহার কোলের উপর 'মালবিকাগ্নিমিত্র' খানি খোলা পড়িয়া ছিল। তিনি মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন। রুম্নি-ঝুম্নির বিবাহ-ব্যাপারে তাঁহার মনের মধ্যে একটা বিপর্যয় ঘটিয়া গিয়াছে। প্রমাণ চাহিলে অবশ্য তিনি দিতে পারিবেন না, কিন্তু অন্তরের মধ্যে তিনি নিঃসংশয়ে ইহা বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহারই প্রীত্যর্থে গঙ্গাগোবিন্দ রুম্নি-ঝুম্নির সহিত অজয়-বিজয়ের বিবাহ দিয়াছেন।

কথাটা বুঝিয়া অবধি তাঁহার মনে শান্তি নাই। কেন তিনি গঙ্গাগোবিন্দকে ও-কথা বলিতে গিয়াছিলেন? গঙ্গাগোবিন্দ হয়তো ভাবিয়াছিলেন, স্বামীর হইয়া তিনি ওকালতি করিতেছেন এবং এইজন্যই তিনি হয়তো এই মহানুভবতাটা করিয়া বসিলেন। মনে করিলেন, বাণী ইহাতে খুশী হইবেন। হায় রে, রমণীরা সত্যই কিসে খুশী হয়, তাহা যদি পুরুষেরা বুঝিত! গঙ্গাগোবিন্দ কি জানেন না যে, তাঁহার খুশীর পথে তিনি নিজেই একদিন অলঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি করিয়াছিলেন? দারিদ্র্যের দম্ভ! এই দম্ভের জগদ্দল প্রস্তরের তলায় বাণীর কিশোরী মন যে একদিন তিনি নিজেই গুঁড়া করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা কি তিনি নিজে জানেন না? আজ তিনি মহানুভবতা দেখাইয়া বাণীকে খুশী করিতে চান? স্পর্ধা তো তাঁহার কম নয়! তিনি কি মনে করেন, তাঁহাকে বিবাহ করিতে পান নাই বলিয়া বাণী আজও তাঁহার পথ চাহিয়া আছেন? তাহা যদি মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মূর্খ তিনি। প্রবলপ্রতাপান্বিত জমিদার উগ্রমোহন সিংহের রাণী বহ্নিকুমারী কিশোরী-কালের একটা ভ্রমকে আঁকড়াইয়া আজও বসিয়া নাই। উগ্রমোহন সিংহের যিনি পত্নী, তাঁহার আবার ক্ষোভ কিসের? গঙ্গাগোবিন্দের মত পুঁথির মুখস্থ বুলি আওড়াইতে হয়তো তাঁহার স্বামী পারেন না, কিন্তু তাঁহার স্বামীর মত পুরুষসিংহ কয়টা আছে এ অঞ্চলে? কয়টা লোকের এমন বিরাট হৃদয়, বিশাল শৌর্য, বিপুল বিক্রম? গঙ্গাগোবিন্দ এই বিবাহ-ব্যাপারে মহত্ত্বটা দেখাইয়া ভালই করিয়াছেন; তাহা না হইলে উগ্রমোহনের রোষবহ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হইয়া যাইতেন তিনি। অন্তঃসারশূন্য দারিদ্র্যের গর্ব লইয়াই লোকটি গেলেন। এত বড় অহঙ্কৃত লোক বহ্নিকুমারী জীবনে আর একটাও দেখেন নাই। ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিলে বোঝা যায় যে, রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহটাও তিনি ছিলেন শুধু একটা বাহাদুরি দেখাইবার জন্য। কি আর এমন তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহাকে? কিছুই নয়। এ স্পর্ধা। এ কেবল তাঁহাকে খাটো করিয়া দিবার একটা ফন্দি। গঙ্গাগোবিন্দকে আর কেহ না চিনুক, বাণী ভাল করিয়াই চেনেন। বাণী ভাল করিয়াই জানেন যে, গঙ্গাগোবিন্দের জীবনের প্রধান সুর—'কাহারও নিকট খাটো হইব না, চিরকাল মাথা উঁচু করিয়া থাকিব। কাহারও নিকট অনুগ্রহ-ভিক্ষা করিব না, যতটা পারি অপরকে অনুগ্রহ করিব।' বাণীকে অনুগ্রহ করিয়া তিনি রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহে মত দিয়াছেন। তাঁহার এই নীরব অহঙ্কারে বহ্নিকুমারীর সমস্ত হৃদয়টা যেন জ্বালা করিতে লাগিল। কেহ যদি তাঁহার উঁচু মাথাটা জোর করিয়া হেঁট করিয়া দিতে পারে, তবে যেন তিনি স্বস্তি পান।

'মালবিকাগ্নিমিত্র' আর পড়া হইল না, তাঁহার সমস্ত হৃদয় গঙ্গাগোবিন্দকে লইয়া অকারণে তিক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। তিনি জোর করিয়া প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন যে গঙ্গাগোবিন্দের সমস্ত আচরণের মধ্যেই আত্মশ্লাঘা ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং তাহা আর কেহ বুঝিতে না পারুক, তিনি বুঝিয়াছেন। তিনি জোর করিয়াই বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার স্বামীর তুলনায় গঙ্গাগোবিন্দ একটা নগণ্য জীব—অত্যন্ত আত্মপরায়ণ, অত্যন্ত স্বার্থপর এবং অত্যন্ত অহঙ্কারী। সমস্ত পুরুষ-জাতিটাই এইরূপ। কেবল স্থান-কাল-পাত্রভেদে একটু ইতরবিশেষ। মহাকবি কালিদাস এই 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের রাজার মুখ দিয়া মালবিকার যে

রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা পুরুষ-কবির পক্ষেই সম্ভব—প্রেমের ছদ্মবেশে লালসার উচ্ছ্বাস। বহ্নিকুমারী মুক্ত বাতায়নপথে চাহিয়া একাকিনী বসিয়া রহিলেন। এক ঝলক বাতাস চূতমুকুলের গন্ধ বহিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। কিন্তু বহ্নি কুমারীর তাহাতে আজ আনন্দ হইল না। গঙ্গাগোবিন্দকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার সমস্ত মন বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

কিন্তু এত বিষের মধ্যেও কি অমৃত ছিল না? ছিল। বায়ুমণ্ডলে সম্পূর্ণরূপে নিমজ্জিত আছি বলিয়া আমরা যেমন বায়ুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন থাকি না, অমৃতপরিমণ্ডলে নিমজ্জিত বহ্নিকুমারীর অন্তরাত্মা অমৃত সম্বন্ধে তেমনই সচেতন ছিল না। সচেতন হইল, যখন উগ্রমোহন আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং বলিলেন, গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছেড়ে একেবারে চলল।

কোথায়?

কাশী।

কেন?

সংস্কৃত পড়বে বলে। তোমাকে একখানা চিঠি লিখেছে। ছোকরার চিরকালই মাথায় একটু ছিট আছে। বলিয়া একখানি পত্র তিনি বহ্নিকুমারীকে দিলেন। তাহাতে লেখা আছে—

বাণী,

তোমাদের কৃপায় আমার জীবনের সামাজিক দায়িত্ব শেষ হইয়াছে। যে কয়দিন বাঁচিব, লেখাপড়ার চর্চা করিয়াই কাটাইব স্থির করিয়াছি। বহুদিন হইতে বাসনা, ভাল করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করি। দারিদ্র্যনিবন্ধন এতদিন তাহা পারি নাই। সম্প্রতি কাশী হইতে জনৈক অধ্যাপক আশ্বাস দিয়াছেন যে, আমি যদি তাঁহার নিকট গিয়া বাস করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করিবেন। এ সুযোগ আমি পরিত্যাগ করিব না। দুই-একদিনের মধ্যেই কাশী যাত্রা করিব এবং জীবনের অবশিষ্ট দিন কয়টা বিশ্বেশ্বরের চরণতলে কাটাইয়া দিব। যাইবার পূর্বে তোমার সাক্ষাৎ পাইলে সুখী হইতাম। ইতি

গঙ্গাগোবিন্দ

রাণী বহ্নিকুমারীর সমস্ত অন্তরটা কে যেন মুচড়াইয়া দিল। গঙ্গাগোবিন্দ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন? আর কখনও ফিরিবেন না? আর কখনও তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না তিনি? তাঁহার স্বামী চেষ্টা করিলে কি তাঁহার যাওয়াটা বন্ধ করিতে পারেন না?

বহ্নিকুমারী একটু হাসিয়া বলিলেন, সত্যই লোকটা পাগল। এর কাশী যাওয়াটা বন্ধ করতে পার?

অসীম ঔদাসীন্যভরে উগ্রমোহন উত্তর করিলেন, তাতে লাভ কি?

বহ্নিকুমারী মুহূর্তের জন্য উগ্রমোহনের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং তাহার পর আবার মৃদু হাসিয়া বলিলেন, তা বটে।

উগ্রমোহন জানালা দিয়া দেখিতে পাইলেন হস্তীপৃষ্ঠে তাঁহার ম্যানেজার অঘোরবাবু আসিতেছেন। আগামী পর মহাকালীর মন্দিরে পূজা, তাহার সম্বন্ধেই উপদেশ লইতে আসিতেছেন বোধ হইল।

অঘোর আসছে দেখছি। নীচে যাই। বলিয়া উগ্রমোহন নামিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী একা স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। সহসা তাঁহার 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জেবউন্নিসা-চরিত্র মনে পড়িল। মবারককে জেবউন্নিসা বিষধর সর্প দিয়া হত্যা করিয়াছিল। তিনিও কি গঙ্গাগোবিন্দকে দেশছাড়া করিলেন? রুম্‌নি-ঝুম্‌নির বিবাহ না হইলে তিনি তো চলিয়া যাইতেন না। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বহ্নিকুমারীও জেবউন্নিসার মত ভাবিলেন, যদি চাষার মেয়ে হইতাম!

আবার তখনই তাঁহার মনে হইল, চাষার মেয়ে হইলেই বা করিতাম কি? গঙ্গাগোবিন্দের মত এত বড় একটা অবুঝ লোককে লইয়া কিছুই করা যায় না। নিজের গরিমায় তিনি এমন আত্মমগ্ন যে, অপরের দিকটা ভাবিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার নাই। আলোকের মত দীপ্ত প্রতিভায় তিনি চতুর্দিকে শুধু ছড়াইয়া থাকিবেন। কাহারও বিশেষ সম্পত্তি তিনি হইবেন না, কাহারও সুবিধা-অসুবিধা সুখ-দুঃখ তিনি লক্ষ্য করিবেন না। নিজেকে বিকশিত করিয়া বিকীর্ণ করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য। বহ্নিকুমারীরই বা তাঁহার জন্য এত মাথাব্যথা কেন? পৃথিবীতে কাহারও অভাবে কিউ আটকায় না। উগ্রমোহন সিংহের বিশাল জমিদারির মধ্যে গঙ্গাগোবিন্দের মত একটা সামান্য প্রজা থাকিল, কি গেল, তাহা লইয়া উৎকণ্ঠিত হওয়া রাণী বহ্নিকুমারীর সাজে না। উগ্রমোহনের পত্নী তিনি। গঙ্গাগোবিন্দ তাঁহার কে?

।। চব্বিশ ।।

শ্যামলতালেশহীন রুক্ষ চামা-প্রান্তরে সূর্য অস্ত যাইতেছে। চতুর্দিকে একটা নিষ্করুণ রক্তাভা। রক্তাম্বরধারী কাপালিকের মত চামা-প্রান্তর স্থির হইয়া রহিয়াছে। তাহার নীরব উদ্ধত গাম্ভীর্যে চতুর্দিক পরিপূর্ণ। অনুর্বর তাহার বক্ষে সবুজের চিহ্নমাত্র নাই—বৃক্ষ নাই, গুল্ম নাই, তৃণদলও নাই। ছায়াবিহীন দীর্ঘ দিবস তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। প্রখর সূর্যের তীব্রদাহে যুগযুগান্ত ধরিয়া চামা-প্রান্তর এইরূপ প্রতিদিন দগ্ধ হইতেছে। পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার কোমলতা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আছে শুধু এক বিশাল ব্যাপ্তি। যতদূর দৃষ্টি যায়, শেষ নাই। ঊষর প্রান্তর আকাশে গিয়া মিশিয়াছে। মনে হয়, যেন একটা অতৃপ্ত বুভুক্ষা মূর্তি ধরিয়াছে।

অঘোরবাবু মহাকালীর মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া নিমেষবিহীন নয়নে সূর্যাস্তের পানে চাহিয়া ছিলেন। চামা-প্রান্তরের অধিষ্ঠাত্রী-দেবতা মহাকালীর মন্দির তান্ত্রিক-সাধক অঘোরনাথের অতিশয় প্রিয় স্থান। এই চামা-প্রান্তর যেন তাঁহারই জীবনের প্রতিচ্ছবি। তাঁহার ছয় পুত্র আর দুই কন্যার মধ্যে একটিও আজ বাঁচিয়া নাই। শোকে দুঃখে স্ত্রীও মারা গিয়াছেন। অনেকের ধারণা, তান্ত্রিক সাধনাই অঘোরবাবুর কষ্টের কারণ। যেদিন হইতে তিনি ইহা শুরু করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই মৃত্যুর করাল ছায়া তাঁহার জীবনে পড়িয়াছে। তথাপি তিনি আজিও নিরস্ত হন নাই। তিনি শব-সাধনা করিয়াছেন, নরবলি দিয়াছেন, মহাকালীকে সন্তুষ্ট করিবার বহু চেষ্টা

তিনি বহুপ্রকারে করিয়াছেন; কিন্তু ছলনাময়ী উন্মাদিনী তাঁহাকে দিয়াছেন শুধু দুঃসহ শোক। অঘোরবাবুর ধারণা, পাগলী তাঁহাকে পরীক্ষা করিতেছেন।

তাঁহার দৃঢ় পণ, এ পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হইবেনই। তাই আজও তিনি একাগ্রমনা শ্যামা-সাধক। এখনও প্রতি অমাবস্যায় এই নির্জন প্রাণহীন শূন্য-প্রান্তরে তিনি মহাকালীর পূজার আয়োজন করেন।

সূর্য অস্ত গেল। অঘোরবাবু নিস্পন্দ-নয়নে চাহিয়া রহিলেন। ঘোর অমাবস্যা-রজনীর গাঢ় তমিস্রা চামা প্রান্তরে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে।

অমাবস্যার গভীর রাত্রি। চতুর্দিক নিস্তব্ধ অন্ধকার। মহাকালীর মন্দিরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। অঘোরনাথ কালীপূজা করিতেছেন। পরিধানে তাঁহার রক্তাম্বর, কপালে সিন্দূরের টীকা, গলায় জবাফুলের মালা। চক্ষু দুইটিও ঈষৎ রক্তবর্ণ, কারণ পান করিয়াছেন। নিকটেই উগ্রমোহন বসিয়া আছেন। তাঁহার সমস্ত মুখে একটা গম্ভীর প্রশান্ত ভাব। তিনি একাগ্রচিত্তে মহাকালীপূজা দেখিতেছেন। পূজা শেষ হইতে আর দেরি নাই।

গোলোক সাও একটু দূরে বসিয়া আছে। পূজা হইয়া গেলে তাহার বিচার হইবে। অঘোরবাবু মন্ত্রপাঠ করিয়া চলিয়াছেন, একটা আর্ত ছাগশিশু তারস্বরে চীৎকার করিতেছে। বাহিরে অমাবস্যার সূচীভেদ্য অন্ধকার।

পূজা শেষ হইল। বলিদান হইয়া গেল।

উগ্রমোহন তখন গোলোক সার দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বলবার আছে তোমার? এখন যদি মায়ের সামনে তোমাকে বলিদান হয়, কি করতে পার তুমি?

গোলোক সা কহিল, আমায় ক্ষমা করুন হুজুর।

একবার তো তোমায় ক্ষমা করা হয়েছিল। দ্বিতীয় বার তুমি আমার আদেশ অমান্য করেছ। তোমাকে আর ক্ষমা করা যায় না। তোমাকে কঠোর শাস্তি দেব আমি, যা তুমি জীবনে কখনও ভুলবে না। দুধনাথ পাঁড়ে!

দুধনাথ পাঁড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

পঁচিশ চাবুক। পহলে নাঙ্গা কর লেও।

কম্পিত-কলেবর উলঙ্গ গোলোক সাকে লইয়া দুধনাথ বাহিরে চলিয়া গেল। একটু পরেই গোলোক সার আর্তস্বর অন্ধকার চামা-প্রান্তরে কাঁদিয়া ফিরিতে লাগিল।

উগ্রমোহন বলিলেন, অঘোর মায়ের প্রসাদ একটু দাও তো। অঘোরবাবু একপাত্র কারণ আগাইয়া দিলেন। উগ্রমোহন তাহা নিঃশেষে পান করিয়া বলিলেন, আর একটু দাও। অঘোরবাবু আর-এক পাত্র দিলেন।

গোলোক সাকে লইয়া দুধনাথ পাঁড়ে ফিরিয়া আসিল।

উগ্রমোহন বলিলেন, এখনও শেষ হয়নি। একটু বিশ্রাম করে নাও। আরও চাবুক লাগাব। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর আজ চাবকাব তোমায়। তোমার টাকার অত্যন্ত গরম হয়েছে।

উগ্রমোহন আর এক পাত্র কারণ পান করিতে করিতে বলিলেন, তোমার পিঠের চামড়াখানি আজ ছাড়িয়ে নিয়ে যাব। বুঝলে? আর সেই চামড়ায় এক জোড়া জুতো বানিয়ে তোমার খাতক চন্দ্রকান্ত রায়কে উপহার দেব। বুঝতে পারছ?

সহসা গোলোক সার চক্ষে একটা হিংস্র দীপ্তি জ্বলিয়া উঠিল। নিকটেই একখানা ইট পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া সে সবেগে উগ্রমোহনের শির লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া দিল। উগ্রমোহন চকিতে মাথা সরাইয়া লইলেন, ইট সোজা গিয়া প্রতিমার অঙ্গে লাগিল। মহাকালীর হস্তধৃত মুণ্ডুটা চুরমার হইয়া ভাঙিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

ব্যাঘ্রের মতন উগ্রমোহন গোলোক সার উপর লাফাইয়া পড়িলেন। লাথি, চড়, কিল, জুতা অবিশ্রান্তভাবে বর্ষণ করিয়া শেষে তিনি বলিলেন, এর শাস্তি মৃত্যু! বলিদান দাও একে। অঘোর!

প্রতিমার অঙ্গে আঘাত লাগিয়াছে। ঘোরতর অমঙ্গল আশঙ্কায় অঘোরনাথের অন্তরাত্মা কাঁপিতেছিল। মুখে কিন্তু তাঁহার এতটুকু চাঞ্চল্য নাই। পুরোহিতের আসন হইতে তিনি ধীরভাবে বলিলেন, বলিদানের পশু অক্ষতদেহ হওয়া প্রয়োজন। ওর নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। সত্যই গোলোক সার নাক দিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার খোঁচা খোঁচা গোঁফ-দাড়ি ভিজিয়া গিয়াছিল। উগ্রমোহন প্রচুর কারণ পান করিয়াছিলেন। বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, মায়ের গায়ে আঘাত করেছে। প্রাণ দিয়ে ওকে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। বলিদান না হয়, অন্য ব্যবস্থা কর। ওর মৃত্যু আমি চাই।

অঘোরবাবু চিন্তা করিয়া বলিলেন, যম-ঘরে পাঠিয়ে দিন তা হলে—বলিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

সুরার তীব্র উন্মাদনায় উগ্রমোহন আবার বলিলেন, হ্যাঁ এখনই নিয়ে যাও। এই দুধনাথ পাঁড়ে! তুম ঔর শুকুল সিং ঔর—

অঘোরবাবু বলিলেন, আমি সব ব্যবস্থা করছি।

কিছুক্ষণ পরে অচেতন গোলোক সাকে লইয়া সিপাহীরা যম-জঙ্গল অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

সঙ্গে অঘোরবাবুও গেলেন।

মন্দিরের পিছনে মানিক মণ্ডল নিঃশব্দে বসিয়া ছিল। সেও এবার ধীরে ধীরে উঠিয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

উগ্রমোহন সিংহ যখন বাড়ি পৌঁছিলেন, তখন রাত্রি দুইটা হইবে। তিনি গিয়া দেখিলেন, রাখালবাবু দেওয়ান চিন্তিত মুখে তাঁর প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন।

কি খবর হে, এত রাত্রে?

আজ্ঞে, বৃন্দাবন থেকে প্রাণমোহন এসেছে। কর্তা-মায়ের ভারি অসুখ। আপনাকে যেতে বলেছেন।

মায়ের অসুখ? কোথা প্রাণমোহন?

সে তার নিজের বাড়ি গেছে। এখনই ফিরবে।

উগ্রমোহন সিংহের বৃদ্ধা জননী স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার অসুখের খবর শুনিয়া উগ্রমোহন চঞ্চল হইয়া উঠিলেন—সওয়ারি ঠিক কর। আমি ভোরেই বেরিয়ে যাব। কিছু টাকা আর জন পাঁচেক লোক সঙ্গে চাই।

রাখালবাবু ব্যবস্থা করিবার জন্য বাহিরে গেলেন।

।। পঁচিশ ।।

উগ্রমোহন বৃন্দাবন চলিয়া গিয়াছেন। বহ্নিকুমারী সঙ্গে যাইতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু উগ্রমোহন তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন না। বহ্নিকুমারী একা পড়িলেন। বহ্নিকুমারী অবশ্য চিরকালই একাকিনী। সাধারণতঃ জমিদার-গৃহিণীগণ সখী-দাসী-পরিবৃতা হইয়া যে-জীবন যাপন করেন, বহ্নিকুমারী তাহা করিতে পারেন নাই। তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্যে এমন কেহ ছিলেন না, যিনি বহ্নিকুমারীর মার্জিত মনের সূক্ষ্ম সুখদুঃখের অংশ লইতে পারেন। সখীবেশে যাহারা আসিতেন, তাঁহারা সকলেই চাটুকার। বহ্নিকুমারী তাঁহাদের প্রশ্রয় দিতেন, কারণ অপরের মুখে আত্মপ্রশংসা শ্রবণ করা আভিজাত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু স্তাবককে তিনি অনুগ্রহই করিতে পারেন, তাঁহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার হয় না, কারণ তাঁহারা নিম্নস্তরের জীব। বহ্নিকুমারীর মন যখন কাদম্বরীর সৌন্দর্যে অভিষিক্ত বা সাহানার সুরে মোহিত, তখন যাহারা আমসত্ত্ব বা ব্যঞ্জন-প্রসঙ্গ উত্থাপিত করে, তাহাদের প্রতি মৃদুহাস্যে কিছু অনুগ্রহ-বর্ষণ করা যাইতে পারে মাত্র, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব করা চলে না। মানসিক সমতা না থাকিলে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা কিছুই জমে না। ইহাদের সহিত সখিত্ব করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতা বহ্নিকুমারীর ছিল না।

স্বামী উগ্রমোহন বহ্নিকুমারীর অবলম্বন, সঙ্গী নহেন। বিশাল মহীরুহ ব্রততীর সঙ্গী হইতে পারে না, আশ্রয় হইতে পারে। উগ্রমোহনের বিরাট ব্যক্তিত্বকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বহ্নিকুমারী বাঁচিয়া ছিলেন। দুইজনের মধ্যে মিল কিছুমাত্র ছিল না। পরস্পর পরস্পরকে অধিকাংশ সময় বুঝিতেও হয়তো পারিতেন না, কিন্তু তবু তাঁহাদের মিলনের বাধা ছিল না। মনের নিভৃত জগতে বহ্নিকুমারী পূজা করিতেন উগ্রমোহনকে নয়, উগ্রমোহনের শক্তিকে। উগ্রমোহনের এই শক্তি, এই মহিমা, এই প্রাবল্য বহ্নিকুমারীর দাম্পত্য-জীবনের মেরুদণ্ড। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই বহ্নিকুমারীর সমস্ত সত্তা দাঁড়াইয়া ছিল, গঙ্গাগোবিন্দের বিরহে ভূমিসাৎ হইয়া যায় নাই। কিন্তু বহ্নিকুমারীর সঙ্গী কেহ ছিল না। বহ্নিকুমারী চিরকালই একাকিনী—লেখাপড়া আর

সঙ্গীত-চর্চা, প্রসাধন ও কারুশিল্প এই সব লইয়াই তাঁহার দিন কাটে। উগ্রমোহন সমস্ত দিন থাকেন অশ্বপৃষ্ঠে, সুতরাং বহ্নিকুমারী তাঁহার মধ্যে সঙ্গী খুঁজিয়া পান নাই। চন্দ্রকান্তের মত তিনিও আপনার কল্পলোকেই বাস করেন। তাঁহার কিশোর মনে গঙ্গাগোবিন্দের যে ছবি আঁকা হইয়া গিয়াছিল, তাহা এখনও আছে। যুক্তির ঘর্ষণে তাহা খানিকটা বিকৃত হইয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু বিলুপ্ত হয় নাই। তাঁহার চিত্তাকাশে গঙ্গাগোবিন্দ যেন ক্ষুদ্র একটি তারা, উগ্রমোহন যেন বিশাল একখানা মেঘ। তারা ক্ষুদ্র হউক, কিন্তু তাহা উজ্জ্বল। মেঘের দ্যুতি নাই, কিন্তু শোভা আছে, বিদ্যুৎ আছে, বজ্র আছে, সলিল-সম্ভারও আছে। তারা আকাশের এক প্রান্তেই স্থির হইয়া থাকে। মেঘ সমস্ত আকাশে নিমেষে আপনাকে বিস্তারিত করিয়া দেয়, ক্ষুদ্র নক্ষত্র ঢাকা পড়িয়া যায়। ঢাকা পড়িয়া যায় বটে, কিন্তু নিবিয়া যায় না। মেঘ সরিয়া গেলে আবার তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আজ প্রায় দশ দিন হইল উগ্রমোহন বৃন্দাবন গিয়াছেন।

বহ্নিকুমারীর একা একা আর ভাল লাগিল না। সন্ধ্যা হইয়াছে, শিবমন্দিরে আরতির শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিতেছে। নহবৎখানায় সানাই পুরবী ধরিয়াছে। আর একদিনের কথা মনে পড়িল।

বহ্নিকুমারী ডাকিলেন, কুসুম!

কুসুম নাম্নী দাসী আসিতেই তিনি আদেশ করিলেন, আমার পালকি তৈরি করতে বল্। একবার দাদার কাছে যাব।

।। ছাব্বিশ ।।

চন্দ্রকান্ত তাঁহার খাস-কামরায় একা বসিয়া তাঁহার নব-নির্মিত একটি সেতারের আওয়াজ পরীক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় বহ্নিকুমারীর পালকি আসিয়া থামিল। উগ্রমোহনের উর্দি-পরা সিপাহী আসিয়া সেলাম করিয়া খবর দিল যে, রাণীজী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আসিয়াছেন।

চন্দ্রকান্ত সেতার রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কে, বাণী এসেছে নাকি? কোথা?—বলিয়া তিনি বাহিরের দিকে আগাইয়া আসিলেন। সিপাহীরা সরিয়া গেল এবং বহ্নিকুমারী পালকি হইতে নামিয়া অগ্রজের পদধূলি লইলেন। চন্দ্রকান্ত হাসিয়া বলিলেন, রাণী বহ্নিকুমারীর আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না যে! আয়, ভেতরে আয়।

ভ্রাতা-ভগ্নী ভিতরে গেলেন।

বহ্নিকুমারী ভিতরে গিয়াই বলিলেন, বাঃ, চমৎকার সেতারটা তো! কোথা থেকে আনলে দাদা?

তৈরী করালাম, এইখানেই। আওয়াজ মন্দ হয়নি।

বহ্নিকুমারী সেতারটা তুলিয়া লইয়া টুং-টাং আওয়াজ করিতে করিতে কহিলেন, বাঃ, বেশ সুন্দর হয়েছে তো!

চন্দ্রকান্ত উপবেশন করিয়া বলিলেন, একটা কিছু বাজা দেখি। অনেক দিন তোর বাজনা শুনিনি।

বহ্নিকুমারী অগ্রজের দিকে চাহিয়া একটু মৃদু হাসিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবার বলিলেন, ভুলে গেছিস নাকি সব? আগে তো তুই আমার চেয়ে ভাল বাজাতিস। বাজা একখানা, শোনা যাক।

কি বাজাব?

যা তোর খুশি।

বহ্নিকুমারী সেতারটা লইয়া একটু নাড়াচড়া করিয়া বলিলেন, তুমি যে সেই জৌনপুরি গৎটা আমায় দিয়েছিলে, সেইটে বাজাই। বাজাব?

এই সন্ধ্যেবেলা জৌনপুরি বাজাবি? আচ্ছা, বাজা।

বহ্নিকুমারী জৌনপুরি বাজাইতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বাজুবন্ধের দোলক দুলিতে লাগিল। কঙ্কণের শিঞ্জিতের সহিত সেতারের ঝঙ্কার মিলিয়া জৌনপুরি নূতন মূর্তি ধরিল, পুরুষ ওস্তাদের হাতে ইহা সম্ভব নয়। বহ্নিকুমারীর দিকে চাহিয়া চাহিয়া চন্দ্রকান্তের মন অতীতে ফিরিয়া গেল। তখনও বাণী অনূঢ়া, নূতন সেতার বাজাইতে শিখিয়াছে। গঙ্গাগোবিন্দকে বাজনা শুনাইবার জন্য তাহার কি আগ্রহ! নানা ফন্দিতে, নানা ছুতায় গঙ্গাগোবিন্দকে সেতার শুনাইয়া দিবার জন্য বাণী উন্মুখ হইয়া থাকিত। চন্দ্রকান্ত ইহা লইয়া বাণীকে কত বিদ্রূপই না করিয়াছেন!

বহ্নিকুমারী বাজনা শেষ করিয়া বলিলেন, উঃ, যা বড় তোমার সেতার হাত ব্যথা হয়ে গেছে। তুমি একটা বাজাও দাদা এবার।

চন্দ্রকান্ত সেতার লইয়া বলিলেন, শুনেছিস, গঙ্গাগোবিন্দ কাল কাশী চলে যাচ্ছে?

হ্যাঁ। আমাকে চিঠি লিখেছিল একটা। কালই যাবে? এত তাড়াতাড়ি?

ওর মাথায় একটা খেয়াল ঢুকলে তো আর রক্ষে নেই। প্রাকৃত শিখবে ঝোঁক চেপেছিল, শিখে তবে ছেড়েছে। এখন সংস্কৃতের ভূত কাঁধে চেপেছে। দেখা যাক, কোথায় গিয়ে থামে!—বলিয়া চন্দ্রকান্ত সেতারের সুর মিলাইতে লাগিলেন। মিলাইতে মিলাইতে বলিলেন, আমার আবার এমন অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে, কেউ ঠেকা না দিলে ভাল বাজাতে পারি না। তুই ঠেকা দিতে পারবি:

না, আমি পারব না।—বলিয়া বহ্নিকুমারী একটু হাসিলেন। আচ্ছা তবে এমনিই শোন। একখানা হাম্বীর বাজাই।—বলিয়া চন্দ্রকান্ত শুরু করিলেন। বহ্নিকুমারী বসিয়া শুনিতে লাগিলেন। বহুকাল দাদার বাজনা শোনা হয় নাই। চমৎকার হাত হইয়াছে তো! বহ্নিকুমারীর মনও অতীতে ফিরিয়া গেল। বৃদ্ধ ওস্তা[illegible]কে মনে পড়িল। বুড়ার হাত কি মিঠা

ছিল। আবিদ মিঞার কাছে বাণীর প্রথম হাতেখড়ি। প্রথম প্রথম মেজ্‌রাপে আঙুলে কত লাগিত, তারে হাত কাটিয়া যাইত। ছাতের ঘরটাতে একা বসিয়া সেই ডা-রা-ডা-রা সাধা। তাহার পর ক্রমশ দুই-একটা গৎ। গঙ্গাগোবিন্দকে ডাকিয়া গৎ শোনানো। গঙ্গাগোবিন্দ কাল চলিয়া যাইতেছে। বহ্নিকুমারী অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। চন্দ্রকান্তের সেতার থামিল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন লাগল হাম্বীর?

বেশ।

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উঠিলেন।

এঃ, তুই সব ভুলে গেছিস দেখছি। হাম্বীর বললাম বলেই হাম্বীর? কেদারা, ধরতে পারলি না? এই দেখ্।—বলিয়া আবার একটু বাজাইলেন। বহ্নিকুমারী যে গঙ্গাগোবিন্দের কথা ভাবিতেছিলেন, তাহা না বলিয়া বলিলেন, অনেক দিন চর্চা নেই।

বাহিরে পদশব্দ হইল।

চন্দ্রকান্ত আছ নাকি? আসতে পারি?—বলিয়া গঙ্গাগোবিন্দই ঘরে ঢুকিলেন এবং বলিয়া উঠিলেন, এ কি, বাণীও যে এখানে! আমি কাল ভোরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাব ভাবছিলাম।

এমন অপ্রত্যাশিতভাবে গঙ্গাগোবিন্দ আসিয়া পড়িবেন, বহ্নিকুমারী তাহা কল্পনাও করেন নাই। হঠাৎ তাঁহার মুখটা ক্ষণিকের জন্য বিবর্ণ হইয়া গেল। নিজেকে সামলাইয়া লইয়া তিনি বলিলেন, কাল সত্যিই যাবে তা হলে?

হ্যাঁ। দেরি করে লাভ কি? স্বল্প তথায়ুর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ। বৃন্দাবন থেকে কোনও খবর এল?

না।

কিছুক্ষণ তিনজনেই চুপচাপ।

গঙ্গাগোবিন্দই প্রথমে কথা বলিলেন, মনে রেখো তোমরা। নানা ভাবে অনেক বিরক্ত করেছি তোমাদের।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, দেখ, বিনয় প্রকাশের স্থান-অস্থান আছে। সেটা ভুলে যাও কেন? সংস্কৃত পড়তে যাচ্ছ বলে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

বহ্নিকুমারী কিছু না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, গ্রাম ছাড়বার সময় বুঝতে পারছি, গ্রামের সঙ্গে সত্যিই একটা নাড়ীর যোগ আছে।

চন্দ্রকান্ত কহিলেন, তোমার মেয়ে-জামাইদের সঙ্গে দেখা করে এসেছ? কি বললে তারা?

বিশেষ কিছু নয়। বিয়ে হলেই মেয়েরা পর হয়ে যায়। বাণী যেমন আমাদের পর হয়ে গেছে।

বহ্নিকুমারীর মনে যে উত্তরটা আসিয়াছিল, তাহা না বলিয়া তিনি বলিলেন, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে বটে, সত্যিই পর হয়ে গেছি এবং পরস্পর।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, এইবার উঠি আমি। আমাকে আবার একটু গোছগাছ করতে হবে।—বলিয়া তিনি সত্যসত্যই উঠিয়া পড়িলেন। অতি সাধারণ কথাবার্তার ভিতর দিয়া বিদায়ের পালা শেষ হইয়া গেল। যাইবার সময় তিনি বলিলেন, ওহে, তোমার ম্যানেজার অনেকক্ষণ থেকে বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছে।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তাই নাকি?—আচ্ছা বসুক।

বহ্নিকুমারী বলিলেন, তার দরকার কি? আমি ততক্ষণ পাশের ঘরে গিয়ে তোমার বই-টইগুলো একটু দেখি।

আচ্ছা, তা হলে ডেকে দিয়ে যাও।

গঙ্গাগোবিন্দ চলিয়া গেলেন এবং বহ্নিকুমারী উঠিয়া চন্দ্রকান্তের পুস্তকাগারে প্রবেশ করিলেন।

।। সাতাশ ।।

কমলাক্ষ আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

চন্দ্রকান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, কোনও খবর পেলে?

আজ্ঞে না।

না মানে? মানিক মণ্ডলের খবর তা হলে ভুল?

খবর ভুল নয়। সে শুনে এসেছিল যে, উগ্রমোহনবাবু গোলোক সাকে যম ঘরে নিয়ে যেতে বলেছিলেন; অথচ যম-ঘর নামে যে ঘর যম-জঙ্গলে আছে, তার ভেতরকার খবর নেওয়া শক্ত—একপ্রকার অসম্ভব।

কেন?

সে ঘরে একটা লোহার দ্বার আছে এবং তা বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ঘরে একটাও জানলা নেই। ঘরের দেওয়াল অত্যন্ত উঁচু। সুতরাং গোপনে সে ঘরের সম্বন্ধে কোন খবর সংগ্রহ করা শক্ত। অথচ মানিক মণ্ডলের খবর, সেই ঘরের মধ্যেই গোলোক সা আছে। আজ প্রায় দশ দিন অতীত হয়ে গেল, কোনও খবরই যোগাড় করতে পারলাম না।

চন্দ্রকান্ত চুপ করিয়া রহিলেন।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, অঘোর চক্রবর্তী কোথা?

তাঁর কাছে রামদীন সিপাহীর মারফৎ একটা চিঠি লিখে পাঠিয়েছিলাম। লিখেছিলাম যে, যম-ঘরের অনুরূপ একটি ঘর টাল-জঙ্গলে করাবেন বলে বাবুর ইচ্ছে হয়েছে, আপনি যদি যম-ঘরটা খুলিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন, তা হলে আমরা ভেতরের মাপ-জোপ নিতে পারি।

কি উত্তর দিলেন তিনি?

তিনি বললেন যে, যম-ঘরের চাবি মালিকের কাছে আছে। তিনি বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলে সে ব্যবস্থা হবে।

চন্দ্রকান্ত কিছুক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। তাহার পর কমলাক্ষকেই বলিলেন, তা হলে এখন কি করা উচিত?

কমলাক্ষ ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে চাহিতে বলিলেন, পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য উপায় দেখি না।

পুলিসে খবর দেবে?—বলিয়া চন্দ্রকান্ত আবার খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন।—পুলিসে খবর দেওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ভেবে পাচ্ছ না?

আজ্ঞে না। আমার মনে হচ্ছে, গোলোক সাকে আমরা যদি দু-একদিনের মধ্যে উদ্ধার না করতে পারি, তা হলে সে বাঁচবে না।

বল কি?

আমার তো সেই রকমই মনে হয়। উগ্রমোহনবাবু তাকে মেরেছেন প্রচুর, তার ওপর আজ দশ দিন ধরে সে ওই যম-ঘরে বন্দী অবস্থায় আছে। এক ফোঁটা জল বা এক দানা খাবার তার পেটে পড়েনি।

কি করে জানলে তুমি?

যম-জঙ্গলে লুকিয়ে লোক মোতায়েন রেখেছিলাম যম-ঘরের ওপর নজর রাখবার জন্যে। দিবারাত্র একজন লোক সেখানে ছিল। আজ থেকে অবশ্য আর নেই। বলিয়া কমলাক্ষ আবার ভিজা-বিড়ালের মত চাহিতে লাগিলেন।

যম-ঘরে গোলোক সা আছে, এ খবর ঠিক তো?

মানিক মণ্ডলের তাই খবর। উগ্রমোহনবাবু এই হুকুম দিয়েছিলেন সে স্বকর্ণে শুনেছে।

চন্দ্রকান্ত নীরবে আরও খানিকক্ষণ বসিয়া রহিলেন। তাঁহার মনে একটি কথাই প্রবলভাবে জাগিতে লাগিল যে, বিলম্ব করিলে গোলোক সার মৃত্যু পর্যন্ত হইতে পারে, এবং মৃত্যু যদি হয়, তাহার জন্য দায়ী তিনি। সুতরাং বিলম্ব করা অনুচিত। পুলিসে খবর দেওয়াটা যদিও তাঁহার মনঃপূত হইতেছিল না, তথাপি তিনি বলিতে বাধ্য হইলেন, আচ্ছা, যা ভাল বোঝ, তাই কর তা হলে।

কমলাক্ষ নমস্কার করিয়া বিদায় লইতেই গঙ্গাগোবিন্দ আবার ফিরিয়া আসিলেন।—ওহে, মল্লিনাথের টীকা তোমার আছে? ও কি, তুমি অমন করে বসে আছ কেন?

চন্দ্রকান্ত হাসিয়া উত্তর দিলেন, মহাবীর উগ্রমোহনের প্রতাপে অস্থির হয়ে গেলাম।

কি রকম?

গোলোক সাকে কোথা এক যম-ঘরে নিয়ে গিয়ে আটকে রেখেছে আজ দশ দিন। লোকটা অনাহারে সেখানে শুকিয়ে মরছে।

গঙ্গাগোবিন্দ হাসিয়া উত্তর দিলেন, সিংহ যে, বীরত্ব দেখাবেন বইকি। মল্লিনাথের টীকা আছে তোমার?

ছিল তো সবই। খুঁজে দেখে কাল পাঠিয়ে দেব। গোলোক সার ব্যাপারে মনটা বড় দমে আছে এখন।

গঙ্গাগোবিন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, বাণী চলে গেল কখন? বাণীর জন্যে ভারি কষ্ট হয়। উগ্রমোহনের মত লোকের সহধর্মিণী হওয়া নিশ্চয়ই সুখের নয় ওর পক্ষে।

চন্দ্রকান্ত একটু চোখ টিপিয়া বলিলেন, চুপ কর। পাশের ঘরেই আছে।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, তাই নাকি? শুনতে পায়নি বোধ হয়। আচ্ছা, আমি চললাম। মল্লিনাথটা খুঁজে দেখো।

পাশের ঘরে দাঁড়াইয়া বহ্নিকুমারী সমস্ত শুনিয়াছিলেন। কমলাক্ষের কাহিনী, চন্দ্রকান্তের উক্তি ও গঙ্গাগোবিন্দের মন্তব্য, কিছুই বাদ যায় নাই। তাঁহার বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, ধরণী, দ্বিধা হও। স্বামীর নিন্দা আর শুনিতে পারি না। রাগে, ক্ষোভে, লজ্জায় তাঁহার মনের যে অবর্ণনীয় অবস্থা হইয়াছিল, তাহার আভাস তাঁহার মুখেও যে ফোটে নাই, তাহা নহে। তাঁহার পাতলা ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছিল। গঙ্গাগোবিন্দ যখন তাঁহার স্বামীর সম্বন্ধে শ্লেষোক্তি করিলেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা করিতেছিল যে, বাহির হইয়া আসিয়া মুখের মতন একটা জবাব দেন। কিন্তু তাহাতে উগ্রমোহন সিংহের পত্নীর সম্মান-লাঘব হইবে—এই আশঙ্কায় তিনি তাহা করেন নাই। কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ পুড়িয়া যাইতেছিল। যম-ঘর? যম-জঙ্গল কাছারিতে বনভোজন উপলক্ষ্যে গিয়া তিনি যম-জঙ্গল দেখিয়াছিলেন বটে। তখনও তাহাতে তালা লাগানো ছিল। সে তালার চাবিও বোধ হয় বহ্নিকুমারী খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবেন। উগ্রমোহন সিংহের একটা দেরাজের মধ্যে যে চাবির গোছা আছে, তাহার মধ্যে একটা বড় চাবির গায়ে একটা কাগজ আঁটা আছে বটে—যম-ঘর।

চন্দ্রকান্ত ডাকিলেন, বাণী এখানে খেয়ে যাবি নাকি?

যেন কিছু হয় নাই, এই ভাবে হাসিয়া বহ্নিকুমারী বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন, না। আমি এখনই চললাম। আমি তোমার এই বইটা নিয়ে চললাম। সাদীর অনুবাদ।

আচ্ছা।

বহ্নিকুমারী চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

বহ্নিকুমারীর পালকি চন্দ্রকান্তের বাড়ির সীমানা ছাড়াইতেই বহ্নিকুমারী আদেশ দিলেন, গঙ্গাগোবিন্দের বাড়ি চল! গঙ্গাগোবিন্দ আহারাদি শেষ করিয়া শুইবার যোগাড় করিতেছিলেন, এমন সময় বহ্নিকুমারীর পালকি তাঁহার দ্বারে থামিল। উর্দি-পরা সিপাহী ভিতরে গিয়া নিবেদন করিল, রাণীজী সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বিস্মিত হইলেন। বাহিরে আসিয়া বলিলেন, এস, বাণী, এস। কি খবর? এলে যে আবার?

বহ্নিকুমারী নামিয়া ভিতরে গেলেন এবং সংক্ষেপে বলিলেন, তোমায় প্রণাম করতে এলাম। তখন ভুলে গিয়েছিলাম। মুখে স্মিত হাসি।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, সে কি?

আর দেখা তো নাও হতে পারে।—বলিয়া বহ্নিকুমারী গঙ্গাগোবিন্দের পদধূলি লইলেন।

বিস্মিত গঙ্গাগোবিন্দ সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারী আবার হাসিয়া বলিলেন, আর একটা ভুলও তোমার ভেঙে দিতে এলাম। আমার স্বামী আমার গর্বের বস্তু। তাঁকে পেয়ে আমি যে শুধু সুখী হয়েছি তা নয়, ধন্য হয়েছি। দাদার কাছে তাঁর সম্বন্ধে যা শুনে এলে, তা সমস্ত মিথ্যে কথা। পুলিস গিয়ে কাল সকালেই বুঝতে পারবে যে, গোলোক সাকে সেখানে আটকে রাখা হয়নি, ওটা অল্পবুদ্ধি কমলাক্ষবাবুর বানানো গল্প। তুমি তো কাল থাকবে না, তোমাকে তাই জানিয়ে দিলাম। কাউকে বলো না যেন।

গঙ্গাগোবিন্দ বলিলেন, না না, আমি কাউকে কিছু বলব না। দরকার কি আমার?

বহ্নিকুমারীর চক্ষে একটা বিদ্যুৎ-দীপ্তি খেলিয়া গেল। তিনি আবার একটু হাসিয়া বলিলেন, চললাম তা হলে।—বলিয়া দ্বারের দিকে একটু অগ্রসর হইয়া গেলেন। তাহার পর ফিরিয়া বলিলেন, আমার একটা কথা রাখবে?

কি কথা?

কিছুই নয়, শুধু মনে রেখো যে, মানব-জন্মটা শুধু মহত্ত্ব আস্ফালন করবার জন্যেই আমরা পাইনি। দেবতাই পাথরের হয়, মানুষের মধ্যে রক্তমাংসের দুর্বলতা থাকা সব সময় দোষের নয়। মনে রেখো কথাটা। চললাম।—বলিয়া বহ্নিকুমারী বাহিরে গিয়ে একেবারে পালকিতে উঠিয়া বসিলেন। নির্বাক গঙ্গাগোবিন্দ বিমূঢ়ের মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

বহ্নিকুমারীর পালকি চলিয়াছে।

যদি কেহ তখন পালকির দরজা খুলিয়া দেখিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত যে, রাণী বহ্নিকুমারী উপুড় হইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছেন।

।। আঠাশ ।।

যখন সকলে চলিয়া গেল, তখন চন্দ্রকান্ত নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে একা বসিয়া রহিলেন। রাণী আজ রাত্রে এখানে খাইয়া গেলে ক্ষতি ছিল কি? কিন্তু তিনি থাকিলেন না। থাকিবেনই বা কেন? রাণী তাঁহার কে? তাঁহার সহিত কতটুকু অন্তরঙ্গতা চন্দ্রকান্তের আছে? কিছুই তো নাই। রক্তের সম্পর্ক অবশ্যই আছে তাঁহারা ভাই-বোন। কিন্তু আত্মার সম্পর্ক তো নাই। একই মাতৃগর্ভে তাঁহারা জন্মলাভ করিয়াছেন, শৈশবে একসঙ্গে কিছুকাল কাটিয়াছে, কিন্তু ওই পর্যন্ত। বিবাহের পর রাণী বহ্নিকুমারী হইয়া গিয়াছেন। চন্দ্রকান্তও নিজের খুশীমত নিজের জীবন যাপন করিয়াছেন। নিজ নিজ কক্ষে ভ্রমণ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে

বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন। বুধের সহিত নেপচুনের এখন আর কোন সম্পর্ক নাই; যেটুকু আছে, তাহা নিতান্তই বাহ্যিক। অন্তরঙ্গতার লেশমাত্র নাই; যাহা আছে তাহা স্মৃতি, জীবন্ত কিছু নয়।

গঙ্গাগোবিন্দও ছাড়িয়া চলিলেন। সকলেই একে একে চন্দ্রকান্তকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। অথচ সমস্ত জীবনটাই তো এখনও বাকি। এখনও যৌবন শেষ হয় নাই। এই দীর্ঘ জীবন একাই যাপন করিতে হইবে নাকি?

থাকিবার মধ্যে আছেন এক উগ্রমোহন। বাণীর অপেক্ষা উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের বেশী আত্মীয়। এই উগ্রমোহনকে কেন্দ্র করিয়াই চন্দ্রকান্তের সমস্ত জীবনটা আবর্তিত হইতেছে। চন্দ্রকান্তের আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ সমস্তই উগ্রমোহনকে অবলম্বন করিয়া। উগ্রমোহনের সহিত অহরহ সংঘর্ষে তাঁহার বুদ্ধি, শক্তি ও অর্থ সার্থক হইয়াছে। উগ্রমোহন না থাকিলে চন্দ্রকান্ত করিতেন কি? উগ্রমোহন কয়েকদিন হইল বৃন্দাবন গিয়াছেন, কবে ফিরিবেন কে জানে! উগ্রমোহনের বিরহে চন্দ্রকান্ত মনে মনে পীড়িত হইতেছিলেন। তাঁহার সহিত আবার বসিয়া দাবা না খেলা পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পাইতেছিলেন না। কবে ফিরিবেন তিনি?

একটা কথা সহসা বিদ্যুৎঝলকের মত চন্দ্রকান্তের মনে ঝলসিয়া উঠিল। কমলাক্ষকে তো তিনি থানায় নালিশ করিবার হুকুম দিয়া দিলেন; কিন্তু ইহার ফল যে কতদূর শোচনীয় হইতে পারে, তাহা তো তিনি ভাবিয়া দেখেন নাই!

গোলোক সা যদি সত্যই মরিয়া গিয়া থাকে এবং যম-ঘরে সেই মৃতদেহ যদি পাওয়া যায়! তাহা হইলে আইনের চক্ষে উগ্রমোহন খুনী বলিয়া প্রমাণিত হইবেন তো! খুনীর শাস্তি যে ফাঁসি! উগ্রমোহনের ফাঁসি হইবে? চন্দ্রকান্তের চক্রান্তে? অসম্ভব। কিছুতেই তাহা হইতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত উঠিয়া পড়িলেন। মূর্খের মত এ কি করিয়া বসিয়াছেন তিনি? তাঁহার জীবনের একমাত্র বন্ধনটি ছিন্ন করিবার আয়োজন করিলেন তিনি কি বলিয়া? কমলাক্ষ কি থানায় গিয়াছেন?

চন্দ্রকান্ত হাঁকিলেন, ভজনা!

ভজনা আসিল।

ম্যানেজারবাবু আছেন কি না দেখ্ তো।

ভজনা চলিয়া গেল। চন্দ্রকান্ত অস্থিরভাবে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। গভীর আঁধারে একটু যেন আলোর রেখা দেখা দিল। তাঁহার জীবনের একমাত্র অবলম্বন উগ্রমোহন সিংহকে, যেমন করিয়া হউক, বাঁচাইতে হইবে।

উগ্রমোহন-বিহীন চন্দ্রকান্তের অস্তিত্ব একান্ত শূন্য ও একান্ত নিরর্থক।

একটু পরেই কমলাক্ষবাবু আসিয়া নমস্কার করিলেন।

আমাকে ডেকেছেন আপনি?

হ্যাঁ। থানায় খবর দিয়েছ না কি?

হ্যাঁ, এইমাত্র তো দিয়ে এলাম।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, তা হলে এখুনি একবার থানায় যাও আবার। যম-জঙ্গল খোঁজবার আর দরকার নেই। গোলোক সা এখনই এসেছিল আমার কাছে। এইমাত্র গেল। উগ্রমোহন তাকে মারধোর করে ছেড়ে দিয়েছিল। তোমার মানিক মণ্ডলের খবর ভুল।

সমস্ত পৃথিবীটা উল্টাইয়া গেলেও বোধ করি কমলাক্ষ সরকার এত আশ্চর্য হইতেন না। তিনি নির্বাক বিস্ময়ে প্রভুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, যাও তা হলে, আর দেরী করো না।

কমলাক্ষ চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রকান্ত একাকী দীর্ঘ বারান্দাটার এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে লাগিলেন।

একটু পরে কমলাক্ষ আসিয়া বলিলেন, দারোগাবাবু বললেন যে, গোলোক সা যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করে যায় একবার। কেসটা তিনি ডায়েরিতে টুকে ফেলেছেন কিনা।

চন্দ্রকান্ত বলিলেন, আচ্ছা। কটা বেজেছে বল তো?

কমলাক্ষ বলিলেন, তা প্রায় এগারোটা হবে।

এখুনি হাতী কষতে বল। কলকাতা যাব আজ রাত্রে। ট্রেন তো রাত দেড়টায়?

বিস্মিত কমলাক্ষ শুধু বলিলেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।—বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। গোলোক সার যমজ ভাইয়ের সন্ধানে চন্দ্রকান্ত সেই দিনই কলিকাতা রওনা হইলেন। তাহার ঠিকানা তিনি জানিতেন।

।। ঊনত্রিশ ।।

সেই দিনই রাত্রে অঘোরবাবুও খবর পাইলেন যে, চন্দ্রকান্তবাবুর ম্যানেজার দুই-দুইবার থানায় গিয়াছেন এবং দারোগাবাবুর সহিত গোপনে কি সব পরামর্শ করিয়াছেন। সেই দিন রাত্রেই কোন রহস্যময় উপায়ে কমলাক্ষের নালিশের মর্মটিও অঘোরবাবুর কর্ণগোচর হইল। নালিশের মর্ম এই যে, জমিদার উগ্রমোহন সিংহ তাঁহাদের আশ্রিত প্রজা গোলোকচন্দ্র সাহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন এবং যম-জঙ্গলের যম-ঘরে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। পুলিস অবিলম্বে সাহায্য না করিলে গোলোক সাহার মৃত্যু হওয়াও অসম্ভব নহে। পরদিন যম-জঙ্গল ঘেরাও করিয়া যম-ঘর খানাতল্লাশি করা হইবে, এ খবরও অঘোরবাবু পাইলেন। কিন্তু কমলাক্ষবাবু দ্বিতীয় বার থানায় গমন করিয়া যে খানাতল্লাশি বন্ধ করিয়া আসিয়াছেন, এ খবরটুকু অঘোরবাবু পাইলেন না। সুতরাং তিনি যথারীতি সাবধান হইলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, কালীপূজার পর দশ দিন কাটিয়া গিয়াছে, সুতরাং পুলিস যম-ঘরে গিয়া

বিশেষ কিছু সুবিধা করিতে পারিবে না। যম-জঙ্গল কাছারিতে ভিখন তেওয়ারী আছে। পুলিস গিয়া তাহার উপর অত্যাচার করিতে পারে এবং পুলিসের চাপে ভিখন তেওয়ারী হয়তো ভিতরের কথা প্রকাশ করিয়াও দিতে পারে। ভিখন তেওয়ারী লোকটির উপর অঘোরবাবুর তাদৃশ আস্থা নাই। কিন্তু যেহেতু সে লোকটি কুস্তি করিতে পারে, মালিকের সেজন্য তাহার উপর অসীম অনুগ্রহ।

পুলিস যখন সেখানে যাইবে, তখন ভিখন তেওয়ারীর সেখানে থাকিবার কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

তাহাকে যম-জঙ্গল হইতে সরাইয়া দেওয়া ভাল বিবেচনা করিয়া অঘোরবাবু একটি সিপাহী পাঠাইয়া দিলেন যে, ভিখন তেওয়ারী যম-জঙ্গল কাছারিতে তালা লাগাইয়া দিয়া অবিলম্বে যেন সদরে চলিয়া আসে। যম-জঙ্গলে কাহারও থাকিবার প্রয়োজন নাই। এই ব্যবস্থা করিয়া অঘোরবাবু ভাবিতে লাগিলেন যে, এখন তাঁহার থানার দারোগার সহিত দেখা করা সমীচীন হইবে কি না! ভাবিতেছিলেন, এমন সময় হাবেলির জমাদার আসিয়া সেলাম করিয়া নিবেদন করিল যে, রাণীজী তাঁহার সহিত কথা কহিতে চান।

রাণীজী?

হ্যাঁ, হুজুর।

বল গিয়ে, আসছি এখনই।

অঘোরবাবু বিস্মিত হইয়া গেলেন। রাণীজী সহসা তাঁহার সহিত কি কথা বলিবেন এতরাত্রে!

পরদার অন্তরাল হইতে বহ্নিকুমারী প্রশ্ন করিলেন, যম-জঙ্গলের যম-ঘর সম্বন্ধে খবরটা আপনি শুনেছেন?

অঘোরবাবুর পাথরের মত মুখ আরও শক্ত হইয়া গেল। তিনি অবিকম্পিত স্বরে মিথ্যা কথা বলিলেন, না।

সেখানে গোলোক সা বলে একজন প্রজাকে আটকে রাখা হয়েছে নাকি?

কই, না, শুনি নি তো কিছু।

চারিদিকে তা হলে যে রব উঠেছে—

অঘোরবাবু বলিলেন, মিথ্যে গুজব।

নারীজাতির নিকট, তা হউন না তিনি রাণী বহ্নিকুমারী, এসব গুহ্য ব্যাপার প্রকাশ করার কোন অর্থ হয় না, অঘোর চক্রবর্তী তাহা বুঝিতেন, এবং বুঝিতেন বলিয়াই বোধ হয় অসঙ্কোচে মিথ্যা কথাগুলি বলিয়া গেলেন। বহ্নিকুমারী আবার প্রশ্ন করিলেন, যম-জঙ্গলে কে আছে এখন?

এখন কেউ নেই সেখানে। ভিখন তেওয়ারী ছিল, তাকেও ডেকে পাঠিয়েছি।

কেন?

কাল সেখানে পুলিস যাওয়ার সম্ভাবনা আছে।

বহ্নিকুমারী নীরব হইয়া রহিলেন। তারপর বলিলেন, আচ্ছা, আপনি যেতে পারেন এখন। নানা রকম গুজব আমার কানে এসেছিল বলে আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

অঘোরবাবু বিদায় লইলেন।

বহ্নিকুমারী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। তাহা হইলে তিনি যাহা শুনিয়াছেন, সব সত্য। তাঁহাদের ম্যানেজারও পুলিসের আগমনবার্তা শুনিয়াছেন এবং সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন। নির্দোষ হইলে সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন হইত না। অঘোরবাবু মিথ্যা কথা বলিয়াও বহ্নিকুমারীকে ঠকাইতে পারেন নাই। গোলোক সা নিশ্চয়ই তাহা হইলে যম-ঘরে বন্দী আছে। এ বিষয়ে তাঁহার কোনও সন্দেহ রহিল না। পুলিসের আগমনবার্তা পাইয়া অঘোরবাবু হয়তো গোলোক সাকে ছাড়িয়াও দিয়াছেন কিংবা মালিকের হুকুম ব্যতীত হয়তো তিনি তাহাও পারিতেছেন না। বহ্নিকুমারী মনে মনে স্থির করিলেন, আমি নিজে গিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিব। উগ্রমোহন সিংহের পত্নী আমি। কাল সকালে পুলিস গিয়া দেখিবে, কেহ নাই। কমলাক্ষ ম্যানেজারের সমস্ত কৌশল পণ্ড হইয়া যাইবে। কথাটা যখন আমার কানে আসিয়াছে, তখন স্বামীর অপমান আমি কিছুতে হইতে দিব না। তাহা ছাড়া স্বামীর ক্রোধে পড়িয়া একটি নিরীহ লোক অনর্থক কষ্ট পাইতেছে, তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়াই তো উচিত। গোলোক সাকে যদি যম-ঘরে পুলিসেরা পায়, তাহা হইলে উগ্রমোহনের শুধু যে পরাজয়, তাহা নয়,—ঘোরতর অসম্মান। শত্রু মিত্র সকলে হাসিবে। তাহা সহ্য করা বহ্নিকুমারীর পক্ষে অসম্ভব। নাঃ, নিজহস্তে বহ্নিকুমারী ইহার প্রতিকার আজই করিবেন। বহ্নিকুমারী ডাকিলেন, কুসুম!

কুসুম আসিলে তিনি বলিলেন, বিহঙ্গিনীকে ডেকে দে তো। বিহঙ্গিনী বহ্নিকুমারীর সহচরী-প্রধানা। তাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য বহ্নিকুমারী তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বিহঙ্গিনী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাতলা ছিপছিপে গড়নের শ্যামবর্ণা একটি যুবতী। চক্ষু দুইটি বেশ বড় বড়, হাসিতে ও বুদ্ধিতে সমুদ্ভাসিত। বহ্নিকুমারী বলিলেন, বিহঙ্গ, একটা কাজ করতে হবে তোমাকে।

কি, বলুন?

আজ রাত্রে সবাই যখন ঘুমুবে, তখন পালকি করে তুমি ও আমি একবার বেরুতে চাই। যম-জঙ্গলে যাব। লুকিয়ে যাব এবং লুকিয়ে ফিরে আসব। বাগানের দিকের খিড়কি-দরজাটা খুলে রেখো। পালকি-বেহারা খিড়কি-দরজার সামনে যে জামগাছটা আছে তারই তলায় যেন আমার অপেক্ষা করে। বাগানের ভেতর দিয়ে গাছের ছায়ায় বেরিয়ে যেতে চাই। কথাটা গোপনীয়। বেহারাদের সে কথা বলে দিও।—বলিয়া বাক্স খুলিয়া কিছু অর্থ তিনি বিহঙ্গিনীকে দিলেন। বলিলেন, তোমার অনেকদিন থেকে পার্সী শাড়ির শখ। ওতেই হবে বোধ হয়। আর এই কটা টাকা বেয়ারাদের দিও।

বিহঙ্গিনী একটু হাসিয়া চলিয়া গেল। বহ্নিকুমারীর এই অদ্ভুত খেয়ালে মনে মনে একটু যে

বিস্মিত হইল না, তাহা নয়। রাণীজীর নানারূপ বিচিত্র খেয়ালের সহিত অবশ্য তাহার পরিচয় আছে। কিন্তু অদ্যকার এই নৈশ-অভিযানটা একটু বেশি রকম খাপছাড়া বলিয়া তাহার ঠেকিল। বিস্ময়কে সে অবশ্য মাত্রা ছাড়াইতে দিল না, কারণ হাতে অনেকগুলা টাকা পাওয়া গিয়াছে এবং রাণীজীর খেয়ালটা চরিতার্থ করিতে পারিলে একখানা বেনারসী শাড়ি বকশিশ পাওয়াও অসম্ভব নয়। সুতরাং মনের বিস্ময় মনেই চাপিয়া বহ্নিকুমারীর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা করিতে সে তৎপর হইয়া উঠিল।

বহ্নিকুমারীর শয়নকক্ষে উগ্রমোহনের একটি তৈলচিত্র টাঙানো ছিল। নির্নিমেষনেত্রে বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া ছিলেন। গর্বিত উগ্রমোহন কোষনিবদ্ধ তরবারিতে হস্তার্পণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অদম্য পুরুষসিংহ। বহ্নিকুমারী ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

পূর্ব-নির্দেশ অনুসারে বাগানের খিড়কিদ্বারে পালকি-বেহারা ও বিহঙ্গিনী অপেক্ষা করিতেছিল। বহ্নিকুমারী সন্তর্পণে গিয়া পালকিতে উঠিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ একখানি কালো শালে আপাদমস্তক ঢাকা।

পালকি নিঃশব্দে যম-জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিল। শুক্লা-একাদশীর জ্যোৎস্নায় চতুর্দিক উদ্ভাসিত।

যম-জঙ্গল কাছারিতে যখন বহ্নিকুমারীর পালকি পৌঁছিল তখন সেখানে কেহ নাই। শুক্লা-একাদশীর চন্দ্র পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে। দুইটি 'চোখ গেল'-পাখী পাল্লা দিয়া সুর চড়াইয়া ডাকিতেছে। বহ্নিকুমারী পালকি হইতে অবতরণ করিলেন। বিহঙ্গিনীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন, তোমরা এখানে থাক, আমি এখনই ফিরে আসছি। ঘটিটা আমাকে দাও।

একা যেতে ভয় করবে না আপনার? আমি না হয় আপনার সঙ্গে যাই।

কিছু দরকার হবে না। আমার মানত হচ্ছে যে, একা রাত্রে বাহিনীর জল নিয়ে সিংহবাহিনীর পূজো দেব।

পালকিতে আসিতে আসিতে বহ্নিকুমারী বিহঙ্গিনীকে একটি গল্প বানাইয়া বলিয়াছিলেন। গল্পটি এই যে, তিনি সন্তান-কামনায় সিংহবাহিনীর একদিন পূজা দিয়াছিলেন। তারপর স্বপ্ন দেখিয়াছেন যে, সিংহবাহিনী যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, একা রাত্রে বাহিনী-নদীর জল যম-জঙ্গল থেকে এনে যদি আমার পূজা করতে পারিস, তা হলে তোর কামনা সিদ্ধ হবে।

সুতরাং বিহঙ্গিনী আর কিছু বলিল না। বহ্নিকুমারী একাকিনী বনপথে চলিয়া গেলেন।

কিছুদূর গিয়া সত্যই কিন্তু তাঁহার ভয় করিতে লাগিল। যদিও বনের মধ্যে পথ আছে এবং জ্যোৎস্নায় পথ দেখিতে কোন অসুবিধা নাই, কিন্তু বনের বিরাট গাম্ভীর্য বহ্নিকুমারীর মনে ভীতির সঞ্চার করিতে লাগিল।

পাশের একটা ঝোপের মধ্যে সরসর করিয়া কি যেন সরিয়া গেল। বহ্নিকুমারীর গাটা ছমছম করিয়া উঠিল।

কিছুদূর গিয়া তিনি দেখিলেন, অল্প দূরে একটা ফাঁকা জায়গায় কতকগুলি শৃগাল কোলাহল করিতেছে। তিনি সেদিকে না গিয়া অন্য দিকে অগ্রসর হইলেন। যম-ঘরটা যে ঠিক কোথায় অবস্থিত, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার ধারণাও খুব স্পষ্ট নয়। কিছুদিন আগে দিবালোকে একবার যম-ঘরটা তিনি দেখিয়াছিলেন। দেখিলে তিনি চিনিতে পারিবেন; কিন্তু এই বিস্তীর্ণ বনভূমির মধ্যে কোথায় যে ঘরটা আছে, তাহা খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত। কিন্তু বাহির তিনি করিবেনই, তাঁহাকে করিতেই হইবে। যম-ঘরের চাবিটা তিনি শক্ত করিয়া হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া আরও খানিকটা দূর অগ্রসর হইলেন। হঠাৎ আবার তাঁহাকে থামিয়া যাইতে হইল। কাহার যেন ক্রন্দন ভাসিয়া আসিতেছে। শিশুর ক্রন্দন। বহ্নিকুমারীর বুকের ভিতরটা সহসা কাঁপিয়া উঠিল। একটু স্থির হইয়া তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, শব্দটা সম্মুখবর্তী বৃহৎ দেবদারুবৃক্ষ হইতে আসিতেছে। তখন তাঁহার মনে পড়িল, কোথায় যেন পড়িয়াছিলেন, শকুনি-শাবকরা ওইরূপ শব্দ করে বটে।

আবার তিনি কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। সামনের একটা ঝোপ পার হইয়া দেখিলেন যে, বাহিনী-নদীর তীরে আসিয়া পড়িয়াছেন। বাহিনীর দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন। বাহিনী-নদী আঁকিয়া-বাঁকিয়া বিসর্পিতগতিতে যম-জঙ্গলের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। তাহার একটা বাঁকের মুখে একটা গাছ হেলিয়া নদীর উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তাহাতে অসংখ্য খদ্যোত জ্বলিতেছে। যেন নক্ষত্রখচিত এক টুকরা অমাবস্যার আকাশ কেহ জ্যোৎস্নার মধ্যে টাঙাইয়া দিয়াছে। বহ্নিকুমারী তাহার দিকে চাহিয়া খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

টি-ট্রি-হি—টি-ট্রি-হি—টি-ট্রি-হি—

একটি টিট্রিভ পক্ষী ডাকিয়া উঠিল। বহ্নিকুমারী চমকাইয়া উঠিলেন। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, যম-ঘর তো বাহিনীর তীরে নয়—যম-ঘর জঙ্গলের মধ্যে। বুঝিলেন, তিনি পথ ভুল করিয়াছেন। বাহিনীর তীর ত্যাগ করিয়া তিনি আবার বনের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। যম-ঘরে তাঁহাকে যাইতেই হইবে। গোলোক সা যদি সেখানে থাকে, তাহাক ছাড়িয়া দিতে হইবে। গঙ্গাগোবিন্দকে কিছুতে বুঝিতে দেওয়া হইবে না যে, উগ্রমোহন সিংহ একটা নরঘাতক দস্যু।

বনের মধ্যে একাকিনী বহ্নিকুমারী চলিয়াছেন। চরণ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গিয়াছে, সেদিকে তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই। ভয়ও তাঁহার আর করিতেছে না। যম-ঘরের চাবিটা দৃঢ় মুষ্টিতে ধরিয়া নির্ভীক চিত্তে তিনি চলিয়াছেন।

।। ত্রিশ ।।

বহ্নিকুমারী আর ফিরিলেন না।

যম-ঘরে দুইটি ময়াল সাপ ছিল।

গঙ্গাগোবিন্দ সংবাদটা যখন শুনিলেন, সহসা বিশ্বাসই করিতে পারিলেন না। বহ্নিকুমারী মরিয়াছেন? বহ্নি কি কখনও নেবে?

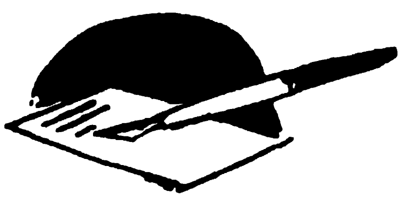
।। একত্রিশ ।।

দ্বৈরথ বন্ধ হয় নাই।

আগে যেমন চলিতেছিল, এখনও তেমনই চলিতে লাগিল। উগ্রমোহন কেবল একটু বেশি গম্ভীর হইয়া পড়িয়াছিলেন। চন্দ্রকান্তের সঙ্গীতচর্চা আর একটু যেন বাড়িয়াছিল। দাবাখেলা থামে নাই। সবই পূর্ব্বের মত চলিতেছিল। উগ্রমোহন চন্দ্রকান্তের সহিত বহ্নি-সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। কেবল একদিন একটু বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন।

গজটা আগাইয়া দিয়া চন্দ্রকান্ত বলিলেন, মন্ত্রী সামলাও।

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া উগ্রমোহন খানিকক্ষণ দাবার ছকের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা অপ্রাসঙ্গিকভাবে চন্দ্রকান্তকে প্রশ্ন করিলেন, আচ্ছা, ইমন আর পূরবীর তফাত ধর কি করে তোমরা?



কিছুক্ষণ

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়
("বনফুল")

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

অগ্রগামী কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু—

ভাগলপুর

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

কিছুক্ষণ

১

সময়ের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

সূর্য্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু সব চলিয়াছে। কত আশা-নিরাশা, আনন্দ-অবসাদ, স্তুতি-নিন্দা, সুন্দর-কুৎসিত, কালস্রোতের ঘূর্ণাবর্ত্তে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। অদৃশ্য ভবিষ্যতকে লক্ষ্য করিয়া—কিম্বা হয়ত লক্ষ্য না করিয়াই—নিখিল বিশ্ব ভাসিয়া চলিয়াছে।

আমিও চলিয়াছি।

গরুর গাড়ীর গাড়োয়ানটাকে বলিলাম—"তুই ট্রেণটা ফেল করাবি দেখছি—একটু হাঁকিয়ে চ"। ফলে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়া মন্থরগতি বলীবর্দ্দযুগলকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। গতিবেগ সামান্য একটু বাড়িল বটে কিন্তু তাহা এমন নয় যে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

৩

কিছুক্ষণ

বন্ধুর গ্রাম্যপথ।

যতদূর দৃষ্টি চলে চাহিয়া আছি। চোখে পড়িতে দূরে তালগাছের সারি। ঋজু বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আকাশে বুকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য আঁকিয়া রাখিয়াছে। তাহাদে আশপাশের ঘনসন্নিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীকে এতদূর হইতে চে যায় না। নগণ্য জনতার মত উহারা দিগন্তরেখাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। ডানদিকের একটা ঝোপ হইতে একটা শৃগাল হঠাৎ বাহির হইয়া এদি ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ আমাদে সাড়া পাইয়া সচকিত হইয়া ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গে দেখি আর একটা। গাড়োয়ান গরু দুইটিকে আর একব সম্ভাষণ করিয়া আমাকে বলিল

"গতিক ভাল লয়—"

"কিসের গতিক?"

"দু দুটো গিয়ে শেয়াল ডানদিকেই, লক্ষণ ভাল লয়

"তাই নাকি?"

"লয় ত কি, কাগ, শেয়াল আর সাপ এ তিনে জানোয়ার ভারি ইয়ে জানবেন আপনি। হনুমান বটে—"

"বাজে! কলিকালে ওসব আর ফলে না!"

গাড়োয়ান খানিকক্ষণ কিছু বলিল না।

বোধহয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ গরুর পিঠে এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিয়া সে কহিল—"আমার হাতে হাতে ফল দেখা আছে। শোনা কথা লয় যে বলব ইয়ে– আরে ই শালার বয়েলটাও একের লম্বর হারামজাদ" বলিয়া সে বলদটার পৃষ্ঠদেশে সশব্দে আর এক ঘা কসাইয়া দিয়া সুরু করিল।

তাহার কাহিনী এই যে, প্রায় বৎসর খানেক পূর্ব্বে সে লবাইগঞ্জের হাট হইতে মথুর মাঝির সঙ্গে ফিরিতে-ছিল! ফিরিবার পথে ঠিক তাহার বাঁ পাশ ঘেঁষিয়া প্রকাণ্ড একটা সাপ চলিয়া যায়। সে সাপ তাহার গণেশকেই লইতে আসিয়াছিল। তাহা সে তখন জানিতে পারে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"গণেশ কে?"

"আমার ছেলে বাবু। ইয়া দামাল দুরন্ত ছেলে ছিল আমার গণেশ!"

"তাকে সাপে কামড়ে দিলে নাকি? সঙ্গে ছিল তোমার?"

"সঙ্গে থাকবে কিসের লেগে। বলছিলাম না আপনাকে—ভারি বিতিকিচ্ছি জানোয়ার ওগুলা! বাড়ী

যেতে না যেতেই শুনলাম গণশার অসুখ—পেট নামছে বমিও খুব। পহর খানেক রাত হতে না হতেই সব খতম। ওসব কলেরা মলেরা আমি বুঝি না বাবু—লিয়তি ওকে টানছিল!—চ, চ, বাবা আর একটুকুন বাকী—একটু চলে চ—"

গাড়োয়ানের কর্কশস্বর কোমল হইয়া আসিয়াছিল—গরু দুইটি তাহার শোকের সুযোগ লইয়া যতদূর সম্ভব মন্থরগতিতে চলিতে লাগিল! আমিও খানিকক্ষণের জন্য ভুলিয়া গেলাম যে এই ট্রেণটা আমার ফেল করা চলিবে না। কাল আমার কলেজ খুলিবে এবং আমার 'পারসেন্‌টেজ্‌' টায়ে টায়ে আছে। গাড়ীর ছইএর ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া সামনে পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম একজোড়া খঞ্জন পাখী পুচ্ছ দোলাইয়া পথের ধারে চরিয়া বেড়াইতেছে।

২

ট্রেণ ছাড়ে নাই।

আমার ট্রেণ আসেই নাই। শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না। শৃগাল দর্শনের ফল হয়ত। পশ্চিমগামী একখানা গাড়ী লাইনচ্যুত হইয়াছে। এ গাড়ীখানা না উঠিলে অন্য কোন গাড়ী আসা অসম্ভব। সমস্ত ট্রেণ-খানার যাত্রীরা সেই ক্ষুদ্র ষ্টেশনটির প্ল্যাটফর্মে নামিয়া এক বিচিত্র জনতার সৃষ্টি করিয়াছে। আমিও গিয়া তাহাদের দলে যোগ দিলাম। অপরিচিত জনতা।

একটি লোক আমার চেনা নয়।

নিজের বিছানা ও সুটকেসটি ষ্টেশনের কোথায় নিরাপদে রাখা যায় চিন্তা করিতেছি এমন সময় টেলিগ্রাফ অপারেটর বাবুটি সহাস্যমুখে আমাকে সম্বোধন করিলেন।

"এই যে সার, আপনিও জুটে গেছেন দেখছি! এই ট্রেণে যাচ্ছিলেন বুঝি!"

"যেতে আপনারা দিচ্ছেন কই? আপাততঃ এ জিনিসগুলো কোথায় রাখি বলুন দেখি! চারিদিকে যা ভীড়—"

৭

"এই যে এখানে রেখে দিন না—" বলিয়া তিনি তাঁহার আপিসের একটা কোণ দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল।

ছুটির প্রারম্ভে যখন মামার বাড়ী আসিতেছিলাম তখন গাড়ীতে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সিগারেট আদান প্রদান করিতে করিতে আলাপটা ঘনিষ্ঠই হইয়াছিল। মনে পড়িতেছে যে সেই স্বল্প আলাপের মধ্যেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে ভদ্রলোকের পরিবারের নাম বিনোদিনী এবং সে স্বামীর কাছে আসিয়া থাকিতে উৎসুক; কিন্তু রেল-কোম্পানি এমন কৃপণ যে কিছুতেই ভাল একটা কোয়ার্টার তাহাকে দিতেছে না। ভদ্রলোকের নাম মাখনলাল। বেশ মন-খোলা লোক। প্রায় মাসখানেক পূর্ব্বে একদা উভয়ে এই ষ্টেশনে নামিয়াছিলাম। মাখনবাবু আসিয়া কাজে 'জয়েন' করিয়াছিলেন এবং আমি মামার বাড়ী চলিয়া গিয়াছিলাম। এই অপরিচিত জনতার মধ্যে মাখনবাবুকে পাইয়া এবং তাঁহার ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া ভাল লাগিল।

নিকটস্থ টুলটিতে উপবেশন করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি করিয়া ট্রেণটা হঠাৎ এমনভাবে পড়িয়া গেল।"

মুচকি হাসিয়া মাখনবাবু বলিলেন—"গাঁজা—অর্থাৎ আমাদের রামদীনের কীর্ত্তি!"

"রামদীন কে?"

"পয়েণ্টস্‌ম্যান্‌"

"পয়েণ্টস্‌ম্যান্‌ গাঁজা খেয়ে এই কীর্ত্তি করেছে? বলেন কি মশাই?"

গলা খাটো করিয়া মাখনবাবু বলিলেন—"আসল ফ্যাক্ট হল এই। তবে আমরা রামদীনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আপনি যেন কথাটা বলে বেড়াবেন না!"

সহসা টেলিগ্রাফের কলটা টক্‌টক্‌ করিয়া উঠিল এবং মাখনবাবু আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া টকা টরে সুরু করিয়া দিলেন। তাহার পর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"সমস্ত দিন ভোগান্তি আছে আজ! রিলিফ্‌ ট্রেণ সন্ধ্যের আগে পাওয়া যাবে না।" আবার কল কথা কহিয়া উঠিল—আবার মাখনবাবু সাড়া দিলেন। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মের কোণে যে জলের কলটা আছে তাহার সম্মুখে বহু লোকের ভীড়। কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে।

একটি শীর্ণকান্তি লোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছে।

রগের শিরগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে।—"একশবার বলব আমি। সেকেন কেলাসের টিকিট আছে বলে কি তোমার বাবুর বেশী তেষ্টা নাকি আমাদের চেয়ে! ইস্ ভারি সেকেন কেলাস ফলাতে এসেছে আমার—সর্ বলছি—"

ভৃত্য-স্থানীয় একটি ছোকরা একটি প্রকাণ্ড কুঁজায় জল ভরিতেছিল। সে অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিল—"আমার ভরা হোক আগে! হুড়বড় কোরো না—"

চাকরটির গায়ে ফরসা হাতকাটা ফতুয়া, কানে একটি অর্দ্ধ-দগ্ধ বিড়ি। বেশ চালাক চতুর চেহারা।

শীর্ণ ভদ্রলোক বলিলেন—"তোমার ওই দিগ্‌গজ কুঁজা ভরতে ত সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সর আমার এই ছোট ঘটিটা ভরে নি আগে—"

ভৃত্য কোন জবাব না দিয়া জল ভরিতে লাগিল। শীর্ণকান্তি লোকটি বলিতে লাগিল—"ওহে, কথার জবাব দাও না কেন হে তুমি। আচ্ছা বেল্লিক ছোকরা ত—"

"মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি—"

"মুখে এক থাবড়া মারব তোমার। ডেঁপো ছোকরা কোথাকার!"

"এই ভীড়ের মধ্যে কারু বাপের সাধ্যি আছে আমার গায়ে হাত দিক্ দিকি—"

"বাপ তুলে গালাগালি দেবার জায়গা পাওনি আর। ব্যাটাচ্ছেলে—হারামজাদা—"

"মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি—"

একজন দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ কাবুলীওলা বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া আগাইয়া গেল এবং এক ঝটকায় ছোকরাকে সরাইয়া দিয়া নিজের বদনা ভরিতে সুরু করিয়া দিল। সেই কাবুলী-ঝট্‌কার প্রাবল্যে যাহা প্রত্যাশিত তাহাই ঘটিল। কুঁজা ভাঙিয়া গেল এবং ভৃত্য ভূশায়ী হইল। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটিং রুম হইতে এক আর্ত্ত নারী-কণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম একটি মহিলা নিতান্ত অসহায়ভাবে বলিতেছেন

"ওমা—কি হবে গো! কাবলেটা ছট্টুকে মেরে ফেল্লে যে গো!"

আইনত এইবার আমার পৌরুষ জাগ্রত হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া আমি ফিক্ করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। হাসি অবশ্য বেশীক্ষণ টিকিল না—কর্ম্মক্ষেত্রে শেষ পর্য্যন্ত অবতীর্ণ হইতেই হইল।

ওয়েটিং রুম হইতে একজন বৃদ্ধ গোছের ভদ্রলোক বাহির হইলেন। পুরু লেন্সের চশমা পরা। ভদ্রলোক মহিলাটিকে বলিলেন—"তুই ভেতরে যা'—আমি দেখছি।"

বলিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন। আসিয়া "ছট্টু—এই ছট্টু" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া অসহায়-ভাবে এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন। আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—"বড় মুস্কিলে পড়া গেল। বিধবা মেয়েটা কাল থেকে নিরম্বু উপবাসী অথচ জল যোগাড় করা মুস্কিল ব্যাপার দেখছি। ওই কাবলের সঙ্গে যোঝবার সামর্থ্য আমার ত নেই। ওরে ছট্টু—এ ব্যাটা চাকর আচ্ছা বাক্যবাগীশ! আবার কার সঙ্গে বচসা সুরু করেছে!"

তখন আমাকে বলিতে হইল "আমাকে একটা কিছু পাত্র দিন ত—চেষ্টা করে দেখি যদি জল আনতে পারি!"

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার হাত দুটি ধরিয়া বলিলেন—"অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন যদি পারেন। যা ভীড়—"

ফিরিয়া দেখিলাম কাবুলীওলা বেশ স্বচ্ছন্দে সমস্ত কলটা অধিকার করিয়া মুখ-প্রক্ষালন করিতেছে এবং অন্ততঃ পঞ্চাশজন প্যাসেঞ্জার বিরক্তি-বিদ্রূপ-হতাশাময় ভঙ্গীতে তাহাকে ঘিরিয়া নানা গ্রামে চীৎকার করিতেছে। ছট্টুও উঠিয়াছে এবং সেই শীর্ণকান্তি লোকটিকে নিকটে পাইয়া বাচনিক বীররসের অবতারণা করিতেছে।

আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বলিলাম—"একটা কিছু পাত্র দিন তাহলে—"

"আসুন—"

ভদ্রলোকের পিছু পিছু ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়া অ্যালুমিনিয়মের একটা ঘটি লইয়া কলের দিকে অগ্রসর হইলাম। ভীড় ঠেলিয়া কাবুলীওলার নিকটস্থ হওয়াই মুস্কিল। হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারী, বাঙালী, বেহারী সকলেই জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সকলেরই লক্ষ্য কলটার উপর—কেহই কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। গাড়ু হস্তে এক বেঁটে ভদ্রলোক একটু তফাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। তিনি আমাকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিলেন—

"ও ব্যাটার হয়ে যাক আগে, তারপর ধরবেন মশাই। কেন মিছিমিছি সকালবেলায় গো-খাদক ব্যাটার হাতে মার খেয়ে মরবেন!"

"দেখি—"

ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং কাহাকেও ঠেলিয়া, কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহাকেও অনুনয় করিয়া, কাহারও পাশ কাটাইয়া কাবুলীওলার নিকটস্থ হইলাম। সে তখন তোড়ে কল খুলিয়া দিয়া মাথা

ধুইতেছে। আমি কাছে আসিতেই সে আমার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে চাহিল। চাহিবামাত্র আমি তাহাকে ভাঙাভাঙা হিন্দিতে বুঝাইয়া বলিলাম যে একটি জেনানি অত্যন্ত পিপাসার্ত্ত, তাহার জন্য জল অবিলম্বে প্রয়োজন—সুতরাং কলটা একবার ছাড়িয়া দেওয়া দরকার !

—"জরুর"

কাবুলীওলা তৎক্ষণাৎ কল ছাড়িয়া দিল। এত অল্প আয়াসে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কাবুলীওলার প্রতি রাগের ভাবটা কমিয়া আসিল। ঘটি অর্দ্ধেক ভরা হইয়াছে এমন সময় কাছায় টান পড়িল। ফিরিয়া দেখিলাম সেই বেঁটে ভদ্রলোকটি একমুখ হাসিয়া আমাকে বলিতেছে—"এই ফাঁকে আমার গাড়ুটাও ভরে দিন না মশাই। আপনাকে যখন ভরতে দিয়েছে। পুলিশে কাজ করেন বুঝি আপনি—হেঁ হেঁ তাই—"

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার ঘটি পরিপূর্ণ হইলে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভদ্রলোককে বলিলাম—"এইবার নিন না—" কিন্তু কাবুলীওলা সে সুযোগ তাহাকে দিল না। আমি সরিয়া যাইতেই সে আসিয়া কল দখল করিল এবং বাকী সকলে নিষ্ফল কোলাহল করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ

ভীড় ঠেলিয়া জলের ঘটিটি লইয়া সন্তর্পণে ওয়েটিং-রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃদ্ধ দ্বারেই দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার বিধবা কন্যাও দেখিলাম পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। আশা করিতেছিলাম তিনি আমার এই অসাধ্যসাধনে পুলকিত হইয়া আমায় ধন্যবাদ দিবেন এবং ওই পিপাসিতা বিধবাটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির দ্বারাও আমাকে অন্তত পুরস্কৃত করিবেন।

কিন্তু কিছুই হইল না!

মেয়েটি বলিল—"ও জল আমি খাব কি ক'রে ?"

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন—"কেন ?"

তারপর হঠাৎ আমার পায়ের দিকে চাহিয়া হতাশ-ভাবে বলিয়া ফেলিলেন—"এঃ সব মাটি হল।"

মেয়েটি বলিল—"তুমি ওঁকে বলে দিলে না কেন বাবা,—ওঁর কি অত খেয়াল আছে!"

"আরে বাঃ—হিন্দু বিধবার জন্যে জুতো পায়ে দিয়ে জল আনে না কি কেউ!"

অপরাধী পাদুকাযুগলের প্রতি চাহিয়া আমি একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আরে বাঃ—তাতে কি হয়েছে। জলটা অন্য কাজে

লাগবে। ভীড়টা কমুক একটু—জল পাওয়া যাবে এখুনি—"

কি করিব ভাবিতেছি এমন সময় সোরগোল করিতে করিতে টেলিগ্রাফ মাষ্টার মাখনলাল আসিয়া হাজির।

"আরে মশাই, আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান্। হঠাৎ কোথায় ডুব মারলেন? ওকি, হাতে জলের ঘটি কেন?"

বলিলাম।

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা কি? আপনার মেয়ের জন্যে জলটল সব আমি বাসা থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও কলের আশা ছেড়ে দিন—"

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আসুন আপনি—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।"

জলের ঘটিটা নামাইয়া দিয়া মাখনলালের অনুবর্ত্তী হইলাম। যাইতে যাইতে মাখন আমাকে কনুই দিয়া এক খোঁচা মারিয়া ভ্রূ নাচাইয়া বলিলেন—"কেল্লা মার দিয়া। বুঝলেন? কোয়ার্টার পেয়ে গেছি। ওয়াইফ্‌কে এনে ফেলেছি। খান না এখন কত চা খাবেন আপনি।" বলিয়া ভদ্রলোক হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

পরমুহূর্ত্তেই আবার গম্ভীর হইয়া চিন্তিতস্বরে সুরু কহিলেন—"ট্রেণখানা ডিরেল্‌ড্‌ হয়ে বড় যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেল। রামদীনটাকে 'এনি হাউ' বাঁচাতে হবে। আমাদের মাষ্টার মশাইও উঠে পড়ে লেগেছেন। দেখা যাক কতদূর কি করা যায়। ব্যাটা গাঁজা খেয়েই মরেছে কি না, তা না হলে লোক ভাল। ওই ত নিজের কোয়ার্টারটা আমায় ছেড়ে দিয়েছে। তা না হলে বিনুকে আমি আনতে পারতাম না কি? ব্যাটা গ্রেট সোল্‌। বললে, আমাকে 'হুজুর বহু মায়িকো লিয়ে আনেন—আমি টিশনে শুত্‌ব। হামার ত জরু টরু কোই নেহি আছে!' ব্যাটা আবার বাঙলা বলে! সত্যি ব্যাটার তিনকুলে কেউ নেই। লোক ভাল। মাটি করেছে ব্যাটাকে গাঁজাতে—"

আমি বলিলাম—"ছোটবাবুর কোয়ার্টার নেই—অথচ পয়েণ্টস্‌ম্যানের কোয়ার্টার আছে এ কি রকম ব্যবস্থা—"

"কোয়ার্টার থাকবে না কেন? ওই যে দেখুন না—রিপেয়ার হচ্ছে—টিমে তেতালা চালে—" বলিয়া তিনি দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

মাখনবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলাম

এবং লক্ষ্য করিতেছিলাম কত বিভিন্ন জাতীয় যাত্রী এই ছোট ষ্টেশনটিতে আটকাইয়া পড়িয়াছে।

একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে যেন।

ট্রেণ লাইনচ্যুত হইয়াছে প্রায় ঘণ্টা দুই হইল। এই দুর্ঘটনার আকস্মিকতা প্রথমে সকলের মনকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নাড়া দিয়াছিল—এখন দুই ঘণ্টা পরে সে ভাবটা আর নাই। এই দুর্ভাগ্যটাকে মানিয়া লইয়া এখন সকলে খানিক ক্ষণের জন্য থিতাইয়া বসিয়াছে। ছোট বড় নানা দলে বিভক্ত হইয়া সকলে নিজ নিজ সুবিধা অন্বেষণে তৎপর হইয়াছে।

আরশোলা-রঙের আজানুলম্বিত গলাবন্ধ কোট গায়ে একটি মাড়োয়ারি সপরিবারে একস্থানে বসিয়া আছে দেখিলাম। মাথায় হলুদরঙের পাগড়ি বহুপাকে পাকান। মুখে ভীত-বিনীত-চতুর ভাব। চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছে। গোঁফজোড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাছেই দুই তিনজন ঘোমটা দেওয়া মহিলাও বসিয়া আছে। হাতে ও পায়ে মোটা মোটা গোল গোল গহনা পরা, পরণে লাল ও হলুদ রঙের ছাপা শস্তা জরির পাড় বসান কাপড়, অঙ্গে প্রায় তদনুরূপ ওড়না। যদিও ঘোমটা দেওয়া কিন্তু

কিছুক্ষণ

অনর্গল কিড়ির মিড়ির করিয়া বকিয়া চলিয়াছে। আমাদের নিকটবর্ত্তী হইতে দেখিয়া মাড়োয়ারি ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিল এবং মাখনবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল যে ট্রেণ ঠিক হইতে কত বিলম্ব হইতে পারে।

মাখনবাবু বলিলেন—"খবর ত দিয়েছি আমরা। এখন প্রভুরা দয়া করবেন তবে না সব ঠিক হবে।" বলিয়া মাখনবাবু হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একদল মুসলমান গোল হইয়া বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে পাঁচ ছয় বছরের একটি মেয়েকে দেখিয়া বেশ লাগিল। ফুটফুটে সুন্দর মুখখানি—ডাগর চোখ দুটিতে সুর্মা লাগান—মাথায় লম্বা বেণী—পরণে কমলা রঙের চিলা পায়জামা—গায়ে ঘন-নীল রঙের আঙরাখা। সর্ব্বদাই ছটফট করিতেছে। আমাকে দেখিয়া অকারণে মুখবিকৃতি করিয়া জিভটা বাহির করিয়া মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইল।

একটি কুচকুচে কালো ভারতীয় ক্রিশ্চান সাহেব তাঁহার সুসজ্জিতা মেমসাহেবসহ একটু দূরে তফাতে দাঁড়াইয়াছিলেন। মেমসাহেবটির বর্ণও মর্ম্মান্তিক। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল যেন তাঁহারা

স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া এই দূষিত জনতার মধ্যে কোনক্রমে দয়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাহেবটির হাতে একটি অর্দ্ধ-দগ্ধ বর্ম্মা চুরুট—মেমসাহেবের হাতে একটি ভ্যানিটি ব্যাগ। মেমসাহেব মুখে প্রচুর পাউডার মাখিয়াছিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মকালে ঘর্ম্মাক্ত কালো মুখে পাউ-ডারের প্রাচুর্য্য দেখিয়া একটা উপমা হঠাৎ মনে উদয় হয়—যেন মাগুর মাছকে কুটিবার পূর্ব্বে ছাই মাখান হইয়াছে।

সাহেব একটু আগাইয়া আসিয়া মাখনবাবুকে প্রশ্ন করিলে—I say, how long are we to wait in this hell of a station—

নির্ব্বিকার-চিত্তে মাখনবাবু বলিলেন—"Can't say"

সাহেব একটু রাগতস্বরে উত্তর দিলেন—"If I Cannot reach my place to-day I shall sue the Railway Company—"

মাখনবাবু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। খানিক দূর আগাইয়া গিয়া কেবল নিম্নস্বরে বলিলেন—"বেটাচ্ছেলে!" এবং আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

আরো একটু অগ্রসর হইয়া দেখা গেল কয়েকটি

কিছুক্ষণ

যুবক এক জায়গায় জমায়েত হইয়া হাস্যপরিহাসে বেশ মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। যুবকগুলির চেহারা বেশবাস কথাবার্ত্তা বৈচিত্রময়। কাহারও পরিধানে ঢিলা পায়জামা, কেহ কাপড়টাকে কায়দা করিয়া পায়জামার মত করিয়া পরিয়াছে, জুলফি গোঁফ ও দাড়িতেও অতি আধুনিকতার উগ্রতা। এ সবের কোন অভাব নাই। অভাব দেখিলাম ভব্যতার। একটি ট্যারাগোছের ছোকরা কোমরে হাত দিয়া দুলিয়া দুলিয়া হো হো করিয়া হাসিতেছিল।

ইহাদের এত আনন্দের উৎস কি তাহাও পরক্ষণেই আবিষ্কার করিলাম। নিকটেই দেখিলাম একটি কমবয়সী মেয়ে একেবারে একাকিনী একটি স্যুটকেসের উপর বসিয়া আছে। কাছাকাছি তাহার কোন আত্মীয়-স্বজন আছে বলিয়া মনে হইল না। মেয়েটি গম্ভীরভাবে দূরে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশেই খুব সম্ভবত তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই যে সব চটুল আলোচনা চলিতেছিল তাহা যে তাহার কানে যাইতেছে মুখ দেখিয়া তাহা বোঝা গেল না। তথাপি আমার মনে হইল মেয়েটির চোখে যেন একটা বিরক্ত বিপন্নভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একবার মনে হইল তাহাকে জিজ্ঞাসা করি

যে তাহার কোন সাহায্য আমি করতে পারি কি না—কিন্তু সঙ্কোচ হইল—পারিলাম না।

একটু দূরে দুম দুম করিয়া কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"বন্দুকের শব্দ কেন মাখনবাবু?"

মাখনবাবু বলিলেন—"গোটা দুই সায়েব ছিল মশাই ফার্স্ট ক্লাসে। তাঁরা ট্রেণ ছাড়বার কোন সম্ভাবনা না দেখে বন্দুক ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়লেন। আস্পর্দ্ধা দেখুন না মশাই—যাবার সময় মাষ্টার মশাইকে বলে গেলেন যে তাঁরা না আসা পর্য্যন্ত যেন ট্রেণ ছাড়া না হয়। তাঁরা কাছাকাছিই থাকবেন—ট্রেণ ঠিক হলে তাদের যেন খবর পাঠান হয়। নবাবপুত্তুর সব! মাষ্টার মশাইকে আমি চোখ টিপছিলুম যেন তিনি ওসব কথা গ্রাহ্য না করেন! কিন্তু মাষ্টার মশাই আমাদের সায়েব দেখলেই একেবারে গলে যান! সেলাম করে হাত কচ্‌লে বলে দিলেন "ইয়েস্ সার—ইয়েস্ সার—যতো সব—"

মাখনবাবুর কোয়ার্টারের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। মাখনবাবু বাহির হইতেই চীৎকার করিলেন—"কই বিনু

—চা রেডি ত! আমার সেই বন্ধুটিকে ধরে এনেছি। চা দাও—"

বিন্নু ওরফে বিনোদিনীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাখনবাবু তখন আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া ভেতরে গেলেন। মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম—"সে কি! চায়ের জল এখনও চড়াও নি?"

"আমার ত পাঁচটা হাত নয়! বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে এই ত সবে কাপড়টি ছেড়েছি। বন্ধু আবার টে্কে?"

শুনিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। মাখনবাবু বাহিরে আসিয়া সহাস্যমুখে আমাকে বলিলেন —"আসুন, আসুন ভেতরে আসুন—আগেকার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বিন্নু সেটা আর দিতে চায় না। ফ্রেশ জল চড়াচ্ছে। আসুন—"

গেলাম।

ভিতরে একটিমাত্র ঘর।

সেইটিই বসিবার ও শুইবার ঘর বলিয়া মনে হইল। আরও দুই একটি ছোটখাটো ঘর আছে। সেগুলি বোধ হয় রান্না ভাঁড়ারের কাজে নিয়োজিত। সঙ্কীর্ণ উঠানে একটা ধূমায়িত কয়লার উনানের সামনে বসিয়া বিন্নু প্রাণপণে হাওয়া করিয়া চলিয়াছে। পরণে একখানি

আধময়লা শাড়ি। হাতে কয়েকগাছি সবুজ রঙের কাঁচের চুড়ি ঝুন্ ঝুন্ করিয়া বাজিতেছে।

চতুর্দ্দিক ধূমাচ্ছন্ন।

মাখনবাবুর জবরদস্ত আতিথেয়তা যে এই বধূটিকে বিব্রত করিতেছে তাহা মনে মনে বুঝিতেছিলাম। কিন্তু কি করিয়া ভদ্রভাবে উদ্ধার পাই কিছুতেই মাথায় আসিতেছিল না।

মাখনবাবু খুব আন্তরিকতার সহিত বলিলেন "আসুন, আসুন—এই আমাদের ঘর দোর। পায়রার খোপ বললেও চলে! এঃ, বড্ড ধুঁয়া হল যে!" বলিয়া তিনি কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কপাটটা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আমার যেন দমবন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমি বলিলাম "কপাটটা খুলে দিন—"

"আরও ধোঁয়া ঢুকবে যে মশাই—এ ধোঁয়া এখনি বেরিয়ে যাবে। দাঁড়ান না জানালাটা খুলে দি বেশ করে। ঘরটার এই একটা সুবিধে আছে দক্ষিণ দিকটা বেশ খোলা—" বলিয়া তিনি জানালাটা খুলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন "একটু কি অসুবিধে জানেন—জানালাটা খুলে দিলে একটু বে-আবরু হয়ে পড়ে—। দাঁড়ান দেখি চায়ের জলটার কতদূর—" বলিয়া তিনি

আবার কপাটটা খুলিয়া বাহিরে গেলেন। এই ধূমাচ্ছন্ন ঘরটা হইতে মুক্তি পাইলে যেন বাঁচি। অথচ মাখনবাবুর মনে কষ্ট দিতেও সঙ্কোচ হইতেছে। মাখনবাবু বাহিরে তাঁহার স্ত্রীকে নিম্নস্বরে কি সব বলিতেছিলেন শুনিতে পাইলাম না। মাখনবাবু ঘরে ঢুকিতেই একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

"ওয়েটিং-রুমে সেই বিধবাটিকে জল দিয়ে আসতে হবে—ভুলে গেলেন বুঝি। বাঃ! দিন একটু জল— দিয়ে আসি।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ত। তা আপনি যাবেন কেন। আপনি বসুন না। আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।"

"না না আমিই গিয়ে দিয়ে আসি। জুতো পায়ে দিয়ে গেলে হবে না আবার—"

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন—"কেন আমি খালি পায়ে যেতে পারি না নাকি! চিরটা কাল খালি পায়েই কেটেছে মশাই, ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠবার পর তবে জুতো পায়ে দিয়েছি!"

আমি বললাম—"না শুধু জুতোর কথা নয়, আপনার হাতে যদি আবার না খান। আপনি ত ব্রাহ্মণ নন। বিধবাটি একটু বেশী নিষ্ঠাবতী বলে মনে হল—"

মাখনবাবু পরাস্ত হইয়া বলিলেন—"তাহলে ত নাচার মশাই। আচ্ছা আপনিই যান তাহলে—চট্ করে যান—বেশী দেরী করবেন না যেন সেখানে। চা হয়ে গেল বলে। বিন্নু 'হাউ ফার'?" বলিয়া মাখনবাবু বাহিরে গেলেন এবং বলিলেন—"আগে একঘটি জল দাও ত। ঘটিটা মাজা আছে ত?"

বিন্নু উত্তর দিল—"ঘটি আবার মাজলাম কখন?"

"কখন মেজেছ তা জিগ্যেস করিনি। মাজা আছে কি না।"

"কাল্ল মেজেছিলাম সকালে—"

"আচ্ছা ওতেই হবে। একঘটি জল দাও। ঘরে খাবার-টাবার কিছু আছে? স্রেফ্ ছোলা গুড়? বেশী নেই? আরে যা আছে তাই দাও না—তুমি বেশী কথা বাড়িও না।"

একঘটি জল ও একটি পাথর বাটিতে কিছু ছোলা ভিজান ও গুড় লইয়া নগ্নপদে ওয়েটিং-রুম অভিমুখে রওনা হইয়া গেলাম। কোথাকার কে অচেনা বিধবা তাহার জন্য জল বহিয়া লইয়া যাইতেছি! পারিপার্শ্বিক ঘটনার এমন সমাবেশ হইয়াছে যে কিছুই অসঙ্গত মনে হইতেছে না। বরং না করিলেই যেন অশোভন হইত।

কিছুক্ষণ

ষ্টেশন প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম সেই কমবয়সী মেয়েটি সুটকেসের উপর তেমনই ভাবে বসিয়া আছে এবং তাহার নিকটে নানা ছাঁদের সেই যুবকগুচ্ছ তেমনি হাসাহাসি করিতেছে।

৩

নিষ্ঠাবতী বিধবাকে ভৃঙ্গার জল দান করিয়া পুণ্য-সঞ্চয় করা আমার ভাগ্যে ছিল না। গিয়া দেখিলাম তিনি একাদশীর পারণ শেষ করিয়াছেন। ভৃত্য ছট্টু খবরটি দিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখিলাম ওয়েটিং রুমের এককোণে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন। ভদ্রলোকের ধপ্‌ধপে শাদা গায়ের রঙ্‌। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীত শোভা পাইতেছে। দৃশ্যটা বেশ ভাল লাগিল। বিধবাটিকে উদ্দেশ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলাম—"এগুলো তাহলে ফিরে রেখে আসি?"

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর না দিয়া মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া সরিয়া বসিলেন। আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে অনিচ্ছুক বুঝিলাম। ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ছট্টু ভৃত্য আসিয়া বলিল যে বাবুর পূজা এখনই হইয়া যাইবে—মাইজি আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন।

অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

বসিয়া বসিয়া বিধবাটিকেই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অল্প বয়স। কুড়ির বেশী বলিয়া মনে হয় না। ইহারই মধ্যে জীবনের আনন্দ-দীপটি নিভিয়া গিয়াছে। থান কাপড়, আভরণহীন অঙ্গ, মুখখানি বিষাদ মাখানো। আজিও আমাদের সমাজে অসহায়া বিধবার সংখ্যা অগণিত। দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা আজও আমাদের হিন্দু বিধবাদের সংস্কারে বাধে। এখনও তাঁহারা ইহাকে পাপ বলিয়াই মনে করেন। আমার নিজেরও বিধবা বোন আছে। বাল-বিধবা। বাবা আবার তাহার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। সে কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজী হয় নাই। কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে এই জীবনটাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়।

"ও—এই যে আপনি এসেছেন দেখছি। বসুন, বসুন—"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভদ্রলোক চশমা পরিধান করিতে করিতে বলিলেন—"এ সব কি এনেছেন আপনি?"

"মাখনবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাদের জন্যে।"

"মাখনবাবুটি বুঝি সেই ভদ্রলোক, যিনি তখন আপনাকে ডেকে নিয়ে গেলেন? আরে বাঃ, ছোলা-

গুড় এনেছেন দেখছি! দুষ্প্রাপ্য জিনিস আজকাল। মিণ্টু খাবি?"

মিণ্টু মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। "আচ্ছা, আমিই চারটি খাই তাহলে।—"

ছোলা চিবাইতে চিবাইতে ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন —"বুড়ো হয়েছি—কিন্তু ছোলা এখনও বেশ চিবুতে পারি। সিংক্রেট্ কি জানেন? নিমের দাঁতন!" বলিয়া সহাস্যমুখে চিবাইতে লাগিলেন।

"ট্রেণটা কখন ছাড়বে বলতে পারেন মশাই?"

"শুনছি ত সন্ধ্যার আগে নয়।"

"তাই নাকি? আপনি কোথা যাবেন?"

"কোলকাতা—"

"তাহলে ত আপনার আরো ঢের দেরী। আমাদের গাড়ী না ছাড়লে ত আপনার গাড়ী আসবে না। কি মুস্কিল।"

একটু থামিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন—"এইটুকু শুধু ভগবানের দয়া যে কারো কোন আঘাত লাগে নি।"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—"

ভদ্রলোকের স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া কেমন যেন সম্ভ্রম হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া

বৃদ্ধ আবার বলিলেন, "বড় খুসী হলাম আপনাকে দেখে। কোলকাতায় কি করেন আপনি ?"

"পড়ি"

"পড়েন ? কোন কলেজে ?"

"মেডিকেল—"

"আরে বাঃ। কোন ইয়ার্ হল ?"

"সিক্স্থ্ ইয়ার চলছে—"

"আরে বাঃ ! তাহলে ত ডাক্তার হয়েই গেছ তুমি—আই মিন্ আপনি।"

সসঙ্কোচে বলিলাম - "আমাকে 'তুমি'ই বলুন।"

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। উঠি উঠি করিতেছি এমন সময় তিনি বলিলেন—"বিনোদ বলে' কাউকে চিনতে ? বিনোদ-বিহারী মৈত্র। তোমার চেয়ে কিছু সিনিয়র—বছর চারেকের।"

বলিলাম—"না, চিনি না। কেন ?"

ভদ্রলোক একটু থামিয়া বলিলেন—"সে আমার ছেলে।"

"কোথায় প্র্যাকটিস্ করছেন ? চাকরি পেয়েছেন নাকি ?"

"পাগল হয়ে গেছে সে। এখন পাগলা-গারদে আছে।"

নিদারুণ সংবাদটা যেন বুলেটের মত আসিয়া বিঁধিল। ভদ্রলোকও কিছু বলেন না। আমিও বলিবার কথা কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। মনে হইল বিধবা যুবতীটি একদৃষ্টে যেন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। ফিরিয়া দেখিলাম সত্যই তাই। আমাকে মনোযোগী দেখিয়া তিনি আবার সসঙ্কোচে মাথায় কাপড়টা টানিয়া সরিয়া বসিলেন।

উঠিয়া পড়িলাম।

"চল্লাম এখন। মাখনবাবু চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। দেরী হয়ে যাবে—"

ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বলিলেন—"মাখনবাবু কে ?"

"যে ভদ্রলোক আপনাদের এই ছোলা গুড় পাঠিয়ে দিয়েছেন—"

"ও হ্যাঁ হ্যাঁ—আরে বাঃ—ভুলেই গেছলাম। তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিও।"

ভদ্রলোকের মনের মেঘটা যেন কাটিয়া গেল। আমি নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। ভদ্রলোক বলিলেন

কিছুক্ষণ

—"তুমি বাবা, চা-টা খেয়ে এসো আবার। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে বলা ত যায় না। একটু গল্প-সল্প করা যাবে—"

"আচ্ছা—"

প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছিলাম।

"বাবুজি—এ বাবুজি—"

ফিরিয়া দেখিলাম ডাকিতেছে সেই বেণী-দোলান মুসলমানের মেয়েটি। আমি ফিরিতেই মুখটি ছুঁচলো করিয়া টুকটুকে লাল জিভটি বাহির করিয়াই ছুট দিল।

দুষ্টু মেয়ে!

একটু দূর গিয়াই সেই বেঁটে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

"নমস্কার দারোগাবাবু—"

কি আশ্চর্য্য, ভদ্রলোক সত্যই যে আমাকে দারোগা ঠাওরাইয়াছেন! ভদ্রলোকের ভুলটা ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। স্মিতমুখে প্রতিনমস্কার করিলাম।

তিনি বলিলেন—"ওই হালুয়াই ব্যাটাকে একটু

শাসিয়ে দিতে পারেন আপনি ? লুচির সের একটাকায় চড়িয়ে দিয়েছে। এ কি মগের মুলুক না কি মশায় ! আমরা না হয় নিরুপায় হয়ে পড়েছি, তাই বলে গলায় ছুরি দেবে ও !"

"কোন হালুয়াই ?"

"ওই যে ইষ্টিশানের ওপারে আছে এক ব্যাটা। কোনোকালে এক পয়সার বিক্রি হত না, আজ ব্যাটার মরশুম পড়ে গেছে।"

"আমার শাসন কি শুনবে ও ?"

"নিশ্চয় শুনবে। পুলিসের গুঁতোয় বড় বড় চোর শায়েস্তা হয়ে যায়, ও ব্যাটা ত সামান্য হালুয়াই।"

আগাইয়া গেলাম।

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক—যিনি কলের কাছে চীৎকার জুড়িয়াছিলেন—দেখিলাম স্নান সমাপন করিয়াছেন। একটি লাল গামছা পরিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ভদ্রলোকের বাহুমূলে প্রকাণ্ড মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ—গলদেশেও তাবিজ-জাতীয় কি একটা দুলিতেছে। তিনি নগ্নগাত্রে গামছা পরিয়া বোধহয়

সূর্য্যস্তব পাঠ করিতেছিলেন। তাঁহার কাছে একটি পাঁচ ছয় বৎসরের বালক আবদার জুড়িয়া নাকে কাঁদিতেছে।

"খিদে পেয়েছে দাদু—ওরা সবাই লুচি জিলিপি খাচ্ছে আমিও খাব—হুঁ হুঁ দাদু—"

ভদ্রলোক মন্ত্র ভুলিয়া খ্যাঁকাইয়া উঠিলেন।

"আরে জ্বালিয়ে খেলে ত দেখছি এটা। তোকে লুচি জিলিপি খাওয়াব বলে কি পয়সা সঙ্গে করে এনেছি নাকি। মাত্র ট্রেণ ভাড়াটি নিয়ে ত বেরিয়েছিলাম—তখন কি জানি এমন হবে। চুপ কর" বলিয়া আবার তিনি মন্ত্রে মন দিলেন।

"হিং—হিং লিজিয়ে বাবু—আচ্ছা হিং—"

কাবুলিওলাটি তাহার জোব্বাজাব্বা পরিধান করিয়া ব্যবসায় সুরু করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া কাছে আসিল।

হাসিমুখে বলিল—"হিং—হিং বালা হিং। চাক্কু—বালা চাক্কু—আস্লি জার্মনি—বড়িয়া চাক্কু - লিজিয়ে বাবুসাব—"

কিছুক্ষণ

আমার প্রয়োজন ছিল না। অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আগাইয়া গেলাম।

একস্থানে একটা গামছাওলাকে ঘিরিয়া দেখিলাম অনেক যাত্রী গামছাই খরিদ করিতেছে। একজন দুগ্ধ বিক্রেতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া গরম দুধ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। সেই মাড়োয়ারিটি মনে হইল এইমাত্র দুগ্ধপান শেষ করিয়াছেন—কারণ তাঁহার হাতে গেলাস্ এবং গোঁফে দুধ। মাড়োয়ারি ভদ্রলোক গোঁফে লাগা দুধটুকুও অপচয় করিতে চান্ না। ঠোঁট ও জিভকে নানা প্রকারে বাঁকাইয়া গোঁফটিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিলাম।

স্যুটকেসের উপর যে মেয়েটি বসিয়াছিল এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া একদল ছোকরা ঘুর-ঘুর করিতেছিল সেই মেয়েটি দেখিলাম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কুলির মাথায় স্যুটকেসটা চাপাইয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল—"দয়া করে আপনি বলে দিতে পারেন

মেয়েদের বসবার আলাদা জায়গা এখানে কোঁথাও আছে কিনা—"

অযাচিতভাবে একটি ছোকরা বলিল—"আপনার ত আর সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট নেই। এখানে তা ছাড়া যে ফিমেল ওয়েটিং রুম আছে তাতে তিল ধারণের স্থান নেই। বেশ ত বসে আছেন আপনি—থাকুন না।"

বুঝিলাম মহিলাটি একটু বিপন্না হইয়াছেন। বলিলাম —"আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে—"। 'আসুন' বলিয়া আহ্বান ত করিলাম, কিন্তু কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে যে স্থান দিব তাহা জানি না। মাখনবাবুই ভরসা। দেখি, কতদূর কি করিতে পারি। ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম দুই তিনটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। তাহাদের দৃষ্টির অর্থ সুপরিষ্কার— কোথা হইতে এ লোকটা আসিয়া জুটিল।

মাখনবাবুর বাড়ীতে আসিয়া দেখি মাখনবাবু নাই। তাঁহার স্ত্রী একটি ময়লা গামছায় করিয়া চা ছাঁকিতেছেন। আমাকে দেখিয়া ভদ্রমহিলা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"মাখনবাবু কোথা গেলেন ?" প্রথমে কোন উত্তরই তিনি দিলেন না। তখন আমি

বলিলাম—" এই মেয়েটিকে একটু বসান ত আপনার কাছে। দেখি আমি মাখনবাবু কোথায় গেলেন—"

কুলিটি এবং তাহার পিছু পিছু মেয়েটিও আসিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। কুলি স্যুটকেসটি নামাইয়া রাখিল এবং মেয়েটী আগাইয়া বিন্নুর কাছে গেল দেখিয়া আমি বলিলাম—"আপনি একটু বসুন এখানে। আমি দেখি মাখনবাবু কোথা গেলেন।"

এইবার ফিস্ ফিস্ করিয়া বিন্নু সেই মেয়েটিকে বলিল—"উনি গেছেন দোকানে খাবার আনতে!"

"আচ্ছা, দেখি আমি—"

৪

হালুয়াইএর দোকানে সত্যই ভীষণ ভীড়।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে সে যে রাবণকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গালি দিত আজ যদি কোন মন্ত্রবলে একদিনের জন্যও সে সেই রাবণ হইতে পারিত অন্ততঃ সেই রাবণের দশটা মুণ্ড ও বিশটা হাত আয়ত্ত করিতে পারিত—তাহা হইলে বেচারা বাঁচিয়া যাইত। দুই হাতে সে কত লুচিই ভাজিবে এবং একটা মুখে কত লোকের সহিতই বা কথা কহিবে। অথচ দুই মাইলের মধ্যে তাহার এই একখানি দোকান এবং অকস্মাৎ এতগুলি বুভুক্ষিত লোকের জন্য তাহা প্রস্তুত ছিল না।

"ওটা তোমার ছান্‌চা, না ছোরা হে! একটাকা সের লুচির দাম। বল কি তুমি। ওরে চ চ, আর লুচি খেতে হবে না তোকে—"

কিছুক্ষণ

"হুঁ হুঁ দাদু—"

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক ও তাহার নাতি আসিয়া জুটিয়াছেন দেখিলাম। নাতির হাত ধরিয়া তিনি হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

"এই আমাকে একপো লুচি আর একটু তরকারি দাও ত—"

"এই শুন্‌তা হ্যায়—এক সের পুরি, আউর আধা সের জিলেবি গরম গরম ভাজ্‌কে দেও—"

"পানতোয়া—আছে?—পানতোয়া?"

"এই—এই—আরে মোলো ব্যাটা কথাই কয় না যে! ওহে শুনছ, দুসের লুচি আর আলুর দম—বাসি না কি ওটা?"

এই প্রকার নানাকণ্ঠের নানা চীৎকারকে অগ্রাহ্য করিয়া বন্‌শি হালুয়াই দ্রুতবেগে লুচি ভাজিয়া চলিয়াছে। অন্য কোন দিকে মন দিবার মত বাড়তি ফুরসৎ তাহার এখন নাই। দুই বৎসর পূর্ব্বে প্রদত্ত এক সন্ন্যাসীর তাবিজের ফল বুঝি ফলিতেছে। দৈবানুগৃহীত এই দুর্ঘটনা। ইহার অন্তরালে যে মঙ্গল এবং শনির পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান, তাহা আর কেহ না বুঝুক বন্‌শি হালুয়াই বুঝিতেছিল।

কিছুক্ষণ

বন্‌শি ভাজিতেছে এবং তাহার ভাই ধাড়ি বিক্রয় করিতেছে। চাকর বুলাকি লুচি বেলিতেছে এবং দ্বারকার মত পাশের কড়াতে-চড়ান তরকারিটাতে খুন্তি চালাইতেছে। চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলাম মাখনবাবুর পাত্তা নাই। সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক দেখিলাম একটু দূরে একস্থানে দাঁড়াইয়া এই জনতা লক্ষ্য করিতেছেন। গোঁফ পরিষ্কার, ত্বধের চিহ্নটুকুও আর সেখানে নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি অকারণে আবার সেলাম করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া ভীড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাখনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত দেখিতেছি। ভদ্রলোক গেলেন কোথায় ?

অনেক কষ্টে ভীড় ঠেলিয়া বন্‌শি হালুয়াইএর সান্নিধ্য-লাভ করিলাম !

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"মাখনবাবু কোথায় জান ? বন্‌শি উত্তর দিল না। সে তখন একসঙ্গে দশখানা লুচি কড়াতে ছাড়িয়াছে এবং ছান্‌চা সঞ্চালন করিয়া চেষ্টা করিতেছে ঘি বেশী না পোড়ে। বন্‌শি লোকটি বেঁটে, রঙ্‌ কালো, দুই চারি গাছা গোঁফ আছে কি না আছে—মাথার সামনের দিকে চুল নাই বলিলেই

চলে। চক্ষু দুইটি হইতে একটি চাপা চতুরতা উঁকি মারিতেছে। পেটটি প্রকাণ্ড। দেহের মধ্যে ওই অবয়বটিই সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফতুয়া সেটিকে আবৃত করিতে পারে নাই—বস্ত্র লাঞ্ছিত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। নাভির বহু নিম্নে নীবিবন্ধন। সমস্ত উদর-দেশ উন্মুক্ত আলোকে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত। বন্‌শির সেজন্য লেশমাত্র সঙ্কোচ নাই। সে পার্শ্ববর্ত্তী বুলাকিকে মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং একাগ্র-মনে লুচি ভাজিয়া চলিয়াছে। অন্যদিকে খেয়াল দিবার মত অবসর তাহার নাই।

আমি আর একবার চেষ্টা করিলাম। "মাখনবাবু কোথায় জান ?"

এবার বেশ একটু চীৎকার করিয়াই বলিলাম। সম্ভবত আমার উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়াই বন্‌শি বলিল —"মাখ্‌খনবাবু ? ভিতোরে আসেন" 'আসেন' মানে অবশ্য 'আছেন'। ঢুকিয়া পড়িলাম ভিতরে। কোথা মাখনবাবু ?

বন্‌শি অঙ্গুলি সঙ্কেতে একটি ক্ষুদ্র দ্বারের দিকে দেখাইয়া দিল। মাখনবাবু কি বন্‌শির অন্তঃপুরে ঢুকিয়াছেন না কি ? গেলাম আমিও। গিয়া দেখি

কিছুক্ষণ

মাখনবাবু উবু হইয়া বসিয়া একটি কুলিজাতীয় লোকের দ্বারায় কি যেন করাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—"ওয়েল্ কম্—ওয়েল্ কম্ সার—নিম্‌কি করাচ্ছি!" তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন—"অন্যদিন হলে বন্‌শি নিজেই করে দিত। আজ ব্যাটার ফুরসৎ নেই। আমাকে হাতজোড় করে বল্লে 'হুজুর, রামদীন্‌কে দিয়ে বানিয়ে নেন্—আমি ভেজে দিচ্ছি'। নিম্‌কি জিনিসটা আবার ব্যাগার সারা করে করলে হয় না কি না—ডল্ ডল্—আর একটু ডল্। বেলতে আর কতক্ষণ যাবে! ময়দা মাখাটাই আসল—"

রামদীন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গাড়িয়া চক্ষু বুজিয়া ময়দার তালটার উপর ঘুঁসি চালাইতে সুরু করিল। আমার ভয় হইতে লাগিল থালাটা না ভাঙিয়া যায়। মাখনবাবুরও দেখিলাম সে ভয় হইয়াছে। কারণ তিনিও বলিলেন—"আস্তে—আস্তে—"

হঠাৎ বাহিরের কলরবটা যেন বাড়িয়া উঠিল—"মারো—ভাগা দেও—শালে কো—"

৪

কিছুক্ষণ

বন্‌শির কণ্ঠস্বর শুনিলাম।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। আসিয়াও কিন্তু সহসা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ভীড়ের মধ্যে একটা আবর্ত্ত সৃষ্টি হইয়াছে এইটুকু মাত্র বোঝা গেল।

বন্‌শিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বাঙলা ভাষায় বলিল "ও কুস্থ নেই 'আসে' বাবু—এক শালা লৌণ্ডা জিলেবি চোরাথা থা—"

এমন সময় ভীড়ের ভিতর হইতে একটা আর্ত্ত শিশু-কণ্ঠ কাঁদিয়া উঠিল—কে যেন তাহাকে মারিতেছে। বাহির হইয়া আসিলাম। ছোট ছেলেকে কেহ মারিতেছে না কি? ভীড়ের ভিতর ঢুকিয়া পড়িলাম। অনেক ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতির পর ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলাম—ছোট ছেলেই বটে। কে যেন তাহার গালে একটা চড় মারিয়াছে—বেশ জোরেই মারিয়াছে—পাঁচটা আঙুলের দাগ বসিয়া গিয়াছে। ছেলেটা সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের নাতি। সত্যই সে জিলাপি চুরি করিয়াছিল। শীর্ণকান্তি ভদ্রলোককে আশে পাশে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এক ঠোঙা জিলাপি কিনিয়া ছেলেটার হাতে দিলাম

এবং তাহাকে ভীড় হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম।

"তোমার দাছু কোথা ?"

জিলাপিতে কামড় দিতে দিতে সে বলিল—"ষ্টেশনে"

একটু হিতোপদেশ দিবার ইচ্ছা হইল।

বলিলাম—"ছি, ছি, তুমি চুরি করেছিলে ? ছি—"

"আমার খিদে লেগেছে যে ! দাছুকে বল্লাম কত—দাছু দিলে না কিনে—"

ইহার উপর আর কোন কথা চলে না।

এখন ছেলেটাকে তাহার দাছুর জিম্মা করিয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই ভীড়ে ছাড়িয়া দিলে হারাইয়া যাইতে পারে।

তাহাকে প্ল্যাটফর্মের দিকেই লইয়া চলিলাম। একটু দূর গিয়াই সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের দেখা মিলিল ! তিনিও নাতির খোঁজে আসিতেছিলেন। সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলাম।

শুনিয়া তিনি একেবারে রুখিয়া উঠিলেন। "হতভাগা, পাজী ছোঁড়া !—শাল্টীর চৌধুরি বংশের ছেলে তুমি—তুমি গিয়েছ জিলিপি চুরি করতে। এত বড় নোলা

তোমার। মেরেই ফেলব আজ—খুন করে ফেলব হারামজাদাকে—"

আমি ছেলেটাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলাম। "শাস্তি ওর যথেষ্ট হয়ে গেছে মশাই—আর কিছু বলবেন না। ছেলেমানুষ—"

কিন্তু শ্যালটীর চৌধুরী বংশের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক কোন কথাই শুনিতে চাহেন না। "বলব না! বলেন কি আপনি! কেটে পুঁতে ফেলব ওকে জুতো ঝাড়ু মারি আমি অমন বংশধরের মুখে। নচ্ছার কুলাঙ্গার—"

উচ্চৈঃস্বরে এতগুলি সংস্কৃত শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হইতেছিল লোক জমিয়া গেল।

"কি হয়েছে মশাই?"

"ব্যাপার কি?"

"চুরি গেল না কি কিছু?"

দুইজন বেহারি নিম্নস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল "বাবু, বাউরা মালুম হোতা হ্যায়—"

"খোকা গেলেন সার"—মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ভীড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্ব্বে শীর্ণকান্তি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়া আসিলাম তিনি

যেন আর মার-ধোর না করেন। তথাপি তিনি ছাড়িলেন না—তাড়া করিলেন। নাতি জিলাপির ঠোঙা ফেলিয়া দৌড় দিল। ঠোঙা মাটীতে পড়িতে না পড়িতেই একদল কুকুর হুমড়ি খাইয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িল। ছেলেটী সেই যা একটি খাইয়াছিল—বাকীগুলি কুকুরের পেটে গেল।

৫

গরম গরম নিমকি লইয়া মাখনবাবু ও আমি বাসায় ফিরিতেছিলাম। পিছনে পিছনে আসিতেছিল রামদীন। মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া বলিলেন—

"দেখেছেন ত মহাপ্রভুকে! এঁরই কীর্ত্তি।"

বুঝিলাম রামদীনের কথা বলিতেছেন।

"একে বাঁচাবেন বলছিলেন না? কি উপায়ে?—"

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া বামহাতের তর্জ্জনী ঠোঁটের উপর চাপিয়া মাখনবাবু তর্জ্জন করিয়া উঠিলেন—"আস্তে মশাই! উচ্চারণ করবেন না ও কথা—জানা-জানি হয়ে গেলেই সর্ব্বনাশ!"

তাহার পর এদিক ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন "বেশ করে চা-টা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা পরামর্শ করতে হবে। মাষ্টারমশাইকে ডেকে আনা যাবে। আপনার মত পাকা-মাথা একটা পাওয়া গেছে—ব্যাটার কপাল ভাল—"

কিছুক্ষণ

"আমি এ বিষয়ে আর কি পরামর্শ দেব আপনাদের—"

"বাঃ—আপনি বয়সে ছোট হলেও শিক্ষিত লোক—আপনার বুদ্ধির দামই আলাদা। আমার নিজের বিদ্যে ম্যাট্রিক অবধি। আর মাষ্টার মশায়ের পেটেও—প্রাইভেট্লি বলছি—এক পিলে ছাড়া আর কিছু নেই। কোন রকমে 'ইয়েস্ সার' 'নো সার' 'ভেরি গুড্ সার'! আপনি এসে গেছেন এ ব্যাটার পরম সৌভাগ্য।"

মিনিট খানেক নীরব থাকিয়া বলিলাম—"আপনার বাসায় আর একজন অতিথি এনে জুটিয়েছি। আপনার স্ত্রীর কাছে তাঁকে বসিয়ে এসেছি—"

মাখনবাবু চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িলেন

"হোয়াট্? আবার কে অতিথি মশাই? আগে বললে নিম্‌কি কিছু বেশী নিতাম যে!"

"ওতেই যথেষ্ট হবে, চলুন—"

চলিতে চলিতে মাখনবাবু বলিলেন—"লোকটি কে?"

"একটি স্ত্রীলোক—"

আবার মাখনবাবু দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

"স্ত্রীলোক? ডোবালেন দেখছি। কে? সেই ওয়েটিং রুমের বিধবা নাকি? আচ্ছা লোক আপনি। ওর জন্যে

৪

আপনার অত মাথা ব্যথা কেন ? ছোলা-টোলা ত সব দিয়ে এলেন !”

“না, না, এ সে নয়—আর একজন !”

“আর একজন ? উঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না ! আচ্ছা লোক ত আপনি। ওসব টেন্‌ডেন্সি ছাড়ুন মশাই এই ভীড়ের মধ্যে। কি মুস্কিল !—” বলিয়া সস্মিত মুখে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। একটু থামিয়া আবার বলিলেন—“কে ইনি ? আগে চিনতেন নাকি ?”

“না—না।”

“সাংঘাতিক লোক আপনি মশাই—”

মাখনবাবুর বাসার সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম জানালায় বিনু দাঁড়াইয়াছিলেন। আমাদের দেখিয়া সরিয়া গেলেন।

শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম মাখনবাবু রামদীনকে বলিতেছেন—

“ওরে তুই মাষ্টার মশায়ের বাড়ী থেকে একখানা চেয়ার বোঁ করে নিয়ে আয় ত। বাইরেই বসা যাক্। আমার চেয়ারটাও বার করি। ভেতরে একে জায়গা কম, তার ওপর আপনি—” বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া

একটু হাসিলেন। আমিও তাড়াতাড়ি বলিলাম—"হ্যাঁ, সেই ভালো—বাইরেই বেশ হবে।"

রামদীন ঊর্দ্ধশ্বাসে একখানা চেয়ার লইয়া আসিল। মাখনবাবুও একখানা ছোট চেয়ার এবং তাহার পর একটা ছোট টেবিলও বাহির করিয়া আনিলেন। টেবিলটা নামাইয়া দিয়া মাখনবাবু এদিকে ওদিকে চাহিতে লাগিলেন—যেন কি খুঁজিতেছেন।

"কি খুঁজছেন? পয়সা-টয়সা পড়ে গেল না কি?"

"না, পয়সা নয়। খুঁজছি একটা সাইজ্ মাফিক ইঁট!"

"ইঁট?"

"হ্যাঁ টেবিলটা একটু ইয়ে কিনা, মানে পায়া চারটে সমান নয়। একটা পায়ার তলায় একটা ছোট্ট ইঁট না দিলে—এই যে পেয়েছি—"

টেবিলটাকে ঠিকমত বসাইয়া মাখনবাবু বলিলেন—"এইবার অল্ রাইট! দেখি চায়ের কতদূর কি হল"—বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

গরুড় পক্ষীটির মত হাত জোড় করিয়া রামদীন নিকটে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ

আটি সাঁট গড়নের লোকটি। পরণে রেলের জামা ও পাগড়ী। মুখের দিকে চাহিলেই প্রথমে চোখে পড়ে লাল চক্ষু ছুটি এবং কপালের ও রগের স্ফীত শিরাসমূহ।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার নাম রামদীন?"

"হাঁ, হুজুর—" যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে শব্দ হইল। এমন সময় মাখনবাবু ফিরিয়া আসিলেন। হাসিয়া হাত ছুইটি উল্টাইয়া বলিলেন—

"এগেন্ কোল্ড সার! ফের জল চড়িয়েছে—ফাইভ্ মিনিটস্ মোর! ততক্ষণ আমি মাষ্টারমশাইকে ডাকি একটু—আপনার সঙ্গে আলাপটা হয়ে যাক্। হ্যাঁ—বাই দি বাই—ওই মেয়েটি ত কিচ্ছু খেতে চাইছে না মশাই। বলছে শুধু বসে থাকতে পেলেই ওর যথেষ্ট। ষ্ট্রেঞ্জ ক্যারাক্টার! সাধারণত লোকে বসতে পেলেই শুতে চায়। এ একেবারে ঠায় বসে আছে—নট্ নড়নচড়ন নট্ কিচ্ছু। বিন্নু বল্লে স্পিকটি নট্—মুখ বুজে চুপচাপ্ বসে আছে। আপনি একটু বলে কয়ে দেখুন না, যদি একটু চা খাওয়াতে পারেন—"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"দরকার কি জোর জবরদস্তি করবার। খেতে বলেছেন ওই যথেষ্ট। তা

ছাড়া আমিও ত ওঁকে চিনি না যে গিয়ে অনুরোধ করব। আমার সম্পূর্ণ অচেনা। প্ল্যাটফর্মে কতকগুলো ছোঁড়া ওঁকে বিরক্ত করছিল তাই আমাকে উনি বল্লেন ফিমেল ওয়েটিং রুমটা দেখিয়ে দিতে—আমি আপনার বাসাতেই নিয়ে এলাম।"

"বেশ আছেন আপনি" বলিয়া হাসিয়া মাখনবাবু মাষ্টার মশাইকে ডাকিতে গেলেন।

ষ্টেশন মাষ্টারের বাসা নিকটেই।

একটু পরেই ষ্টেশন মাষ্টার মহাশয় আসিলেন। ভদ্রলোকের হাঁপানি আছে লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার গায়েও রেলের জামা। গলায় একটা বেমানান গোছের সবুজ মাফলার। কাঁচা পাকা দাড়ী গোঁফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। চোখের তারা দুইটি সর্ব্বদাই যেন কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে কিছু দেখিবার চেষ্টা করিতেছে—অথচ আবার মাঝে মাঝে সম্মুখের দিকেও চট্ করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। আমার দিকে চকিতে চাহিয়া আবার উর্দ্ধনেত্র হইলেন। আমি নমস্কার করাতে একবার ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে চাহিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন—"এঁরই কথা বলছিলাম।"

"ও" বলিয়া মাষ্টার মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারটাতে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

রামদীন চা ও নিম্‌কি লইয়া আসিল।

মাষ্টার মহাশয় ও আমার সম্মুখে এক পেয়লা করিয়া চা ও প্রচুর নিম্‌কি আগাইয়া দিয়া মাখনবাবু বলিলেন—"খেতে খেতে আলাপটা হোক সার—"

মাষ্টার মহাশয় হাত নাড়িয়া অতি কষ্টে বলিলেন "খাবাও টাবার খাব না—ওসব চলবে না। খেলেই হাঁপানি বাড়ে। চা বরং চলতে পারে একটু। এ সময় আমি খাইও এক 'কপ্‌" বলিয়া তিনি একটা পেয়ালা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া পকেটে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। দুইটি পকেটই খুঁজিলেন কিন্তু ঈপ্সিত বস্তু পাওয়া গেল না। মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন—"লেফ্‌ট্‌ বিহাইণ্ড্‌ বুঝি!—ওরে রামদীন—"

রামদীন বাড়ীর ভিতরে ছিল। দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। রামদীন আসিতেই মাখনবাবু বলিলেন —"ওরে দৌড়ে গিয়ে বাবুর আপিঙের কৌটোটা নিয়ে আয় ত!"

রামদীন দৌড়িল।

মাষ্টার মশাই উর্দ্ধনেত্র হইয়া চক্ষু মিট্‌মিট করিতে

করিতে বলিলেন—"বালিশের নীচে আছে বলে দিন—"

মাখনবাবু আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ওরে রামদীন শোন—বালিশের নীচে আছে, বুঝলি ?"

"হাঁ, হুজুর"

রামদীন চলিয়া গেল।

রামদীন না আসা পর্য্যন্ত আমরা সকলেই রামদীনের পথপানে চাহিয়া রহিলাম। আপিঙের কৌটা না আসা পর্য্যন্ত জমিবে না। যদিও বেশী দেরী হয় নাই, মাখনবাবু তথাপি অধীর হইয়া উঠিলেন "এ বেটা গাঁজাখোরকে নিয়ে আর পারা যায় না"—এমন সময় রামদীনকে দেখা গেল বেচারা দৌড়াইয়াই আসিতেছে।

একগুলি অহিফেন গলধঃকরণ করিয়া এবং তৎপরে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া মাষ্টার মশাই বলিলেন—"ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে চাকরি বোধ হয় আর থাকে না। আচ্ছা মাখনবাবু, আমি ভাবছি এ ভদ্রলোককে আমাদের এ সব ব্যাপারে জড়ান কি ঠিক হবে ?"

মাখনবাবু নড়-বড়ে টেবিলটা চাপড়াইয়া বলিলেন

"সারটেন্লি—নিশ্চয়ই। আমাদের এখন কারুরই মাথার ঠিক নেই। আপনারও নেই—আমারও নেই। অর্থাৎ কি ভাবে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপান যায়—সেই পরামর্শটা—"

মাষ্টার মহাশয়ের ভ্রূ-সন্ধানী নয়নযুগল ঘনঘন মিট্‌মিট্ করিতে লাগিল। তিনি গভীর চিন্তামগ্নভাবে আর এক চমক চা পান করিলেন। আমার সহিত এই সব গোপনীয় অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিতে মাষ্টার মহাশয়ের মন সরিতেছিল না।

আমার নিজেরও মনোগত অভিপ্রায় ছিল না এই সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে। কিন্তু মাখনবাবু না-ছোড়। তিনি কনুই দিয়া আমার পিঠে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন—"বলুন না মশাই, কার ঘাড়ে দোষটা চাপান যায়—" বলিয়াই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া একবার চতুর্দ্দিক দেখিয়া লইলেন—অপর কেহ আমাদের কথা-বার্ত্তা শুনিতেছে কি না। এক রামদীন ছাড়া কাছে-পিঠে আর কেহ ছিল না।

মাখনবাবু বলিলেন—"এই রামদীন—সিগ্রেট্ লে আও"। রামদীন চলিয়া গেলে আমি বলিলাম—"রামদীনকে বাঁচাতে হলে হয় ড্রাইভারের দোষ দিতে হয়,

না হয় ইঞ্জিনের দোষ দিতে হয়—না হয় রেল লাইনের দোষ দিতে হয়। এর মধ্যে কোনটা সম্ভবপর হতে পারে ভেবে দেখুন আপনারা”—মাষ্টার মশাই নিমেষের জন্য আমার পানে চাহিয়া আবার উর্দ্ধনেত্র হইলেন। তাঁহার চোখের পাতা খুব ঘন ঘন ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

মাখনবাবু আমার চিন্তা-প্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে মাষ্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবটা যেন—দেখিলেন ত, কেমন গুছাইয়া জিনিসটাকে বলিলেন ইনি। মাষ্টার মহাশয় উর্দ্ধ-দৃষ্টি হইয়া হাঁপাইতেছিলেন তিনি মাখনবাবুর এই পুলকিত মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলাম তাঁহার পক্ষে বেশী কথা বলা কষ্টকর।

মাখনবাবুকে আমি আবার বলিলাম—“তাছাড়া আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে এখন। বল্লাম বটে ইঞ্জিন আর রেল লাইনের দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু ভেবে দেখছি ও দুটো বোধ হয় খাটবে না—”

“কেন? হোয়াই?” বিজ্ঞভাবে মাখনবাবু বলিলেন। মাষ্টার মশাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে মনোযোগসহকারেই আমাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তাগ্রস্ত

মুখে ও দ্রুত নড়নশীল চোখের পাতায় তাহা প্রতীয়মান হইতেছিল।

আমি বলিলাম, "ইঞ্জিন আর রেল লাইন যে ঠিক আছে তাত যে কোন ইঞ্জিনিয়ার এসেই ধরে ফেলবে। রামদীনকে বাঁচাতে হলে ড্রাইভারের নামে দোষ চাপান ছাড়া আর কোন বুদ্ধি ত মাথায় আসছে না—"

মাখনবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন—"তাত ঠিক। কিন্তু হবে? কেমন করে?"

"সেটা ভেবে দেখতে হবে। বলতে পারেন ড্রাইভার মাতাল অবস্থায় এই কাণ্ড করেছে—কিম্বা ওই রকম একটা কিছু—"

মাষ্টার মহাশয়ের নয়নযুগল অল্পক্ষণের জন্য আমার মুখপানে নিবদ্ধ হইয়া আবার ঊর্দ্ধগামী হইল। মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য যেন একটা আনন্দের আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন—"আমিও রিপোর্ট করেছি তাই। ড্রাইভার ফাউণ্ড ড্রাঙ্ক। এখন কথা হচ্ছে—" বলিয়া তিনি চায়ের বাটিতে আর একটা চুমুক দিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন—"আপনি রিপোর্ট করে দিয়েছেন অল্‌রেডি?"

কিছুক্ষণ

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে এই সামান্য বুদ্ধিটা কি আর আমার ঘটে নেই—অ্যাদ্দিন চাকরি করছি। হ্যাঃ! কি মনে করো তুমি আমাকে।"

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন "গ্রেট মেন্ থিঙ্ক্ অ্যালাইক্" মাষ্টার মহাশয় কিছু না বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। এই উত্তেজনাটুকুতে তাঁহার হাঁপানিটা যেন বাড়িয়া গেল। চা টুকু নিঃশেষ করিয়া মাষ্টার মশাই উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, "আপনারা দুজনে ভেবে-চিন্তে দেখুন জিনিসটাকে! 'ড্রাঙ্ক' বল্লেই ত হবে না। প্রমাণের উপর সেটাকে দাঁড় করাতে হবে ত?"

নিম্‌কিতে একটা কামড় দিয়া মাখনবাবু বলিলেন "সারটেন্‌লি—নিশ্চয়ই!"

রামদীন এক প্যাকেট্ সিগারেট লইয়া আসিল। একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে আমি বলিলাম—"যাই, প্ল্যাটফর্ম টায় একবার ঘুরে ফিরে আসি।"

মাখনবাবু বলিলেন, "বেশী দেরী করবেন না যেন। রান্না প্রায় শেষ হয়ে গেল। আপনি আমার এখানে খাবেন—সেকথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। রান্না প্রায় হয়ে এল। আর হ্যাঁ—আপনি ওই মেয়েটিকে

বলে কয়ে দেখুন না, যদি একটু কিছু খাওয়াতে পারেন—"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম—"আপনার স্ত্রী সে সব ঠিক করবেন এখন। আমার এ রকমভাবে বলাটা কি ভাল দেখায় ? ভেবে দেখুন না !"

মাখনবাবু চায়ের বাটিতে চুমুক দিতেছিলেন। বাটিটা নামাইয়া বলিলেন—"হ্যাঁ, বিন্নু ওসব বিষয়ে খুব ওস্তাদ আছে। পরকে এমন আপন করতে পারে ! গিয়ে হয়ত দেখব দুজনে হরিহর-আত্মা হয়ে বসে আছে। কিছু বলা যায় না—" বলিয়া মাখনবাবু এতদূর হইতে অনর্থক উঁকি ঝুঁকি দিয়া অন্তঃপুরের অবস্থাটা, পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"একটু ঘুরে আসি তাহলে।"

"যান—বেশী দেরী করবেন না।" তাহার পর হাসিয়া বলিলেন—"আর কাউকে জোটাবেন না যেন ?"

চলিয়া যাইতেছিলাম। মাখনবাবু আবার পিছু ডাকিলেন।

"দিস্ ফেলোর কথাটাও একটু ভাব্‌বেন। শক্ত সমস্যা। ড্রাঙ্ক বল্লেই ত হবে না—প্রমাণ করতে হবে—"

আমি হাসিয়া বলিলাম—"রামদীনকে বলুন না। ড্রাইভার-টাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি সত্যিই একটু মদ খাওয়াতে পারে। বিনা পয়সায় পেলে হয়ত খেতেও পারে—!"

মাখনবাবুর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন—"দেখি—মন্দ বুদ্ধি নয় এটা। মাথা বটে আপনার!"

৬

প্ল্যাটফর্মের ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়িল সেই বেণী-দোলান মেয়েটি রেল-লাইনের বেড়া-দেওয়া তারের উপর দাঁড়াইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া ঝুলিতেছে। আমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে তাহার টুকটুকে লাল জিবটুকু বাহির করিয়া মুখভঙ্গীসহকারে ঠিক অভ্যর্থনা করিত। একবার মনে করিলাম ডাকি মেয়েটিকে।

কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। নিকটেই একটা গোলমাল উঠিল। একদল লোক তালগোল পাকাইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি সেই কাবুলিওলা একটি যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে এবং মার্জ্জার-কবলিত মূষিকের ন্যায় যুবকটি চিঁ চিঁ করিতেছে। কৌতূহল হইল। ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে গেলাম। কাবুলি আমাকে দেখিয়া বলিল—"উজুর, আপ দেখিয়ে—আপ বালা আদমি ইন্‌সাফ্ কর্ দিজিয়ে—" বলিয়া সে যাহা বলিল তাহার মর্ম্মার্থ এই যে এই যুবকটি কাবুলিটির নিকট ছুরি কিনিবে বলিয়া

একটি ছুরি চাহিয়া লয় এবং ছুরির ধার আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের হাতের নখগুলি কাটিতে থাকে। দুইটি হাতের সমস্ত নখ নিপুণভাবে কাটিয়া এখন ছোকরা ছুরিটি এই অজুহাতে ফিরাইয়া দিতে চায় যে ছুরিটি আশানুরূপ তীক্ষ্ণ নহে। তদুত্তরে কাবুলিওলা বলিতেছে যে ছুরির ধার আছে কিনা তাহা সে এখনই সর্ব্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিবে এই বেইমানের নাসিকা ছেদন করিয়া। যুবকটির দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সেই ট্যারা ছোকরা। একাকিনী ভদ্রমহিলাটির সম্মুখে একটু আগেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল।

তাহাকে বলিলাম—"আপনি ছুঁরি যখন নেবেন না, তখন মিছিমিছি কেন ওর ছুরি দিয়ে নখ কাটলেন ?"

"ধার নেই মশাই ওর ছুরিতে—"

"ধার নেই ত দশটা আঙুলের নখ অমন সুন্দরভাবে কাটলেন কি করে ?—"

"জুট বাৎ মৎ বোল্‌না—"—কাবুলি গর্জ্জন করিয়া উঠিল।

ট্যারা ছোকরাটি বলিল—"তাছাড়া অত দাম দিয়ে ছুরি কে নেবে মশাই—দাম বলছে আড়াই টাকা—"

"আচ্ছা, দো রূপেয়া মে দেগা, নাফা ছোড় দিয়া—"

আমি বলিলাম—"কাজটা ঠিক হয় নি আপনার। এর সঙ্গে যখন দরদস্তুর করেছেন, হাতের নখ কেটেছেন, তখন নেওয়া উচিত আপনার ছুরিটা—"

"আমার কাছে অত পয়সা এখন নেই ত"

"আপনার বন্ধুবান্ধবদের কাছে দেখুন। আপনারা ত একদল ছিলেন—"

"আপনি যখন বলছেন তাই দেখি। এই হাত ছোড়ো" কাবুলি হাত ছাড়িয়া দিল।

কাবুলিকে বলিলাম—বেচারার নিকট পয়সা নাই। বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে জোগাড় করিয়া আনিতেছে। কাবুলিওলা ছোকরার পিছু পিছু গেল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলাম ছোকরার বন্ধুবান্ধবদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সব সরিয়া পড়িয়াছে।

আর একটু আগাইয়া যাইতেই সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এবারও আমাকে সেলাম করিলেন। শুধু সেলাম করিয়াই এবার ক্ষান্ত রহিলেন না, নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন যে আমার সহিত তাঁহার গোপন একটা পরামর্শ আছে—

আমি যদি অনুমতি করি—বিস্মিত হইলাম। আমার সহিত কি গোপন পরামর্শ থাকিতে পারে?

একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম—"বেশ ত, বলুন"—তিনি বলিলেন যে এখানে অনেক লোকজন রহিয়াছে—পরামর্শটা প্ল্যাটফর্মের বাহিরে হওয়াটাই সমীচীন। আমি তখন বলিলাম যে ওয়েটিং-রুমে এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি সেটা না সারিয়া এখন আমি প্ল্যাটফর্মের বাহিরে যাইব না। তিনি কি অপেক্ষা করিবেন?

"বহুত খুব!"

আমি ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাড়োয়ারিটি চঞ্চলভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ওয়েটিং রুমে ঢুকিয়া দেখিলাম বৃদ্ধ বিছানা বিছাইয়া বেশ জমিয়া বসিয়া একটি বহি পড়িতেছেন। তাঁহার বিধবা কন্যাটি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের এককোণে ষ্টোভে রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন।

"এসো, এসো—আরে বাঃ—চা-টা খাওয়া হয়ে গেল? বস বস, এই বিছানাতেই বস না তুমি—"

কিছুক্ষণ

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে আমাকে আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি বই পড়ছেন ওটা?"

ভদ্রলোক বইখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন "ও একটা বাজে বই বলে মনে হবে তোমার। আমার কিন্তু বেশ লাগে—"

বিধবা মেয়েটি দেখিলাম মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে। আমি আবার বলিলাম—"কি বই?"

"আমার এই বয়সে 'পিল্‌গ্রিম্‌স্ প্রগ্রেস্' বা গীতা বা ওই রকম কিছু একটা পড়া উচিত; কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার এই বইখানা—" বলিয়া বইটা আমার হাতে দিলেন।

দেখিলাম—"অ্যালিস্ ইন্ ওয়ান্‌ডার ল্যাণ্ড"। বলা বাহুল্য আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। আরও দুই তিনখানা বই কাছে পড়িয়া আছে দেখিলাম। বলিলাম—"বইটা ত খুব ভাল বই। ছোট ছেলেমেয়েদের এমন বই আর হয় নি—"

ম্লান হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন—"ভেবেছিলাম নাতিনাতনীদের নিয়ে বুড়ো বয়সে এই বইগুলো আবার বেশ জমিয়ে পড়ব—কিন্তু ভগবান আমার কপালে

সে সুখ ত আর লেখেন নি। তাই একা একাই পড়ি—"

চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আপনারা খুব গোঁড়া হিন্দু—না ?"

তিনি হাসিয়া বলিলেন—"না, মোটেই না! তবে আমার মেয়ে কিছুদিন থেকে—" বলিয়া তিনি চকিতে একবার কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন—"ও কিছুদিন থেকে ভয়ানক গোঁড়া হয়ে উঠেছে।"

আমি বলিলাম—"কিছুদিন থেকে, মানে? আগে গোঁড়া ছিলেন না।"

"না মোটেই না। কলেজে পড়া মেয়ে কি সহজে গোঁড়া হয়? ও বি-এ পাশ করেছে আজ বছর চারেক হল—তাই না মিণ্টু ?"

মিণ্টু কিন্তু দেখিলাম আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আলু ছাড়াইতেছেন। বৃদ্ধের কথায় একটু মাথা নীচু করিলেন মাত্র।

—"হ্যাঁ—চার বছরই" বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

মিণ্টু নীরবে তরকারী কুটিতে লাগিলেন। আমি

অ্যালিস্ ইন্ ওয়ান্ডার ল্যান্ডের" পাতাগুলা উল্টাইয়া ছবি দেখিতে লাগিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন—"বরাত, বরাত—সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। বুঝলে বাবা? বিধাতার বিধানকে মেনে নেবার মত মনের শক্তি থাকার দরকার। আমার ওইটের অভাব ছিল বলেই এত কষ্ট পেলাম।" বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিলেন।

একটু চুপ করিয়া আবার সুরু করিলেন—"বিধাতার বিধানকে মেনে নেওয়াই উচিত। বিনোদ পাগল হয়ে গেছে—পাগলা গারদে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি ত। মিণ্টু বিধবা হয়েছিল সেটাকেও এমনি ভাবে মেনে নিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমি গেলাম বিধাতার উপর টেক্কা দিতে! বিধাতা সে কথা শুনবেন কেন—আরে বাঃ!" বলিয়া আবার একটু হাসিলেন।

হঠাৎ মিণ্টু বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"আচ্ছা বাবা, নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বাইরের পাঁচজনকে শুনিয়ে লাভ কি? এ সব কি বলে বেড়াবার মত কথা?"

আমি বলিলাম—"থাক থাক, দরকার কি ও-সব কথার। এবার আমাকে উঠতেও হবে—" বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলাম। •

বৃদ্ধ একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বলিলেন—"এরই মধ্যে উঠবে কোথায়? ট্রেণের ত এখন ঢের দেরী। আমাদের এইখানেই যখন রান্না হচ্ছে তখন এইখানেই চারটি খাও না—"

"আমার আপত্তি নেই তাতে। কিন্তু মাখনবাবুর বাড়ীতে আমার জন্যে রান্না হচ্ছে শুনলাম—"

"ও—আচ্ছা সেখানেই খেও তাহলে। তবু বস একটু। এর মধ্যেই রান্না নিশ্চয়ই হয়ে যায় নি—"

"না, তা বোধহয় হয় নি। আচ্ছা বসছি একটু" বলিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু স্বচ্ছন্দভাবটা যেন আর ফিরিয়া পাইলাম না। বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—"হ্যাঁ বস বস, কোথায় যাবে এখন। মেডিকেল কলেজের ছেলে দেখলেই আমার বিনোদকে মনে পড়ে। এর মধ্যে হয়ত কোন যুক্তি নেই, কিন্তু মেডিকেল কলেজের ছাত্র শুনলেই তাকে নিজের লোক বলে মনে হয়—অর্থাৎ—"

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ভদ্রলোক থামিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ নীরবেই কাটিল।

আমি কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম।

কোন ছুতায় উঠিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচি। এমন সময় বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন—

"মিণ্টু তুই রাগ করলি, কিন্তু তুই ভেবে দেখ দিকি, এ-সব কথা চেপে রাখা উচিত কি? শিক্ষিত লোক-মাত্রকেই সমাজের গলদের কথাটা বলা উচিত—কারণ হয়ত ওঁরা এর প্রতিকার করতে পারবেন। আমার মনে হয় খবরের কাগজে লেখালেখি করে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে সব দেখিয়ে দেওয়া দরকার। সম্ভব হলে এসব লোককে পুলিশের হাতে দেওয়া কর্ত্তব্য। শরীরের কোথাও যদি ঘা হয়ে পচে যায় সেটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আরে বাঃ!" তাঁহার চশমার পুরু লেন্স দুইটি আলোকপাতে অত্যন্ত চক্‌চক্‌ করিতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন—

"না, না, শোন তুমি। তোমার শোনা উচিত। প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জানা উচিত, কি রকম পাজি সমাজে আমরা বাস করি। মিণ্টু বিধবা হবার পর আমি তার আবার বিয়ে দিয়েছিলাম। সে একরকম জোর করে। মিণ্টুকে অনেক কষ্টে রাজী করালাম। মিণ্টু যদি রাজী হল—আত্মীয়-স্বজনেরা ঘোরতর আপত্তি করলেন। আমি দেখলাম—আরে বাঃ, আত্মীয়-স্বজনদের

মন রাখতে গেলে নিজের বিবেককেই অগ্রাহ্য করতে হয়। লেখাপড়া শিখেছি তাহলে কিসের জন্যে! পাত্রের জন্য খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম।”

বলিয়া ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়াই আবার আরম্ভ করিলেন—“একদিন সকাল বেলা বসে আছি একটি নিরীহ গোছের লোক এসে দেখা করলেন। বললেন আমার বিজ্ঞাপন তিনি দেখেছেন এবং আমার মেয়েকে বিয়েও করতে রাজী আছেন। তিনিই পাত্র, বুঝলে। বিধবা-বিবাহ নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা হল—ছেলেটির কথাবার্তা শুনে আমার বেশ ভাল লাগল। ছেলেটি দেখতেও বেশ ভদ্র নিরীহ। তারপর ছেলেটি বল্লে যে বিধবা-বিবাহ করলে কিন্তু আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ত্যাগ করবে। একরকম নিঃসম্বল নিঃসহায় হয়ে পড়তে হবে তাকে। সুতরাং কিছু পণ চাই—অন্ততঃ পাঁচ হাজার টাকা না পেলে তার পক্ষে এ বিধবার দায়িত্ব নেওয়া সম্ভবপর নয়। আমি ভেবে দেখলাম কথাটা ঠিকই—সমাজকে ত চিনি। রাজী হয়ে গেলাম—”

বৃদ্ধ আবার চুপ করিলেন।

মিণ্টুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম—সে একমনে

তরকারিই কুটিতেছে। বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন "উঃ, সবই বরাত। আমার রোক চড়ে গিয়েছিল। ছোকরাটি বল্লে সে গোপনেই বিয়ে করতে চায় তাতেও রাজী হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে যাবার মাসখানেক পরেই ছোকরা একদিন নিরুদ্দেশ। কোন পাত্তা নেই। তারপর শুনলাম এবং খোঁজ-খবর করে জানলাম যে কথাটা সত্যি—ছোকরার আরও দু' দুবার বিয়ে হয়েছে—পত্নী দুটিও জীবিতা। ভেবে দেখ একবার! মিণ্টু তারপর থেকে যে নিষ্ঠা সুরু করেছে তা প্রায় আত্মহত্যারই সামিল—অর্থাৎ—এই দারুণ গ্রীষ্মে নিরম্বু উপবাসটা—কিন্তু করবেই ত, মানে ওর মনের অবস্থাটা—করবে না? আরে বাঃ—"

বৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম—"আমি বুঝেছি সব। আপনি একটু স্থির হন—"

"স্থির হব বৈ কি! আমরা অতি ধীর স্থির বিচক্ষণ জাতি যে—আরে বাঃ—অস্থির হওয়া আমাদের ধাতেই নেই। একটু অস্থির প্রকৃতির হলে ওই জুয়াচোরটা এতদিন খুন হয়ে যেত, আর আমি এতদিন ফাঁসি যেতাম। কিন্তু আমরা রাজা উজির মারি মুখে। সত্যি সত্যি

মারি মশা আর ছারপোকা—ময়লা বিছানায় বসে বসে। আসল কাজ কিছু করতে পারি না—ইংলণ্ডে মেয়েরা কত অসতী তারই হিসেব করতে আমরা ব্যস্ত—আমরা—”

এমন সময় ফেন উৎলাইয়া জ্বলন্ত ষ্টোভটা হঠাৎ নিভিয়া গেল। মিণ্টু উঠিয়া সেইদিকে গেলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেদিকে একবার চাহিয়া আবার স্থরু করিতেছিলেন। আমি কিন্তু উঠিয়া পড়িলাম।

“মাখনবাবুদের রান্না বোধ হয় হয়ে গেছে—এইবার আমি যাই—”

বাহির হইয়া আসিলাম। আসিবার সময় মিণ্টুর পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম—কিছু দেখা গেল না। নির্ব্বাপিত ষ্টোভটার সম্মুখে সে আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আছে।

বাহিরে আসিতেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোকটির সহিত দেখা হইল।

তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

৭

অতিশয় সসঙ্কোচে এবং অত্যন্ত সবিনয়ে মাড়োয়ারি ভদ্রলোক যে কথাটি আমাকে বলিলেন তাহাতে শুধু বিস্মিত নয় চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িলাম। চলিতেছিলাম—দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

মাড়োয়ারিও দাঁড়াইলেন এবং উভয় হস্ত নাড়িয়া এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে যে কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও তদনুসারে কার্য্য করা সম্ভবপর ছিল না। সেকথা তাঁহাকে বলিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন যে আমাকে, মাখনবাবুকে এবং মাষ্টার মহাশয়কে পান খাইবার জন্য কিছু দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন—কার্য্যটি কিন্তু করাইয়া দিতে হইবে।

ব্যাপার নিম্নলিখিত রূপ।

বন্‌শি হালুয়াই মাড়োয়ারিটির পূর্ব্বপরিচিত। সহসা এতগুলি লোকের ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি বন্‌শি হালুয়াই-

এর নাই। সুতরাং এই মরশুমে শেঠজির সহিত বন্‌শির দেখা হইয়া যাওয়াতে রামজির কৃপাই প্রমাণিত হইতেছে। ক্যাপিটালের জন্য আর তাহাকে ভাবিতে হইবে না। প্রাক্তন বন্ধু বন্‌শির উপকারার্থে শেঠজি "শও দোশ" খরচ করিতে পশ্চাৎপদ নহে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি আমাদের কৃপা-প্রার্থনা করিতে চাহেন। অর্থাৎ তিনি চাহেন যে আমি মাখনবাবু এবং মাষ্টার মশাই পান খাইয়া এমন একটা "কাররোয়াই" করি যে ট্রেণখানা অন্তত আরো চব্বিশ ঘণ্টা যেন এখানে পড়িয়া থাকে। তাহা না থাকিলে অনর্থক এতগুলা টাকা খরচ করিয়া আটা ঘিউ এবং তরকারির জন্য চার ক্রোশ দূরবর্ত্তী সাধুগঞ্জের বাজারে যাওয়ার কোন অর্থ হয় না। কাছাকাছি যত আটা, ঘি এবং তরকারি ছিল বন্‌শি সব কিনিয়া লইয়াছে এবং তাহাও নিঃশেষিতপ্রায়। সাধুগঞ্জে যাইবার জন্য সে শেঠজিকে পীড়াপীড়ি করিতেছে। শেঠজিরও যাইতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি আমাদের কৃপা-প্রার্থনা করেন। ইচ্ছা করিলে পান অবশ্য আমরা খাইতে পারি।

আমি জানাইলাম আমাকে এসব কথা বলা বৃথা— কারণ আমিও একজন প্যাসেঞ্জার মাত্র। মাখনবাবু বা

কিছুক্ষণ

মাষ্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা নিতান্তই আকস্মিক।

ইহা শুনিয়া তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না। মৃদু মৃদু মাথা নাড়িয়া অর্দ্ধ-নিমীলিত নেত্রে তিনি যাহা বলিতে লাগিলেন তাহার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি এমন কোন উক্তি করিলেন না যাহা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায়। তিনি বলিতে লাগিলেন যে আমার সহিত মাখনবাবু ও মাষ্টার মহাশয়ের যে কোন সম্পর্ক নাই তাহা তিনি অবগত আছেন। সমস্ত 'পাকা' খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং ইহাই সার বুঝিয়াছেন যে আমি যদি মাখনবাবু ও মাষ্টার মহাশয়কে একটু অনুরোধ করি তাহা হইলেই কার্য্যটি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। একথা তিনি ভাল করিয়া জানিয়াই তবে আমার নিকট আসিয়াছেন।

সামান্য পান খাইতে আপত্তি কি ?

বুঝিলাম এখানে সত্যভাষণ নিষ্ফল।

একটু কৌতুক বোধও হইল।

বলিলাম—"আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখছি—"

বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটু গিয়া দেখিলাম তিনি পিছু পিছু আসিতেছেন। তাঁহাকে

ডাকিয়া বলিলাম যে তিনি যদি পিছু পিছু আসেন তাহা হইলে কিন্তু কার্য্যসিদ্ধি হওয়া শক্ত। এ কথায় যাদুমন্ত্রের মত কাজ হইল। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গ ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে বলিয়া গেলেন যে আমার দয়ার উপর "ভরোসা" করিয়া তিনি তাহা হইলে সাধুগঞ্জের হাট অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

হাসিয়া উত্তর দিলাম—"আচ্ছা"

"নমস্কার—"

ফিরিয়া দেখি সেই বেঁটে ভদ্রলোক। একটি লাল রঙের কোট বাহির করিয়া পরিধান করিয়াছেন। হাতেও একটি বেঁটে গোছের বর্ম্মা চুরুট। এত বেঁটে বর্ম্মা চুরুট ইতিপূর্ব্বে দেখি নাই।

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেলাম।

৮

কিছুদূর গিয়াই মাখনবাবুর সহিত দেখা হইল।

তিনি আমাকে ডাকিতে আসিতেছিলেন। দূর হইতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"ভীষণ কাণ্ড মশাই—শীগ্‌গীর আসুন।"

"কি হ'ল?"

"আরে ওই যে মেয়েটা আপনি রেখে গেলেন—ও মুচির মেয়ে। ভাগ্যে রান্নাঘরে ঢোকে নি—ঢুক্‌লে ত সব হাঁড়িকুঁড়ি ফেলে দিতে হত। কি মুস্কিল! অজ্ঞাত-কুলশীলকে এই জন্যেই আশ্রয় দিতে নেই শাস্ত্রে বলেছে। আরে না-না আপনাকে অত কাচুমাচু হতে হবে না। আপনার দোষ কি? বাইরে থেকে দেখে ত কিছু বোঝবার জো নেই আজকালকার দিনে! সবাই ফিট্‌ফাট—"

আমি শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম—"বুঝলেন কি করে?"

"আরে সে নিজেই বল্লে কি না! এ ধারে মেয়েটি বেশ ইয়ে আছে—"

"নিজেই বল্লে?"

"হ্যাঁ। বিনু খাওয়ার জন্যে খুব জিদ্ করতে লাগল। তখন মেয়েটি বল্লে যে 'আমি তাহলে আপনাদের থালা গেলাস এঁটো করব না—সব জেনে-শুনে যদি এঁটো করতে দেন তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আমার প্রথমেই আপনাদের জানানো উচিত যে আমি মুচির মেয়ে'। এই শুনেই ত বিনুর পিলে চমকে গেল।"

বলিয়া মাখনবাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"মেয়েটি এখন আছে কোথায়? আপনাদের বাড়ীতেই?"

মাখনবাবু আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—"নো নো, সার। ভয় নেই—সে নিজেই চলে গেছে—"

"কোথায়?"

"আলগোছে একখানা নিম্‌কি খেয়ে সে ওই রাস্তাটা দিয়ে চলে গেল। বলে গেল আমি গ্রামের ভেতরটা একটু ঘুরে আসি। জিনিসপত্র সব আমার বাসাতেই পড়ে আছে—"

কি বলিব কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

কিছুক্ষণ

মাখনবাবু অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন।

"আজ সব মাটি হয়েছিল আর একটু হলে!

রামদীন ব্যাটা গ্র্যাণ্ড্ পাব্দা মাছ জোগাড় করে এনেছে, আর বিনু করেছে তার ঝাল। বিনুর হাতের ঝাল কোনদিন খান নি—খেলে আর ভুলতে পারবেন না। সিম্‌প্লি বিউটিফুল! ও বেটি ছুঁয়ে দিলেই সব ভেস্তে গিয়েছিল আর একটু হলে—"

মাখনবাবুর বাড়ীর কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"চান করবেন ত আপনি?"

"ইচ্ছে ত আছে। কিন্তু এখন আবার কাপড়টা ভেজাব কি না ভাবছি—"

"কাপড় দিচ্ছি আমি মশাই—চান করুন। চান না করলে চলে এই গরমে—" বলিয়া মাখনবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বাহিরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম মাখনবাবু বলিতেছেন—"এ কি পাব্দা মাছগুলো এখনোও কিছু কর নি? তোমাকে বলে গেলাম ঝাল করতে—"

"এ বেলা থাক না আর। কালকের বাসি মাছের টক ত আছে একখোরা। পাব্দাগুলো বরং ভেজে

রাখি ওবেলা হবে। শরীরটাও ভাল নেই—কেমন যেন জ্বর জ্বর করছে—"

"না না, তা কি হয়। ভাল করে ঝাল কর মাছ-গুলোর! ভদ্রলোককে আমি বললাম যে তোমার হাতের ঝাল খেলে তিনি জীবনে সেকথা ভুলতে পারবেন না—"

"আহা!"

"কর কর, বুঝলে—"

"উনুন ত নিভে গেছে। তোমার যত সব অনাছিষ্টি—"

"কুছ্ পরোয়া নেই—রামদীনকে ডেকে দিচ্ছি—"

আমি দেখিলাম এ ভাবে দাঁড়াইয়া দাম্পত্যালাপ চুরি করিয়া শোনাটা ঠিক নয়। একটু সরিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। মিনিটখানেক পরেই মাখনবাবু একখানা কাপড়, গামছা এবং একটা চায়ের পেয়ালায় করিয়া খানিকটা তৈল লইয়া দর্শন দিলেন।

তেল মাখিতে মাখিতে প্রশ্ন করিলাম—"কাছাকাছি পুকুর কোথাও আছে? একটা ডুব দিয়ে আসতাম তাহলে—"

মাখনবাবু বলিলেন—"খুব কাছাকাছি নেই। তবে একটু দূরে গেলেই—আধ মাইলটাক্—একটা ভাল পুকুর

পেতে পারেন। এই যে রাস্তাটা সোজা চলে গিয়ে ওই মন্দিরটার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে—ওই রাস্তা! মন্দিরটার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তাটা দু-দিকে ভাগ হয়ে গেছে—আপনি বাঁ দিকেরটা ধরে সোজা চলে গেলেই পুকুর পাবেন। বেশ ভাল পুকুর। যান তাহলে দেরী করবেন না—"

মাথায় একটু তেল চাপড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে রাস্তার মোড়টায় যেখান হইতে আমাকে বাঁকিয়া পুকুরের রাস্তা ধরিতে হইবে সেইখানটায় অনেকগুলি লোক জমিয়াছে এবং একটা গোলমাল হইতেছে।

দ্রুতপদেই যাইতেছিলাম—গতিবেগ আরও একটু বাড়াইলাম।

ভীড়ের নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলাম একটা গরুর গাড়ীর একটা চাকা রাস্তার পাশের একটা গর্ত্তে পড়িয়া গিয়াছে। শীর্ণ গরু দুইটি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে বটে কিন্তু তাহাদের সাধ্যে কুলাইতেছে না!

গাড়োয়ান সে কথা শুনিবে কেন?

তাহার হাতে লাঠি আছে—গায়ে শক্তি আছে। সে প্রাণপণে লাঠিবাজি ও গলাবাজি করিয়া লোক জমাইয়া

ফেলিয়াছে। লোকও দেখিলাম জমিয়াছে অনেকগুলি আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই পাঁজর-বাহির-করা ঘাড়ে-ঘা বলদ দুইটির বদমায়েসি সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আশ্চর্য্য পাজি গরু! এত মার খাইতেছে তবু জোর করিয়া টানিয়া গাড়ীটাকে গর্ত্ত হইতে তুলিবে না!

"পেজোমি তোদের বের করছি থাম—"

ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান তড়াক্ করিয়া লাফাইয়া পড়িল এবং গাড়ীর সামনে গিয়া গরু দুইটির মুখের উপর নাকের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। গাড়োয়ান এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই হিন্দু। গোজাতির উপর তাহাদের শাস্ত্রীয় অধিকার আছে। বলিবার কিছু নাই।

গাড়োয়ানের হাত ব্যথা হয় নাই। সুতরাং সে হাত চালাইতেছিল। আমি আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম—

"ওহে, আর মেরো না! এসো বরং আমরা সবাই মিলে ঠেলে-ঠুলে গাড়ীটাকে তুলে দি ওপরে—"

"আরে থামেন বাবু আপনি। এ গরুকে আপনি চেনেন না! দেখুন না আমি শায়েস্তা করে তবে ছাড়ব—"

বলিয়া সে আবার মার সুরু করিল।

"চোড় দেও—মাৎ মারো—"

দেখি সেই কাবুলিওয়লা আসিয়া হাজির হইয়াছে।

"চোড়ো—"

সে তাহার বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আগাইয়া গেল এবং প্রথমেই গিয়া গরু দুইটাকে খুলিয়া দিল।

"এই আগা সায়েব—কেয়া করতা"—বলিয়া গাড়োয়ান প্রথমটা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু কাবুলিওলার মুখে সে যে ভাব দেখিল তাহাতে সে আর বেশী কিছু বলা নিরাপদ মনে করিল না।

"তুম্ আদ্‌মি নেহি—জানবর হ্যায়—"

বলিয়া কাবুলি গরু দুইটিকে হাঁকাইয়া নিকটেই বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। এইবার সে আমাকে দেখিতে পাইল। সেলাম করিয়া সহাস্যে সে বলিল—"আইয়ে বাবু সাব, থোড়া হাত লাগা দিজিয়ে—"

বলিয়া সে নিজেই প্রথমে গিয়া জোয়ালে কাঁধ দিল। তাহার দেখাদেখি গাড়োয়ান এবং আরও দুই একজন আগাইয়া গেল। আমি এবং আর বাকী সকলে গাড়ীটার পিছন হইতে ঠেলিতে লাগিলাম। অনেক ঠেলাঠেলির পর গাড়ীটা পথে উঠিল। কার্য্যসমাধা

করিয়া কাবুলিওলা পস্তু ভাষায় খানিকটা কি বলিয়া গেল—বুঝিলাম না—ষ, ঝ এবং 'Z' এর একটা ঝড় বহিয়া গেল! পরিশেষে সে আমাকে আবার সেলাম করিয়া বিদায় লইল—কহিল এ ট্রেনে সে যাইবে না, কারণ ট্রেন ছাড়িবার কোনই ঠিক নাই। উপস্থিত সে গ্রামান্তরে যাইতেছে।

কাবুলিওলা চলিয়া যাইবার পর গাড়োয়ান গজর গজর করিতে লাগিল।

"উঃ শালা গোঙার এসে আমার সব নয়-ছয় করে দিয়ে গেল। মাল গেছে পড়ে—একবেলা যাবে এখন কুড়োতে। এই—এই—একটি দানায় কেউ হাত দিও না বলছি—"

সত্যই পিছনের একটা ফাটা বস্তা হইতে কিছু ছোলা রাস্তার ধুলার উপর পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া কয়েকজন পড়িয়াছিল বোধ হয় কুড়াইয়া দিবার জন্যই। কিন্তু গাড়োয়ান তাহাদের এই উপচিকীর্ষাকে আমল দিল না—দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া গেল।

পার্শ্ববর্ত্তী একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম "এই আগা সায়েব এই অঞ্চলেই থাকে নাকি?"

কিছুক্ষণ

সে বলিল যে আগা সায়েব কোথায় যে থাকে তাহা তাহার জানা নাই—তবে এই অঞ্চলে সে প্রায়ই ঘোরে। অনেকেই তাহার কাছে টাকা ধার লয়। অত্যন্ত চড়া সুদ। মাসিক টাকা প্রতি দুই আনা! তাহার পর নিম্নস্বরে সে জানাইয়া দিল যে এই মঙ্গল গাড়োয়ানই তাহার নিকট টাকা ধারে। তাই তাহার কার্য্যে বাধা দিতে সাহস পাইল না। তাহা না হইলে……।

আমার আর বেশী শুনিবার আগ্রহ ছিল না। মাখনবাবুর নির্দ্দেশমত বাম দিকের রাস্তাটা ধরিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম।

কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের বুক চিরিয়া একটি পায়ে-চলা সরু পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। কাছে দূরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। পাশেই কয়েকটি রাখাল বালক ডাংগুলি খেলিতেছে। তাহাদেরই একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম পুকুরটা কোন দিকে। তাহারা বলিল যে সোজা কিছুদূর গেলেই পাওয়া যাইবে।

উদার বিস্তীর্ণ মাঠে চলিতে চলিতে মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম মেঘলেশহীন নীলাম্বর খর-রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। বহু ঊর্দ্ধে

কিছুক্ষণ

চক্রাকারে কতকগুলি শকুনি উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটা গরুর পিঠে একটা কাক বসিয়া তাহার পুরাতন ক্ষতটাকে ঠোকরাইয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আরও একটু দূরে গিয়া দেখিলাম বিস্ফারিত-চঞ্চু শালিক-দম্পতি আমাকে দেখিয়া উড়িয়া গেল।

রৌদ্র-দগ্ধ ধূসর মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি। পুষ্করিণী কতদূরে আছে কে জানে !

৯

স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছি এমন সময় মনে হইল পুকুরের ওপারে সেই মেয়েটি যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে বোধ হয় দেখিতে পায় নাই! ওপারে একটা গাছের তলায় হেঁট হইয়া একমনে কি যেন কুড়াইতেছে। একটা কি যেন গাছ রহিয়াছে ওপারে।

সিক্ত কাপড়টি কাচিয়া গামছায় বাঁধিয়া ওপারের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। একটু দূরে গিয়াই বুঝিলাম সেই মেয়েটিই বটে।

কাছাকাছি হইতেই মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল! আমি নমস্কার করিলাম। মেয়েটি প্রতি-নমস্কার করিয়া নীরব হইয়া রহিল। নীরবতা আমাকেই ভঙ্গ করিতে হইল। মেয়েটির বয়স কম—তাহাকে 'তুমি' বলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহার মুখে-চোখে এমন কি একটা আছে যে বলিতে বাধে। বলিলাম—

"এখানে একা একা কি করছেন?"

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—“জাম কুড়োচ্ছি। কেমন সুন্দর জাম দেখুন ত—”

সত্যই বেশ সুন্দর বড় বড় জাম। অনেকগুলিই সংগ্রহ করিয়াছে দেখিলাম।

—“খাবেন ? নিন, না !”

“না, এখন আর খাব না। আমাকে ভাত খেতে হবে এখুনি গিয়ে। চান করতে এসেছিলাম—”

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিতে লাগিল “আমার জাতের কথা টের পেয়ে গেছেন বুঝি ? ফলের বেলায় ত দোষ নেই শুনেছি। আমার মা ঝুড়ি করে জাম, বৈঁচি, কুল ফেরি করে বেড়াতেন—”

“না না, সেজন্য নয়। আমার নিজের ও-সব কোন সংস্কার নেই—আচ্ছা দিন দু-চারটে—তা নাহলে আপনার বিশ্বাস হবে না—”

জাম চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম—“এখানে একা একা কি আর করবেন ? চলুন ষ্টেশনের দিকেই যাওয়া যাক—”

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল।

“বাঃ, ওই দিকে একটা কি সুন্দর জাম পড়ে রয়েছে দেখুন। থামুন, আনি ওটাকে—”

কিছুক্ষণ

পাশেই একটা কাঁটা ঝোপের ভিতর একটা পাকা পুষ্ট জাম পড়িয়াছিল। মেয়েটি অতি সন্তর্পণে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া সেটিকে হস্তগত করিল।

বলিলাম—"এইবার চলুন তাহলে—"

"আপনি যান। আমি এখন যাব না—একটু পরে আসছি—"

ইহার পর আমার চলিয়া আসাই উচিত ছিল। কিন্তু মাখনবাবুর বাড়ী হইতে মেয়েটির অকস্মাৎ অন্তর্দ্ধানে মনে আঘাত পাইয়াছিলাম। অপ্রত্যাশিত ভাবে ইহাকে আবার এখানে পাইয়া ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিল না।

মুচির মেয়ে? মুচির ঘরে এমন মেয়ে হয় তাহা আমার জানা ছিল না। মেয়েটির চোখে মুখে এমন একটা বুদ্ধির জ্যোতি রহিয়াছে যাহা ভদ্র মেয়েদের মুখেও খুব বেশী দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আবার বলিলাম, "মাখনবাবুর স্ত্রী আপনাকে ঠিক কি বলেছেন জানিনা কিন্তু আমাদের সাধারণ হিন্দু ঘরের প্রচলিত সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এটা আপনার বোঝা উচিত—"

মেয়েটি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদের সুরে বলিল—"না না, মাখনবাবুর স্ত্রী আমাকে তেমন কিছু ত বলেন নি!

বললেই বা কি করতুম। মুচির মেয়ে হয়ে এদেশে এর চেয়ে আর বেশী কি সম্মান আশা করতে পারি বলুন—"

আমি বলিয়া ফেলিলাম—"আপনাকে দেখে সত্যি কিন্তু মুচির মেয়ে বলে মনে হয় না। সত্যি বলছি--" মেয়েটি গাছের ও পাশটায় সরিয়া গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধহয় আর একটা জাম কুড়াইতে গেল। তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না। রঙীন কাপড়ের প্রান্তটুকু শুধু দেখা যাইতেছিল। আমিও ঘুরিয়া গাছের ও পাশটায় গেলাম। গিয়া বলিলাম—"চলুন চলুন—এখানে একা নির্জ্জন মাঠের মাঝে থাকা ঠিক নয়।"

"নির্জ্জন জায়গাই আমাদের পক্ষে নিরাপদ! কেন, আপনি আমাকে শুধু শুধু বিপদের মধ্যে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছেন? প্ল্যাটফর্মের ওপর অসভ্য একদল ছেলে বিরক্ত করছিল তাই দেখে আপনি নিয়ে গেলেন এক ভদ্রলোকের বাসায়। সেখান থেকেও ফিরে আসতে হলো। তার চেয়ে আমি এইখানে বেশত আছি!—"

"আপনি বেশ আছেন তাত দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে এখানে এরকম ভাবে ফেলে রেখে যেতে আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না—"

"না না, ও কিছু নয়, আপনি যান। আমার জন্যে

এতটা কষ্ট স্বীকার করেছেন এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।"

"বেশ ত ধন্যবাদ আপনার গ্রহণ করলাম; কিন্তু এবারে চলুন। আপনাকে এই মাঠের মাঝখানে একা ফেলে রেখে আমি যাব না। আপনি যদি না যান এই আমিও বসলাম—"

বলিয়া নিকটস্থ একটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলাম।

একটি জাম মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা একগুঁয়ে লোক ত আপনি। আমার জন্যে এতখানি কষ্ট স্বীকার আপনি কেন করছেন বলুন দেখি—হাড়ি মুচির কত মেয়ে রাস্তায় ঘাটে কতভাবে ত রোজ অপমানিত হচ্ছে—সকলের জন্য আপনি ত এতটা ব্যস্ত হন না। আমার জন্যেই বা এতটা ব্যস্ত হতে আমি দেব কেন আপনাকে? একজন নীচ-জাতীয়ার জন্য ব্যস্ত হবার কারণই বা কি থাকতে পারে?"

"জাত আপনার যাই হোক—তাতে কিছু এসে যায় না। আপনাকে নিজেদের সমশ্রেণীর বলে মনে হচ্ছে তার প্রধান কারণ বোধহয় আপনি ফরসা জামা কাপড় পরে রয়েছেন—"

"আর কোন কারণ নেই ত ?"

প্রশ্নটা শুনিয়া মনে মনে একটু লজ্জা পাইয়া গেলাম। মুখে বলিলাম, "কারণ হয়ত অনেকগুলিই আছে। সবগুলো না-ই শুনলেন !"

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

"নিতান্তই ছাড়বেন না যখন—চলুন তবে।"

"চলুন।"

নির্জ্জন মাঠের ভিতর দিয়া খররৌদ্রে দুইজনে হাঁটিয়া চলিয়াছি। দুইজনেই নির্ব্বাক।

নীরবতাই ভাষাময় হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল "আপনি করেন কি ?"

"আমি পড়ি—"

"কি পড়েন ? কোথায় ?"

"কোলকাতায়—মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ি !"

"ও, সেইজন্যই ঠিক 'ডায়াগনোসিস্' করেছেন—"

মেয়েটির মুখে ইংরেজি কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

কিছুক্ষণ

"কিসের 'ডায়াগ্নোসিস্"

"থাক্—ও কিছু নয়—"

বলিয়া একটু হাসিয়া মেয়েটি চুপ করিয়া গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল।

কাহারও মুখে কথা নাই।

একটু পরে মেয়েটিই আবার কথা কহিল।

"আপনাকে একটা কথা বলছি। কাউকে বলবেন না কিন্তু। আপনি ঠিকই ধরেছেন—আমি মুচির মেয়ে নই। আমি কায়স্থের মেয়ে—"

দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

"কায়স্থের মেয়ে? তবে আপনি নিজেকে মুচির মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন কেন?"

শুনিয়া মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল—"আপনি মহাভারত নিশ্চয়ই পড়েছেন। কুন্তীপুত্র কর্ণ চিরকাল নিজেকে অধিরথসূত বলে পরিচয় দিতেন তা জানেন ত? আমারও অবস্থা অনেকটা তাই—"

"কি রকম?"

"দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন! চলুন না, যেতে যেতে সব বলছি—"

চলিতে লাগিলাম।

মেয়েটিও বলিতে লাগিল—"আমার বাপ মায়ের নাম আমি বলব না। কোথায় আমাদের বাড়ী তা'ও আপনার জানবার দরকার নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে ভদ্রকায়স্থ ঘরে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম। আমার মা উপর্যুপরি দশটি মেয়ে প্রসব করার পর আমাকে প্রসব করেছিলেন। আমাকে প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গেই মা অজ্ঞান হয়ে যান। সেই সুযোগে আমার ঠাকুমা তখন নাকি আঁতুড় ঘরেই আমাকে বিলিয়ে দেন—সেই ধাত্রী হাড়িনীকে। বাবারও নাকি তাতে মত ছিল। মায়ের জ্ঞান হবার পর মাকে জানানো হয় যে একটা মরা মেয়ে হয়েছিল এবং তা ফেলে দেওয়া হয়েছে—"

বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

"তারপর ?"

"তারপর আর কি ? আমিই সেই একাদশ কন্যা !"

এ রকম অসম্ভব কথা জীবনে কখন শুনি নাই।

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? না হবারই কথা। এর একটি বর্ণ কিন্তু মিথ্যে নয়। খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল—"

বলিবার কিছু ছিল না। মনে হইতেছিল এসব

প্রসঙ্গ না তুলিলেই বোধহয় ভাল হইত। মনে হইতেছিল মেয়েটিকে অবিশ্বাস করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইতাম। কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সমাজকে ত চিনি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "হাড়ি আর মুচি এক নাকি? আপনি পরিচয় দিচ্ছেন মুচির মেয়ে বলে, অথচ বলছেন আপনার ঠাকুমা হাড়িনীকে—"

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল—"আপনি ভুল লাইন ধরেছেন। ডাক্তার না হয়ে উকীল হলে আপনার বেশী পসার হত। ঠাকুমা বিলিয়ে দিয়েছিলেন হাড়িনীকে—হাড়িনী আবার আমাকে বিক্রি করে দেয় এক মুচিকে! মুচির বাড়ীতেই আমি মানুষ হয়েছি—মুচি মায়ের দুধ খেয়েই আমার এই দেহ পুষ্ট!"

"আমার কিন্তু একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য্য লাগছে—মুচির বাড়ীতে আপনি এরকম শিক্ষা পেলেন কি করে?"

"কেন মুচিরা মানুষ নয় না কি?"

মেয়েটির চোখে একটা ক্রুর ব্যঙ্গ যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত্ত হইয়া উঠিল।

"মানুষ নয় তা আমি বলছি না—"

"এই সব মুচি মেথররা আধমরা ভদ্রলোকদের চেয়ে

ঢের বেশী জীবন্ত—তা জানেন ? তবে এটা ঠিক মুচির ঘরে বরাবর থাকলে আমি লেখাপড়াও শিখতে পারতাম না, কিছুই না। ভাগ্যে ক্রিশ্চান মিশনারিরা এদেশে এসেছিল তাই আমাদের গতি হয়েছে—"

"আপনি ক্রিশ্চান না কি ?"

"হ্যাঁ, আমি ক্রিশ্চান। মিস্ মার্থা দাস এখন আমার নাম। আমি কিন্তু মুচির মেয়ে বলেই নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসি। বিশেষত হিন্দু সমাজে···"

মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য একটা ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ যেন চকমক করিয়া উঠিল !

"আপনার বাপ মা এখনও বেঁচে আছেন ?"

"না, তাঁরা মারা গেছেন শুনেছি। অন্যান্য আত্মীয় স্বজন কে কোথায় আছেন জানিনা। খোঁজ নিতে প্রবৃত্তিও হয় না। ক্রিশ্চান মিশনারিদের কাছেই আমি মানুষ। তাদেরই আশ্রয়ে ছেলেবেলাটা আমার মান্দ্রাজ অঞ্চলে কেটেছে—শুধু ছেলেবেলা কেন—এ দেশে আমি অল্প কয়েকদিনই হল এসেছি—"

"বাঙলা ভুলে যান নি ত !"

"আমাদের এক মিশনারি মেম সুন্দর বাঙলা জানতেন। তিনিই আমাকে বাঙলা পড়িয়েছিলেন খুব

৭

যত্ন করে। তিনি বলতেন আমি বাঙালীর মেয়ে বাঙ্‌লাটা আমার ভাল করে শেখা উচিত। তাঁর কাছে আমি বাইবেলও যেমন পড়েছিলাম রামায়ণ মহাভারতও পড়েছিলাম। তাঁর আগ্রহ আর উৎসাহ না থাকলে আমার বাঙালীত্বও এতদিনে লোপ পেয়ে যেত!"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"এদেশে আপনি ফিরে এসেছেন আবার কি সূত্রে?"

"একটু দরকার আছে—"

বলিয়া মেয়েটি একটু যেন লজ্জিত হইল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম।

"আপনি এ দেশের মেয়ে হয়ে মান্দ্রাজে চলে গেলেন কি করে?"

"সে অনেক কথা। আমার মুচি বাবা আর মুচি মা এদেশে অন্ন সংস্থান না করতে পেরে মান্দ্রাজের দিকে চলে যান একটা চাকরি পেয়ে। আমার বাবা জুতোর খুব ভাল কারিগর ছিলেন। সেখানেও কিন্তু তাঁরা সুখে থাকতে পারেন নি। আমার বাবা অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। সে অনেক কথা। ক্রমে তাঁর চাকরিটি গেল—মহাকষ্ট। শেষকালে এক পাদ্রির অনুগ্রহে শেষ

জীবনটা তাঁরা একটু শান্তি পেয়েছিলেন। সেই সময়েই আমরা সবাই ক্রিশ্চান হয়ে যাই—"

ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম।

মেয়েটি বলিল—"এলাম ত আপনার সঙ্গে—এখন যাই কোথায় বলুন ত। সকলের ব্যবহার দেখে বড় কষ্ট পাই—সত্যি বলছি। নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে—"

আমি বলিলাম—"আপনি মাখনবাবুর বাসাতেই আসুন না। তাতে কি হয়েছে?"

"না, না, মাপ করবেন, আমি এখন ওখানে যাবনা। বিশেষত এখন আপনাদের খাওয়া দাওয়ার সময়—"

মেয়েটি সোজা প্ল্যাট্‌ফর্মের দিকেই আগাইয়া গেল। আমি মাখনবাবুর বাড়ীর দিকে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি মাখনবাবু নিজেই রান্না করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। আমার সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ধোঁয়ায় দুই চক্ষু লাল—জল পড়িতেছে। কোমরে গামছা বাঁধা—কাপড়ে হলুদের ছোপ—হাতে হাতা। আমাকে দেখিয়া বলিলেন—"আপনার দেরী দেখে একটু পায়েস চড়িয়ে দিলাম। হয়ে গেল বলে—আর দেরী নেই—টেন মিনিট্‌স্—"

বলিয়া আবার তিনি ধূমাচ্ছন্ন রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। রান্নাঘর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন— "আমার ঘরে টেবিলের ওপর আয়না চিরুণী আছে—"

ঘরে ঢুকিতেই মাখনবাবুর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল তিনি যেন শুইয়া ছিলেন। শুনিলাম তাঁহার শরীর খারাপ।

১০

আহারাদির পর দেখা গেল বেলা তিনটা বাজিয়াছে। পাবদা মাছের ঝাল সত্যই ভাল হইয়াছিল। পান চিবাইতে চিবাইতে মাখনবাবু বলিলেন "আপনি একটু বসুন সার—আমি দেখে আসি রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে—আপনি শুয়ে পড়ুন না ততক্ষণ!"

আমি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলাম, "আপনার স্ত্রীর খাওয়া হয়ে গেছে কি? তাঁর শরীরটা ভাল নয় শুনলাম—"

"হ্যাঁ, শরীরটা তেমন সুবিধে নেই বলছিল। মুড়ি দিয়ে ত পাশের ঘরটায় শুয়েছে। জ্বরটর এসেছে বোধহয়! ম্যালেরিয়ায় ত প্রায়ই ভোগে। আচ্ছা, দেখি দাঁড়ান—" বলিয়া মাখনবাবু পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পাশের ঘর হইতেই আমাকে ডাকিলেন—"শুনে যান—"

গেলাম। গিয়া দেখি মাখনবাবুর স্ত্রী জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম—গা পুড়িয়া যাইতেছে।

মাথায় জলপটি দিয়া হাওয়া করিতে বলিলাম। শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু বলিলেন, "সিরিয়াস্ বুঝছেন নাকি কিছু ?"

"না—জ্বরটা একটু বেশী হয়েছে কিনা—তাই ওই রকম করে রয়েছেন। কুইনিন পাওয়া যাবে এখানে ?"

"ছিল ত আমার কাছেই কয়েকটা গুলি। দেখি দাঁড়ান। ও ঘরে র‍্যাক্‌টায় ছিল মনে হচ্ছে—"

"আপনি আগে মাথায় জল দিয়ে ভাল করে বাতাস করুন। আমি দেখছি র‍্যাক্‌টা খুঁজে—" ফিরিয়া আসিয়া র‍্যাকটা খুঁজিয়া দেখিলাম। একটি খালি কুইনিনের টিউব রহিয়াছে। কুইনিন নাই।

মাখনবাবু এই শুনিয়া ওঘর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন—মাষ্টার মহাশয়ের বাসায় পাওয়া সম্ভব। মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতে গেলাম। পাশের বাড়ী। সেখানে গিয়া দেখি মাষ্টার মহাশয় বাসায় নাই—ষ্টেশনে গিয়াছেন। একটি দশবছরের ছেলে বাসা হইতে বাহির হইয়া এই খবরটি দিল। তাহাকে বলিলাম যে মাখন বাবুর স্ত্রীর খুব জ্বর হইয়াছে—বাড়ীতে যদি কুইনিন থাকে একটু চাই। খোকা বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই কুইনিন পিল কয়েকটা লইয়া হাজির হইল।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম একটি আধময়লা-কাপড়-পরা আধঘোমটা দেওয়া মহিলাও বাহির হইলেন এবং একটু দূরে আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিলেন।

মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী বোধহয়।

ফিরিয়া দেখি মাথায় জল দেওয়াতে বিন্নুর জ্ঞান হইয়াছে। মাখনবাবু প্রাণপণ শক্তিতে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন।

"পেলেন কুইনিন সার ?"

"হ্যাঁ, পেয়েছি—"

"মাষ্টার মশায়ের হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার—এই যে স্বয়ং লক্ষ্মীও এসে হাজির হয়ে গেছেন দেখছি। আসুন বৌদি—চাঙ্গা করে তুলুন। এসব আমার কর্ম্ম নয়—" বলিয়া মাখনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী বিন্নুর শিয়রে গিয়া বসিলেন।

"বাস্ নিশ্চিন্দি ! এইবার দেখা যাক রামদীন ব্যাটা কদ্দূর কি করলে—হ্যাঁ কুইনিনটা কি এখনই দিয়ে দিতে হবে ?"

"দিলেই ভাল হয়—দুটো পিল দিন—"

আমার হাত হইতে কুইনিনের পিলগুলি লইয়া মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রীর হাতে সেগুলি দিয়া মাখনবাবু বলিলেন—

কিছুক্ষণ

"শুনলেন ত? ছুটো পিল দিয়ে দিন এখুনি—জাস্ট্ নাউ! বুঝলেন?"

মাষ্টার মহাশয়ের স্ত্রী ঘাড় কাৎ করিয়া জানাইলেন যে তিনি বুঝিয়াছেন এবং ফিস্ ফিস্ করিয়া বলিলেন যে আমরা বাহিরে গেলেই তিনি পিল ছুইটি খাওয়াইয়া দিবেন।

মাখনবাবু আমাকে বলিলেন, "চলুন সার, তবে বাইরে যাই। বৌদি এসে গেছেন যখন, তখন আর কিছু দেখবার দরকার নেই। কিছুক্ষণ পরে চাই কি উনি চা-ও খাইয়ে দেবেন আমাদের—"

ফিস্ ফিস্ করিয়া বৌদি আবার বলিলেন—"ও বাড়ীতে যান না—চায়ের জল বসানই আছে। খোকনকে বল্লেই সে সব ঠিক করে দেবে—"

সস্মিত দৃষ্টিতে মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"শুনলেন ত?"

"চলুন আমরা বাইরে যাই—" বলিয়া আমি মাখন বাবুকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম। মাখনবাবু বলিলেন—"রামদীন ব্যাটা কদ্দূর কি করলে একবার দেখতে হচ্ছে। ব্যাটাকে একটা টাকা দিয়েছি ত অনেকক্ষণ হল—"

"কেন ?"

"ড্রাইভার ব্যাটাকে যদি ফুস্‌লে ফাস্‌লে মদ খাওয়াতে পারে—"

হঠাৎ আমার মনের ভিতরটাতে কে যেন একটা মোচড় দিয়া গেল। এই চক্রান্তে সত্যই যদি ড্রাইভারের চাকরিটা যায়। আমি অনর্থক ইহার মধ্যে নিজেকে জড়াইলাম কেন ? নিতান্ত নিরীহ একটা লোককে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন ভাবে—

"কি ভাবছেন সার ?"

"কিছু না—"

এমন সময় দূরে দেখা গেল সেই মাড়োয়ারি ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া আবার সেলাম করিলেন। ইহাঁর কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সব মনে পড়িয়া গেল। মাখনবাবুকে বলিলাম—"আবার এক ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই—"

"কি ফ্যাসাদ ?"

আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা মাখনবাবুকে বলিলাম। মাখনবাবু নির্ব্বিকারচিত্তে বলিলেন, "কত টাকা দিতে চায় ?"

"সে দরদস্তুর ত করি নি। টাকা নেবেন নাকি সত্যি ?"

"সার্‌টেন্‌লি! টাকা পেলে ছাড়তে আছে?"

বলিয়া মাখনবাবু হাতছানি দিয়া তাহাকে ডাকিলেন। মাড়োয়ারি ভদ্রলোকও ইহারই জন্য ওৎ পাতিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হইল। আমি বলিলাম—"আপনারা তাহলে কথাবার্ত্তা চালান। আমি প্ল্যাটফর্ম্মটার খবর নিয়ে আসি একবার। সেই মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে জানেন ত?"

"কোন মেয়েটি? সেই মুচির মেয়ে?"

"হ্যাঁ—"

"কেমন করে জানলেন আপনি?"

"পুকুর ধারে ছিল। আমার সঙ্গেই ফিরে এসেছে— প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে গেছে। খবর নিয়ে আসি একবার—"

"মুচির মেয়েকে নিয়ে আর অত বেশী মাথামাখি করবেন না। ওসব টেন্‌ডেন্‌সি ছাড়ুন। মরুকগে ও—"

"না মাথামাখি করব কেন? আপনি শেঠজির সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ করুন না। আমি এখনি ফিরে আসছি—"

শেঠজি আসিয়া পড়িয়াছিলেন।

মাখনবাবু তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। আমি প্ল্যাটফর্ম্মের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিছুক্ষণ

প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া একটা হাসির হর্‌রা শুনিতে পাইল্যম। দেখিলাম সেই ছোকরার দল হাসিতেছে। হাসির উপকরণ এবারে তাহারা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেই একজন দেখিলাম ঘোমটা দিয়া বউ সাজিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে একটি ছোকরা অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাহিতেছে—

কাদের কুলের বউ গো তুমি
কাদের কুলের বউ—

বাকী সকলে হো হো করিয়া হাসিতেছে।

একটু দূরে একটা গাছতলায় দেখিলাম সেই ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান দম্পতি বেশ গুছাইয়া বসিয়াছেন। একটা বেতের বাক্স হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি বাহির হইয়াছে। পাঁউরুটি, মাখন এবং একটা জ্যামের শিশি দূর হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে। লাল চোঙ-ওলা একটা শস্তা গ্রামোফোনে একটা বিলাতী প্রচলিত গৎ বাজাইয়া তাঁহারা ভোজন-ব্যাপারে ইউরোপীয় আবহাওয়া সৃষ্টিরও প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিলাম। কতকগুলি অর্দ্ধ-নগ্ন গ্রাম্য বালকবালিকা কিছুদূরে দলবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই

ক্রিশ্চান-দম্পতির সঙ্গীতময় ভোজনবিলাস সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সেই মেয়েটিও সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে দেখিলাম। ধর্ম্মগত মিল থাকাতে আলাপ-পরিচয়ে বেশ একটা হৃদ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

উহাদের নিকট যাওয়া সঙ্গত হইবে কিনা চিন্তা করিতেছি এমন সময় মাখনবাবু ঊর্দ্ধ-শ্বাসে আসিয়া বলিলেন—

"একটু তাড়াতাড়ি আসুন সার! বড় বিপদে পড়েছি—রামদীন ব্যাটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাদের 'এনকোয়্যারিং' অফিসর এখুনি আস্‌ছেন ট্রলি করে। ড্রাইভারটারও পাত্তা নেই!"

"আমি তার কি করব?"

"আহা, আসুনই না আমার সঙ্গে। ওদিকে চা-ও হয়ে গেছে। নিন একটা সিগ্রেট নিন। মাথা ঠিক রাখুন এ সময়ে! আপনি ঘাবড়ালেই ত গেছি আমরা—" বলিয়া তিনি ফস্‌ করিয়া একটা দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরিলেন, "আসুন সার—চলুন—'নো টাইম্ টু লুজ্'"

মহা বিপদে পড়িয়াছি এ ভদ্রলোককে লইয়া! অথচ এড়াইবার উপায় নাই।

গেলাম সঙ্গে।

বাহিরে আসিতেই কনুই দিয়া আমাকে একটা খোঁচা দিয়া মাখনবাবু সহাস্যে বলিলেন—"টোপ গিলিতং!"

"তার মানে?"

"তার মানে শ্রীমান ড্রাইভারচন্দ্র খুব টেনে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন ওই ওদিককার গুমটির ধারে। আপনার প্ল্যান কোয়াইট্ সাক্সেস্ফুল!"

"রামদীন কোথায়?"

"চা করছে, আসুন—"

"আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?"

"বিল্কু অল্ রাইট্। বল্লাম ত বৌদি যখন গেছেন তখন নো ফিয়ার!"

নিজেকে আবার কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। ড্রাইভারটার যদি চাকরি যায়! এ কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে অনর্থক জড়াইলাম! "ওদিকে নয় সার—এদিকে আসুন। চা হচ্ছে মাষ্টার মশায়ের বাসায়—"

উভয়ে মাষ্টার মহাশয়ের বাসাতে প্রবেশ করিলাম।

১১

প্ল্যাটফর্ম্মের কোলাহলটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

"সায়েব এল বোধ হয়—"

মাখনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া পড়িলেন।

মাষ্টার মশাই উর্দ্ধ-নেত্র হইয়া চক্ষু মিট্ মিট্ করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম—"আপনারা বসুন। আমি দেখে আসি চট্ করে ব্যাপারটা কি—"

মাখনবাবু বলিলেন, "যাবার সময় আপনি রামদীনটাকে একটু পাঠিয়ে দিয়ে যান ত। একটু শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা দরকার ব্যাটাকে!"

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম রামদীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিয়া সোজা প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। প্ল্যাটফর্ম্মে গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল!

দেখিলাম সেই ক্রিশ্চান মেয়েটিকে ঘিরিয়া আবার সেই অশিষ্ট যুবকদল মহাকলরব সুরু করিয়াছে। আমি

আগাইয়া আসিয়া বলিলাম—"আবার আপনারা ওকে অপমান করছেন—?"

সেই ট্যারা ছোকরাটি ছিল।

সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, "কিছু অপমান করিনি মশাই। ভীড়ে যেতে যেতে ওঁর গায়ে আমার একটু গা ঠেকে গিয়েছিল—উনি হঠাৎ আমাকে গালাগালি দিয়ে বল্লেন 'ইডিয়ট'। আমি বরং ভালভাবে বল্লাম—'দয়াময়ি, রাগ করছ কেন—দয়া কর—দয়া পরম ধর্ম্ম!"

বলিয়া ছোকরা ফিক্ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। ছোকরার মুখের হাসির উপরই একটি প্রকাণ্ড চড় বসাইয়া দিলাম। আর একটি ছোকরা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল তাহাকেও এক ঘা দিলাম।

"ছি, ছি মারামারি করবেন না ওসব ছোটলোকদের সঙ্গে। আসুন—বাইরে আসুন—"

আমার রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আরও নানা লোক আসিয়া ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। আমি এদিক ওদিক চাহিয়া মেয়েটিকে দেখিতে পাইলাম না। একটু দূরে দেখিলাম লাল কোট পরিয়া সেই বেঁটে

ভদ্রলোকটি আমার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া আরও দুই তিনজন লোককে কি যেন বলিতেছেন।

আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন এবং মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন—

"নমস্কার দারোগা বাবু" এবং সরিয়া দাঁড়াইলেন।

"মেয়েটি কোন দিকে গেল দেখেছেন ?"

তিনি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে মেয়েটি 'গেট' দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে এবং তাহার পর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

পুলিশের লোকের সহিত বেশী বাক্যালাপ করাটা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না বোধ হয়।

বাহিরে গেলাম।

বাহিরে গিয়াই মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা।

"সায়েব এল না কি ?"

"না। সেই মেয়েটি কোথা গেল দেখেছেন ?"

"হ্যাঁ—সে ত আমার বাসায় গিয়ে ঢুকল ফের। আমি দাঁড়িয়েছিলাম মশাই – কিছু বলতে পারলাম না। মহা মুস্কিল হল দেখছি—জাতজন্ম আর কিছু রইল না—"

কিছুক্ষণ

এমন সময় হঠাৎ তিনজন সাহেব আসিয়া হাজির। একজনের কাঁধে রক্তাক্ত একটা বুড়ী।

এ কি কাণ্ড!

সাহেবেরা প্রথমেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে নিকটে কোন ডাক্তার আছে কি না। কাছাকাছি হাসপাতালই বা কতদূর।

মাখনবাবু শশব্যস্ত হইয়া মাষ্টার মশাইকে ডাকিয়া দিলেন। সাহেবের নাম শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় দিয়া হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে আসিয়া হাজির হইলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইহাঁদের কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম।

সাহেবেরা তিনজন সেই ফার্ষ্ট ক্লাসের যাত্রী। নিকটবর্ত্তী ঝিলে পক্ষী-শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই ঘুঁটেকুড়ানী বুড়ীটা ঝিলের ধারে গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক সাহেবের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বুড়ীকে লাগিয়াছে।

সাহেবেরা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

ষ্টেশন মাষ্টারকে বলিতেছেন শুনিলাম যে যত টাকাই খরচ হউক না কেন—বুড়ীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

হাসপাতাল কতদূরে ?

মাষ্টার মহাশয় জানাইলেন যে প্রায় মাইল চারেক দূরে একটি সরকারি হাসপাতাল আছে !

সাহেবেরা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন কাছাকাছি আর কোন 'মেডিক্যাল হেল্‌প' পাওয়া সম্ভব কি না। আর কোন ডাক্তার নাই ?

মাখনবাবু হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন—

"হিয়ার ইজ্‌ ওয়ান্‌ মেডিকেল কলেজ ষ্টুডেণ্ট সার—ভেরি এক্সপার্ট—"

আমাকে আগাইয়া আসিতে হইল।

বুড়ীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে যদিও আঘাত গুরুতর—কিন্তু হাসপাতালে লইয়া গিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদি করিলে বাঁচিয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। বাহিরে ইহার চিকিৎসা হইতে পারে না—বিশেষত এ স্থানে।

এই কথা শুনিবামাত্র একটি কুলিকে সঙ্গে লইয়া সাহেব তিনজন চার মাইল দূরবর্ত্তী হাসপাতাল অভিমুখে পদব্রজে রওনা হইয়া গেলেন। পাল্‌কি কিম্বা ডুলি না পাওয়া যাওয়াতে বুড়ীকে কাঁধে করিয়াই তুলিয়া লইয়া গেলেন।

কিছুক্ষণ

তাহারা চলিয়া গেলে মাখনবাবু বলিলেন—"দেখলেন শালার ব্যাটাদের কাণ্ড!"

মাষ্টার মহাশয় ঊর্দ্ধ-নেত্রে মিটিমিটি করিয়া বলিলেন—"পুলিশ কেস হলে আবার সাক্ষী ফাক্কি দিতে না হয়! এ এক ভারি হাঙ্গামায় পড়া গেল দেখ্‌ছি—"

এমন সময় ষ্টেশন প্ল্যাটফর্ম্মে আবার একটা কলরব শোনা গেল। রামদীন ঊর্দ্ধ-শ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে ট্রলি করিয়া দুইজন সাহেব আসিয়াছেন।

মাষ্টার মহাশয়ের টুপি পরাই ছিল।

তিনি সোজা চলিয়া গেলেন।

মাখনবাবুও পিছু পিছু গেলেন।

আমিও গেলাম।

একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ—আর একজন ব্রাউন রঙের। তবে ব্রাউন রঙের হইলেও তিনি একজন পদস্থ অফিসার তাহা মাষ্টার মহাশয় ও মাখনবাবুর ব্যবহারে বোঝা গেল।

মাষ্টার মশাই দেখিলাম হাত কচলাইতেছেন ও ভুল ইংরেজিতে বলিতেছেন যে দোষ ড্রাইভারের। সে

লোকটা মাতাল অবস্থায় সিগ্‌ন্যাল অগ্রাহ্য করিয়া 'ফুল ফোর্সে' ষ্টেশনে ট্রেন 'ইন' করিয়াছিল।

শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি মুখ হইতে পাইপ নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন যাত্রী জখম হইয়াছে কিনা। হয় নাই শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে ড্রাইভার কোথায় ?

মাখনবাবু বলিলেন যে সে মত্ত অবস্থায় গুম্‌টির ধারের রাস্তায় শুইয়া আছে। ট্রেণ ডিরেল্ড্ হইবার পর সে ক্রমাগত মদ খাইতেছে।

সাহেব বলিলেন—"লেট্ আস্ সি হিম্"—

সকলে অগ্রসর হইলাম।

গেট হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি এমন সময়ে মাখনবাবুর বাসা হইতে সেই খৃষ্টান মেয়েটি বাহির হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল—"হ্যালো পল্ —ইউ আর হিয়ার! বাই গড্। হ্যভ্ ইউ বিন্ ট্র্যান্সফারড্ ?"

"মার্থা ? হোয়াট ব্রিংস্ ইউ হিয়ার ?"

"আই ওয়াজ্ অন্ মাই ওয়ে টু ইউ !"

ব্রাউন রঙের সাহেবটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

মার্থা তখন আসিয়া সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করিতে লাগিল

যে তাহাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কোন খবর না দিয়াই সে তাহার কাছে যাইতেছিল। হঠাৎ পথে এই বিপদ।

তাহার পর তাহারা গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গেল। তাহাদের কথা-বার্ত্তা আর শুনিতে পাইলাম না। শ্বেতাঙ্গ সাহেবটিও দেখিলাম সহাস্যমুখে হ্যাটটা একটু খুলিয়া মার্থাকে অভিবাদন করিলেন।

মাখনবাবু চুপি চুপি আমার কানে কানে বলিলেন "সারলে দেখছি সার। ওই সাহেব হচ্ছে পি. ডব্লিউ. আই। এ মেয়েটার সঙ্গে বেশ ভাব আছে দেখছি। মাগী আমাদের নামে না লাগায়!" আমি কোন উত্তর দিলাম না।

আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

গুমটির নিকট পৌঁছিয়া দেখা গেল ড্রাইভার রাস্তার ধারে শুইয়া আছে। পাশে একটা মদের বোতলও রহিয়াছে। তাহার একজন অর্দ্ধমত্ত সঙ্গী তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে উঠাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ড্রাইভার কিন্তু বেহুঁস। শুধু বিড় বিড় করিয়া কি বকিতেছে।

কাছেই একটা ঝোপের ধারে দেখিলাম সেই ফুটফুটে বেণীদোলান মেয়েটি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া একটা

প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সহসা এতগুলি লোকের সমাগমে সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল—প্রজাপতি উড়িয়া গেল।

সাহেবেরা গিয়া ড্রাইভারকে দেখিতে লাগিলেন। ভাঙা হিন্দীতে শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি ড্রাইভারের সঙ্গীটিকে প্রশ্ন করিলেন যে ড্রাইভার কখন হইতে মদ খাইতেছে। সে সত্য কথাই বলিল। সে বলিল যে এখানে ট্রেণ 'ডিরেল্ড্' হইবার পর তবে তাহারা মদ খাইয়াছে। ষ্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান্ রামদীন সাক্ষী আছে।

ষ্টেশন মাষ্টার চক্ষু মিট্ মিট্ করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন—"অল্ ফল্স্—"

অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না।

হঠাৎ সেই ব্রাউন রঙের সাহেবটি মাখনবাবু ও আমার দিকে ফিরিয়া ইংরেজিতে বলিলেন যে এই বিপদে আমরা তাঁহার বাগদত্তা পত্নীর প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি তাহার জন্য তিনি আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ওই মেয়েটি ইহাঁর বাগদত্তা পত্নী!

মাখনবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল।

তিনি ও মাষ্টার মহাশয় উভয়েই নত হইয়া এখন তাঁহাকে সেলাম করিলেন।

কিছুক্ষণ

সাহেবেরা কার্য্য শেষ করিয়া আবার ষ্টেশনের দিকে ফিরিলেন। আমার আর ষ্টেশনে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মাখনবাবুকে বলিলাম—"আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আপনারা যান—"

সকলে চলিয়া গেলে আমি ড্রাইভারের সেই মুসলমান সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ওই সবুজ ওড়না-পরা মেয়েটি কাহার। মেয়েটি দেখিলাম একটু দূরে আবার প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। লোকটি বলিল যে মেয়েটি এই ড্রাইভারেরই মা-মরা মেয়ে। বাপ যখন যেখানে যায় প্রায়ই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

সংবাদটা শুনিয়া কেমন যেন হইয়া গেলাম। অজ্ঞাতসারে ইহার কি সর্ব্বনাশটাই করিয়াছি। একবার ভাবিলাম সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিই। কিন্তু মাখনবাবুর কথা স্মরণ করিয়া তাহা পারিলাম না।

অন্যমনস্ক ভাবে মাঠের দিকে অগ্রসর হইলাম।

১২

কতক্ষণ হাঁটিয়াছিলাম খেয়াল ছিল না। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এক নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। জটিল শাখা-প্রশাখাময় বিরাট কি একটা গাছ দূরে দাঁড়াইয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র তাহার আড়ালে উঠিতেছে দেখিতে পাইলাম। কোথাও একটু বসিতে পাইলে যেন বাঁচিতাম।

পা দুইটা ব্যথা করিতেছিল।

ধীরে ধীরে গাছটার দিকেই অগ্রসর হইলাম। গাছের নিকটবর্ত্তী হইতেই তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে অন্ধকারকে চিরিয়া একটা শকুনি ডাকিয়া উঠিল। ডানার ঝট্‌পট্‌ শুনিয়া বুঝিলাম এই গাছেই বোধ হয় শকুনিদের বাসা আছে।

দূরে কোথায় একটা ফেউ ডাকিতে লাগিল। গাছটার ও-পাশে গিয়া দেখি একটা উঁচু মত ঢিবি রহিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া বসিয়া পূর্ব্ব দিগন্তে

কিছুক্ষণ

চাহিয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিতেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। ফাঁকা মাঠে ঝির ঝির করিয়া সুন্দর বাতাস বহিতেছে।

একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। তবু কিন্তু ভালই লাগিতেছিল। চাঁদ আর একটু উঠিলে দেখিতে পাইলাম যে একটু দূরে একটা ছোট নদীও রহিয়াছে। ঢিপি হইতে নামিয়া সেই দিকেই গেলাম। শীর্ণস্রোতা নদীটির উপর ক্ষীণ জ্যোৎস্না পড়িয়া সেই নির্জ্জন প্রান্তরে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল যাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সেই নদীরধারেই একটি ফাঁকা জায়গা বাছিয়া বসিলাম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাণ্ড উল্কাপাত হইয়া গেল। সমস্ত মাঠটা আলোকিত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিনের অবসাদে শরীর মন ক্লান্ত। মাঠের মাঝে হাওয়াটুকু বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম একটু বিশ্রাম করিয়া ষ্টেশনের দিকে যাওয়া যাইবে।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখি একটু দূরে দাউ দাউ

করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। কাছেই কতকগুলি লোক বসিয়া আছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

লোকগুলির নিকটে গেলাম।

ইহারা মড়া পোড়াইতেছে! যাহা জ্বলিতেছে তাহা চিতা। আমি এতক্ষণ শ্মশানে শুইয়া ছিলাম!

রাত্রি কত হইয়াছে?

একজন বলিল—"বারটা হবে—"

বারটা?

ষ্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলাম।

ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি চারিদিক নিস্তব্ধ। মাখনবাবু বসিয়া টেলিগ্রাফ-যন্ত্রে টক্কা-টরে করিতেছেন। সমস্ত যাত্রীদের লইয়া ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

একজনও নাই।

আমি নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহাদের লইয়া সমস্ত দিন এত উৎসাহে এত আগ্রহে এত সত্য-মিথ্যার জাল বুনিতেছিলাম তাহারা অতর্কিতে এমন করিয়া ফেলিয়া গেল! আর জীবনে দেখা হইবে না!

ধীরে ধীরে মাখনবাবুর কাছে গেলাম।

মাখনবাবু বলিলেন, "অনেকক্ষণ আপনি বেড়ালেন ত

সার। আপনারও ট্রেন এল বলে। সিগন্যাল দিয়েছে। আপনার জন্যে রুটি করিয়ে রেখেছি। খাবেন কি? সময় কিন্তু নেই—"

"থাক দরকার নেই—"

"আচ্ছা—ওয়েট এ মিনিট্—আপনার সঙ্গে খাবার-গুলো বেঁধে দিই না হয়—"

শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু চলিয়া গেলেন। আমি একা নির্জ্জন প্ল্যাটফর্ম্মে সিগ্‌ন্যালটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম···ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না।

শেষ

বনফুলের গল্প

শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিমচাটুজ্জে ষ্ট্রীট.
কলিকাতা—১২

দ্বিতীয় সংস্করণ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২
তৃতীয় সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৫৫
প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২
প্রচ্ছদপট-পরিকল্পনা—
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রাকর—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
মানসী প্রেস,
৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট
ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ ষ্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

দুই টাকা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

আমার গল্প যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের কাছে আমার লেখা সম্বন্ধে ভূমিকা নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা ভালবাসেন না তাঁহাদের কাছে আরও নিষ্প্রয়োজন। যাঁহারা আমার লেখার সহিত পরিচিত নহেন তাঁহারা গল্পগুলি পড়িলেই আমার স্বরূপ জানিতে পারিবেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্যেও আমার বিশেষ কোন নিবেদন নাই।

এই সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে করি। আমার পরম বন্ধু 'শনিবারের চিঠি'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামীর নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাহার উৎসাহ এবং আগ্রহ না থাকিলে হয়ত আমি অধিকাংশ গল্পই লিখিতাম না।

শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহায়তায় আমার গল্পগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল।

ইঁহাদিগকেও আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

"বনফুল"

ভাগলপুর

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বেমানান বলিয়া তিনটি বড় গল্প এই সংগ্রহ হইতে বাদ দিলাম। ইতি—

গ্রন্থকার

ভাগলপুর

১৪.৩.৭৫

সূচীপত্র

বাড়তি মাশুল	১
চোখ গেল	২
অমলা	৩
খেঁদি	৫
পারুল প্রসঙ্গ	৬
আত্ম-পর	৮
একফোঁটা গল্প	৯
সার্থকতা	১০
অজ্ঞাতে	১১
বেচারাম বাবু	১২
সমাধান	১৪
ভৈরবী ও পূরবী	১৬
অদ্বিতীয়া	২০
খেঁকি	২৪
অনির্ব্বচনীয়	২৮
রামায়ণের এক অধ্যায়	৩১
স্কুলের স্মৃতি	৩৩
বিধাতা	৩৫
তর্ক ও স্বপ্ন	৩৮
চলচ্চিত্র—	৪০
বর্ষা-ব্যাকুল	৪৫
পূজার গল্প	৪৮

বল হরি, হরিবোল	৫০
ট্রেণে	৫৫
সনাতনপুরের অধিবাসী বৃন্দ	৫৯
মাত্র দশটি টাকা	৬৬
শেষরক্ষা	৭৩
যুগল স্বপ্ন	৭৭
ভিতর ও বাহির	৭৯
সুলেখার ক্রন্দন	৮৪
বুধ্‌নী	৮৯
মানুষের মন	৯৩

বাড়তি মাশুল

একেই বলে বিড়ম্বনা।

আমি একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার। সেদিন সমস্ত দিন আফিসে কলম পিষে ঊর্দ্ধশ্বাসে হাওড়ায় এসে লোকাল ট্রেণের একখানি থার্ড ক্লাসে বসে হাঁপাচ্ছি—এমন সময় দেখি সামনের প্লাটফর্ম থেকে বোম্বে মেল ছাড়ছে, আর তারই একটি কামরায় এমন একখানি মুখ আমার চোখে পড়ে গেল যাতে আমার সমস্ত বুক আশা আনন্দে দুলে উঠল।

বহুদিন আগে আমার এক ছেলে তারকেশ্বরে মেলা দেখতে গিয়ে ভীড়ে কোথায় হারিয়ে যায়—আর ফেরে নি। অনেক খোঁজ-খবর করেছিলাম, কিছুতেই কিছু হয় নি। ভগবানের ইচ্ছা বলে মনকে প্রবোধ দিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ তারই মুখখানি—হ্যাঁ, ঠিক সেই মুখটিই বোম্বে মেলের একটা কামরায় দেখতে পেলাম।

আর কি থাকতে পারি ?

তাড়াতাড়ি গিয়ে বোম্বে মেলে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মেলও ছেড়ে দিলে। ট্রেণে উঠে আবার ভাল করে দেখলাম—হ্যাঁ, ঠিক সেই—পাশে একটি বৃদ্ধও বসে আছেন।

ভয়ে ভয়ে রুদ্ধ নিশ্বাসে জিজ্ঞাসা করলাম "এতদিন কোথায় ছিলি—আমাকে চিনতে পারিস্ ?"

হা ঈশ্বর—সে উত্তর দিল হিন্দীতে। "হামারা নাম পুঁছতে হেঁ ?

কেঁও? হামারা নাম মহাদেও মিসর, ঘর ছাপরা জিলা।" সমস্ত মনটা ভেঙ্গে গেল—মনে হল যেন আমি দ্বিতীয়বার পুত্রহারা হলাম।

বৃদ্ধটি বললেন—"হামারা লেড়কা হ্যায় বাবুজি, আপ কেয়া মাঙ্‌তে হেঁ।"

রুদ্ধকণ্ঠে বলিলাম—"কিছু না।"

বেহারী ছাপরাবাসী পিতাপুত্রকে বিস্মিত করে দু-ফোঁটা চোখের জলও আমার শুষ্ক শীর্ণ গালের উপর গড়িয়ে পড়ল।

বর্দ্ধমানে নামলাম।

আবার Excess fare—বাড়তি মাশুল দিতে হল।

চোখ গেল

সাধারণের চোখে হয়ত সে সুশ্রী ছিল না।

আমিও তাকে যে খুব সুন্দরী মনে করিতাম তাহা নহে—কিন্তু তাহাকে ভালবাসিতাম। তাহার চোখ দুটিতে যে কি ছিল তাহা জানি না। তেমন স্বপ্নময় সুন্দর চোখ জীবনে কখনও দেখি নাই। দুষ্টু বলিয়াও তাহার অখ্যাতি ছিল।

সেই কুরূপা এবং চঞ্চলা মিনি আমার চিত্ত-হরণ করিয়াছিল। তাহার চোখ দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

মনে আছে তাহাকে একদিন নিভৃতে আদর করিয়া বলিয়াছিলাম, —"ইচ্ছে করে তোমার চোখ দুটো কেড়ে রাখি।"

"কেন?"

"ওই দুটোই ত আমাকে পাগল করেছে। আমি সব চেয়ে ওই দুটোকেই ভালবাসি।"

এত ভালবাসিতাম—কিন্তু তবু তাহাকে পাই নাই।

অজ্ঞাত অপরিচিত আর একজন আসিয়া বাজনা বাজাইয়া সমারোহ করিয়া তাহাকে লইয়া চলিয়া গেল।

প্রাণে বড় বাজিল।

কিন্তু সে বেদনা হয়ত মুছিয়া যাইত যদি সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মর্ম্মান্তিক ঘটনা না ঘটিত।

মিনি যখন বাপের বাড়ী আসিল, দেখি, তাহার ছুটি চক্ষুই অন্ধ। কারণ শোনা গেল যে চোখে গোলাপ জল দিতে গিয়া সে ভুলক্রমে আর একটা ঔষধ দিয়া ফেলিয়াছে।

আমার সঙ্গে আড়ালে একদিন দেখা হইয়াছিল।

বলিলাম—"অসাবধানতার জন্মে অমন ছুটি চোখ গেল।"

সে উত্তর দিল—"কেন যে গেল তা যদি না বুঝতে পেরে ·থাক তাহলে না জানাই ভাল।"

অমলা

অমলাকে আজ দেখতে আস্‌বে। পাত্রের নাম অরুণ। নাম শুনেই অমলার বুকটিতে যেন অরুণ আভা ছড়িয়ে গেল। কল্পনায় সে কত ছবিই না আঁক্‌লে। সুন্দর, সুশ্রী, যুবা—বলিষ্ঠ, মাথায় টেরি, গায়ে পাঞ্জাবী—সুন্দর সুপুরুষ।

অরুণের ভাই বরুণ তাকে দেখতে এল। সে তাকে আড়াল থেকে দেখে ভাব্‌লে—'আমার ঠাকুর-পো।'

মেয়ে দেখা হয়ে গেল। মেয়ে পছন্দ হয়েছে। একথা শুনে অমলার আর আনন্দের সীমা নেই। সে রাত্রে স্বপ্নই দেখলে।

বিয়ে কিন্তু হল না—দরে-বন্‌ল না।

২

আবার কিছুদিন পরে অমলাকে দেখতে এল। এবার পাত্র স্বয়ং। নাম হেমচন্দ্র। এবার অমলা লুকিয়ে আড়াল থেকে দেখলে; বেশ শান্ত সুন্দর চেহারা—ধপ্‌ধপে রঙ্—কোঁকড়া চুল—সোনার চশমা—দিব্যি দেখতে।

আবার অমলার মন ধীরে ধীরে এই নবীন আগন্তুকের দিকে এগিয়ে গেল।

ভাবলে—কত কি ভাবলে।

এবার দরে বন্‌ল—কিন্তু মেয়ে পছন্দ হল না।

৩

অবশেষে মেয়েও পছন্দ হল—দরেও বন্‌ল—বিয়েও হল। পাত্র বিশ্বেশ্বর বাবু। মোটা কালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট ভদ্রলোক—বি, এ পাশ—সদাগরি অপিসে চাকরী করেন।

অমলার সঙ্গে যখন তাঁর শুভদৃষ্টি হল—তখন কি জানি কেমন একটা মায়ায় অমলার সারা বুক ভরে গেল। এই শান্ত শিষ্ট নিরীহ স্বামী পেয়ে অমলা মুগ্ধ হ'ল।

অমলা সুখেই আছে।

খেঁদি

তখন সবে সন্ধ্যা।—মালতী ঘরে এসে প্রদীপটা জ্বালতেই তার স্বামী বলে উঠ্‌ল—"লতি···আমি একটা নাম ঠিক করেছি।"

"কি ?"

"ওই যে তুমি বল্লে—'কি'।"

"তার মানে ?"

"ইংরিজি Key মানে চাবি, আর বাঙলা 'কি'—একটা প্রশ্ন। মেয়ে মানুষের পক্ষে বেশ মানান সই নাম হবে।"

"এখন কোথায় কি তার ঠিক নেই—এখন থেকেই নামকরণ! আর আমার মেয়েই হবে তুমি জান্‌লে কি করে ? ও জ্যোতিষীর কথায় আমার একটুও বিশ্বাস নেই।"

"না—না ঠিক মেয়ে হবে—দেখো তুমি। আমাদের শ্যামবাবু জাগ্রত জ্যোতিষী।"

"ধর যদি মেয়েই হয়—তা বলে ওই নাম রাখতে হবে ? কত সব ভাল নাম আছে—"

"যথা—শরৎশশী, নিভাননী, ইন্দুবালা, প্রভা, প্রতিভা, সুধা, আশালতা—এই সব ত ? সব বাজে—পুরোণো, সেকেলে, এক ঘেয়ে। আমার মেয়ের নাম হবে একেবারে নতুন।"

* * * *
* * * *

মালতীর প্রসব হবার দুমাস পূর্ব্বে তার স্বামী কলেরায় মারা গেল। প্রসব হতে গিয়ে মালতীও মারা গেল। জ্যোতিষীর কথা ফলেছিল—মালতীর মেয়েই হয়েছিল। সে এখন তার মামার বাড়ী সোণারপুরে মানুষ হচ্ছে। তাঁরা তার নাম রেখেছেন "খেঁদি।"

"ও কি তোমাদের মত উপায় ক'রে খাবে নাকি?

"উপায় ক'রে না থাক—তা'ব'লে মাছ দুধ চুরি ক'রে খাওয়াটা—"

"আমার ভাগের মাছ দুধ আমি ওকে খাওয়াব।"

"সে ত খাওয়াচ্ছই—তা'ছাড়াও সে চুরি করে। এ রকম রোজ রোজ—"

"বাড়িয়ে বলা কেমন তোমার স্বভাব। রোজ রোজ খায়?"

"যাই হোক্—আমি বেরালকে মাছ দুধ গেলাতে পারব না। পয়সা আমার এত সস্তা নয়।"

এই বলিয়া ক্রুদ্ধ বিনোদ সমীপবর্ত্তিনী মেনি মার্জ্জারীকে লক্ষ্য করিয়া চটিজুতা ছুঁড়িল। মেনি একটি ক্ষুদ্র লম্ফ দিয়া মারটা এড়াইয়া বাহিরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী পারুলবালাও চক্ষে আঁচল দিয়া উঠিয়া গেলেন। বিনোদ খানিকক্ষণ গুম্ হইয়া রহিল। কতক্ষণ আর থাকা যায়? অবশেষে তাহাকেও উঠিতে হইল। সে আসিয়া দেখে পশ্চিম বারান্দায় মাদুর পাতিয়া অভিমানে পারুলবালা ভূমি-শয্যা লইয়াছেন।

বিনোদ জিনিসটা লঘু করিয়া দিবার প্রয়াসে একটু হাসিয়া বলিল—"কি কর্‌ছ ছেলেমানুষি! আমি কি সত্যি সত্যি তোমার বেরাল তাড়িয়ে দিচ্ছি!"

পারুল নিরুত্তর।

বিনোদ আবার কহিল—"চল চল—তোমার বেরালকে মাছ দুধই খাওয়ান যাক্।"

পারুল—"হ্যাঁ, সে তোমার মাছ দুধ খাওয়ার জন্যে ব'সে আছে

কি না ? তাড়াবেই যদি, এই অন্ধকার রাত্রে না তাড়ালে চলছিল না ?"

"আচ্ছা আমি খুঁজে আনছি তাকে—কোথায় আর যাবে ?"

বিনোদ লণ্ঠন হাতে বাহির হইয়া গেল। এদিক ওদিক রাস্তা ঘাট জামগাছতলা প্রভৃতি চারিদিক খুঁজিল, কিন্তু মেনির দেখা পাইল না। নিরাশ হইয়া অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া দেখিল—পারুল ঠিক তেমনি ভাবেই শুইয়া আছে।

"কই দেখতে পেলাম না ত বাইরে। সে আসবে ঠিক। চল, ভাত খাইগে চল।"

"চল, তোমাকে ভাত দিই, আমার আজ ক্ষিদে নেই।"

"Hunger strike—করবে না কি !"

পারুল আসিয়া রান্নাঘরে যাহা দেখিল—তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :—কড়ায় একটুও দুধ নাই—ভাজামাছগুলি অন্তর্হিত—ডালের বাটিটা উল্টান।

এই বিসদৃশ ব্যাপার দেখিয়া পারুল ত অপ্রস্তুত।

বিনোদ এ-সম্বন্ধে আর আলোচনা করা নিরাপদ নয় ভাবিয়া যাহা পাইল খাইতে বসিয়া গেল।

পারুলবালাও খাইলেন।

উভয়ে শুইতে গিয়া দেখে মেনি কুণ্ডলী পাকাইয়া আরাম করিয়া তাহাদের বিছানায় ঘুমাইতেছে।

আত্ম-পর

সারা সকালটা খেটেখুটে দুপুর বেলায় দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা বিছানা পেতে একটু শুয়েছি। তন্দ্রাটি যেই এসেছে—অমনি মুখের উপর থপ্ করে' কি একটা পড়ল। তাড়াতাড়ি উঠে দেখি একটা কদাকার কুৎসিত পাখীর ছানা। লোম নেই—ডানা নেই—কিম্ভুতকিমাকার। রাগে ও ঘৃণায় সেটাকে উঠোনে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। কাছেই একটা বেড়াল যেন অপেক্ষা করছিল—টপ্ করে মুখে করে নিয়ে গেল। শালিক পাখীদের আর্ত্তরব শোনা যেতে লাগল।

আমি এপাশ ওপাশ করে আবার ঘুমিয়ে পড়্লাম।

তারপর চার পাঁচ বছর কেটে গেছে।

আমাদের বাড়ীতে হঠাৎ একদিন আমারই বড় আদরের একমাত্র ছেলে শচীন হঠাৎ সর্পাঘাতে মারা গেল। ডাক্তার—কবরেজ—ওঝা—বদ্যি কেউ তাকে বাঁচাতে পারলে না। শচীন জন্মের মত আমাদের ছেড়ে চলে গেল।

বাড়ীতে কান্নার তুমুল হাহাকার।

ভিতরে আমার স্ত্রী মূর্চ্ছিত অজ্ঞান। তাঁকে নিয়ে বাড়ির কয়েক-জন শশব্যস্ত হয়ে উঠেছে। বাইরে এসে দেখি দড়ির খাটিয়ার ওপর শুইয়ে বাছাকে নিয়ে যাবার আয়োজন হচ্ছে।

তখন বহুদিন পরে—কেন জানিনা—সেই পাখীর ছানাটার কথা মনে পড়ে গেল।

সেই চার পাঁচ বছর আগে নিস্তব্ধ দুপুরে বেড়ালের মুখে সেই অসহায় পাখীর ছানাটি, আর তার চারিদিকে পক্ষীমাতাদের আর্ত্ত-হাহাকার।

হঠাৎ একটা অজানা ইঙ্গিতে শিউরে উঠলাম।

একফোঁটা গল্প

রামগঞ্জের জমিদার শ্যামবাবু যে খেয়ালী লোক তা জানতাম। কিন্তু তাঁর খেয়াল যে এতদূর খাপছাড়া হতে পারে তা ভাবিনি। সেদিন সকালে উঠেই এক নিমন্ত্রণ পত্র পেলাম। শ্যামবাবু তাঁর মাতৃশ্রাদ্ধে সবান্ধবে নিমন্ত্রণ করেছেন। চিঠি পেয়ে আমার মনে কেমন যেন একটু খটকা লাগল। ভাবলাম—শ্যামবাবুর মায়ের অসুখ হল অথচ আমি একটা খবর পেলাম না। আমি হলাম এদিককার একমাত্র ডাক্তার।

যাই হোক নিমন্ত্রণ যখন করেছেন তখন যেতেই হবে। গেলাম, গিয়ে দেখি শ্যামবাবু গলায় কাচা নিয়ে সবাইকে অভ্যর্থনা করছেন। তাঁর মুখে একটা গভীর শোকের ছায়া। আমাকে দেখেই বল্লেন, "আসুন ডাক্তারবাবু—আসতে আজ্ঞা হোক্।

দু'চার কথার পর জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার মায়ের হয়েছিল কি?"

শ্যামবাবু একটু বিস্মিত হয়ে উত্তর দিলেন—"ও, আপনি শোনেন নি বুঝি! আমার মা ত আমার ছেলেবেলাতেই মারা গেছেন—তাঁকে আমার মনেও নেই—ইনি আমার আর এক মা—সত্যিকারের মা ছিলেন।"

ভদ্রলোকের গলা কাঁপতে লাগল।

আমি বললাম—"কি রকম? কে তিনি?"

তিনি বলিলেন—"আমার মঙ্গলা গাই—আমার মা কবে ছেলেবেলায় মরে গেছেন মনে নেই—সেই থেকে গাইটিই তো দুধ খাইয়ে আমাকে এত বড় করেছে। ওরি দুধে আমার দেহ মন পুষ্ট। আমার সেই মা আমায় এতদিন পরে ছেড়ে গেলেন ডাক্তারবাবু।"

এই বলে তিনি হু হু করে কেঁদে ফেল্লেন।

আমার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।

সার্থকতা

আমার অতীত জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি—আর আমার দুঃখ হয়। সে যেন একটা সুখ-স্বপ্ন ছিল! সেই আমার অতীত জীবনের স্মৃতি···আজ সত্য সত্যই স্মৃতি মাত্র। মাঝে মাঝে মনে হয় আমার সে জীবন গেল কোথায়? সেই শোভন, সুন্দর, মোহন জীবন।

···একদিন আমার রূপ ছিল—সৌরভ ছিল—মধু ছিল। আমার সেই সুষমার দিনে কত মধুলুব্ধ ভ্রমরই না আমার কানে কানে বন্দনার স্তুতিগান তুলিয়াছে···তাহারা আজ কোথায়?

···এই আকাশ বাতাস আলো একদিন কতই না ভালো লাগিয়াছে! একদিন ইহাদের লইয়া সত্যই আমি পাগল হইয়া থাকিতাম···আজ কোথায় গেল আমার সেই পাগলামি···সেই সহজ উন্মাদনা—ছন্দময়ী ভাললাগার নেশা! আজ কই তারা সব?

...আজ আমি পরিপক্ক—অভিজ্ঞ। আমার সেই অতীতের তরল অনুভূতি জমিয়া যেন কঠিন হইয়া গিয়াছে।

আমার আজ কেবলই মনে হইতেছে···আমার অতীত আর ফিরবে না জানি—কিন্তু ভবিষ্যৎ? সে কেমন কি জানি! আমার আনন্দময় অতীতকে হারাইয়া আজ এই যে, পরিপক্ক অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছি—ইহার পরিণতি কি?—ইহার সার্থকতা কোথায়?

* * * *

গাছের একটি পাকা ফল এই সব ভাবিতেছিল। হঠাৎ বাতাসের দোলায় মাটিতে পড়িয়া গেল।···একটি পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া ফলটি লইয়া একটি ডালে বসিল এবং পরম আনন্দে ঠোকরাইয়া খাইতে লাগিল।

অজান্তে

সেদিন আপিসে মাইনে পেয়েছি।

বাড়ী ফেরবার পথে ভাবলাম 'ওর' জন্যে একটা 'বডিস্' কিনে নিয়ে যাই। বেচারী অনেক দিন থেকেই বলছে।

এ-দোকান সে-দোকান খুঁজে জামা কিনতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে গেল। জামাটি কিনে বেরিয়ে—বৃষ্টিও আরম্ভ হল। কি করি—দাঁড়াতে হল। বৃষ্টিটা একটু ধরতে—জামাটি বগলে করে'—ছাতাটি মাথায় দিয়ে যাচ্ছি। বড় রাস্তাটুকু বেশ এলাম—তার পরই গলি, তা-ও অন্ধকার।

গলিতে ঢুকে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে ভাবতে যাচ্ছি—অনেকদিন পরে আজ নতুন জামা পেয়ে তার মনে কি আনন্দই না হবে! আজ আমি—

এমন সময় হঠাৎ একটা লোক ঘাড়ে এসে পড়ল। সেও পড়ে গেল, আমিও পড়ে গেলাম—জামাটা কাদায় মাখামাখি হয়ে গেল।

আমি উঠে দেখি—লোকটা তখনও ওঠেনি—ওঠ্‌বার উপক্রম করছে। রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল—মারলাম এক লাথি।

"রাস্তা দেখে চলতে পার না শুয়ার!"

মারের চোটে সে আবার পড়ে গেল – কিন্তু কোন জবাব করলে না! তাতে আমার আরও রাগ হল—আরও মারতে লাগলাম।

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ীর এক দুয়ার খুলে গেল। লণ্ঠন হাতে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি মশাই?

"দেখুন দিকি মশাই—রাস্কেলটা আমার এত টাকার জামাটা মাটি

করে দিলে। কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে একেবারে। পথ চলতে জানেনা—ঘাড়ে এসে পড়ল—"

"কে—ও ? ওঃ—থাক্ মশাই, মাপ করুন ওকে, আর মারবেন না। ও বেচারা অন্ধ বোবা ভিখারী—এই গলিতেই থাকে—"

তার দিকে চেয়ে দেখি—মারের চোটে সে বেচারা কাঁপচে—গা'ময় কাদা। আর আমার দিকে কাতরমুখে অন্ধদৃষ্টি তুলে হাত দুটি জোড় করে আছে।

বেচারাম বাবু

হরিশ মুদী সন্ধ্যাবেলা হিসাব বুঝাইয়া গেল যে গত মাসের পাওনা ২৭।।/৫ হইয়াছে এবং তাহা অবিলম্বে মিটাইয়া দেওয়া দরকার। সদ্য অফিস-প্রত্যাগত বেচারামবাবু বলিলেন—"আচ্ছা মাইনেটা পেলেই—!" অতঃপর কাপড়-চোপড় ছাড়িয়া বেচারাম বাহিরের রোয়াকটিতে বসিয়া হাঁক দিলেন—"ওরে চা আন্—" চা আসিল। চা আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পাড়ার হরিবাবু, নবীন রায়, বিধু ক্লার্ক প্রভৃতি চার পাঁচজন ভদ্রলোকও সমাগত হইলেন এবং সমবেতভাবে গল্প-গুজব সহযোগে চা-পান চলিতে লাগিল।

গল্প চলিতেছে। এমন সময় বেচারামবাবুর ছোট মেয়ে পুটি আসিয়া উপস্থিত—"বাবা, দুখানা চিঠি এসেছে আজ ডাকে। আনব ?"

পুঁটির ছোট বোন টুনিও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে কহিল--"আমি আনব বাবা!" বেচারামবাবু মীমাংসা করিয়া দিলেন, "আচ্ছা দু'জনে দুটো আনো।"

শ্রীযুক্ত বেচারাম বক্সির পাঁচ কন্যা এবং দুই পুত্র।

পুঁটি ও টুনি দুজনে দু'খানি পত্র বহন করিয়া আনিল। প্রথম পত্রখানি বেচারামবাবুর প্রবাসী পুত্র বহরমপুর হইতে লিখেতেছে—তাহার কলেজ ফি, হষ্টেল চার্জ প্রভৃতি লইয়া এ মাসে ৫৫্ চাই। দ্বিতীয় পত্রটি তাঁহার কন্যা শ্বশুরবাড়ী হইতে লিখিয়াছে যে গত বৎসর ভাল করিয়া পূজার তত্ত্ব করা হয় নাই বলিয়া তাহাকে অনেক খোঁটা সহ্য করিতে হইয়াছিল। এবার যেন পূজার তত্ত্বে কার্পণ্য করা না হয়, তাহা হইলে তাহার পক্ষে শ্বশুরবাড়ীতে তিষ্ঠান দায় হইবে।

বেচারামবাবু চিন্তিত মুখে পত্র দুটি পকেটস্থ করিলেন ;

...আবার গল্প চলিল। নবীন রায় একট পান মুখে পুরিয়া কহিলেন—"তোমার মেজ মেয়ের বিয়ের কচ্ছ কি ? বিয়ে না দিলে আর ভাল দেখাচ্ছে না।"

বেচারাম কহিলেন—"পাত্র একটি দেখ না।"

নবীন তদুত্তরে বলিলেন—"পাত্র একটি আছে। খাঁইও খুব বেশী নয়। ৫০১্ নগদ—তেত্রিশ ভরি সোণা আর বরাভরণ। এমন কিছু বেশী নয় আজকালকার দিনে।"

থামিয়া বেচারাম উত্তর দিলেন—তা বটে।

ক্রমে সভাভঙ্গ হইল। বেচারামবাবু অন্দরে গেলেন। ভিতরে গিয়া আহারে বসিতেই গৃহিণী হরিমতি কাছে বসিয়া বসিলেন এবং নানা কথার পর বলিলেন—

"বিনোদের মুখে মাসীমা খবর পাঠিয়েছেন যে, তিনি আসবেন। কিছু আলোচাল আর একসের দুধের কথা বলে দিও তাহলে কাল থেকে। তিনি আফিং খান জান তো ?"

শুইতে গিয়া দেখিলেন ছেলেমেয়েরা ঘুম ভাঙিয়া কাঁদিতেছে। বলিলেন—"কি হল ওদের ?"

স্ত্রী বলিলেন—"হবে না ? শীত পড়ে গেছে—কারো গায়ে একটা জামা নেই। লেপটাও ছিঁড়ে গেছে। সেই পাঁচ বছর আগে করান হয়েছিল, ছিঁড়বে না আর! তোমাকে ত বলে বলে হার মেনেছি। কি আর করব বল।"

বেচারাম এবার আর কিছুই বলিলেন না। শুধু টেবিলের উপর আলোটার দিকে চাহিয়া রহিলেন। মোমবাতিটা পুড়িয়া পুড়িয়া প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিতেছে।

সমাধান

আকাশ নীল, বাতাস স্নিগ্ধ, ফুল সুন্দর এবং আমার নাম নীহাররঞ্জন হওয়া সত্ত্বেও আমার বিবাহ হইল পাকুড়াগ্রাম বাসিনী ক্ষান্তমণি নাম্নী এক পল্লীবালার সহিত এবং বৎসরান্তে তিনি একটি কন্যারত্ন প্রসব করিয়া তাহার নাম রাখিয়া দিলেন—বুঁচি! নামকরণটিতে একটু আপত্তি করিয়াছিলাম। তাহাতে বাড়ীর এবং পাড়ার সকলে সত্য কথাই বলিল—"এই কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে—তার নাম পুষ্পমঞ্জুরি দিবি নাকি ? তোর যত সব অনাছিষ্টি—"

মেয়েটা কুৎসিতই ছিল। রঙ্ ত কালোই—একটা চোখ ছোট, আর একটা বড়—তাছাড়া কি রকম বোকাহাবা ধরণের—মুখে সর্ব্বদাই লালা ঝরে। পুষ্পমঞ্জুরি নাম দেওয়া চলে না তা ঠিক!

বছর দুই পরে।

ক্ষান্তমনি বুঁচিকে লইয়া বাপের বাড়ী গিয়াছেন। সেদিন রবিবার

কাহারো কাজকর্ম্ম নাই—চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া নানা আলোচনা চলিতেছে। হঠাৎ আমার কথাই উঠিয়া পড়িল!

নৃপেন বলিল—"এই দেখ না নীহারের অদেষ্ট। হল বা যদি একটা মেয়ে—তাও আবার এমন কদাকার—"

শ্যাম বোস বলিলেন—"তা আবার বলতে! বিয়ে দেবার সময় নাকের জলে চোখের জলে হতে হবে আর কি। টাকা চাই প্রচুর!"

হারু খুড়ো তামাকটাতে দু'টান দিয়া কহিলেন—আরে ভাই, আজকাল আবার শুধু টাকা হলেই হয় না। লোকে টাকাও চায়—রূপও চায় যে। চোখ দুটো ছোট বড় হয়েই আরও মুস্কিল কিনা—কি যে হবে—"

সকলেরই ঘোরতর দুশ্চিন্তা।

এমন সময় পিওন আসিয়া আমাকে একখানা চিঠি দিয়া গেল।

নৃপেন বলিল—"কার চিঠি হে?"

আমি চিঠিটা পড়া শেষ করিয়া বলিলাম—"বউ লিখেছে। বুঁচি মারা গেছে কাল।"

ভৈরবী ও পূরবী

কাননে একটি ফুল ফুটিল—যেন বন-লক্ষ্মীর রচিত একটি কবিতা। গন্ধে বর্ণে ছন্দে অপরূপ। ফুল চাহিয়া দেখিল তার চারিদিকে আনন্দের উৎস লাগিয়াছে। আকাশে বাতাসে আলোতে যেন কিসের আকুলতা। বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখে পলক পড়ে না।

আকাশের নীলে ভরিল নয়ন
আলোর সোহাগে আকুল তনু,
রূপসী ঊষার সোনার পরশে
হরষে ভরিল প্রতিটি অণু।

কে যেন কহিছে "বন-লক্ষ্মীর
স্বপ্ন যে তুমি ধরেছ কায়া
তাই বন-ভরি বাজে আশাবরী
আলোতে লেগেছে রঙীন মায়া।"

গুঞ্জন তুলিয়া কে যেন তাহার কানে কানে কহিল—

অঙ্গ ভরিয়া এনেছ বর্ণ
এঁকেছ নয়নে মোহন ছবি—
আঁখি তুলে চাও আজি এ প্রভাতে
এসেছি যে আমি তোমারি কবি।

চকিত হইয়া ফুল কহিল—"কে তুমি?"

"আমি ভ্রমর"

"কি চাও?"

ভ্রমর কহিল—

কি যে চাই সখি জানিনা ত তাই
তবে মনে হয় আজিকে প্রাতে
এতটুকু মধু দিতে যদি তুমি
তোমার রঙীন সোহাগ সাথে।
মুখ তুলে' সখি আঁখি মেলে চাও
বিফল কোরো না এমন আলো,
গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

এই শুনিয়া ফুলের হঠাৎ কেমন লজ্জা হইল—সে মাথা নত করিল। বৃন্তের উপর সে তার সরম শঙ্কিত দেহকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চায়। অলি ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিতে লাগিল।

গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা
ব্যর্থ করো না এমন আলো।
গুণ্ঠন খোলো গুণ্ঠন খোলো
তোমারেই আমি বেসেছি ভালো।

ফুল কিন্তু কিছুতেই গুণ্ঠন খুলিতে পারিল না। অপরিসীম লজ্জায় যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ আড়ষ্ট অবশ হইয়া আসিল। তাহার হৃদয়ের দ্বারে কে যেন মিনতি করিয়া বলিতে লাগিল—"না, না, না—না—না—"

অবশেষে ভ্রমর কহিল—তবে যাই।

এমন আলো এমন বাতাস হয়ত আবার উঠ্‌বে না,
যদিই ওঠে হয়ত তখন বন্ধু এমন জুটবে না।

এই যে প্রাতে ওই রবিতে

গান ধরেছে ভৈরবীতে

হয়ত তাতে আর কোন দিন এই মাধুরী ফুটবে না।

ভ্রমরের গুঞ্জন দূর হইতে সুদূরে মিলাইয়া গেল।

* * * *

ভ্রমর যখন চলিয়া গেল তখন, কি আশ্চর্য্য, ফুলটির যেন ঘুম ভাঙিল। তাহার মর্ম্মের মাঝখানে যেন গুঞ্জন গানে বাজিতে লাগিল—

গুণ্ঠন খোলো একবার ওগো

তোমারেই আমি বেসেছি ভালো

তাহার রঙীন পাপড়ি ভরিয়া গন্ধ জাগিয়া উঠিল। নিশ্বাস ফেলিয়া সে প্রার্থনা জানাইতে চায়—"আহা সে যদি আর একবার আসে!"—কিন্তু সে আসিল না। কুসুমের প্রাণের কামনায় প্রভাত-সমীরণ মদির হইয়া গেল। প্রভাত বহিয়া গেল, দ্বিপ্রহরও উত্তীর্ণ হইল, সন্ধ্যা হয়-হয়—কিন্তু কোথা সে, যার ধ্যানে

অঙ্গ ভরি অবিরাম উঠিছে উচ্ছ্বসি'

ছন্দ-ভরা ঘন গন্ধ ভার

যার গানে মুখরিত গগন পবন

মুখরিত আলো-অন্ধকার!

কই সে? সে ত আর আসিল না। সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিল।

ছোট ফুলটির আঁধারে আলো জ্বালাইয়া জোনাকী আসিল।

ম্লান কণ্ঠে ফুল তাহাকে শুধায়—"কে ভাই তুমি?"

"আমি জোনাকী।"

আগ্রহ ভরে ফুল জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি তাকে চেন কি ?"

"কা'কে ?"

"যে আমায় আজ সকালে গানে গানে বলেছিল "—গুণ্ঠন খোলো। তার আশায় আজ সারাদিন বসে আছি। সে ত আর এল না। তুমি তা'কে চেন কি ?"

জোনাকী বলে—"মনে ত হয় না।"

মিনতি করিয়া ফুল তাহাকে কহিল—"তার সঙ্গে যদি দেখা হয় বোলো সে যেন আর একবার আসে।"

"দেখা পাই ত বলব"—এই বলিয়া জোনাকী উড়িয়া গেল। সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে কাঁপিয়া ফুলটির সর্ব্বাঙ্গ যেন গান গাহিতে লাগিল !

সন্ধ্যার অন্ধকার নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইয়া গেল।

*   *   *   *

* *   * *   * *   * *

তারপর দিন সন্ধ্যায় জোনাকী আসিয়া কহিল—"খুঁজে পেলাম না তা'কে।"

ফুল কহিল—"কা'কে ?"

"তুমি কাল যার কথা বলেছিলে ?"

"আমি ত কাল ছিলাম না—আজ ফুটেছি।"

"কালকের ফুল কোথা ?"

"সে ঝ'রে' গেছে। তারই পাশের বোঁটায় আমি ফুটেছি আজ"

জোনাকী চুপ করিয়া রহিল।

তখন নূতন ফুলটি বলিল—"আচ্ছা, তুমি একজনকে চেন কি ?"

"কা'কে ?"

যে আজ সকালে কেবল গুঞ্জন-গানে আমাকে ব'লে গেল,

"গুণ্ঠন খোলো ওগো কাননিকা,

ব্যর্থ কোরো না এমন আলো"

তার আশায় আজ সারাদিন বসে আছি আমি। যদি তার দেখা পাও আসতে বোলো আর একবার। বলবে ?"

"দেখা পাই ত বলব"—মৃদু হাসিয়া জোনাকী উড়িয়া গেল—আঁধারের বুকে ছোট্ট একটি আলেয়া!

আদ্রতায়া

বেশ ছিলাম।

আপিসে সাহেব এবং গৃহে মা-ষষ্ঠী আমার প্রতি সদয় ছিলেন। সাহেব আমার মাহিনা এবং মা-ষষ্ঠী আমার সংসার বাড়াইতেছিলেন। আমার পিতৃমাতৃকুলে আর কেহ ছিল না। উত্তরাধিকার সূত্রে কিছু টাকাও জুটিয়া গিয়াছিল। খাসা ছিলাম।

প্রভাবতী অর্থাৎ আমার গৃহিণী গড়ে বছরে দেড়টি করিয়া সন্তান প্রসব করিয়া চারি বৎসরেই আমাকে ছয়টি পুত্রকন্যার মালিক করিয়া তুলিয়াছিলেন—মাঝে দুইবার যমজ হয়।

এবম্বিধ প্রজাবৃদ্ধিসত্ত্বেও কোন অভাব ছিল না। হঠাৎ কিন্তু বেকুব বনিয়া গেলাম।

পঞ্চম বর্ষেও গৃহিণী তাঁহার স্বাভাবিক গর্ভভার বহন করিতেছিলেন। এবার কিন্তু ব্যাপারটা স্বাভাবিক হইলেও সহজ ছিল না বোঝা গেল। কারণ তিনি মারাই গেলেন। তিনি তাঁহার পিত্রালয় শান্তিপুরে ছিলেন। যদিও আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী উভয়েই অনেক-

কাল স্বর্গীয় হইয়াছেন, কিন্তু আমার শ্যালক বিনোদ ডাক্তার বলিয়া প্রভা প্রতিবারই সেখানে যাইত। বিনোদ লিখিতেছে—

"হঠাৎ 'এক্লেম্প্‌সিয়া' হইয়া দিদি তিন চার ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেলেন। আপনাকে খবর দেওয়ার সময় ছিল না। 'কিডনি' খারাপ ছিল। সেজদি ছেলেদের লইয়া সম্বলপুরে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার চিঠি বোধ হয় পাইয়াছেন।"

পাইলামও। তিনি লিখিতেছেন—"কি করিবে বল ভাই। সবই অদৃষ্ট। তোমার ছেলেমেয়েরা এখন আমার কাছে কিছুদিন থাকুক। আমি ত বাঁজা মানুষ। আমার কোন অসুবিধা হইবে না। ছেলেরা ভালই আছে। কোন ভাবনা করিও না। ইতি···"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ছুটির দরখাস্ত করিলাম। কপালগুণে, আমার সাহেবও বদলি হইয়া গিয়াছিলেন। ছুটি সুতরাং মঞ্জুর হইল না।

২

দুই মাস পরে।

সম্বলপুরবাসিনী শ্যালিকার আর একখানি পত্র পাইলাম। তিনি অন্যান্য নানা কথার পর লিখিতেছেন—

"প্রভা সতীলক্ষ্মী ভাগ্যবতী ছিল। সে গেছে, বেশ গেছে। জাজ্বল্যমান সংসারে স্বামী ছেলেপুলে সব রেখে গেছে। কিন্তু তোমার তা বলে সংসারটা ছারখার করা ত ভাল দেখায় না। উচিতও নয়। আমার কথা শোনো। আবার বিয়ে কর তুমি।···এখানে একটি বেশ ডাগর-ডোগর মেয়ে আছে। যদি তোমার ইচ্ছে হয়—বলো, সম্বন্ধ করি। আমার ত মেয়েটিকে বেশ পছন্দ। তোমার নিশ্চয়ই পছন্দ হবে।"—ইত্যাকার নানারূপ কথা।

সাত দিন ভাবিয়া—অর্থাৎ এক টিন চা ও পাঁচ টিন সিগারেট নিঃশেষ করিয়া আমি এই চিরন্তন সমস্যার যে মীমাংসা করিলাম তাহা মোটেই অসাধারণ নয়। সেজদিকে যে পত্র দিলাম তাহা অংশতঃ এইরূপ—

"বিয়ে করতে আর ইচ্ছে হয় না। প্রভার কথা সর্ব্বদাই মনে পড়ে। কিন্তু দেখ সেজদি, আমার ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে ত সংসার বসে নেই। সে আপনার চালে ঠিক চলছে ও চলবে। সুতরাং ভাবপ্রবণ হওয়াটা শোভন হলেও সুযুক্তির নয়—এটা ঠিকই। তা ছাড়া দেখ, আমরা "মা ফলেষু কদাচন" দেশের লোক। আর তোমরাও যখন বলছ—তখন আর একবার সংসারটা বজায় চেষ্টা করাই উচিত বোধ হয়।···দ্বিতীয় পক্ষের বিয়েতে আবার পছন্দ! তোমার হয়েছে ত?···"

ক্রমশঃ বিবাহের দিন স্থির হইল। সম্বলপুরেই বিবাহ। সেজদি বুদ্ধিমতী। লিখিয়াছেন—"ছেলেদের লাহোরে বড়দির কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বাপের বিয়ে দেখতে নেই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম।

যথাকালে সাহেবের হাতে-পায়ে ধরিয়া হপ্তাখানেকের ছুটি লইয়া সোজা রওনা হইয়া পড়িলাম। একাই। এ বিয়ের কথা কাউকে বলিতে আছে? কি ভাবিয়া গোঁফটা কামাইয়া ফেলিলাম। একে এই কালো মোটা চেহারা—তাহার উপর কাঁচাপাকা একঝুড়ি গোঁফ লইয়া বিবাহ করিতে যাইতে নিজেরই কেমন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

বিবাহ-বাসর।

ওই অবগুণ্ঠিতা চেলি-পরা মেয়েটিই আবার আমার সঙ্গিনী হইতে চলিয়াছে। প্রভাকেও একদিন এই ভাবেই পাইয়াছিলাম—সে

কোথায় চলিয়া গেল। আজ আবার আর একজন আসিয়াছে। ইহার "কিডনি' কেমন—কে জানে। নানারূপ এলোমেলো কথা মনে আসিতে লাগিল। প্রভার মুখ বারবার মনে পড়ে। ছেলেগুলো না জানি এখন কি করিতেছে ?···মৃত্যুর পরও কি আত্মা সত্যি থাকে ?··· এ মেয়েটি বেশ বড়সড় দেখিতেছি—কিন্তু ভারি জড়সড় হইয়া বসিয়া আছে—একেবারে মাথা নীচু করিয়া। আচ্ছা প্রভার আত্মার যদি······গৃহ্যামি·····...গৃহ্যামি······

যন্ত্রচালিতবৎ বিবাহ-অনুষ্ঠান চলিতে লাগিল। শুভদৃষ্টির সময় মেয়েটি কিছুতেই ঘোমটা খুলিল না। সেজদি বলিলেন—ভারি লাজুক। বাসর-ঘরেও শুনিলাম, ভারি লাজুক। আপাদমস্তক মুড়িয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। আমিও ঘুমাইলাম। সেজদি লোক জমিতে দেন নাই। তা ছাড়া দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহে কে আর আমোদ করিতে চায় ? মেয়েটির আপন বলিতে কেহ ছিল না। পরের বাড়ীতে মানুষ। সেজদির বাড়ীতেই বিবাহ—বলিতে গেলে সেজদিই কন্যাকর্ত্তা। সুতরাং বিবাহ-উৎসব জমে নাই।

* * * *

জমিল ফুলশয্যার রাত্রে!

বক্ষে অনেক আশা ও আশঙ্কা লইয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখি আমার ছয়টি সন্তান ও আরও একটি নবজাত শিশু লইয়া স্বয়ং প্রভা খাটে বসিয়া! স্বপ্ন দেখিতেছি না কি ?

প্রভা কহিল—"ছি, ছি, সেজদিরই জিৎ হল!"

"মানে ?"

"মানে আবার কি ? এবার ছেলে হওয়ার সময় ভারি কষ্ট হয়েছিল। অপরাধের মধ্যে সেজদিকে বলেছিলাম যে আমি মলে

ওঁর ভারি কষ্ট হবে। সেজদি বললে—হাতী হবে। তিনমাস যেতে না যেতে ফের বিয়ে করবে। আমি বললাম—কক্‌খনো নয়। তারপর বাজি রেখে সেজদি আর বিনোদ মিলে এই ষড়যন্ত্র। আমি শান্তি-পুরেই ছিলাম। আজ এই সন্ধ্যেবেলা এসেছি। এসে দেখি সেজদিরই জিৎ। পাড়ার মাণ্‌কে ছোঁড়াকে কনে' সাজিয়ে সেজদি বাজী জিতেছে। একশটি টাকা দাও এখন! ছি ছি—কি তোমরা! অমনি গোঁফটা কি বলে কামালে?"

আমার অবস্থা অবর্ণনীয়!

পরদিন প্রভাতে সেজদির পাওনা চুকাইয়া দিয়াছি। এখন গোঁফটা উঠিলে যে বাঁচি!

খেঁকি

১

যদিও বাঙালী নহি—কিন্তু তবুও আমার জীবনকাহিনী করুণ। যদিও আমি সামান্য কুকুর মাত্র, তথাপি হে বাঙালী ভাই, খোঁজ করিলে তোমারই মত আমার শোণিতেও আভিজাত্যের আমেজ পাওয়া যাইবে। শুনিয়াছি আমার অতি বৃদ্ধ পিতামহীর কোনো প্রণয়ী বুলডগ-বংশাবতংস ছিলেন এবং সেই বুলডগ শোণিতধারার কিয়দংশও আমার ধমনীতে এখনও প্রবাহিত হইতেছে ভাবিয়া আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করি। লোকে কিন্তু আমাকে বলে খেঁকি কুকুর। সত্য বটে আমার গায়ে লোম নাই—সর্ব্বাঙ্গে ঘা—চোখে ভাল দেখিতে পাই না—স্টেশনের ধারে পরিত্যক্ত পাতা ও ঠোঙা লইয়া অন্যান্য কুকুরদের সহিত মারামারি করিয়া আমার দিনপাত হয়—সবই সত্য; কিন্তু

তথাপি আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না, আমার পূর্ব্বপুরুষ বুলডগ ছিলেন। ইহাই আমার সান্ত্বনা—ইহারই প্রভাবে আমার মনে হয় আমার এ দুর্দ্দিন থাকিবে না। ভগবান একদিন মুখ তুলিয়া চাহিবেন।

২

সেদিন সকালে স্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিয়াছে। আমি ঠোঙা চাটিবার প্রত্যাশায় গাড়ীর প্রতি বাতায়ন-পথে লুব্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছি। এমন সময় পিছন হইতে কে আমার গলায় একটা দড়ির ফাঁস লাগাইয়া আমাকে বাঁধিয়া ফেলিল। চাহিয়া দেখি স্টেশনের পরিচিত কুলী—মিঠ্ঠু! মিঠ্ঠুর হাতে অনেকবার মারও খাইয়াছি, ভাতও খাইয়াছি। স্টেশনের ধারে তার বাড়ী—সে আমাকে মারধোর করিলেও—ডাকিয়া প্রায়ই ভাত-রুটি দিত। হঠাৎ সেই মিঠ্ঠু আমাকে একেবারে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া চলিল কেন—কিছুই বুঝিলাম না। এতদিনে কি তাহার হুঁস হইয়াছে যে আমার মতন এমন একটা বুলডগ-বংশধরের পক্ষে এরূপ ভিক্ষুকের মত ঘুরিয়া বেড়ানটা অশোভন? তাই কি সে চায় যে আমাকে অভিজাতবংশীয় কুকুরদের মত বাঁধিয়া খাওয়াইবে? জানি না কি তাহার মনোভাব। টানিতে টানিতে সে কিন্তু সোজা আমাকে স্টেশন-মাষ্টারের কামরায় লইয়া গেল।

৩

স্টেশন-মাষ্টার বৃদ্ধ। আমার দিকে একবার তাকাইয়া বলিলেন, "আরে এ কোথেকে একটা খেঁকি কুত্তো নিয়ে এলি?"

—"ওইতেই হবে—A dog ত বটে—ওর বেশী ত আর কিছু লেখা নেই।"

তাঁহার সহকারী ছোকরাটি ফোড়ন দিল।

মালবাবু ঘরে ঢুকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"ব্যাপার কি মশাই? এ কুকুরটাকে বেঁধে রেখেছেন কেন?

স্টেশন-মাষ্টার তখন বিবৃত করিয়া বলিলেন—"আর বলেন কেন মশাই! চাকরি বুঝি আর থাকে না। কোন এক সাহেব মহাপ্রভু—এই গাড়ীতে যাচ্ছেন—তার নাকি এক কুকুর Dog Box-এ ছিল; আমরা ত দেখছি খালি—আমাদের আগের ষ্টেশন বলছে যে তারা Dog Box-এ কুকুর দেখেছে। অথচ এখানে দেখছি—Dog Box খোলা। বেটা কুকুর হয়ত কোথাও পড়ে মড়ে গেছে—আমাদের রামসুন্দরবাবু বলছেন, দিন যে কোন একটা কুকুর পুরে—তারপর দেখা যাবে। রেল কোম্পানি ত A Dog বলে বুক করেছে—A Dog হলেই হল। তারপর ব্যাটার কুকুর যদি পছন্দ না হয় ত কোর্টে গিয়ে বোঝাপড়া করুক গে! যত সব আপদ জোটে আমারি ঘাড়ে। কি বলেন? দোব এ কুকুরটাকে ঢুকিয়ে? একেবারে রোঁয়া নেই।"

মিঠ্ঠু বলিল—এত তাড়াতাড়ি অন্য কুকুর পাওয়া সম্ভব নহে।

মালবাবু বলিলেন—"দিন ত দুর্গা বলে চড়িয়ে। তারপর দেখা যাবে—"

মিঠ্ঠু আমাকে টানিতে টানিতে লইয়া গিয়া Dog Box-এ তুলিয়া দিল। ট্রেন ছাড়িয়া গেল।

চলিয়াছি। নববধূ যেমন তার আজন্মপরিচিত গৃহ ছাড়িয়া অজানা অচেনার উদ্দেশ্যে আশা-আশঙ্কা-উদ্বেল-হৃদয়ে যাত্রা করে আমিও তেমনি চলিয়াছি। জানি না আমার এই অজানা সাহেব কেমন লোক! যেমনই লোক হোক্, সাহেবেরা শুনিয়াছি ভাল কুকুরের আদর জানে। তাছাড়া সত্যই ভাল কুকুরকে চেনে—যত্নও করে। তাই

আমার আশা আছে যে বুলডগ-পূর্ব্বপুরুষের আভিজাত্য সে আমার জীর্ণ অঙ্গেও খুঁজিয়া পাইবে। শুনিয়াছি সাহেবেরা কুকুরকে মাংস খাইতে দেয়। মাংস কেমন কখনো খাই নাই। মাঝে মাঝে দু-এক টুকরা শুষ্ক অস্থি চিবাইয়াছি—কিন্তু ভাল মাংস শুনিয়াছি অতি অপরূপ জিনিস—সাহেবেরা শুনিয়াছি রোজ মাংস খাইতে দেয়। শুনিয়াছি···

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভাঙিয়া দেখি একটা স্টেশনে গাড়ী দাঁড়াইয়াছে। পশ্চিম গগনে সূর্য্য অস্তোন্মুখ।

একটু পরেই দরজাটা খুলিয়া গেল এবং একটা কুলী আসিয়া আমাকে টানিয়া বাহির করিল। বুঝিলাম, এইবার আমার সাহেব মনিবের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় হইবে। মিলন-লগ্ন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে। সহসা বুকের ভিতরটা কেমন কাঁপিয়া উঠিল—আশায় আনন্দে, না ভয়ে—বলিতে পারি না। কেমন যেন মনে হইল, আর চলিতে পারিতেছি না। সেই কঙ্করময় প্লাটফর্মের উপর বসিয়া পড়িলাম। কুলীটা কিন্তু আমার অন্তরের আকুলতা বুঝিল না—কাঁকরের উপর দিয়াই হেঁচড়াইয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

* * *

সাহেব দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কুলী গিয়া সেলাম করিয়া বলিল—"হুজুর, কুত্তা লে আয়া।"

সাহেব বলিলেন—"What ? what's the joke ?"

ক্ষীণ ভীরু দৃষ্টি তুলিয়া প্রভুর দিকে চাহিতে যাইব, এমন সময় আমার মুখের উপরেই সজোরে সবুট পদাঘাত করিয়া সাহেব গর্জ্জিয়া উঠিলেন "লে যাও হিয়াসে—station masterকো বোলাও।"

* * *

তারপর কি ঘটিল জানি না। দড়ি ছিঁড়িয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলাইয়া আসিয়া এক ভদ্রলোকের আঙিনায় ঢুকিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই। আঙিনার এক কোণে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। একটু পরেই দেখিলাম, এক ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। করিয়াই ডাকিলেন—"ওগো, শুন্‌চ ?"

"কি হল"—বলিয়া এক উদ্‌গ্রীব তরুণী বাহির হইয়া আসিলেন।

"চাকরি হল না। সাহেব বল্লে—ও postএ বাঙালী নেওয়া হবে না—সাহেবদের জন্য ওটা Reserved। অমন চাকরি কি আর ভেতো বাঙালীর অদৃষ্টে জোটে !"

হঠাৎ তাহাদের নজর পড়িল আমার উপর। তরুণীটি বলিলেন, কোত্থেকে একটা লোম-ওঠা পাগলা কুকুর এসেছে দেখ। নাকে মুখে রক্ত লেগে আছে। নিশ্চয়ই কামড়েছে কাউকে। ভয় করছে আমার। মেরে দূর কর এখনি।"

ভদ্রলোকটি বেগে লাঠি তুলতেই খিড়কি দরজা দিয়া সুট করিয়া সরিয়া পড়িলাম !

অনির্ব্বচনীয়

ক্ষণিকা খাস্তগীরের মস্তকে বজ্রপাত হইয়াছে। এখনও কিন্তু সে মরে নাই বরং এ অবস্থায় মরা উচিত কিনা এবং উচিত হইলেও সহজ অথচ মর্ম্মান্তিক মৃত্যুর উপায় কি—তাহাই ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবার জন্য সে ছাদে পায়চারি করিতেছে। কেরোসিন তেল, গলায় দড়ি, পুকুরে ডোবা, এমন কি cyanide পর্য্যন্ত নিতান্ত মামুলি হইয়া পড়িয়াছে। যক্ষ্মার জীবাণু শুঁকিলে হয় না ?

হঠাৎ পিছনে রমেশ বাবুর চটির শব্দ।

"খন্তু, এখানে আছিস?—এই যে! আচ্ছা, কি ছেলেমানুষ বল ত তুই!"

ক্ষণিকা কোন কথা কহিল না।

রমেশবাবু বলিলেন—"কথা বলছিস না যে! আমি কি এক্ষুণি তোর সঙ্গে ওর বিয়ে দিয়ে দেব? কথাটা ভেবে দেখতে দোষ কি?"

ক্ষণিকা বলিল—"তুমি যে বাবা শেষকালে আমাকে একটা দোজবরের হাতে দেবে, একথা ভাবতেও পারি না!"

রমেশবাবু বলিলেন—"বেশ ত তাকে না-ই করলি বিয়ে! আমার ছেলেটিকে ভালো লাগল—তাই বলছিলাম। বিদ্বান, বড় চাকরি করে, চমৎকার স্বাস্থ্য। ছেলেপিলে কিছু নেই। হলই বা দ্বিতীয় পক্ষ। বেশ ত বাপু তোর পছন্দ না হয়, করিস না বিয়ে। এখন শুবি চল! তোরা লেখাপড়া শিখে শুধু টন্‌সিল দুটোই বড় করেছিল—বুদ্ধি কিছু বাড়ে নি!"

মাতৃভাবাপন্ন রমেশবাবু তাঁহার মাতৃহীন কন্যাকে লইয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

বলিতে ভুলিয়াছি—প্রথমেই বলা উচিত ছিল—ক্ষণিকা খাস্তগীর ইংরেজীতে 'অনার্স' লইয়া বি-এ পাশ করিয়াছেন। প্রধান মাসিক-পত্রগুলিতে তাঁহার ছবি ছাপা হইয়া গিয়াছে।

ক্ষণিকা পরদিন বান্ধবী সুজাতাকে বলিল—"যাক খুব ফাঁড়াটা কেটে গেল। লোকটার আক্কেলকে বলিহারি যাই। বউ মরতে না মরতে অমনি বিয়ের তাড়া পড়েছে। পুরুষগুলো আমাদের দেখছি সিগারেটের সামিল করে তুলেছে। একটা ফুরোতে না ফুরোতে আর একটা ধরান চাই। এ ভদ্রলোক যেন আরো ব্যস্তবাগীশ! যেন

আগের স্ত্রীর চিতার আগুন থেকেই দ্বিতীয় বিয়ের হোমের কাঠগুলো ধরিয়ে নিতে চান !"

সুজাতা জিজ্ঞাসা করিল—"ব্যাপার কি ? ভদ্রলোক কে ?"

ক্ষণিকা উত্তর দিল—"ভদ্রলোকের নাম—অজয়কুমার বোস। সরকারী চাকরি করেন—কবিতাও লেখেন। কাব্যরস একটু বেশীমাত্রায় !"

সুজাতা কেবল কহিল—"তাই নাকি ?"

ক্ষণিকার উত্তেজনা তখনও কমে নাই। সে বলিয়া চলিল—"আমার ত মনে হয়, আইন করে এসব বিয়ে বন্ধ করা উচিত !"

সুজাতা কিছু বলিল না।

সুজাতা তখন কিছু বলিল না বটে—কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহার আইন-জ্ঞান হাতেকলমে দেখাইয়া দিল। মাসখানেক পরে সুজাতা দেবীর সহিত অজয় বোসের শুভবিধাহের নিমন্ত্রণ-লিপি পরিচিত মহলে বিতরিত হইতে লাগিল।

* * *

বন্ধুর স্বামী। আলাপ হইলই। একদিন কথায় কথায় হাসিতে হাসিতে ক্ষণিকা অজয়বাবুকে কহিল, "ছেলেবেলায় আপনি 'ট্রাই ট্রাই এগেন কবিতাটি ভাল করেই পড়েছিলেন দেখছি !"

অজয়বাবু বলিলেন—"সে ত পড়েইছি। তা ছাড়া কি জানেন, প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর—বড় বড় লোক এসে দিনরাত অনুরোধ করতে শুরু করলেন—"কি করি বলুন ! নিজের তাগিদ ত ছিলই—"

ক্ষণিকা সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—"বড় বড় লোক মানে ?"

"এই ধরুন না কেন যুগ্মপত্নীর স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য থেকে সুরু করে—

শেলি, বায়রণ, মোফাসাঁ, রবীন্দ্রনাথ সবারই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—এমন কি আমাদের সত্যেন দত্ত পর্য্যন্ত বলেন—

কে গেছে কে যায় আর
অত শত ভাবনার
ফুরসুৎ নেই আজ – নেই বন্ধু!

ওই যে ওমর খৈয়াম আপনি বিয়েতে উপহার দিয়েছেন সে ভদ্রলোক ত নাছোড়! এখন ভেবে দেখুন, ভদ্রভাবে ওঁদের অনুরোধ রক্ষা করতে হলে আমাদের মত গরীব লোকের বিয়ে করা ছাড়া উপায় কি!”

আরক্তিম-কর্ণমূল হইয়া ক্ষণিকা বলিল—“থামুন—থামুন, আপনাদের বোঝা গেছে!”

কিন্তু অজয়ের সপ্রতিভ সরস উত্তরটা সে মনে মনে উপভোগ না করিয়া পারিল না। লোকটি রসিক—সুজাতা সুখী হইবে।

* * *

কিছুদিন পরে শোনা গেল সুজাতা আত্মহত্যা করিয়াছে এবং তাহারও কিছুদিন পরে শোনা গেল অজয় বাবু নাকি আবার বিবাহ করিতেছেন এবং এবার নাকি ক্ষণিকা খাস্তগীরকে।—‘লভ্ ম্যারেজ’।

রামায়ণের এক অধ্যায়

অভিনয় কাণ্ড

সীতাকে বনবাসে দিয়া রাম পত্নীশোকে উন্মত্তপ্রায়। কেবলই তাঁহার মনে হইতেছে—ঘোরতর অবিচার করিয়াছি।

কুলগুরু বশিষ্ঠকে বলিতেছেন—“গুরুদেব, অবিচার! এ ঘোর

অবিচার ; সীতার কোন অপরাধ নাই—তিনি নিরপরাধিনী, দেবী ! আমার কোন অধিকার নাই তাঁকে শাস্তি দিবার ! আমি মহাপাপ করিয়াছি, আমি—"

তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বশিষ্ঠ বলিলেন—"বৎস, সত্যরক্ষা করা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম। তুমি সত্যাশ্রয়ী। সত্যধর্ম্ম পালন করিয়া প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের কার্য্য করিয়াছ।"

রাম বলিলেন,—"এতো সত্য নয়—এ যে মিথ্যা। এ যে অবিচার গুরুদেব—এ যে মিথ্যাচার—গুরুদেব—"

গুরুদেব বলিলেন,—"অধীর হইও না বৎস, রাজধর্ম্ম বড়ই কঠিন।"

রামচন্দ্র শুনিলেন না। অধীর হইয়া উঠিলেন।

"রাজ্য চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না—প্রজাপুঞ্জের মতামত গ্রাহ্য করি না—সীতাকে চাই ! আমার দেবীকে চাই ! রাজ্য যাক—মান যাক..."

রাম পাগল হইয়া গেলেন।

২

অভিনেতা নকুড় মাইতি রামের অভিনয় শেষ করিয়া যখন শেষ-রাত্রে বাড়ী ফিরিলেন তখন তাহার পা টলিতেছে—মদের নেশায় চুরচুর।

ঠেলাঠেলির পর স্ত্রী হরিমতি দ্বার খুলিয়া দিলে নকুড়বাবু বলিলেন—"হারামজাদি, আধঘণ্টা ধরে দোর ঠেলছি, খেয়াল নেই ?"

হরিমতি বলিলেন—ঘুমিয়ে পড়েছিলাম..."

নকুড় মাইতি কহিলেন—"ফের কথার ওপর কথা।"

বলিয়াই এক লাথি এবং রাম লাথি।

স্কুলের স্মৃতি

গত বর্ষায় বেশ একটু কাবু করিয়াছিল। পল্লীগ্রামে বাস করি, সুতরাং বর্ষার আগমন আমার পক্ষে মনোরম না হইবার কথা। কিন্তু একটি স্থূলাঙ্গিনী রমণীর প্রেমে পড়িয়া অবস্থা অন্যরূপ দাঁড়াইয়া গেল। বিস্তৃত বিবরণ দিয়া লাভ নাই। সংক্ষেপে এইটুকু জানিয়া রাখুন, সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত ব্যাপারটির আনুপূর্ব্বিক আলোচনা করিয়া বুঝিলাম কাব্যরসে কুলাইবে না—কিছু চোলাই রসের প্রয়োজন। দোকান আমার বসত বাটি হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। উপায়ান্তর নাই দেখিয়া হাঁটু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া কাদায় ছপ্ ছপ্ করিতে করিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

*　　　*　　　*

গঙ্গার তীর। দুকূলপ্লাবিনী বর্ষার গঙ্গা। শ্রাবণের পূর্ণিমা তিথি। মেঘে আর জ্যোৎস্নায় নির্জ্জন নদীতীরে···যাক্ বর্ণনা করিয়া সময় নষ্ট করিব না। সে আর আমি মুখোমুখি বসিয়াছিলাম। এই আমাদের প্রথম নির্জ্জন সাক্ষাৎ। চারিদিকে জনমানবের চিহ্ন নাই—একটু দূরেই স্থানীয় শ্মশান। আকাশে মেঘ ও জোৎস্না। সম্মুখে বেগবতী বর্ষার নদী। ট্যাঁকে কিঞ্চিৎ ধন ও উদরে প্রচুর 'ধেনো'। বিকম্পিত কণ্ঠে বলিলাম—"আর একটু কাছে এসে বস না।"

রমণী দৃঢ়কণ্ঠে বলিল—"না।"

আমি আবেগভরে বলিলাম—"কেন? বল, কেন?"

রমণী এবার কিছু না বলিয়া একটু সরিয়া বসিল। আমিও আর একটু কাছে গিয়া বলিলাম—

"কেন? বল, কেন? ভয় করছে? কিসের ভয় তোমার। সরে এসো লক্ষ্মীটি!"

"না—" বলিয়া সে আর একটু সরিয়া বসিল। আমি আবার একটু কাছে গিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিলাম—

"তুমি বিয়াত্রিচের গল্প শুনেছ? যার প্রেমে দান্তে পাগল হয়েছিলেন? শোন নি? জোহান বোয়ারের 'লাইফ পড়েছ? যাতে সেই স্কুলমাস্টার, তাও শোন নি? বেশ, কেষ্টরাধার কথা ত জান? এবার ভেবে দেখ দিকি সেই যমুনার কূলে—"

এবার রমণী বলিল—"আমরা হলাম কৈবর্ত্তের মেয়ে—!"

উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলাম—"হোক্—তাতে ক্ষতি নাই। দোহাই তোমার, একটু কাছে সরে এসো।" বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম।

এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে আরও খানিকটা সরিয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার কাছে গিয়া বসিলাম।

বৃষ্টি সুরু হইয়া গেল। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না। বলিলাম, "দেখ, জীবন খুব ছোট—এই ক্ষুদ্র জীবনে আজ যে শুভ মুহূর্ত্তটি এসেছে—নষ্ট কোরো না তাকে। শুনছ? যত টাকা লাগে—! শুনছ?"

রমণী কিছু বলিল না। হাত ধরিতেই কিন্তু আবার সরিয়া বসিল। আমিও সরিয়া গেলাম।

শ্রাবণের আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। রমণী কিন্তু ভিজিল না। তখন মনে হইল গান গাহিয়া দেখি যদি কিছু হয়। গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম করিয়া গান ধরিলাম—

"বুলবুলি তুই ফুল শাখাতে দিস্ নে আজি দোল
বা—গিচায়।"

হঠাৎ দেখি সে কাৎ হইতেছে।

"ওকি, অমন করছ কেন?"

ঝপাং করিয়া ধ্বস্ ভাঙিল।

* * *

হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে তিন সেকেণ্ড স্থূলাঙ্গিনী আমার কণ্ঠলগ্না অবস্থায় ছিল। এতদুপলক্ষে আমরা উভয়েই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মদেহ ধারণ করিয়াছি—কিন্তু স্থূলের স্মৃতিটি আজিও মর্ম্মে শূলের মত বিঁধিয়া আছে।

বিধাতা

বাঘের বড় উপদ্রব। মানুষ অস্থির হইয়া উঠিল। গরু বাছুর, শেষে মানুষ পর্য্যন্ত বাঘের কবলে মারা পড়িতে লাগিল। সকলে তখন লাঠি সড়কি বর্শা বন্দুক বাহির করিয়া বাঘটাকে মারিল। একটা বাঘ গেল—কিন্তু আর একটা আসিল। শেষে মানুষ বিধাতার নিকট আবেদন করিল—

"ভগবান, বাঘের হাত হইতে আমাদের বাঁচাও।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

কিছু পরেই বাঘরা আসিয়া বিধাতার দরবারে নালিশ জানাইল—"আমরা মানুষের জ্বালায় অস্থির হইয়াছি। বন হইতে বনান্তরে পলাইয়া ফিরিতেছি। কিন্তু শিকারী কিছুতেই আমাদের শান্তিতে থাকিতে দেয় না। ইহার একটা ব্যবস্থা করুন।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

তৎক্ষণাৎ নেড়ার মা বিধাতার নিকট আবেদন পেশ করিলেন—

"বাবা আমার নেড়ার যেন একটি টুকটুকে বউ হয়। দোহাই ঠাকুর, তোমায় পাঁচ পয়সার ছিন্নি দেব।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

হরিহর ভট্টাচার্য্য মামলা করিতে যাইতেছিল। সে বিধাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আজীবন তোমার পূজো করে' এসেছি। উপবাসে দেহ ক্ষীণ করেছি। শালা ভাইপোকে আমি দেখে নিতে চাই। তুমি আমার সহায় হও।"

বিধাতা কহিলেন, "আচ্ছা।"

সুশীল পরীক্ষা দিবে। সে রোজ বিধাতাকে বলে, "ঠাকুর পাশ করিয়ে দাও।" আজ সে বলিল, "ঠাকুর, যদি স্কলারশিপ পাইয়ে দিতে পার, পাঁচ টাকা খরচ করে' হরির লুট দেব—"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

হরেন পুরকায়স্থ ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান হইতে চায়। কালী পুরোহিতের মারফত সে বিধাতাকে ধরিয়া বসিল—এগারোটা ভোট আমার চাই। কালী পুরোহিত মোটা রকম দক্ষিণা খাইয়া ভুল সংস্কৃত মন্ত্রের চোটে বিধাতাকে অস্থির করিয়া তুলিল। ভোটং দেহি—ভোটং দেহি—

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা—"

কৃষক দুই হাত তুলিয়া কহিল—"দেবতা, জল দাও—"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা"

পীড়িত সন্তানের জননী বিধাতাকে প্রার্থনা জানাইল—"আমার একটি মাত্র সন্তান, ঠাকুর কেড়ে নিও না—"

বিধাতা কহিলেন,—"আচ্ছা।"

পাশের বাড়ীর ক্ষেন্তিপিসি উপরোক্ত মাতার সম্পর্কে বলিলেন—

"বিধাতা, মাগীর বড় দেমাক। নিত্যি নতুন গয়না প'রে ধরাকে সরা জ্ঞান করছিল। ছেলের টুঁটিটি টিপে ধরে বেশ করেছ দয়াময়। মাগীকে বেশ একটু শিক্ষা দিয়ে দাও ত।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

দার্শনিক কহিল—"হে বিধাতা—তোমাকে বুঝিতে চাই।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

চীন দেশ হইতে চীৎকার আসিল—"জাপানীদের হাত হইতে বাঁচাও প্রভু।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

বাঙলা দেশ হইতে এক তরুণ ধরিয়া বসিল—"কোনো সম্পাদক আমার লেখা ছাপিতেছে না। 'প্রবাসী'তে লেখা ছাপাইতে চাই। রামানন্দবাবুকে সদয় হইতে বলুন।"

বিধাতা কহিলেন—"আচ্ছা।"

একটু ফাঁক পড়িতেই বিধাতা পার্শ্বোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার বাসায় খাঁটি সর্ষের তেল আছে?"

ব্রহ্মা কহিলেন—"আছে। কেন বলুন ত?"

বিধাতা। "আমার একটু দরকার। দেবেন কি?"

ব্রহ্মা। (পঞ্চমুখে) "অবশ্য, অবশ্য।"

ব্রহ্মার বাসা হইতে ভাল সরিষার তৈল আসিল। বিধাতা তৎক্ষণাৎ তাহা নাকে দিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

আজও ঘুম ভাঙে নাই।

তর্ক ও স্বপ্ন

তর্ক হইতেছিল।

প্রথম তার্কিক-প্রাণীটি বলিতেছিলেন, "মাংস আগে ভেজে পরে সিদ্ধ করে নিলে সুস্বাদু হয়।"

দ্বিতীয়টি তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিলেন। বলিলেন—"মাংস আগে ভাজলে সিদ্ধ হওয়া শক্ত। সেজন্য মাংস আগে সুসিদ্ধ হলে পরে ঝোলটা মেরে ভাজা-ভাজা করে নিলেই ভাল হয়। তুমি জান না।"

—"আমি জানি না! মাংস ত ভাজা উচিতই, মশলাও ভাজা উচিত।"

"পাক-প্রণালীতে ওকথা লেখে না!"

"পাক-প্রণালীর কথা রেখে দাও। বড় বড় বাবুর্চির মুখে আমি শুনেছি মাংসটা আগে সিদ্ধ—"

"পাক প্রণালী"র কথা তুমি মানতে চাও না?"

"না।"

"কেন শুনতে পাই কি?"

"কারণ নানা পাক-প্রণালীর নানা মত। সুতরাং বাবুর্চিরা—অর্থাৎ যারা নিত্য রাঁধছে—তাদের কথাই প্রামাণ্য।"

প্রথম তার্কিক একটু থতমত খাইয়া গেলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার বুদ্ধি খুলিল।

—"সব বাবুর্চিও ত সব সময়ে একমত নয়।"

"যে সব বাবুর্চিরা মাংস আগে ভাজতে চায়, তারা বাবুর্চি নয়—বেকুব। জাপানে কি করে শুনবে?"

প্রথম তার্কিক ধৈর্য্য হারাইলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"জাপান টাপান বুঝি না। তুমি বাবুর্চির অপমান করবার কে? অভদ্র কোথাকার।"

"কি, যত বড় মুখ নয় ততবড় কথা! নিজে দুনিয়ার কোন খবর রাখবে না—আবার ফদর ফদর করে তর্ক করতে আসে! বেকুব।"

"ফের বেকুব বলছ?"

"ক্রমাগত বলব।—"

"তবে রে—"

—"তবে রে—"

"তর্ক যুদ্ধে পরিণত হইল।

একটি শৃগাল অনতিদূরে বসিয়া তর্কপ্রগতি উপভোগ করিতেছিল; উভয়কে সমরোন্মুখ দেখিয়া হাস্যভরে কহিল—"পুঙ্গবদ্বয়, তোমরা ত উভয়েই নিরামিষ-ভোজী। আমিষ বিষয়ক তর্কে লিপ্ত হইয়া অনর্থক গোলমাল দাঙ্গা করিতেছ কেন? তোমাদের প্রভু জাগরিত হইলে মুসকিলে পড়িবে। শৃগালের কথা তাহারা শুনিল না—পরস্পর শিঙে শিঙ লাগাইয়া ঘোর-নাদে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

আচমকা ঘুম ভাঙ্গিয়া গাড়োয়ান দেখিল রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার বলীবর্দ্দযুগল লড়াই করিতেছে। এবম্বিদ যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে শান্ত করিবার সদুপায় তাহার অবিদিত ছিল না। লগুড় এবং প্রাকৃত ভাষার প্রচুর ব্যবহার সে করিল। তৎপরে গরু দুটিকে পৃথক করিয়া দূরে দূরে বাঁধিয়া সে উপসংহারে কহিল—"খা শালারা খা—বেশী ডেঁপোমি করিস্ না!"

খাইতে দিল বিচালি।

* * *

চট্ করিয়া আমার ঘুমটাও ভাঙিয়া গেল। স্বপ্নটাও। যে দুইজন উগ্র প্রকৃতির যুবক জাপান-জার্ম্মানী সংবাদ, হিটলার-মুসোলিনি প্রকৃতি লইয়া তর্কমুখর হইয়া উঠিয়াছিলেন তাঁহারা দেখিলাম নামিয়া গিয়াছেন, ট্রেণ থামিয়াছে, নাথনগরে।

চলচ্ছবি

সুন্দর সুসজ্জিত একটি কক্ষ।

একটি তরুণী বসিয়া সেলাই করিতেছে। কোণে দুগ্ধফেননিভ একটি মার্জ্জার। সেলাই ভাল লাগিল না। পিয়ানো বাজাইয়া গান ধরিল। তাহাও ভাল লাগিল না। অবশেষে টেবিলের উপর একটি ফুলদানিতে ফুল সাজাইতে বসিল। সঙ্গে সঙ্গে গুনগুন করিয়া গান। মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ভাবিতে লাগিলাম। আমার মনের কথা কখনও কি তাহার কাছে পৌঁছিবে?

জানিতে পারিলাম তাহার অগণিত প্রণয়ীর মধ্যে দুইজনকে লইয়া সে সম্প্রতি বিব্রত। একজন ধনীর দুলাল, নাদুস্নুদুস্ ভদ্রলোক। রোজ নানাবিধ উপহার লইয়া বিকশিতদশনে আসিয়া ধর্ণা দেয়। মোটরে বেড়াইতে লইয়া যায়। তরুণীর পিতা ইহাতে আপত্তির কিছু দেখেন না। কারণ তিনি চান এই নাদুস্নুদুস্ লোকটি তাঁহার জামাই হোক্। তাঁহার স্বর্গীয় পত্নীরও এই ইচ্ছাই ছিল এবং মৃত্যুকালে তাঁহার অনুরোধেই এই তন্বী রূপসী ওই নাদুস্নুদুস্কে বিবাহ করিতে রাজী হইয়াছিল। মৃত্যুশয্যায় শায়িতা জননীর শেষ ইচ্ছা পালন করিতে কে না চায়?

নাদুস্নুদুস্ লোক ভাল, টাকা কড়ি আছে, কুরূপও নয়, স্বাস্থ্য

ভালই—কিন্তু! তরুণীটি নানাদিক হইতে চিন্তা করিয়া দেখে। 'কিন্তু'কে ঠেকান যায় না। সেদিন দুরন্ত ছুটন্ত পাগলা ঘোড়ার সম্মুখীন হইয়া নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যে সুশ্রী যুবকটি তাহাকে বাঁচাইয়াছিল নাহুস্‌নুহুস্‌ মোটেই তাহার মত নয়।

সেই নামগোত্রহীন দুঃসাহসী যুবাকে সমস্ত নারীহৃদয় দিয়া সে চায়।

নাহুস্‌নুহুস্‌ কিন্তু না-ছোড়!

তরুণী তাহাকে তাড়াইয়া দিতেও পারে না। জননীর শেষ-ইচ্ছা। জননীর মৃত্যু-ছায়াচ্ছন্ন শীর্ণ মুখখানি মনে পড়ে। নাহুস্‌নুহুস্‌কে কিছু বলিতে পারে না।

অথচ সেই যুবক!—যুবকটির পরিচয় সে পাইয়াছে। সে এক জমিদার বাড়ীর সহিস। হোক সহিস—সে সুশিক্ষিত। সেকস্‌পিয়র হইতে গলস্‌ওয়ার্দ্দি এমন কি আরলেনের পর্য্যন্ত খবর রাখে সে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। দেশের মুকুটমণি হইতে পারিত—শুধু কপালের দোষে সে আজ সহিস মাত্র।

সর্ব্বোপরি সুন্দর এবং সুপুরুষ। বলিষ্ঠ সতেজ বিদ্রোহী। যদিও সামান্য সহিস—কিন্তু মুখে হাসি ঝলমল করিতেছে—চোখে অহীন-দীপ্তি!

আমি দমিয়া গেলাম।

সত্যই ত, একদিকে নাহুস্‌নুহুস্‌ আর একদিকে ওই সর্ব্বগুণান্বিত সহিস ছোক্‌রা—ইহারা মধ্যে আমার মত নগণ্য লোকের স্থান কোথায়? একমাত্র সম্বল ছাঁটা গোঁফ-জোড়াটায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চিন্তা করিতে লাগিলাম।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বে দু-একবার

তরুণীটি ও সহিস-যুবকটি সহরের বাহিরে যে পুলটা আছে তাহারই উপর গোপনে সন্ধ্যায় দেখাশোনা করিয়াছে। একদিন চুম্বন-বিনিময়ও হইয়াছিল! কিন্তু সেদিন যাহা ঘটিল তাহা সত্যই রোমাঞ্চকর!

গভীর রাত্রি। সহিস ছোকরাটি এক প্রকাণ্ড ঘোড়ায় চড়িয়া হাজির। ব্রাউন রঙের বিশাল ঘোড়া ঘাড় বাঁকাইয়া ছুটিয়া আসিল।

তরুণীটির বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া 'হুইসল্' দিতেই তরুণী পথে নামিয়া আসিল। ক্ষণিকের জন্য তাহার মায়ের শেষমুখচ্ছবি স্মৃতিপটে ভাসিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা ক্ষণিকের জন্যই। অবলীলাক্রমে সহিস তাহাকে অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইল। তাহার পর—

—টগবগ টগবগ টগবগ!

ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে আমার রক্তও যেন ফুটিতে লাগিল।

অল্পক্ষণ পরে নাহুসনুহুসও টের পাইল! যখন সে সত্যই বুঝিল যে প্রেয়সী প্রণয়-শৃঙ্খল কাটিয়া পলাইয়াছে তখন তাহার মুখভাব একটা দেখিবার মত জিনিস! প্রতারিত নাহুসনুহুস্, বিরহী নাহুসনুহুস্, উন্মাদ নাহুসনুহুস্! সে কি চেহারা। মোটর লইয়া পথে বাহির হইতেই একজন বৃদ্ধা তাহাকে বলিয়া দিল কোনপথে তাহারা গিয়াছে। প্রকাণ্ড 'রোলস্ রয়েস্' সেই পথে ছুটিল। উদভ্রান্ত নাহুসনুহুস্ 'ষ্টিয়ারিং' ধরিয়া বসিয়া আছে। ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, গাড়ীর বেগ বাড়িয়া চলিয়াছে। ফরফর করিয়া মাথার চুল উড়িতেছে।

সে কি প্রাণান্তকর অনুধাবন। নক্ষত্রবেগে ঘোড়া মাঠ,বন,অরণ্য, পর্ব্বত পার হইয়া যাইতেছে—বিদ্যুৎবেগে নাহুসনুহুস অনুসরণ করিতেছে। প্রায় ধরে ধরে—এমন সময় সম্মুখে এক নদী। এক

লম্ফে অশ্ব নদী পার হইয়া গেল। নাহুসন্নুহুসের রোলস্ রয়েস্ পারিল না। ষ্টিয়ারিং ছাড়িয়া নাহুসমুহুস আক্রোশে দুই হাতে চুলের মুঠি চাপিয়া ধরিল।

—ঝপাং।

নাহুসন্নুহুস্ জলে লাফাইয়াছে। কিন্তু সাঁতার জানে না। খরস্রোতা পাহাড়ী নদী। স্রোত ভীষণ। প্রাণপণে তবু চেষ্টা করিতে লাগিল সে। সহজে ছাড়িবে না। নাকে মুখে চোখে জল ঢুকিয়া, প্রবল স্রোতে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া নাকানি-চোবানির চরম হইল। তবু ছাড়িবে না। কি অমানুষিক আপ্রাণ চেষ্টা! এমন না হইলে প্রেম! সমস্ত আত্মা দিয়া, সমস্ত সত্তা দিয়া নাহুসন্নুহুস ওপারে যাইতে চায়।

প্রিয়তমা যে ওপারে আততায়ীর হস্তে!

নাহুসন্নুহুস আর পারে না। বোধশক্তি হারাইয়া যাইতেছে—হস্ত পদ ক্লান্ত অবসন্ন! সর্ব্বাঙ্গ শিথিল হইয়া আসিল। নাহুসন্নুহুস বুঝি তলাইয়া গেল।

... ...

সেই সময়ে ঠিক ওপারে একটি গিরিশৃঙ্গে দাঁড়াইয়া সহিস ছোকরাটি ও তরুণীটি আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিতেছে মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চাঁদ উঠিতেছে।

হঠাৎ সহিসের নজরে পড়িল নীচে নদীতে কে যেন ডুবিতেছে। সঙ্গিনীকে কহিল, "দেখ, কে যেন ডুবছে—ওকে তুলি।"

তরুণী কহিল—"ও কিন্তু নাহুসন্নুহুস।" সহিস সামান্য লোক নয়। মহামানব সে। সে হাসিয়া কহিল—"তা আমি জানি; হোক্ নাহুস-

নুহুস কিন্তু মানুষ ত! সে ডুববে আর আমি দাঁড়িয়ে দেখব। হতে পারে না।" তীর-বেগে ঘোড়ায় চড়িয়া তরতর করিয়া পাহাড় হইতে নামিয়া গেল সে।

খানিকক্ষণ পরে দেখা গেল নাহুসনুহুসের দেহ স্কন্ধে বহিয়া সহিস হাঁটিয়া পাহাড়ে উঠিতেছে। সংজ্ঞাহীন বিশালকায় ভিজা নাহুস-নুহুসকে লইয়া পাহাড়ে চড়া! কি কষ্ট। সহিসের মুখে দেবতার দীপ্তি—দেহে দৈত্যের বল।

ঘোড়াটি মন্ত্রমুগ্ধের মত পিছু পিছু আসিতেছে।

তাহার পর দুই জনে মিলিয়া নাহুসনুহুসের কি সেবাটাই করিল। সহিস তাহার একমাত্র কম্বলে তাহাকে ঢাকিয়া দিয়া নিজে শীত ভোগ করিতে লাগিল।

তরুণী তখন কহিল—"প্রিয়তম তুমি সহিস নও—তুমি দেবতা।" কম্বলের ভিতর হইতে নাহুসনুহুস বলিল—"ঠিকই বলিয়াছ। কিন্তু এখন ঘুমাও।

ঘুমাইতে ঘুমাইতে তরুণী স্বপ্ন দেখিতে ছিল। তাহার মা যেন বলিতেছেন—"বৎসে, তুমি যোগ্যতমকেই বিবাহ কর—ইহাই আমার পুনশ্চ ইচ্ছা।"

ঘুম ভাঙিয়া দেখিল—সম্মুখে বৃক্ষশাখায় একজোড়া কপোত কপোতী চঞ্চু চুম্বন করিতেছে। পাশ ফিরিয়া দেখিল—নাহুসনুহুস জাগিয়া বসিয়া আছে। নাহুসনুহুস আবেগভরে কহিল, "দেখ, তুমি এই সহিসেরই উপযুক্ত। আমাকে এখন কেবল নদীটা পার করিয়া দাও। ঈশ্বর তোমাদের সুখী করুন।"

তরুণী কহিল—"ধন্যবাদ। আপনাকে উনি নিশ্চয়ই নদীপার করিয়া দিবেন। ওঁকে জাগান।"

নাহুসনুহুস্ দেখিল অদূরেই সহিস অঘোরে ঘুমাইতেছে। ডাকিল, সাড়া নাই। ঠেলিল, সাড়া নাই। সহিস জ্বরে অচৈতন্য।

তখন সে অগত্যা একাই পাহাড় হইতে নামিতে লাগিল। কাপড় তখনও ভিজা—সর্ব্বাঙ্গ কাদা—মুখে নিরাশা।

হতাশ প্রণয়ী নাহুসনুহুসের সে কি করুণ অবরোহণ!

সিনেমা শেষ হইয়া গেল। পথ চলিতে চলিতে বুকের ভিতরটা কেমন যেন করিতে লাগিল। কি আর করি। অগত্যা পোড়া বিড়িটা কান হইতে নামাইয়া ধরাইয়া ফেলিলাম।

বর্ষা-ব্যাকুল

ঘন-ঘোর করিয়া আসিয়াছে।

সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া নিবিড় কালো মেঘ থম্ থম্ করিতেছে। আকাশ চিরিয়া বিদ্যুতের আলো। পূরবী বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিতেছে।

মনটা বিকল হইয়া গেল। বাতায়ন পথে আকাশের অনেকখানি দেখা যায়। বিছানায় উপুড় হইয়া উদ্বেলিত চিত্তে অবশ্যম্ভাবী বর্ষা সমাগম প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কি ঘন ঘটা···। খবরের কাগজটা খুলিয়া দেখিলাম। অস্বস্তি বাড়িয়া গেল। কালিদাসটা কোথা?

গুরু গুরু গুরুগুরু— আকাশ ডাকিল।

"কেষ্টা—অ কেষ্টা!"

কেষ্টা চাকর আসিল। তাহাকে কহিলাম—"ওরে বৃষ্টি আসছে। কড়া এক কাপ চা নিয়ে আয় ত। আর দেখ এক বাণ্ডিল বিড়িও আনিস্।"

বাতায়ন পথে দেখিলাম ঘনকৃষ্ণ মেঘমালাঘনতর হইয়া আসিয়াছে। কালিদাসকে চাই। কালিদাস না হইলে জমিবে না। আসিলেন কিন্তু ভজহরিবাবু। তাঁহার সম্মুখের দন্ত কয়েকটি সর্ব্বদাই প্রকাশিত। আমাদের ম্যানেজার তিনি।

"সহায়রামবাবু, আপনার একখানা চিঠি এসেছে আজ"।

চিঠি দিয়া ভজহরিবাবু চলিয়া গেলেন।

প্রিয়ার পত্র। বহুকাল পরে। বুকটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। আকাশ নিবিড় হইয়া আসিল। চিঠিখানি খুলিয়া আদ্যোপান্ত পড়িলাম। আর একবার পড়িলাম। আবার একবার!

সমস্ত মনটা উদাস হইয়া গেল। কেষ্ট চা আনিল। একটু একটু চা পান করিতে করিতে প্রিয়ার পত্রখানি চতুর্থবার পাঠ করিলাম। আকুলতা বাড়িল বই কমিল না!

আকাশের ঘনায়মান আয়োজন আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। নীরব অন্ধকার!

টপ্ টপ্ টিপ টাপ্—বর্ষণ সুরু হইল।

হাত ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম—পৌনে দশটা। সমস্ত মন প্রাণ বিচলিত। এখন যদি…নাঃ! পাশের বাড়ীর গ্রামোফোন হইতে অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন।

"রতন পালংপর বৈঠল দুঁহু জন…" সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া বিদ্যুৎ ঝলসিয়া গেল।

কড়—কড়—কড়—কড়াৎ

আর পারি না। অন্তরের সমস্ত আবেগ ভাষায় রূপান্তরিত করিলাম—"কালিদাস রাস্কেলটা গেল কোথায়?"

সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস আপাদ মস্তক ভিজিয়া হুড়মুড় করিয়া ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

"উঃ, কি বৃষ্টি মাইরি!"

"কি বৃষ্টি মাইরি! সেই থেকে তোর জন্য বসে আছি। আমাদের জাতটা এই জন্য উচ্ছন্ন গেল! সময়ের একটা জ্ঞান নেই! ক্যাড্ কোথাকার! এখন কি করে যাই বল ত? না আছে একটা ছাতা, না আছে ওয়াটারপ্রুফ!"

কালিদাস অপ্রতিভ হইয়াবলিল—"হঠাৎ বৃষ্টিটা নামতেই আট্‌কে পড়লুম ভাই।"

"আজই কি শেষ?"

"হ্যাঁ, আজই শেষ।"

"ছি ছি মাইরি গ্রেটা গার্বোর অমন ছবিটা দেখ হল না। দশটা বেজে গেছে!"

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন মানসে কালিদাস কহিল—"তোর হাতে ওটা কি?"

"বৌ. চিঠি দিয়েছেন। তাঁর জ্বর, বড় মেজ সেজ ছোট্ট ন—সব ছেলেগুলির জ্বর। মেয়ে দুটোর আমাশা হয়েছে। সে যাক গে। গ্রেটা গার্বোর লভ্ সিনটা মাইরি দেখা হল না।—এ দুঃখ রাখি কোথা—"

নিস্ফল আক্রোশে মুষলধারার প্রতি চাহিয়া রহিলাম। পাশের বাড়ীতে গান চলিতে লাগিল—রসভরে দুহুঁ তনু—থর থর কাঁপই—"

পূজার গল্প

গল্প শুনিতে চান ত? শুনুন তবে।

সেবার পূজার দুইএকদিন আগে সিমলা হইতে ফিরিতেছিলাম। আমি ইন্‌সিওরেন্‌সের দালাল। কার্য্য-ব্যপদেশে নানাস্থানে গতিবিধি! যে 'লাইফ'টির জন্য গিয়াছিলাম—তাহা লইতে পাই নাই! অন্য আর একজন সেটি বাগাইয়া লইয়াছে। সুতরাং মন খারাপ ছিল।

যে কামরায় উঠিলাম তাহাতে দেখি অপরূপ সুন্দরী—একজন নয়—তিন তিন জন। চোখ ঝলসাইয়া গেল। সঙ্গে একটি যুবক আছেন। তিনিও কন্দর্পকান্তি। আমার এই মেদবহুল কৃষ্ণবপু লইয়া ইহাদের নিকটে বসিতে লজ্জা করিতে লাগিল। তবু বসিলাম। খানিকক্ষণ পরে যুবকটিকে সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিলাম "কত দূর যাবেন?" তিনি দেখিলাম একটি সিনেমা সাপ্তাহিকে নিবদ্ধদৃষ্টি—একটি অভিনেত্রীর অর্দ্ধনগ্ন চিত্র তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে।

"কত দূর যাবেন?"

চকিত হইয়া যুবকটি বলিল—"কি বলছেন?"

"কতদূর যাবেন তাই জিজ্ঞাসা করছি।"

"বঙ্গদেশ।"

"আমিও ত সেখানেই যাচ্ছি। একসঙ্গে যাওয়া যাবে বেশ"—যুবকটি দেখিলাম—আবার সাপ্তাহিকে মন দিয়াছেন!

সাপ্তাহিকটিতে আমাদের কোম্পানির একটি বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে দেখিলাম। যুবকটির চিত্ত সেই দিকে আকর্ষণ করিবার আশায় কহিলাম—"এই বিজ্ঞাপনটা আমাদের কোম্পানির—আমরা যত বোনাস্ দিই—"

অর্দ্ধনগ্ন অভিনেত্রীর দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া যুবকটি বলিলেন—"ওসব বুঝি না।"

"বোনাস্ বোঝেন না! আপনি ইন্‌শিওর্ড ত?

"ওসব বুঝি না! যা বুঝি তা দেখছি।" বলিয়াই আবার সেই চিত্রের দিকে চাহিলেন। আমি বিষ্ণুচরণ বর্ম্মা—ছাড়িবার পাত্র নহি। বলিলাম "আপনার মত রসিক লোক জীবন-বীমা বোঝেন না এটা বিশ্বাস করা শক্ত। মাসে সামান্য কিছু অর্থব্যয় করে যদি জীবনটাকে"—

বাধা দিয়া যুবক কহিলেন—"অনর্থক অর্থের কথা পেড়ে আমাকে বিব্রত করবেন না। বৈষয়িক যদি কিছু আলোচনা ক'র্‌তে চান মায়ের সঙ্গে করুন।"

সহাস্য নমস্কারে তাঁহার জননীর সম্বর্দ্ধনা করিলাম। বলিলাম—"আপনার ছেলে তো এ বিষয়ে আলোচনা ক'র্‌তেই চান না। আপনি নিশ্চয় আমার সঙ্গে একমত যে, জীবন-বীমা জিনিসটা সকলের পক্ষেই অবশ্য কর্ত্তব্য।"

মহিলাটি সমস্ত মুখে স্নিগ্ধ হাসির আভা ছড়াইয়া বলিলেন—"আমিও কিন্তু ও বিষয়ে বিশেষ কিছু জানি না; আপনার অসুবিধা না হয় ত একটু বিশদ করে বলুন।"

"নিশ্চয়ই"—বলিয়া সুরু করিলাম এবং অনর্গল আমাদের সম্মোহন-মন্ত্রগুলি সগর্ব্বে আওড়াইয়া গেলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য—মহিলাটির মনে রেখাপাত পর্য্যন্ত করিল না। অন্য দুইটি মহিলাও আমার বক্তৃতা মন দিয়াই শুনিলেন—কিন্তু তাঁহাদেরও কোন উৎসাহ দেখিলাম না।

একটু থামিয়া বলিলাম—"আশা করি আমার সব কথা আমি স্পষ্ট করে বোঝাতে পারছি!"

প্রথম মহিলাটি বলিলেন, "হ্যাঁ, অস্পষ্ট কিছু নেই। কিন্তু আমার দরকার হবে না জীবন-বীমার।"

"আপনার না হয় না হতে পারে—কিন্তু আপনার পুত্রের, আপনার স্বামীর ?"

"আমার স্বামী মৃত্যুঞ্জয়। সুতরাং তাঁর জীবন-বীমার প্রয়োজন কই ?"

এমন সময় বাঙ্কের উপর হইতে স-শুণ্ড মুণ্ড বাহির করিয়া গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে গণেশ কহিলেন—"তোমরা বড় গোলমাল করছ মা। এ চারদিন কি আর নিদ্রা হবে ? একটু ঘুমিয়ে নাও না—"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দেখিলাম—এ কি ! ভ্রম বুঝিতে পারিলাম। জগজ্জননী দুর্গা বঙ্গদেশে চলিয়াছেন—সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পদধূলি লইলাম। বলিলাম—"অবোধ আমি—ক্ষমা চাই।" শঙ্করী হাসিয়া বলিলেন—কোন দোষ ত কর নাই বৎস। ফর্ম্ম বাহির কর—বঙ্গদেশে পূজাটা ইন্‌শিওর করিয়া রাখি। তোমার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়াছি।"

বল হরি, হরি বোল

"বল হরি, হরিবোল"

নৈশ গগন মুখরিত করিয়া আমরা কয়জন প্রাণী চলিয়াছি। হঠাৎ রমেশবাবু আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনার নিশ্চয় খুব রাগ হচ্ছে আমার উপর।"

আমি বলিলাম—"না—কিছুমাত্র না।"

রমেশবাবু বলিতে লাগিলেন—"না হওয়াটাই আশ্চর্য্য। আজ

বিকেলে আপনি আমার বাড়ীতে অতিথি হলেন। রাত্রে আপনাকে মড়া বইতে নিয়ে যাওয়াটা ভদ্রোচিত নয়। কিন্তু লোক জুটল না— কি করি বলুন।"

আমি বলিলাম—"আহা, ওর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? কলেজে পড়ার সময় মড়া পোড়ানটাও আমাদের কোর্সের মধ্যেই ছিল প্রায়। প্রায়ই এ কার্য্য করতে হত।"

হরেন্দ্রবাবু তখন বলিয়া উঠিলেন, "ওসব বাজে ভদ্রতা ছেড়ে এখন কেউ একটা মিঠে গোছের প্রেমের গল্প বলুন দেখি—সময়টা যাতে কাটে। এখনও বেশ কিছু দূর হেঁটে যেতে হবে। শ্যামবাবু, আপনি বলুন।"

শ্যামবাবু আমাদের মধ্যে একটু বয়স্ক লোক। তিনি বলিলেন— "আরে বাপু—দু একটা প্রেম যা জীবনে করেছি তা' কি আর এখন মনে আছে? আমাকে এখন অ্যালজাব্রার ফর্ম্যুলা জিজ্ঞেস করাও যা, প্রেমের গল্প বলতে বলাও তাই। এককালে করেছি সব। কিন্তু কিছুই ভাল মনে নেই। এখন আমার প্রধান চিন্তা, তোমাদের পাল্লায় পড়ে এলাম ত—বাতটা না বাড়ে।"

"বল হরি, হরি বোল—"

হরেন্দ্র তখন শ্যামবাবুকে ছাড়িয়া চন্দ্রবাবুকে ধরিয়া পড়িলেন। "আপনি ত চন্দর-দা এককালে খুব উড়েছিলেন। বলুন না দু' একটা গল্প—সময়টা কাটুক।"

"বল হরি, হরি বোল"

চন্দ্রবাবু বলিলেন—"উড়েছিলাম বটে। কিন্তু ঠিক যে প্রেম করেছিলাম তাতো বলতে পারি না। কারণ each time, I had to pay for my love either in coins or in kinds। সুতরাং

তার সম্বন্ধে বিশেষ কোন কবিত্ব নেই মনের মধ্যে। রাণী, হাবি, বিনোদিনী, নয়নতারা সব একাকার হয়ে গেছে। Distinguish করা শক্ত।"

"বল হরি, হরি বোল।"

হরেন্দ্রবাবু রমেশবাবুকে তখন বলিলেন—"আপনার ষ্টকে কিছু আছে নাকি রমেশ দা? ছাড়ুন না—"

রমেশবাবু হাসিয়া উঠিলেন—"আমি ভাই ইস্কুলে পড়ামুখস্থ করে একজামিন পাস করাটাই পরমার্থ মনে করতাম। সুতরাং ছাত্রজীবনে পরীক্ষা পাস করা ছাড়া আর কিছু করি নি। বিয়ে করে স্ত্রীর প্রেমে পড়েছিলাম। ফলে চারটি মেয়ে হয়েছে দেখতে পাচ্ছ।"

"বল হরি, হরি বোল"

একটু থামিয়া রমেশবাবু আবার বলিলেন—"এইবার একটা প্রেম করব মনে করছি। কিন্তু অবসর কই? সকাল থেকে উঠে আপিস যাওয়ার তাড়া। সন্ধ্যে বেলা ফিরে এসে মনে হয় চাট্টি খেয়ে শুতে পারলে বাঁচি। তোমার নিজের কিছু থাকে ত বল না ভায়া। অপরকে জ্বালাতন কর কেন?"

"বল হরি, হরি বোল"

হরেন্দ্রবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন,—"ডাক্তারেরা যেদিন থেকে আশঙ্কা করলেন যে, আমার বুকের দোষ আছে—সেদিন থেকে জীবনকে আর কারুর সঙ্গে জড়াতে সাহস পাই না। তা ছাড়া আমার মত মুখে বসন্তের দাগ—একচোখকাণা লোককে কোন্ মেয়ে ভালবাসবে বলুন। কিন্তু প্রেমের গল্প শুনতে আমার ভারি ইচ্ছে। বলুন না আপনারা কেউ একটা।"

"বল হরি, হরি বোল"

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কিছু মনে করবেন না মশাই। আপনি অপরিচিত লোক। জীবনে যদি ঘটে থাকে কিছু বলুন না। সময়টা কাটুক।"

"বল হরি, হরি বোল"

আমার জীবনে যে রমণীর আবির্ভাব ঘটে নাই তা নয়। কিন্তু তাহা বলিতে লজ্জা করে। সুতরাং কথাটা ঘুরাইয়া বলিলাম, "এখন কি ওসব ভাল লাগবে? তার চেয়ে বরং ভূতের গল্প বলুন কেউ।"

বয়স্থ শ্যামবাবু বলিলেন —'প্রেমের গল্প আর ভূতের গল্প আমার কাছে দুইই সমান। আপনি প্রেমের গল্পই বলুন।"

"বল হরি, হরি বোল"

বলিতে লাগিলাম।

"তখন সবে আমি এম, এ, পাস করেছি। বেশী দিন নয়, বছর-খানেক আগেকার কথা। মামার বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলাম। হঠাৎ সেখানে এক অশিক্ষিতা চাকরাণীকে ভাল লেগে গেল। বয়স কম। কিন্তু ভারি সুন্দর। খোঁজ করে শুনলাম মেয়েটি বিধবা। অমন নিষ্পাপ মূর্ত্তি আমি কখনো দেখি নি।"

"বল হরি, হরি বোল"

"তারপর ক্রমশঃ যেমন হয়। একদিন আড়ালে পেয়ে তাকে প্রেম নিবেদন করলাম। মেয়েটি শুধু বললে—'তা কি হয়?'

আমি তাকে বুঝিয়ে দিলাম "খুব হয়"। বলে' একটা আধুলি বার করে তার হাতে দিতে গেলাম। সে কিছুতে নিলে না।"

"বল হরি, হরি বোল"

"এমনি করে কিছুদিন গেল। যতদিন মামার বাড়ীতে ছিলাম তার আশেপাশে ঘুরেছি। কিন্তু কিছুই সুবিধা করে উঠতে পারি নি।

মামা, মামী, বাড়ীসুদ্ধ লোকজন। একদিন লুকিয়ে তার বাড়ী গেলাম। সেখানেও দেখি এক খাণ্ডার মাসী রয়েছে। বড় অস্বস্তির মধ্যে দিন কাটতে লাগল। হঠাৎ একদিন সুযোগ পেয়ে গেলাম। মুকুজ্জেদের বাড়ী মামামামী বাড়ীসুদ্ধ লোকের নেমন্তন্ন হল। ফাঁকা বাড়ী। কুসুমকে সেদিন একা পেলাম।"

হরেন্দ্রবাবু চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বল হরি, হরি বোল"

"সেই দিনই বুঝলাম, কুসুমও আমাকে ভালবাসে। সেইদিনই তার সেই চকিত চাহনি আর ঠোঁটের কাঁপন দেখে আমি বুঝেছিলাম যে আমার স্বপ্ন সফল হয়েছে। সেদিন তাকে আমি যা-ইচ্ছা তাই করতে পারতাম। কিন্তু কেন জানি না, কিছু করতে পারলাম না। শুধু একটি চুমু খেলাম।"

"বল হরি, হরি বোল।"

আমার আর কিছু বলিবার ছিল না।

হরেন্দ্রবাবু বলিলেন, ''তারপর?"

"তারপর? তারপর আর কিছু নেই। জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয়ে আমি পালিয়ে এলাম। কুসুমের আর দেখা পাই নি, শুনেছিলাম আমি চলে আসার পর সে-ও মামার বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে।"

"বল হরি, হরি বোল"

শ্মশানে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। শব নামান হইল। চিতা সাজান হইল। শবের দেহাবরণ খুলিয়া তাহাকে চিতায় তুলিবার সময় বলিয়া উঠিলাম—

"থামুন—থামুন—থামুন—এ আপনার বাসায় কি করে এলো রমেশবাবু?"

রমেশবাবু বলিলেন—"অসুস্থ হয়ে এই মেয়েটি দুদিন আগে

আমাদের গোয়ালঘরে আশ্রয় নিয়েছিল। বলেছিল, কাকে খুঁজতে সে বেরিয়েছে। তাছাড়া অত প্রশ্ন করার অবসর ছিল কোথায়? বেচারী মারাই গেল। কেন বলুন ত?"

স্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ট্রেনে

ট্রেনে এক বৃদ্ধ চলিয়াছেন। বৃদ্ধ হইলেও লোকটি যে এককালে সৌখিন ছিলেন তা বেশ বোঝা যায়। মাথার চুল হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের মোজাটা পর্য্যন্ত তাঁহার বিগত-যৌবনের রুচির পরিচয় দিতেছে। হাতে একটি মোটা বর্ম্মা চুরুট। খবরের কাগজে নিবদ্ধদৃষ্টি।

তিনি কামরাটিতে একাই ছিলেন। কিউল ষ্টেসনে ট্রেন থামিতে একটি উনিশ-কুড়ি বৎসর বয়সের যুবক আসিয়া সেই কামরায় উঠিল।

যুবকটির ঘাড় চাঁছা, গোঁফ ছাঁটা, চোখে শস্তা দামের খেলো নীল চশমা—পরনে চুড়িদার পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির অন্তরালে গোলাপি গেঞ্জি, মুখে বিড়ি, বগলে একটি মাসিক পত্র। আসিয়াই বেঞ্চি বাজাইয়া গান ধরিয়া দিল—"কে বিদেশী মন উদাসী বাঁশের বাঁশী বাজাও বনে—"। তারপর বৃদ্ধের দিকে তাকাইয়া বিড়িটা ধরাইতে ধরাইতে একমুখ হাসিয়া প্রশ্ন করিল—"আপনার কত দূর যাওয়া হবে স্যার—"

বলা বাহুল্য, বৃদ্ধ বিরক্ত হইয়াছিলেন। সংযতকণ্ঠে তথাপি উত্তর দিলেন—"দানাপুর যাব। আপনি?

"তবে বেশ ভালই হল—আমিও দানাপুরেই যাব। তাহলে আমার

স্যার এই পুঁটুলি আর বইটা রইল। আমি চট্ করে এক কাপ চা খেয়ে আসি। আর বিড়িও আনি এক বাণ্ডিল।"

অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল। মুখে বিড়ি। কিছুক্ষণ কোন কথা-বার্ত্তা নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি হাতের খবরের কাগজটা নামাইতেই যুবকটি হাত বাড়াইল—"কাগজটা একবার পেতে পারি স্যর—"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও কাগজটা দিতে হইল।

একটু পরেই যুবকটি বলিয়া উঠিল—"ইস্—একটি ছোক্‌রা আত্মহত্যা করেছে দেখছি প্রেমে পড়ে'—"

বৃদ্ধ যেন ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিলেন। সশব্দে ঝালটা ঝাড়িয়া দিলেন—"আজকালকার এই গোঁফ-ছাঁটা ছোঁড়াগুলোকে দেখলে গা জ্বলে' যায়।"

যুবকটি কিছুমাত্র না চটিয়া পানের ছোপ-ধরা দাঁত বাহির করিয়া হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আপনাদের ছোক্‌রা কালে কি আপনারা প্রেম করেন নি? সব যুধিষ্ঠির ছিলেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন—"যুধিষ্ঠির হয়ত ছিলাম না। কিন্তু বেয়াদপ ছিলাম না। বুড়ো লোকের সম্মান রেখে কথা কইতাম।—"

ছোক্‌রা দমিবার নহে। আবার হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল, "আপনারাও প্রেম করতেন তাহলে—"

বৃদ্ধ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া রহিলেন। খানিকক্ষণ পরে বলিলেন, "আপনার হাতে ওখানা কি কাগজ? দেখি একবার—"

"হাঁ হাঁ স্যর দেখুন। ওতে বেশ একটা ভাল গল্প আছে, পড়ে দেখুন। 'মগডালে' পড়ে দেখুন—"

বৃদ্ধ মাসিকটির আদ্যোপান্ত উল্টাইয়া "মগডালে" পড়িতে সুরু করিলেন। লেখকের নাম নাই। বৃদ্ধ পড়িতে পড়িতে বর্ম্মাতে ছুটো টান দিয়া বুঝিলেন—ধরাইতে হইবে। দেশলাইটা কোথা গেল? এ পকেট সে পকেট খুঁজিতেছেন এমন সময় যুবকটি চট্ করিয়া নিজের দেশলাইটা হইতে ফস্ করিয়া একটা কাঠি জ্বালাইয়া বলিল—

"এই যে আসুন স্যর—"

"Thanks"

"কেমন লাগছে স্যর গল্পটা—?"

"একেবারে ট্রাশ। শেষ হলে বাঁচি।"

"শেষের দিকটা দেখবেন—রস আছে।"

"দেখা যাক্—"

"বাগানের দৃশ্যটা কেমন লাগল?"

"বেশ অদ্ভুত। তবে কোন জিনিসই শেষ পর্য্যন্ত না পড়ে কিছু বলা যায় না—"

যুবক কিছু না বলিয়া আর একটি বিড়ি ধরাইয়া গান ধরিল—

ফুল বাগানে ঝুলবি যদি আয়
এই ভরা জ্যোছনায়—

বৃদ্ধ পড়িয়া চলিয়াছেন—। বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে।

গল্প শেষ হইলে বৃদ্ধ বলিলেন—"একেবারে বাজে—"। যুবক বলিয়া উঠিল—"কেন শেষকালটায়—যেখানে মণিমালা কদম গাছের মগডালে উঠে বসে আছে। আর নায়ক ভুলে মনে করছে যে সে তালপুকুরে ডুবে গেছে—আর সেই ভেবে ক্রমাগত-সাঁতার দিয়ে খুঁজছে। সেখানটা ভাল লাগল না আপনার?"

"রাবিশ—! আজকাল ছেলেরা বোধ হয় সত্যিকার মেয়েমানুষের সন্ধান পায় না—"

"তার মানে ?"

"তা না হলে ওই রকম গল্প লেখে কেউ। এই সত্যি কথাটা কেউ বুঝছে না যে যাকে স্বর্গের দেবী বলে বলে সবাই অস্থির হচ্ছে—she can be easily bought !"

"সেটা কি সব ক্ষেত্রে সম্ভব—"

"প্রায় ক্ষেত্রেই—অন্ততঃ আমার তাই ধারণা।"

"কি রকম বলুন না—"

"এই ধর একটা concrete example দিচ্ছি। আমারই ছেলেবেলায় প্রায় বছর কুড়ি আগে সৈরভি বলে একটি মেয়ের সঙ্গে প্রেম হল—তার গর্ভে একটা ছেলেও হল ! ছেলেটা যখন মাস ছয়েকের, তখন ব্যস্, মাগী একদিন উধাও। শুনলাম তিনি রামেশ্বর পুরের জমিদারের প্রেমে পড়েছেন ! আমি আর ও নিয়ে বিশেষ কোন মাথাই ঘামালাম না। I had another—girls were so cheap in those days" যুবক মুখ হইতে বিড়িটা ফেলিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ।

তাহার পর যুবক বিনীত স্বরে বলিল—"আমায় মাপ করবেন। না জেনে হয়ত আপনার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছি।"

"মানে ?"

"মানে সৈরভি আমারই মা—তিনি এখনও রামেশ্বরপুর জমিদার বাড়ীতে চাকরাণী আছেন। আপনি, আমার বাবা—"

এই বলিয়া সে প্রণত হইয়া বৃদ্ধের পদধূলি লইল।

তাহার পর হঠাৎ বলিল—"আচ্ছা, আপনার নাম কি হারাধন বসাক ?"

"আমার নাম রমেশ সেন—"

"ও, যাক্। তবে আপনি নন্। মায়ের মুখে শুনেছি আমার বাবার নাম হারাধন বসাক। তাহলে আপনার একটা চুরুট দিন স্যর। আমার বিড়ি গেছে ফুরিয়ে—বাঁচালেন আপনি।"

বলিয়া ছোক্‌রা হি হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ

১

প্রবীণ মোক্তার শৈলেশ্বরবাবু হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাই যথেষ্ট উত্তেজনার কারণ। খবরের কাগজে ছবি ছাপাইয়া, সভা-সমিতি করিয়া কবিতা লিখাইয়া, সর্ব্ববিধ উপায়ে সনাতনপুরের অধিবাসীবৃন্দ অনায়াসে তাহাদের উত্তেজনা প্রকাশ করিতে পারিত। কিন্তু তাহাদের বর্ত্তমানে এ-সব কিছুই করিবার উপায় নাই। নিরুপায় হইয়া তাহারা শুধু ফুস্-ফুস্ গুজ-গুজ করিতেছে মাত্র কারণ আর কিছুই নহে, শ্যামা নাম্নী ধোপানিটিও সঙ্গে-সঙ্গে অন্তর্হিতা হইয়াছে।

যাঁহারা প্রবীণ এবং শৈলেশ্বরের হিতৈষী তাঁহারা বাহিরে কথাটাকে সাধ্যমত চাপা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। হালদার-মহাশয় সর্ব্বত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন, শৈলেশ্বর একটা মোকদ্দমার তদ্বির করিতে খুলনা গিয়াছেন। যাইবার সময় তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছিল।

কথাটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রবীণ হালদার মহাশয় কিন্তু প্রবলভাবে

উহা প্রচার করিতে লাগিলেন। এই হালদার-মহাশয়ের সহিতই কিন্তু আবার যখন প্রবীণ ভাদুড়ী-মহাশয়ের সাক্ষাৎকার ঘটিল তখন তিনি নিম্নস্বরে বলিলেন, শৈলেশ কি কেলেঙ্কারিটাই করলে। ছি ছি—"

এতৎপ্রসঙ্গে ভাদুড়ী-মহাশয় য-ফলা আকার ব্যবহার করাটাই অধিকতর সমীচীন মনে করিলেন! বলিলেন—"আরে ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা-ছ্যা—!"

পরমুহূর্তেই কিন্তু ভাদুড়ী সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, কোন ধোপানিটা বলত হে?"

দেখা গেল, হালদার-মহাশয় বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জানেন। তিনি উক্ত রজকিনীর আবাস-স্থান, চেহারা বয়স এবং স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়া উপসংহারে বলিলেন, "শৈলেশ যে ভেতরে-ভেতরে এতখানি জড়িয়ে পড়েছে কে জানত?' অত বড় ছেলে অত বড় মেয়ে—"

ভাদুড়ী-মহাশয় আবার বলিলেন, "ছ্যা-ছ্যা। লোক হাসালে।" খোঁড়া মল্লিক-মহাশয় কৌশলে খবর সংগ্রহ করিলেন যে শ্যামা পলাইবার আগের দিন তাহার স্বামী পিরু ধোবার নিকট, মার খাইয়া ছিল। মল্লিক-মহাশয় শৈলেশের হিতাকাঙ্ক্ষী। তিনি পিরু-ধোপাকে বলিলেন, "কথাটা আর কারো কাছে প্রকাশ করিস নি, বুঝলি?"

বিস্মিত পিরু জিজ্ঞাসা করিল, "কোন কথাটা?" মল্লিক-মহাশয় থতমত খাইয়া কোন সদুত্তর দিতে না পারিয়া খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে নিজেদের দলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া পিরু-ঘটিত ব্যাপার প্রকাশ করিলেন। করিবামাত্র সকলে মিলিয়া মল্লিককেই বকিতে লাগিলেন। —কেন সে পিরু-ধোপার নিকট গিয়াছিল? এ কি আহাম্মকি!

সুতরাং মল্লিক-মহাশয়ের এই কাঁচা কাজটি সামলাইতে পাকাবুদ্ধি

মুকুজ্জ্যে-মহাশয়কে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পিরুর বাড়ীতে যাইতে হইল এবং নিরীহ মল্লিকের নামে মিথ্যা দোষারোপ করিয়া বলিতে হইল,মল্লিকের কথায় কিছু মনে করিসনি। সিদ্ধির ঝোঁকে যা-তা বলেছে।"

এবারও বিস্মিত পিরু কহিল, "মানে ? কি বলেছেন ?" মুকুজ্জ্যে দাঁত বাহির করিয়া বলিলেন, "মানে ? ও কিছু নয়।—বুঝলি ?" বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের দলে আসিয়া সংবাদ দিলেন, "পিরু একেবারে ক্ষেপে আছে হে! মল্লিক একেবারে সাপের ঘাড়ে পা দিয়েছে।"

সকলে চটিয়া মল্লিকের উপর খড়্গহস্ত! বেচারি মল্লিক দলছাড়া হইয়া একা একা ঘুরিতে লাগিলেন। পিরুর দল দূর হইতে মল্লিককে যখনই দেখিল, তখনই হাসিল এবং ভাবিল মলিকমহাশয় আজকাল সিদ্ধি খাইতেছেন।

যাই হোক শৈলেশ্বরবাবুর বন্ধুবর্গ—মিত্র, হালদার,মুকুজ্জ্যে প্রভৃতি প্রবীণ মহাশয়গণ একজোট হইয়া একবাক্যে শৈলেশ্বরবাবুর খুলনা-গমন সমর্থন করিতে লাগিলেন। ভিতরে-ভিতরে অবশ্য ভাদুড়ী হইলেন কৌতূহলী, মুকুজ্জ্যে উত্তেজিত, হালদার বিস্মিত এবং মল্লিক ক্ষুব্ধ!

ইহা হইল শৈলেশ্বরের হিতৈষীবর্গের মনোভাব। কিন্তু সনাতনপুর গ্রামটি নেহাৎ ছোট নয়! অনেকগুলি বনিয়াদি ভদ্রগৃহস্থের সেখানে বসবাস। গোটা-দুই চণ্ডীমণ্ডপ সেখানে আছে। সুতরাং শৈলেশ্বর বাবুর বিপক্ষদলও একটি ছিল এবং যেহেতু শৈলেশ্বরবাবু বড়লোক, পরোপকারী,কর্ম্মনিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ছিলেন,সেই হেতু তাঁহার বিপক্ষ দলটি বেশ ভারিও ছিল। তাঁহারা সুযোগ পাইলেন। শৈলেশ্বর-রজকিনী-প্রসঙ্গটা তাঁহারা বেশ-একটু রঙ চড়াইয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

একজন আসিয়া খবর দিল, "হালদার-মশাই বলে বেড়াচ্ছেন যে, শৈলেশ্বরবাবু নাকি খুলনা গেছেন।"

হুঁকাতে দুইটি টান মারিয়া রায়-মহাশয় বলিলেন, "হালদারকে বলে দিও হে—সূর্য্য আজকাল পশ্চিমেই ওঠে—তা আমরা সবাই জানি। খুলনার চেয়ে ঢাকা বললে আরও মানাত।"

মাথা নাড়িয়া মুচকি হাসিয়া লাহিড়ী বলিলেন—"আহা চট কেন। একথা হালদার বলবে না ত কে বলবে বল। ওই দলটার সব কটা পাজী। বুড়ো মিত্তিরটা সেদিন দেখি লুকিয়ে তাড়ি খেয়ে ফিরছে। উনি আবার মাষ্টারি করেন।"

"ভাদুড়ীর বা কি কম! রোজ ওঁর ময়নাদীঘির ধারে বেড়াতে যাওয়াটার অর্থ কি?

বৃদ্ধ গোস্বামী-মহাশয় এতক্ষণ কিছু বলেন নাই।

তিনি এইবার সংক্ষেপে বলিলেন,—"সব ঘুঘু।"

"পাঁড়-ঘুঘুটি এইবার ফাঁদে পড়েছেন!" এই বলিয়া রায়মহাশয় হুঁকাটি গোস্বামীর হস্তে দিলেন।

২

ফলে অচিরকাল মধ্যে শৈলেশ্বরবাবুকে কেন্দ্র করিয়া ভাদুড়ী-মহাশয়ের বিরুদ্ধে রায় মহাশয়, রায়-মহাশয়ের বিরুদ্ধে মুকুজ্জ্যে-মহাশয়, মুকুজ্জ্যে-মহাশয়ের বিরুদ্ধে গাঙ্গুলি-মহাশয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়া গেলেন। শৈলেশ্বরবাবুর সম্পর্কে অসম্ভব-রকম সব গুজব রটিতে লাগিল। অধিকাংশ লোকের মতে তিনি কলিকাতায় গিয়াছেন। কিন্তু এই কলিকাতা-সম্পর্কিত মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি জনমত ক্রমশঃ গঠিত হইতেছিল। তাহা এই যে, ট্রেনে করিয়া তিনি কোথাও

যান নাই—কারণ ষ্টেশনের কর্ম্মচারীরা কেহ তাঁহাকে ট্রেনে যাইতে দেখেন নাই। সুতরাং তিনি পদব্রজেই কোথাও গিয়া স-রজকিনী আত্মগোপন করিতেছেন! একজন প্রত্যক্ষদর্শী জোর-গলায় বলিতে লাগিলেন, "আমি স্বচক্ষে দেখেছি, শৈলেশ্বরবাবু ধোপানিটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে মাঠামাঠি দৌড়ুচ্ছেন।"

৩

শৈলেশ্বরবাবুর পত্নী সপুত্রকন্যা পিত্রালয়ে গিয়াছিলেন। শৈলেশ্বর-বাবুর পলায়নের গুজবটা এত ব্যাপকভাবে রটিয়াছিল যে,ভীত-চকিত শৈলেশ্বর গৃহিণী স্বয়ং একদিন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আসিয়া কিন্তু তিনি আরও অকূল পাথারে পড়িলেন। তাঁহার সমবয়স্কা গৃহিণীগণ বেশ রসায়ন দিয়া নানা কথা তাঁহাকে শুনাইল।

"ওমা কি ঘেন্নার কথা, শুনে লজ্জায় বাঁচি না—।"বলিয়া অনেকেই গালে হাত দিল এবং ঘাড় কাৎ করিল।

গাঙ্গুলী-গৃহিণী বলিলেন, "পুরুষমানুষকে কিছু বিশ্বাস নেই বোন, কিছু বিশ্বাস নেই। একবার চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্।"

হালদার-গৃহিণী একটু সহানুভূতির সুর দিয়া বলিলেন, "উনিত বলছিলেন শৈলেশবাবু খুলনা গেছেন—"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়া বলিলেন, "থাম লো থাম্। আমার কর্ত্তাটিও ওই দলে। সব চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই। বলে দিয়েছি এবার পষ্ট করে যে ওসব দলে আর মিশতে পাবে না। খাবেদাবে রান্নাঘরের দাওয়াটিতে চুপ করে বসে থাকবে। বুড়ো মিনষের অত আড্ডা দেওয়া কেন?

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণীর ফাঁদি-নথ ঘন-ঘন আন্দোলন হইতেলাগিল।

মরীয়া হইয়া শৈলেশ্বরবাবুর স্ত্রী বলিলেন,"কোনদিন কিন্তু ওঁকে শ্যামা ধোপানির সংস্রবে দেখিনি। আমাদের কাপড় ধোয় ছিরু ধোপা। শ্যামা ত কোনদিন আসেও নি আমাদের বাড়ী—"

মুখোপাধ্যায়-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "এই বুদ্ধি না হলে তোমার স্বামী যাবে কেন বোন্! তারা যা করবে তা কি তোমাকে সাক্ষী রেখে করবে নাকি? শৈলেশবাবু হলেন একটা ঘাগি মোক্তার। তার সঙ্গে চালাকি। পুরুষমানুষদের বশে রাখার একমাত্র উপায় হচ্ছে—নজরবন্দী করে রাখা। চোখে চোখে রাখা। যা বল্লেন আমাদের গাঙ্গুলিদিদি, চোখের আড়াল হয়েছে কি বাস্।"

৪

শৈলেশ্বরবাবুর দুই পুত্র মাধব ও যাদব। মাধব, বি, এ, পাস্ করিয়াছে। যাদব আই, এ, পড়িতেছে। তাহারা পূজনীয় পিতার সম্পর্কে এই দুরপনেয় কলঙ্কের কথা শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল। কিন্তু কি করিবে। তাহাদের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেও সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিয়াছিল যে শৈলেশ্বরবাবু প্রকৃতই একটি ঝুনা-ভণ্ড—এতদিনে দিবালোকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যেও কয়েকজন ছোকরা মাধব ও যাদবের পক্ষ অবলম্বন করিল। এবং মৌখিক সহানুভূতি জানাইতে লাগিল। এদিকে বৃদ্ধদের দুইপক্ষের মধ্যে ব্যাপার অনেকদূর গড়াইয়াছিল। হালদার-মহাশয়ের উপর ধনী রায়-মহাশয় এতদূর চটিয়াছিলেন যে,তিনি তাঁহার নামে ডাব-চুরির অপবাদ দিয়া নালিশ ঠুকিয়া দিয়াছেন। ভাদুড়ী-মহাশয় মাণিক পোদ্দারের নিকট হ্যাণ্ডনোট লিখিয়া কিছু টাকা লইয়াছিলেন, গাঙ্গুলী মহাশয়ের উস্কানিতে পোদ্দারের পো ভাদুড়ী-মহাশয়কে চাপ দিতে সুরু

করিয়াছে। মল্লিক-মহাশয় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারি করেন। তিনি বিপক্ষদলের কাহারো বাড়ী আর চিকিৎসা করিবেন না বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন। ফলে গোস্বামী-মহাশয় কলিকাতা হইতে "সরল হোমিওপ্যাথি–শিক্ষা" নামক পুস্তক ক্রয় করিয়া হোমিওপ্যাথি শিখিতে লাগিয়া গিয়াছেন।

শৈলেশ্বরবাবুর নামে দুই-চারি খানি চিঠি আসিয়াছিল। চিঠিগুলি কি করিয়া বিপক্ষদলের হস্তগত হইল। এই ব্যাপারে ক্ষেপিয়া স্বদলের কয়েকজন পাণ্ডা স্থানীয় পোস্টমাস্টারের বিরুদ্ধে এক প্রকাণ্ড দরখাস্ত দিয়া ফেলিলেন।

পোস্টমাস্টার বেচারা এই আকস্মিক বিপদে সকলের দ্বারস্থ হইয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলিবার জন্য সকাতরে অনুরোধ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। গ্রামের উকিল আশুবাবু টেবিল চাপড়াইয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন—"Everything is fair in love and fight! শেষ পর্য্যন্ত লড়ে দেখব—তবে ছাড়ব!"

৫

সনাতনপুরে ঘোর চাঞ্চল্য। সকলেরই রসনা সবেগে চলিতেছে। এমন সময় গ্রামে দুইটি ঘটনা ঘটিল।

—হঠাৎ শ্যামা ধোপানি কোথা হইতে ফিরিয়া আসিল। সে নাকি মামার বাড়ী গিয়াছিল। দেখা গেল, পিরুর সহিত তাহার কোন কলহ নাই। দুইজনে গাধার পিঠে মোট চাপাইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে ঘোরাফেরা করিতে লাগিল—যেন কিছুই হয় নাই। প্রবীণের দল কতকটা হতভম্ব হইয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাহার পর অবশ্য তাঁহারা ব্যাপারটা বুঝিয়া ফেলিলেন, "ভূতের কাছে

মামদোবাজী! মামার বাড়ী! পিরু-ব্যাটা টাকা খেয়েছে নিশ্চয়। মাধব ছেলেটা ঘড়েল আছে ত।"

শৈলেশ্বর মোক্তার আর ফিরিলেন না। কারণ তিনি মারা গিয়াছিলেন। প্রেমে পড়িয়া নয়—কূপে পড়িয়া। গ্রামেই একটা অব্যবহৃত এঁদো নেড়া কূয়া ছিল। তাহারই ভিতর হইতে তাঁহার গলিত শবদেহটা কিছুদিন পরে বাহির হইল।

মল্লিক-মহাশয় আবিষ্কার করিলেন।

মাত্র দশটি টাকা

১

অপ্রস্তুত হইয়া বিধুবাবু বলিলেন, "আচ্ছা থাক, তাতে কি হয়েছে? হাতে যখন থাকবে, তখন দেবেন। ব্যস্ত কি?"

ততোধিক অপ্রস্তুত হইয়া নিখিলবাবু বলিলেন, "না, ব্যস্ত হবার কথা বৈ কি! এই নিয়ে আপনাকে তিনবার ঘোরালাম। আজ আপনাকে ঠিক দিতাম, কাল রাত্রে টাকাটা এনেও রেখেছিলাম। কিন্তু সকালে বোসজা-মশাই এসে একেবারে নাছোড় হয়ে পড়লেন। বেনারসে তাঁর ছেলের অসুখ করেছে—তার এসেছে—কিছু টাকা না হলে—"

বিধুবাবু বলিলেন, "তা বেশ করেছেন দিয়েছেন। তার জন্যে আর কি হয়েছে। তিনি ফেরৎ দিলে আমাকে দেবেন এখন। আজ দেখি যদি বিপিন কিছু ধার দেয়। আমারও আজ দরকার কিছু টাকার—" বলিয়া বিধুবাবু উঠিলেন। বিধুবাবু বাহির হইয়া যাইতেই

নিখিলবাবুর অপ্রস্তুত ভাবটা কাটিয়া গেল এবং মনে মনে তিনি বলিলেন, "চামার কোথাকার! ক'টা টাকার জন্যে আর ঘুম হচ্ছে না।"

বাহিরে গিয়া বিধুবাবুরও মুখভাব বদলাইল এবং তিনিও অনুচ্চস্বরে বলিলেন, "বেটাচ্ছেলে ভোগাবে দেখছি।"

২

স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে দিন কাটিতে থাকে। একটি সপ্তাহ কাটিল। বিধুবাবু আবার একদা প্রাতে নিখিলবাবুর বাহিরের ঘরটিতে আসিয়া দেখা দিলেন। প্রায় মাস তিনেক পূর্ব্বে বিধুবাবু নগদ দশটি টাকা নিখিলবাবুকে ধার দিয়াছিলেন, এবং "কালই সকালে দিয়ে দেব" এই প্রতিশ্রুতি পাইয়াছিলেন, কিন্তু নিয়তির এমনই পরিহাস যে, আপিসের গণ্যমান্য বড়বাবু নিখিলনাথ মিত্রকে অদ্যাপি অধমর্ণই থাকিতে হইয়াছে—তাহাও সামান্য দশটি টাকার জন্য এবং বিধুচরণ বসুর মত একটা লোফারের নিকট! "হায়রে নিয়তি—তোমাকে গড় করি। নলরাজার মত বিচক্ষণ রাজাকেও তুমি নাকাল করিয়াছিলে, আমিতো সামান্য কেরানি মাত্র—"ইহাই ছিল নিখিলনাথের সান্ত্বনা। বাল্যকালে নিখিলনাথ মহাভারতের গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন, এইরূপ জনশ্রুতি আছে।

বিধুচরণ আসিতেই নিখিলনাথ মুখে এমন একটা ভাবপ্রকাশ করিলেন, যেন তিনি বিধুচরণের পথ চাহিয়াই উৎকণ্ঠিত ভাবে দিনযাপন করিতেছিলেন। বিধুচরণ আসাতে তাঁহার সে দারুণ উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইল।

"বাঁচা গেল! আসুন বিধুবাবু, আপনার কথা রোজই ভাবি; আজ আমাদের পাড়ায় গণেশ-অপেরা যাত্রা হবে! আসবেন শুনতে?

একজন মনোমত সঙ্গী না পেলে এসব জিনিস শুনে সুখ নেই! আসুন না।”

যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছেন, বিধুচরণের মুখমণ্ডলে এইরূপ একটি আনন্দ-জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। তিনি উদ্ভাসিতচক্ষু তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশত! কটার সময়—”

“আটটা! সন্ধ্যে আটটা—”

“আসব শুনতে।”

এমন সময় নিখিলনাথবাবুর ছয়বৎসরের কন্যা মিণ্টু আসিয়া বলিল, “বাবা, মা বললে চিনি ফুরিয়ে গেছে।” বিধুবাবু মিণ্টুকে ধরিয়া তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। এত আলাপ তিনি নিজের মেয়ের সহিতও করেন না।

“বাঃ খুকী তোমার ফ্রকটি তো বেশ সুন্দর! মাথার ফিতেও চমৎকার দেখছি তো!”—ইত্যাকার নানারূপ আলোচনায় আরও মিনিট দশেক কাটিল।

বিধুচরণবাবুর এখানে আসার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দশটি টাকা। কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাগাদা করিতে পারিলেন না। নানা ছুতানাতায় কালহরণ করিতে লাগিলেন, যদি নিখিলনাথবাবু কথাটা নিজেই পাড়েন। বিধুচরণবাবুর চক্ষুলজ্জা প্রবল।

নিখিলনাথবাবুর মহাভারতীয় মন। তিনি ও-দিক দিয়াই গেলেন না। এ বৎসর ফতেপুর সিক্রিতে কি ভীষণ শীত পড়িয়াছে, এবং তজ্জন্য গরীব লোকদের কি দারুণ কষ্ট হইতেছে, এই সম্পর্কে তিনি নানাভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজিল। নিখিলনাথবাবু বলিলেন, “এইবার আপিস যাওয়ার যোগাড় করা যাক।”

বিধুচরণ এইবার মরীয়া হইয়া বলিয়া ফেলিলেন,"বোস্‌জা মশায়ের কাছে টাকাটা ফেরত পেয়েছেন না কি?" নিখিলনাথ যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, "ঠিক ঠিক ভুলেই গেছি তো। টাকা আপনার জন্যে রেখেছি আমি—" বলিয়া তিনি পকেট হাতড়াইতে লাগিলেন।

"আরে গেল যা! চাবিটা ফেললাম কোথা!" সমস্ত পকেটগুলি খুঁজিলেন। টেবিলের নীচে, আলমারীর মাথায় সর্ব্বত্র খুঁজিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য, চাবি পাওয়া গেল না। বিধুচরণও খুঁজিলেন এবং শেষটা বলিলেন, "আচ্ছা থাক—ব্যস্ত কি—"

৩

সন্ধ্যাকালে যথাসময়ে আসিয়া বিধুবাবু দেখিলেন, নিখিলনাথ অনুপস্থিত! খোঁজ করিয়া জানিলেন যে, কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যে তিনি বাহিরে গিয়াছেন কখন ফিরিবেন স্থিরতা নাই। বিধুচরণ একাই বসিয়া যাত্রা শুনিলেন। উত্তরার অভিনয় তাঁহার বেশ ভাল লাগিল! শরীরের সহিত মনের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ আছে তাহা অস্বীকার করা যায় না! প্রমাণও মিলিল। উত্তরার দুঃখে তিনি খুব বেশী অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। পরদিন সকালে উঠিয়া দেখিলেন হৃদয়ের বেদনা গলদেশ আশ্রয় করিয়াছে। ঢোক গিলিতে কষ্ট হইতেছে এবং টনসিল দুইটি ফুলিয়াছে। এমন কি টেম্পারেচার লইয়া দেখিলেন, সামান্য জ্বরও হইয়াছে। সামান্য জ্বর ক্রমশঃ অসামান্য হইয়া উঠিল। তখন শয্যাগত বিধুচরণ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, নিখিলনাথের সঙ্গে দেখা না হইলে তিনি কদাপি যাত্রা শুনিতে যাইতেন না, এবং ইহাও সত্যকথা যে, মূলে দশটি টাকা না থাকিলে কেবলমাত্র সঙ্গকামনায় নিখিলনাথের সহিত তিনি দেখাও করিতে যাইতেন না। এইরূপ বিশ্লেষণ

করিবার পরে বিধুচরণ বলিতে বাধ্য হইলেন, "ব্যাটা আমাকে ধনে প্রাণে মারবে দেখছি!"

বিধুচরণ একসপ্তাহ শয্যাশায়ী থাকিলেন এবং চিকিৎসা বাবদ তাঁহার ১৭৸/১৫ খরচ হইল।

৪

উক্ত ঘটনার পর একটি মাস কাটিয়াছে। কারণ পৃথিবী বাঙালী নহে, নিয়মিতভাবে সে নিজকক্ষে ঘুরিয়া চলিয়াছে, নিয়মিতভাবে দিবারাত্রি আসিতেছে এবং যাইতেছে।

সে দিন মাসের ছয় তারিখ। নিখিলনাথ নীচের ঘরটাতে বসিয়া মানসাঙ্ক কষিতেছিলেন। আগামীকল্য তিনি মাহিনা পাইবেন। কাটিয়া-কুটিয়া ৫৫।৶/১০। ইহার মধ্যে বাড়ীভাড়া দিতে হইবে ১৫৲, মুদীকে দিতে হইবে ২০৲। বাকী থাকে ২০।৶/১০। সাড়ে সাত আনা ছাড়িয়া দিলে—থাকে কুড়ি টাকা। ইহার ভিতর সমস্ত মাসের তরকারি খরচ, ছেলেমেয়ের স্কুলের মাহিনা, দুধ, কেরোসিন তেল, কাপড়-চোপড়ের বিল। নাঃ, বিধুচরণ বাবুকে দশটা টাকা দেওয়া অসম্ভব।

গৃহিণীর হাতে অবশ্য গোটাকয়েক টাকা আছে। বাজার খরচ প্রভৃতি হইতে এক-আধ পয়সা করিয়া বাঁচাইয়া নিখিল-গৃহিণী গোটা কয়েক টাকা জমাইয়াছেন ঠিকই কিন্তু ঠিক কয়টা টাকা তাহা নিখিলের সঠিক জানা নাই; তাহা ছাড়া এই কয়টি টাকা হইতে শোভাকে বঞ্চিত করিতে নিখিলনাথের মায়া হয়। কি বলিয়া চাহিবে!

বিধুর কাছে সে টাকাটা লইয়াছিল, রেস্ খেলিবার জন্য। বলা বাহুল্য, হারিয়াছে। একথা অকপটে স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়া

বলিবার মত নহে। নিখিলনাথ ভাবিয়াছিল, কোনরূপে ম্যানেজ করিয়া টাকাটা সে বিধুকে দিয়া দিবে। কিন্তু প্রতিমাসেই সে একবার করিয়া মানসাঙ্ক কষিয়া দেখিতেছে, ম্যানেজ করা অসম্ভব। অথচ মিথ্যা অজুহাত দেখাইয়া বিধুকে আর ঠেকাইয়া রাখাও অসম্ভব। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা সীমা আছে। নিখিলনাথ কি করিবে ভাবিতেছিল এমন সময় গলির মোড় হইতে হঠাৎ বিধুর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিল, "এই একবার নিখিলবাবুর কাছে যাচ্ছি!"

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় নিখিলনাথ তাড়াতাড়ি উঠিয়া পাশেই একটা চোরকুঠুরি ছিল তাহাতে ঢুকিয়া খিল লাগাইয়া দিলেন।

৫

"নিখিলবাবু!"

মিণ্টু আসিয়া কহিল, "বাবা তো এক্ষুনি এখানে বসেছিলেন। বাইরে গেছেন তাহলে।"

"আচ্ছা। এলে বোলো যে আমি এসেছিলাম।"

"আচ্ছা।"

বিধুবাবু চলিয়া গেলেন। বিধুবাবু চলিয়া যাইতে না যাইতে "বাপরে বাপ—উঃ উঃ—" করিতে করিতে সবেগে নিখিলনাথ চোরকুঠুরি হইতে বাহির হইলেন। চোর-কুঠুরির কোণে একটা বোলতার চাক ছিল। কামড়ের চোটে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া নিখিলবাবু গাড়ু হইতে খানিকটা জল লইয়া চোখে মুখে ঝাপ্টা দিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বাঁ চোখটা ফুলিয়া চোখ ঢাকিয়া গেল এবং ডান দিকের গালটার স্ফীতি মিণ্টুর হাস্যোদ্রেক করিল। নিখিলনাথ উপরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন।

ঠিক এমনি সময় দুইজন লোক ধরাধরি করিয়া বিধুবাবুকে লইয়া হাজির। কি করিয়া নিখিলনাথের কাছে টাকাটা আদায় করা যায় তাহাই ভাবিতে ভাবিতে তিনি এমন অন্যমনস্কভাবে পথ চলিতেছিলেন যে কলার খোসায় পিছলাইয়া একেবারে সাংঘাতিক রকম পড়িয়া গিয়াছেন। মাথা কাটিয়াছে, হাতও ভাঙিয়াছে। দুইজন পথিকের সহায়তায় অতিকষ্টে তিনি নিখিলনাথের বাড়ী ফিরিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী অনেক দূর।

নিখিলনাথ উপরে গিয়া বিছানায় শুইয়াছিলেন। ডাকাডাকিতে নামিয়া আসিয়া দক্ষিণ চক্ষুটি দিয়া দেখিলেন বিধুচরণ আবার ফিরিয়াছে।

উভয়ে উভয়কে দেখিয়া যুগপৎ বলিয়া উঠিলেন, "বাঁচান আমাকে।"

* * * *

আরও তিনমাস কাটিয়াছে।

নিখিলনাথ এখনও টাকা দেন নাই।

বিধুচরণ এখনও ঘোরাফেরা করিতেছেন।

শেষ রক্ষা

সুপ্রসিদ্ধ গল্পলেখক অম্বুজাক্ষ ভৌমিক অতিশয় চিন্তাগ্রস্ত। বর্ত্তমান বাজারে লেখক মাত্রেই একটু বিপন্ন। ভাল লেখার সমঝদার নাই, ভাল লেখার বাজার দর কম এবং ভাল লেখাকে ক্ষত বিক্ষত করিবার জন্য একদল সমালোচক সর্ব্বদাই সশস্ত্র হইয়া আছেন। ভৌমিক মহাশয়ের বর্ত্তমান চিন্তার কারণ কিন্তু স্বতন্ত্র। তিনি গত পরশ্ব হইতে একটি গল্প সুরু করিয়াছেন—খুব মনোরম ভাবেই সুরু করিয়াছেন—(লিখিতে লিখিতে নিজেরই তাঁহার বার কয়েক রোমাঞ্চ হইয়াছে)—কিন্তু কি করিয়া এই বিস্ময়কর উপাখ্যানটি তিনি শেষ করিবেন তাহা তাঁহার মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। গল্পের শেষ রক্ষা করা সত্যই একটি দুরূহ সমস্যা—গল্পলেখক মাত্রেরই তাহা জানা আছে। শেষ বরাবর আসিয়া ভৌমিক মহাশয় লেখনী সম্বরণ করিয়া বসিয়া আছেন। সকাল হইতে চার পেয়ালা কড়া চা এবং এক প্যাকেট সিগারেট্ শেষ হইয়া গিয়াছে—গল্প কিন্তু শেষ হইতে চাহে না।

ভৌমিক মহাশয় বসিয়া আছেন—নির্জ্জন ত্রিতলের ঘরটিতে। ঘরের কপাটটি খোলা। মুক্ত দ্বারপথ দিয়া কিঞ্চিৎ বাতাস, স্ত্রীর কণ্ঠস্বর, ছেলেমেয়েদের হুড়োমুড়ির শব্দ এবং দুইটি বায়সের চীৎকারধ্বনি প্রবেশ করিতেছিল। বাতাসটা মন্দ লাগিতেছিল না—কিন্তু উপরোক্ত শব্দগুলির প্রত্যেকটিই যেন গল্পের প্লটটিকে গলাধাক্কা দিয়া মস্তিষ্ক হইতে বিদূরিত করিয়া দিতেছে—ভৌমিক মহাশয়ের এইরূপ মনে হইল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দ্বারদেশ অর্গলবদ্ধ করিলেন এবং একটি ভীমকান্তি সিগার ধরাইয়া হাঁটু নাচাইতে লাগিলেন। এই ভাবে কিছুক্ষণ

কাটিল। জানু যুগল পরিশ্রান্ত হইল—কিন্তু গল্পের কোন সুরাহা হইল না। ভৌমিক মহাশয় তখন ক্লান্ত হাঁটুকে আর না ঘাঁটাইয়া দক্ষিণ কর্ণটি লইয়া পড়িলেন। একটি দিয়াশালাই কাঠি সন্তর্পণে তিনি দক্ষিণ কর্ণ-বিবরে প্রবেশ করাইয়া দক্ষিণ চক্ষু ও গণ্ডদেশ কুঞ্চিত করিলেন। গল্পের শেষটা আজ লিখিয়া দিতেই হইবে—কারণ গল্প দেওয়ার আজই শেষ দিন। আজ গল্পটি দিতে না পারিলে "চমৎকারিণী নামক মাসিক পত্রিকায় তাহার স্থান এ মাসে অন্ততঃ হইবে না। এ মাসে না হইলে পঁচিশটি টাকা ত মারা যাইবেই—উপরন্তু তিনি গৃহিণী এবং সম্পাদক উভয়েরই নিকট খেলো হইয়া যাইবেন।

সম্পাদককে কথা দিয়াছেন যে, একটি বৃহৎ চমকপ্রদ গল্প তিনি পঁচিশ টাকা পাইলে লিখিয়া দিবেন এবং তৎপূর্ব্বে,তিনি গৃহিণীর নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে আগামী মাসে তিনি তাঁহাকে পঁচিশ টাকা দিয়া একখানি মুগার শাড়ী খরিদ করিয়া দিবেনই দিবেন। দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বৈ কি!

গৃহিণীকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে বলিয়াই তিনি "চমৎকারিণী" পত্রিকায় আদৌ লিখিতে রাজী হইয়াছেন। তাহা না হইলে তিনি ওরূপ তৃতীয় শ্রেণীর কাগজে উত্তেজক গল্প লিখিতে রাজী হইতেন কি? অম্বুজাক্ষ ভৌমিক একজন নামজাদা রক্ষণশীল লেখক। চিরকাল তিনি তাঁহার প্রত্যেকটি গল্পে পুণ্যের জয় ও পাপের ক্ষয় দেখাইয়া আসিয়াছে এবং এই ধরণের গল্প ভৌমিক মহাশয়ের হাতে খোলেও ভাল। তাঁহার লিখিত "হিন্দু বৈজয়ন্তী" গ্রন্থের পাতায় পাতায় উপদেশ। গল্পচ্ছলে নীতিকথা প্রকাশ করিতে তিনি অদ্বিতীয়! তাঁহার 'বঙ্গ বিষাণ' নামক গ্রন্থটি প্রত্যেক যুবক-যুবতী, শুধু যুবক-যুবতী কেন, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেরই পড়িয়া দেখা উচিত। এ হেন ভৌমিক মহাশয় প্রৌঢ়ত্বের

শেষ সীমায় উপনীত হইয়া কেবল গৃহিণীর মনোরঞ্জনার্থেই এক ছ্যাবলা কাগজের সম্পাদকের ফরমায়েস অনুযায়ী এই ফ্যাসাদে পড়িয়াছেন। নীতিমূলক তাঁহার একটি সুন্দর গল্প ছিল! কেমন করিয়া বিলাসপুরের ধর্ম্মাত্মা জমিদার একটি অজ্ঞাতকুলশীলা রমণীর সতীত্ব রক্ষার নিমিত্ত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পথে দাঁড়াইলেন—কেমন করিয়া দুরাত্মা ধনী মাধবলাল বজ্রাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং কেমন করিয়া আবার সেই সর্ব্বস্বান্ত জমিদার কেবলমাত্র পুণ্যফলে এক সন্ন্যাসীর সহায়তায় হস্তচ্যুত জমিদারী পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইলেন—এই সমস্তই সুন্দর প্রাঞ্জল ভাষায় তিনি তাঁহার "সতীর আশীর্ব্বাদ" নামক গল্পটিতে লিখিয়াছিলেন। কিন্তু "চমৎকারিণী"র সম্পাদক মহাশয় মাইনাস্ থ্রী চশমা পরিধান করিয়া সম্ভবতঃ কন্টিনেন্টাল ভাব-রাজ্যের অলি-গলিতে ঘুরিয়া বেড়ান—তিনি উক্ত গল্পটি পছন্দ করেন নাই। কিঁ ধরণের গল্প হইলে তাঁহার পছন্দ হইতে পারে তাহারও আভাস দিয়াছেন। তরুণী গৃহিণীর অভিমানভরা মিষ্ট মুখখানির খাতিরে "যা থাকে কপালে" বলিয়া পরশু দিন হইতে ভৌমিক মহাশয় কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া পড়িয়াছেন। বদ্ধপরিকর হইয়াও বিশেষ কিছু সুবিধা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে না। শেষ-পর্য্যন্ত কানে দিয়াশালাই কাঠিও ঢুকাইতে হইয়াছে।

২

"উঃ" বলিয়া কাঠিটি ভৌমিক মহাশয় কান হইতে বাহির করিলেন। বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলেন খোলার বাড়ীর চালে বসিয়া একটি বীর হনুমান দাঁত খিঁচাইতেছে এবং একটি বৃদ্ধা তদ্দর্শনে নিজের বড়িগুলি সামলাইতেছেন। ভৌমিক মহাশয় যে গল্প ফাঁদিয়াছেন এই সব অকিঞ্চিৎকর দৃশ্য তাহাতে কাজে লাগিবে না ভাবিয়া তিনি চক্ষু

অন্যদিকে ফিরাইলেন। অন্য দিকে মানে ঘরের দেওয়ালের দিকে! কিন্তু ভৌমিক মহাশয়ের ভাড়াটে গৃহের দেওয়ালেও এমন কোন কিছু ছিল না যাহা তাঁহার "প্রেমের জন্য" নামক গল্পের শেষরক্ষা করিতে পারে। নিরুপায় হইয়া ভৌমিক চক্ষু মুদিয়া চুরুটে একটি টান দিলেন। টান দিয়াই বুঝিলেন চক্ষু খুলিতে হইবে। চুরুট নিবিয়াছে, ধরান দরকার। নিপুণভাবে চুরুটটি তিনি ধরাইলেন। ধরাইয়া ভাবিতে লাগিলেন এ অবস্থায় কি করা উচিত। নায়ক নায়িকার বাড়ী পাঁচিল ডিঙাইয়াছে। অমাবস্যার দ্বিপ্রহর রাত্রি। টিপি টিপি বৃষ্টি পড়িতেছে। নায়ক গুঁড়ি মারিয়া আসিয়া একটি পেয়ারা গাছের তলায় আশ্রয় লইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু সম্মুখে একটি গরু থাকাতে আর অধিকদূর অগ্রসর হইবার সাহস হইতেছে না।

ভৌমিক মহাশয় এই পর্য্যন্ত অবলীলাক্রমে লিখিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু ইহার পর আর কি লিখিলে আর্ট বজায় থাকিবে, নায়ক আর কোন্ কোন্ দুরূহ প্রক্রিয়া করিলে তাহা সম্পাদকের মনোহরণ করিতে পারিবে তাহা ভৌমিক মহাশয়ের মাথায় কিছুতেই আসিতেছে না। তিনি চিরকাল পুণ্যের জয় ও পাপের পতন চিত্রিত করিয়া আসিয়াছেন —এই অশ্লীলমনা নায়ককে লইয়া এখন কি করা কর্ত্তব্য তাহা তিনি ভাবিয়াই পাইতেছেন না। ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার ইচ্ছা করিতেছে 'বেল্লিককে' চাবকাইয়া উহার পিঠের ছাল ছাড়াইয়া ফেলি! কিন্তু তাহাতে আর্ট ক্ষুণ্ণ হইবে এবং আর্ট ক্ষুণ্ণ হইলেই পঁচিশটি টাকা!

উঃ ভগবান্ এ কি সমস্যা! তখন তিনি প্রাণপণে ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলেন—"ঈশ্বর এ উভয়-সঙ্কট হইতে আমাকে বাঁচাও। পাপের চিত্র আমি আঁকিতে পারিব না—অথচ গৃহিণীকেও চটাইতে পারিব না। দয়াময়, দয়া কর।"

ভগবান যেন স্বকর্ণে শুনিলেন।

দুই মিনিটে সব ঠিক হইয়া গেল।

ভূমিকম্প হইয়া যাইবার পর স্থূলকলেবর ভৌমিক মহাশয় আবিষ্কার করিলেন যে, তাঁহার গৃহিণীর আর মুগার শাড়ীর দরকার নাই।

কারণ তিনি বিধবা হইয়াছেন!

যুগ স্বপ্ন

১

সুধীর আসিয়াছে। তাহার হাতে একটা ফুল-সুদ্ধ রজনীগন্ধার ডাঁটা। চোখে মুখে হাসি। তাহার সমস্ত মন যেন পাখা মেলিয়া উড়িতে চাহিতেছে।

সুধীর আসিয়াই বলিল—"হাসি, আজ একটা ভারি সুখবর আছে। কি দেবে বল—তা না হলে বলব না।"

হাসি বলিল—"বলুন না কি।"

"কি দেবে বল আমাকে—"

"কি আর দিতে পারি আমি?—আচ্ছা, আপনার রুমালে একটা বেশ সুন্দর এম্‌ব্রয়ডারী করে দেব। চমৎকার প্যাটার্ণ পেয়েছি একটা।"

"না, ওতে আমি রাজি নই।"

"তবে কি চাই আপনার? চকোলেট আছে দিতে পারি।"

"আমি কি কচি খোকা নাকি? চকোলেটে তুষ্ট হব!"

হাসি হাসিয়া ফেলিল। বলিল—"তা'হলে শুনতে চাই না যান।

এমব্রয়ডারী করে দেব বললাম, চকোলেট দিতে চাইলাম—তাতে যখন আপনার—"

সুধীর বলিল—"চললাম তাহলে !"

হাসি আবার ডাকিল—"বল্‌বেন না কিছুতে ?"

"একটি জিনিস পেলে বলতে পারি। সেই যে সেদিন যা চেয়েছিলাম"—বলিয়া সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে হাসির পানে চাহিয়া হাসিল।

হাসি হঠাৎ লজ্জা পাইয়া সামলাইয়া লইল।

বলিল—"আপনাকে বলেছি—তা হয় না।"

কিন্তু সুধীরের মুখের দিকে চাহিয়া সে ভয় পাইল। সে শুনিল সুধীর বলিতেছে—"মনে করেছিলাম খবরটা খুব লঘু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করব। কিন্তু পারলাম না। মাপ কোরো আমায়। শুনে এলাম তোমার বিয়ে সাঁতরাগাছিতে সেই পাত্রটির সঙ্গে ঠিক হোয়ে গেছে।"

বলিয়া সুধীর চলিয়া গেল।

হাসি ডাকিল—"সুধীর দা—শুনে যান।"

সুধীর ফিরিয়া আসে নাই।

২

অলকা আসিয়াছে।

সেই অলকা, যাহাকে একবার দেখিবার জন্য অজয় সমস্ত দিন অপেক্ষা করিত—কখন সন্ধ্যাবেলায় সে আসিবে।

অলকা আসিয়া বলিতেছে—'আচ্ছা, অজয়দা—ইংরিজিতে 'পেট' বলে কোন কথা আছে নাকি ?"

অজয় বলিল—হ্যাঁ আছে, 'পেট' মানে মাথা।"

"সত্যি ?"

"অভিধান খুলে দেখ। পেট মানে মাথা !"

"আমাদের বরুণাদি তাহলে ঠিক বলেছেন ত !"

অজয় বলিল—"আচ্ছা, মুণ্ডুর ইংরিজি কি বল ত ?"

অলকা মিটি মিটি তাকাইয়া বলিল—"হেড !"

"হেড মানে ত 'মাথা'"—

"মুণ্ডু মানেও ত মাথা—"

অজয় হাসিয়া বলিল—"এই বুঝি তোমার বাংলা ভাষায় জ্ঞান ! "মাথা আর মুণ্ডু বুঝি একই বস্তু !"

অলকা হাসিয়া বলিল—"তফাৎ কি ?"

অজয় গম্ভীর ভাবে বলিল—"তোমার সঙ্গে আর ওই পাঁচি ধোপানিটার সঙ্গে কোন তফাৎ নেই তাহলে বল ! দুজনেই ত মেয়ে মানুষ !"

অলকা জিজ্ঞাসা করিল—"পাঁচি ধোপানিটা কে ?"

"ওই যে তোমাদের গলিটার মোড়ে একজন ধোপার মেয়ে আছে। কম বয়স—তোমার বয়সী হবে !"

অলকা বক্র হাসি হাসিয়া কহিল—"আজকাল অজয়দা দেখছি সমস্ত জিনিসই বেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে আরম্ভ করেছেন ! ধোপানী পর্য্যন্ত বাদ পড়ে না।"

অজয় বলিল—নিশ্চয় ! নিজের জিনিসটি যে ভাল, সেটা যাচাই করে দেখে নিতে হবে না ?"

"কে আপনার নিজের জিনিস।"

"আছে একজন—"

অলকা হঠাৎ অন্যমনস্ক হইয়া পাশের টেবিলটা গুছাইতে লাগিল।

অজয় জানালা দিয়া অকারণে বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল।

*　　*　　*　　*

দুইটী স্বপ্ন দুইজনে দেখিতেছে!

অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে দুইজন পাশাপাশি শুইয়া আছে।

হাসির হাতখানা অজয়ের বুকের উপর।

হাসি ও অজয়—স্বামী স্ত্রী।

ভিতর ও বাহির

আমাদের মন সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ বাহিরের—অন্য ভাগ ভিতরের। মনের যেদিকটা বাহিরের তাহা ভদ্র, তাহা সামাজিক এবং সভ্য। ভিতরের মনটা কিন্তু সব সময়ে সভ্য ও সামাজিক নয়—তাহার চাল-চলন চিন্তা-প্রণালী বিচিত্র। বাহিরের মনের কার্য্যকলাপ দেখিয়া ভিতরের মন কখনও হাসে, কখনও কাঁদে এবং ক্বচিৎ সায় দেয়। দুই ভাগের কলহও নিত্যনৈমিত্তিক।

রামকিশোরবাবুর ভিতরের মনটা বহুকালাবধি মৃতপ্রায়। বাহিরের মনের অত্যাচারে সেটাকে জরজর করিয়া ফেলিয়াছিল। রামকিশোর-বাবু উকীল। খুনীকে বাঁচাইবার জন্য মিথ্যা-সাক্ষী সৃষ্টি করিবার প্রয়াস, বড়লোক জমিদারের হইয়া গরীব প্রজার সর্ব্বনাশসাধন, জাল উইল সৃষ্টির পরামর্শদান ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার কার্য্যেই তিনিই বাহিরের ব্যবহারিক মনটার সাহায্য লইয়াছিলেন। ভিতরের মনটা প্রথম প্রথম তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক অনর্থ সৃষ্টি করিয়াছিল—আজকাল আর সে কিছু করে না।

সেদিন সকালে রামকিশোরবাবু তাঁহার কেশবিরল মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বাগানে ভ্রমণ করিতেছিলেন। এক জন বিধবার

সম্পত্তিঘটিত একটা মামলায় তাঁহাকে কিছুকাল যাবৎ বিব্রত করিতেছে। আজ কেসটা কোর্টে উঠিবে—সেজন্য তিনি একটু উদ্বিগ্ন, অন্যমনস্ক আছেন।

এমন সময় আর এক জন প্রৌঢ়গোছের ভদ্রলোক আসিয়া নমস্কার করিয়া বলিলেন যে, তিনি কোন বিষয়ের পরামর্শ লইতে চাহেন। রামকিশোরবাবু ভদ্রলোককে চিনিতেন না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলিলেন, "আইন-সংক্রান্ত কোন পরামর্শ দিতে হ'লে আমি 'ফী' নিয়ে থাকি তা জানেন ত ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ—কত দিতে হবে আপনাকে ?"

"বত্রিশ টাকা।"

"আচ্ছা, বেশ—।"

উভয়ে বৈঠকখানায় গিয়া বসিলেন।

আগন্তুক বলিলেন, "আমার একজন আত্মীয় আছেন—তাঁর একমাত্র ছেলের বিবাহ হয়েছে আজ প্রায় দশ বৎসর। সন্তানাদি আজও কিছু হয় নি। সম্ভাবনাও কম।"

"ডাক্তার দেখিয়েছিলেন ?"

"হ্যাঁ, তাঁদেরও মত যে ছেলেপিলে হওয়া শক্ত।"

"ছেলেটি বেশ স্বাস্থ্যবান ত ?"

হ্যাঁ, ছেলের কোন রোগ নেই।"

"আমার কাছে কোন্ বিষয়ে পরামর্শ চান" বলিয়া রামকিশোর বাবু একটি নস্যদানি হইতে এক টিপ্ নস্য গ্রহণ করিলেন।

"এ সম্বন্ধে আপনার কাছে শুধু এইটুকু জান্তে আসা যে, যদি বংশ লোপই পায়, তাহ'লে শেষ-পর্য্যন্ত সম্পত্তিটা কারা পাবে ?"

নস্যের টিপ্‌টা নাসারন্ধ্রে টানিয়া লইয়া রামকিশোরবাবু বলিলেন,

"ছেলে যখন স্বাস্থ্যবান, তখন সে আবার স্বচ্ছন্দে বিয়ে করতে পারে। হিন্দু ল' অনুসারে তাতে কোন বাধা নেই।"

"তা ত নেই! কিন্তু আইনের বাধা না থাক্‌লেও সবসময় কি সব-জিনিস করা সম্ভব?"

রামকিশোরবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন, "সেন্টিমেণ্ট অনুসারে চললে কি আর দুনিয়ায় চলা যায় মশাই। ওই সব বাজে সেন্টিমেণ্ট নিয়েই ত আমরা ডুব্‌তে বসেছি!"

রামকিশোরবাবু সেন্টিমেণ্টের অপকারিতা সম্বন্ধে নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা দিলেন। বাহিরের মন তাঁহার যুক্তি ও কথা জোগাইল। ভিতরের মন নির্ব্বাক।

আগন্তুক তখন বলিলেন, "ধরুন যদি ওঁরা ছেলের বিয়ে আর না দেন তা'হলে সম্পত্তি কারা পাবে?"

আইন-অনুযায়ী যাহারা যাহারা উত্তরাধিকারী হইতে পারে—রামকিশোরবাবু তাহা গড়গড় করিয়া বলিয়া গেলেন।

পরিশেষে তাঁহার স্বকীয় মতটা পুনরায় তিনি বলিতে ছাড়িলেন না;—"ছেলের আবার বিয়ে দিন মশাই। বাঁজা বউ নিয়ে সংসারে সুখ হয় কি? ছেলেপিলে না থাকলে সংসার ত শ্মশান! আমি মশাই যেটা উচিত মনে করছি, তাই আপনাদের বল্‌লাম—আপনার সেন্টিমেণ্টে যদি আঘাত লেগে থাকে মাপ করবেন।"

আগন্তুক বলিলেন, "না না—কিছুমাত্র না। আপনি স্পষ্টবাদী লোক এবং মক্কেলের ঠিক সত্যিকার হিতৈষী—এই শুনেছি বলেই ত আপনার কাছে আসা!"

বত্রিশ টাকা ফী দিয়া ভদ্রলোক বিদায় লইলেন।

চার-পাঁচদিন পরে একদিন একটি গাড়ী আসিয়া রামকিশোরবাবুর

বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল। গাড়ী হইতে একটি অল্পবয়সী স্ত্রীলোক নামিয়া ভিতরে চলিয়া গেলেন।

রামকিশোরবাবু বিপত্নীক। বাড়ীতে ঠাকুর-চাকরের সংসার। দ্বিপ্রহরে বিশেষ কেহ নাই—একটা ছোঁড়া চাকর মাত্র আছে। রামকিশোরবাবু কোর্টে। ছোঁড়া চাকরটা ট্রাঙ্ক বিছানা প্রভৃতি নামাইয়া ভিতরে লইয়া গেল। ট্রাঙ্কের উপর নাম লেখা—"সরোজিনী দেবী।"

ব্যবহারে বোঝা গেল, ছোঁড়া-চাকরটা সরোজিনী দেবীকে চেনে না। তা ছাড়া তরুণীটির ব্যবহারে সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

সরোজিনী ভিতরে বারান্দায় গিয়া বাক্স-বিছানা রাখিয়া চাকরটাকে একবার জিজ্ঞাসা করিল, "বাবু কোথায়?"

"কাছারীতে।"

"কখন আসবেন?"

"জানি না।"

তিনি বারান্দায় নিজের বাক্সটার উপর বসিয়া রহিলেন। বিষাদের প্রতিমা।

* * *

রামকিশোরবাবু কোর্ট হইতে ফিরিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন, "এ কি সরি, তুই হঠাৎ খবর না দিয়ে এলি যে!"

"ও বাড়ীতে থাকা আর পোষাবে না!"

"কেন? ব্যাপার কি?"

রামকিশোরবাবু কন্যার ব্যবহারে ক্রমশই বিস্মিত হইতেছিলেন।

"পোষাবে না, মানে?"

"ওরা ছেলের আবার বিয়ে দিচ্ছে। তুমিও ত মত দিয়েছ!"

"আমি মত দিয়েছি,—মানে ?—"

"ওরা এক জন অচেনা লোক তোমার কাছে পাঠিয়ে তোমার ঠিক মতটা জেনে নিয়ে গেছে। তুমি নাকি বলেছ—ছেলের বিয়ে দেওয়াই ভাল—"

রামকিশোরের নেপথ্যবাসী ভিতরের মনটা তখন বাহিরের মনের টুঁটি চাপিয়া ধরিয়াছে।

হতবাক্ রামকিশোর তাঁহার একমাত্র কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে চাহিয়া রহিলেন।

সরোজিনী জিজ্ঞাসা করিল, "সত্যি তুমি বলেছ, বাবা ?"

সুলেখার ক্রন্দন

সুলেখা কাঁদিতেছে।

গভীর রাত্রি—বাহিরে জ্যোৎস্নায় ফিনিক্ ফুটিতেছে। এই স্বপ্নময় আবেষ্টনীর মধ্যে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় উপুড় হইয়া শুইয়া ষোড়শী তন্বী সুলেখা অঝোরে কাঁদিতেছে। একা।—ঘরে আর কেহ নাই। চুরি করিয়া এক ফালি জ্যোৎস্না জানালা দিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। প্রবেশ করিয়া এই ব্যথাতুরা অশ্রুমুখী রূপসীকে দেখিয়া সে যেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কেন এ ক্রন্দন ?

প্রেম ? হইতে পারে বই কি ? এই জ্যোৎস্না-পুলকিতা যামিনীতে সুন্দরী ষোড়শীর নয়ন-পল্লবে অশ্রুসঞ্চারের কারণ প্রেম হইতে

পারে। সুলেখার জীবনে প্রেম একবার আসি-আসি করিয়াছিল ত! তখনও তাহার বিবাহ হয় নাই। অরুণ দা নামক যুবকটিকে সে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। অতীব সঙ্গোপনে এবং মনে মনে। এই শ্রদ্ধাই স্বাভাবিকনিয়মে প্রেমেপরিণত হইতে পারিত—কিন্তু সামাজিক নিয়ম তাহাতে বাধা দিল। সামাজিক নিয়ম অনুসারে অরুণ-দা নয়, বিপিন নামক জনৈক ব্যক্তির লোমশ গলদেশে সুলেখা বরমাল্য অর্পণ করিল!

হয়ত এই গভীর রাত্রিতে জ্যোৎস্নার আবেশে সেই অরুণ-দা'কেই তাহার বার-বার মনে পড়িতেছে। নির্জ্জন শয্যায় তাহারই স্মরণে হয়ত এই অশ্রু-তর্পণ! তবে ইহাও ঠিক যে, তাহার গোপন হৃদয়ের ভীরু বার্ত্তাটি সে অরুণ-দা'কে কখনও জানায় নাই। মনে মনে তাহার যে আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিয়াছিল, বিবাহের পর তাহা ধীরে ধীরে কালের অমোঘ নিয়মানুসারে আপনিই নিবিয়া গিয়াছে।

বিপিন যদিও অরুণ-দা নয় কিন্তু বিপিন,—বিপিন।—একেবারে খাঁটি বিপিন! এবং আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও ইহা সত্য কথা যে, বিপিনের বিপিনত্বকে সুলেখা ভালও বাসিয়াছিল। ভালবাসিয়া সুখীও হইয়াছিল। সহসা আজ নিশীথে সেই বিস্মৃত-প্রায় অরুণ-দা'কে মনে পড়িয়া আঁখিপল্লব সজল হইয়া উঠিবে, সুলেখার মন কি এতটা অতীত-প্রবণ?

হইতে পারে। নারীর মন বিচিত্র। তাহাদের মনস্তত্ত্বও অদ্ভুত! সে সম্বন্ধে চট্ করিয়া কোন মন্তব্য করা উচিত মনে করি না! বস্তুতঃ স্ত্রী-জাতির সম্বন্ধে কোন কিছু মন্তব্য করাই দুঃসাহসের কার্য্য। যে রমণীকে দেখিয়া মনে হয় বয়স বোধ হয় উনিশ কুড়ি—অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহার বয়স পঁয়ত্রিশ। এতদনুসারে সাবধানতা অবলম্বন করিয়া পুনরায় কাহারও বয়স যখন অনুমান করিলাম পঁচিশ

—প্রমাণিত হইয়া গেল তাহার বয়ঃক্রম পনর বৎসরের এক মিনিটও অধিক নয়।

সুতরাং নারী-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে বেকুবের মত ফস্ করিয়া কিছু-একটা বলিয়া বসা ঠিক নয়। সর্ব্বদাই ভদ্রভাবে ইতস্ততঃ করা সঙ্গত। ইহাই সার বুঝিয়াছি এবং সেই জন্যই সুলেখার ক্রন্দন সম্বন্ধে সহসা কিছু বলিব না। কারণ আমি জানি না। এই ক্রন্দনের শোভন ও সঙ্গত কারণ যতগুলি হওয়া সম্ভব তাহাই বিবৃত করিতেছি।

গভীর রাত্রে একা ঘরে একটি যুবতী শয্যায় শুইয়া ক্রমাগত কাঁদিয়া চলিয়াছে—ইহা একটি ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের প্রথম পরিচ্ছেদের বিষয়ও হইতে পারে। কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, তাহা নয়। পাঠক-পাঠিকাগণ এ-বিষয়ে অন্তত নিশ্চিন্ত হউন। বিপিন এবং সুলেখাকে যত দূর জানি তাহাতে তাহাদের ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা হইবার মত যোগ্যতা আছে বলিয়া মনে হয় না।

অরুণ-দা'র কথা ছাড়িয়া দিলে সুলেখার ক্রন্দনের আর একটি সম্ভাবনার কথা মনে হইতেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে সুলেখার একটি সন্তান হইয়াছিল। তাহার প্রথম সন্তান্। সেটি হঠাৎ মাস-দুই পূর্ব্বে ডিপথিরিয়াতে মারা গিয়াছে। হইতে পারে সেই শিশুর মুখখানি সুলেখার জননী হৃদয়কে কাঁদাইতেছে। শিশুটির মৃত্যুর পর সুলেখার দুই দিন 'ফিট্' হয়—ইহা ত আমরা বিশ্বস্তসূত্রে জানি। চিরকালের জন্য যাহা হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে ক্ষণিকের জন্যও ফিরিয়া পাইবার আকুলতা কঠোর পুরুষের মনেও মাঝে মাঝে হয়। কোমল হৃদয়া রমণীর অন্তঃকরণে তাহা হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। ক্রন্দনের কারণ পুত্রশোক হইতে পারে। অবশ্যই হইতে পারে।

কিন্তু হ্যাঁ,—আর একটা কারণও ত হইতে পারে। পুত্রশোক-

প্রসঙ্গের পর এই কথাটি বলিতেছি বলিয়া আমাকে আপনারা ক্ষমা করুন—কিন্তু সুলেখার ক্রন্দনের এই তুচ্ছ সম্ভাবনাটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। বিগত কয়েক দিবস হইতে এক নামজাদা ছবি স্থানীয় সিনেমা হাউসে দেখান হইতেছে। পাড়ার যাবতীয় নর-নারী সদলবলে গিয়া ছবিটি দেখিয়া আসিয়াছেন এবং উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। কিন্তু বিপিন লোকটি এমনই বেরসিক যে, সুলেখার বারম্বার অনুরোধ সত্ত্বেও সে সুলেখাকে উক্ত ছবি দেখাইতে লইয়া যায় নাই। প্রাঞ্জল ভাষায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সুলেখার যাহা ভাল লাগে প্রায়ই দেখা যায় বিপিনের তাহাতে রাগ হয়। আশ্চর্য্য লোক এই বিপিন। কিছুক্ষণ আগেই সিনেমার "লাস্‌ট শো" হইয়া গিয়াছে। সুলেখার শয়নঘরের বাতায়নের নীচে দিয়াই সিনেমাতে যাইবার পথ। দর্শকের দল খানিকক্ষণ আগেই এই রাস্তা দিয়া সোল্লাসে হল্লা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিল। হয়ত তাহাতেই সুলেখার সিনেমা শোক উথলিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে একা কেন? বিপিন কোথায়। সে কি বেগতিক দেখিয়া এই গভীর রাত্রেই কল্যকার জন্য "সিট্ বুক" করিতে গিয়াছে?

হইতে পারে! তরুণী পত্নীকে শান্ত করিবার জন্য মানুষ সব করিতে পারে। হোক্ না বিপিন লোমশ—সে মানুষ ত। তাহা ছাড়া বিপিন সুলেখাকে সত্যই ভালবাসিত—ইহাও আমরা বিশ্বস্ত-সূত্রে অবগত আছি। কারণ আমরা—লেখকরা—অনেক কথাই বিশ্বস্তসূত্রে অবগত থাকি। সুতরাং এই ক্রন্দন সিনেমা-ঘটিত হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে।

সবই হওয়া সম্ভব। বাস্তবিক যতই ভাবিতেছি ততই আমার বিশ্বাস হইতেছে সুলেখার ক্রন্দনের হেতু সবই হইতে পারে। এমন

কি আজই সন্ধ্যাকালে সামান্য একটা কাপড়ের পাড় পছন্দ-করা প্রসঙ্গে সুলেখার সহিত বিপিনের সাংঘাতিক মতভেদ হইয়া গিয়াছে। রূঢ়ভাষী পুরুষ-মানুষেরা সাধারণতঃ যাহা করে বিপিন তাহাই করিয়াছে। গলার জোরে অর্থাৎ চীৎকার করিয়া জিতিয়াছে। মৃদু-ভাষিণী তরুণীগণ সাধারণতঃ যে উপায়ে জিতিয়া থাকেন সুলেখা সম্ভবতঃ তাহাই অবলম্বন করিয়াছে—অর্থাৎ কাঁদিতেছে!

কারণ যাহাই হউক ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে করুণ! রাত্রি গভীর এবং জ্যোৎস্না মনোহারিণী হওয়াতে আরও করুণ,—অর্থাৎ করুণতর। কোন সহৃদয় পাঠক কিংবা পাঠিকা যদি ইহাকে করুণতমও বলেন তাহা হইলেও আমার প্রতিবাদ করিবার কিছু থাকিবে না। কারণ সুলেখা তরুণী। রাত্রি যতই নিবিড় এবং জ্যোৎস্না যতই আকাশ-প্লাবিনী হউক না কেন এ-বিষয়ে খুব সম্ভবতঃ আমরা একমত যে এই রাত-দুপুরে একটা বালক কিংবা একটা বুড়ী কাঁদিলে আমরা এতটা আর্দ্র হইতাম না। উপরন্তু হয়ত বিরক্তই হইতাম।

সুলেখা কিন্তু তরুণী। মন সুতরাং দ্রব হইয়াছে এবং একথাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সুলেখার ক্রন্দনের কারণ না-নির্ণয় করা পর্য্যন্ত স্বস্তি পাইতেছি না। এমন কি অরুণ-দা'কে জড়াইয়া একটা সস্তা-গোছের কাব্য করিতেও মন উৎসুক হইয়া উঠিয়াছে। মন বলিতেছে, "কেন নয়? এমন চাঁদনী-রাতে কৈশোরের সেই অর্দ্ধ-প্রস্ফুটিত প্রণয়-প্রসূত সহসা পূর্ণ-প্রস্ফুটিত হইতে পারে নাকি? ওই ত দূরে 'চোখ গেল' পাখী অশ্রান্ত সুরে ডাকিয়া চলিয়াছে। সম্মুখের বাগানে রজনীগন্ধাগুলি স্বপ্ন-বিহ্বল—চতুর্দ্দিকে জোৎস্নার পাথার! এমন দুর্লভক্ষণে অরুণ-দা'র কথা মনে হওয়া কি অসম্ভব, না অপরাধ?" মনের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া কপাটটা হঠাৎ খুলিয়া গেল।

ব্যস্ত সমস্ত বিপিন প্রবেশ করিল। মুখে শঙ্কার ছায়া। সিনেমার টিকিট পায় নাই সম্ভবতঃ। কিন্তু এ কি!

বিপিন জিজ্ঞাসা করিল—"দাঁতের ব্যথাটা কমেছে?"

"না! বড্ড কনকন্ করছে।"

"এই পুরিয়াটা খাও তাহ'লে। ডাক্তার বাবু কাল সকালে আসবেন বললেন। কেঁদে আর কি হবে। এটা খেলেই সেরে যাবে। খাও লক্ষ্মীটি!—"

জোৎস্নার টুক্‌রাটি মুচকি মুচকি হাসিতেছে।

দেখিলেন ত? বলিয়াছিলাম—সবই সম্ভব।

বুধ্‌নী

১

জীবনের সহিত যদি প্রদীপের উপমাটা দেওয়া যায় তাহা হইলে বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপের তৈল নিঃশেষপ্রায় হইয়াছে—একথা কিছুতেই বলা চলিবে না। কারণ বিল্‌টুর জীবন-প্রদীপে তৈল পূরাই আছে, সলিতাও ঠিক আছে, শিখাও উজ্জ্বলভাবে জ্বলিতেছে। কিন্তু সে শিখা নিবিবে। একটি সবল ফুৎকারে তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হইবে। কাল তাহার ফাঁসি!

সে দোষী কি নির্দ্দোষ সে আলোচনা আমাদের অধিকারের বহির্ভূত। আইনের চক্ষে সে দোষী প্রমাণিত হইয়াছে এবং সমাজের মঙ্গলার্থে তাহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। হয়ত তাহাকে লইয়া

মাথাই ঘামাইতাম না, যদি সেদিন জেলখানায় বেড়াইতে গিয়া তাহার আর্ত্ত-করুণ চীৎকার না শুনিতাম।

"বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী।" ভীত মিনতিভরা কণ্ঠে সে ক্রমাগত চেঁচাইয়া চলিয়াছে। বুধ্‌নী তাহার স্ত্রীর নাম।

২

হাজারীবাগের পার্ব্বত্য প্রদেশে ইহাদের বাস। এই পার্ব্বত্য পল্লীতেই একদা ধনুকধারী বিল্‌টু শিকার সন্ধান করিতে করিতে বুধ্‌নীর দেখা পায় এক মহুয়া গাছের তলায়। নিকষ-কৃষ্ণাঙ্গী কিশোরী বুধ্‌নী। সভ্য কোন যুবক আলো-ছায়া খচিত মহুয়া তরুতলে কোন কিশোরীকে দেখিলে যে ঔদাসীন্য ভরে চলিয়া যাইত, বিল্‌টু তাহা করে নাই। বন্য পশুর মত সে তাহাকে তাড়া করিয়াছিল। ত্রস্ত হরিণীর মত দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া বুধ্‌নী নিস্তার পায়। তখনকার মত নিস্তার পাইল বটে কিন্তু বিল্‌টু তাহাকে স্বস্তি দিল না। অসভ্যটা তাহাকে দেখিলেই তাড়া করিত।

৩

তাহার পর সেই বাঞ্ছিত দিবস আসিল।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের এক বিচিত্র প্রথা প্রচলিত ছিল। মাঝে মাঝে প্রভাতে বিস্তীর্ণ মাঠে ইহাদের সভা বসিত। সেই সভায় কুমার এবং কুমারীগণের সমাগম হইত। একটা পাত্রে খানিকটা সিঁদূর গোলা থাকিত। কোন অবিবাহিত যুবক কোন কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে তাহাকে সেই কুমারীর কপালে ওই সিঁদূর লাগাইয়া দিতে হইত। সিঁদূর লাগাইলেই কিন্তু যুবকের প্রাণ-সংশয়। সেই কুমারীর আত্মীয়স্বজন তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ, সড়্‌কি, বল্লম লইয়া যুবাকে তাড়া করিবে এবং যুবা

যদি আত্মরক্ষা করিতে না পারে—মৃত্যু সুনিশ্চিত। কিন্তু সে যদি সমস্তদিন আত্মরক্ষা করিতে পারে তাহা হইলে সূর্য্যাস্তের পর আত্মীয়-স্বজনেরা মহা আনন্দে মাদল বাঁশী বাজাইয়া কলরব করিতে করিতে কন্যাকে বরের গৃহে পৌঁছাইয়া দিবে।

এই শক্তি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বিল্‌টু বুধ্‌নীকে জয় করিয়াছিল। এই ত সেদিনের কথা। এখনও দুই বৎসর পূরা হয় নাই।

৪

অসভ্য বিল্‌টু জংলি বুধ্‌নীকে পাইয়া কি ভাষায় কোন্ ভঙ্গীতে তাহার প্রণয় প্রকাশ করিয়াছিল তাহা আমি জানি না। কল্পনা করাও আমার পক্ষে শক্ত। আমি ড্রইংরুম-বিহারী সভ্য লোক, বর্ব্বর বন্য-দম্পতীর আদবকায়দা আমার জানা নাই! যাহারা গুহা-নিবাসী সুপ্ত শার্দ্দুলকে ভল্লের আঘাতে হনন করে, মৃগের সঙ্গে ছুটিয়া পাল্লা দেয়, উত্তুঙ্গ পাহাড়ে অহরহ অবলীলাক্রমে ওঠে নামে, পূর্ণিমা নিশীথে মহুয়ার মদে আনন্দের স্রোত বহাইয়া দেয়—তাহাদের প্রণয়লীলা কল্পনা করার দুঃসাহস আমার নাই।

শুধু এইটুকু জানি বিবাহের পর বিল্টু বুধ্‌নীকে একদণ্ড ছাড়ে নাই! এক দণ্ডও নয়। বনে জঙ্গলে পর্ব্বতে গুহায় এই বর্ব্বর-দম্পতী অর্দ্ধনগ্ন দেহে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। বুধ্‌নীর খোঁপায় টকটকে লাল পলাশ ফুল—বিল্‌টুর হাতে বাঁশের বাঁশী। এই সম্বল!

৫

সহসা একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল !

বুধ্‌নী এক সন্তান প্রসব করিল। অসহায় ক্ষুদ্র এক মানবশিশু ! বুধ্‌নীর সে কি আনন্দ ! বর্ব্বর জননীরও মাতৃত্ব আছে, তাহারও অন্তরের সন্তান-লিপ্সা স্নেহময়ী জননীর কল্যাণী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। নারীত্বের ধাপে পা রাখিয়া বুধ্‌নী মাতৃত্বলোকে উত্তীর্ণ হইয়া গেল ! বিল্‌টু দেখিল—একি। বুধ্‌নীকে দখল করিয়া বসিয়াছে এই শিশুটা ! বুধ্‌নী ত তাহার আর একার নাই ! অসহ্য !

৬

বিলটুর ফাঁসি দেখিতে গিয়াছিলাম। সে মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত চীৎকার করিয়া গেল—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী—বুধ্‌নী। ভগবানের নামটা পর্য্যন্ত করিল না।

নৃশংস শিশু-হত্যাকারীর প্রতি কাহারও সহানুভূতি হইল না !

মানুষের মন

নরেশ ও পরেশ। দুইজনে সহোদর ভাই। কিন্তু এক বৃন্তে দুইটি ফুল—এ উপমা ইহাদের সম্বন্ধে খাটে না। আকৃতি ও প্রকৃতি—উভয় দিক দিয়াই ইহাদের মিলের অপেক্ষা অমিলই বেশী। নরেশের চেহারার মোটামুটি বর্ণনাটা এইরূপ—শ্যাম বর্ণ, দীর্ঘ দেহ, খোঁচা খোঁচা চিরুণী সম্পর্ক বিরহিত চুল, গোলাকার মুখ এবং সেই মুখে একজোড়া বুদ্ধিদীপ্ত চক্ষু, একজোড়া নেউলের লেজের মত পুষ্ট গোঁফ এবং একটি সূক্ষ্মাগ্র শুকচঞ্চু নাসা।

পরেশ খর্ব্বাকৃতি, ফরসা, মাথার কোঁকড়ান কেশদাম বাবরি আকারে সুসজ্জিত। মুখটি একটু লম্বা-গোছের, নাকটি থ্যাবড়া। চক্ষু দুইটিতে কেমন যেন একটা তন্ময় ভাব। গোঁফদাড়ি কামানো। গলায় কণ্ঠি। কপালে চন্দন।

মনের দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় যে, দুইজনেই গোঁড়া। একজন গোঁড়া বৈজ্ঞানিক এবং আর একজন গোঁড়া বৈষ্ণব। অত্যন্ত নিষ্ঠাসহকারে নরেশ জ্ঞানমার্গ এবং পরেশ ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়াছেন।

যখন নরেশের কম্‌বাইন্‌ড হ্যাণ্ড' চাকর নরেশের জন্য 'ফাউল কাট্‌লেট' বানাইতে ব্যস্ত এবং নরেশ 'থিওরি অফ্ রিলেটিভিটি' লইয়া উন্মত্ত তখন সেই একই বাড়ীতে পরেশ স্বপাক নিরামিষ আহার করিয়া যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে মগ্ন। ইহা প্রায়ই দেখা যাইত।

তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে, উভয়ে সর্ব্বদা লাঠালাঠি করিতেন ; মোটেই তা নয়। ইহাদের কলহ মোটেই নাই। তাহার সুস্পষ্ট

কারণ বোধ হয় এই যে, অর্থের দিক দিয়া কেহ কাহারও মুখাপেক্ষী নন।

উভয়েই এম্-এ পাস—নরেশ কেমিষ্ট্রিতে এবং পরেশ সংস্কৃতে। উভয়েই কলেজের প্রোফেসারি করিয়া মোটা বেতন পান। মরিবার পূর্ব্বে পিতা দুইজনকেই সমান ভাগে নগদ টাকাও কিছু দিয়া গিয়াছিলেন। যে বাড়ীতে ইঁহারা বাস করিতেছেন—ইহাও পৈতৃক সম্পত্তি। বাড়ীটি বেশ বড়। এত বড় যে, ইহাতে দুইতিনটি পরিবার পুত্র-পৌত্রাদি লইয়া বেশ স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। কিন্তু নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই পরিবারহীন। নরেশ বিবাহ করিয়াছিলেন। কিন্তু বিবাহের কিছুদিন পরেই পত্নী ইহলোক ত্যাগ করাতে তাঁহার এবং পরেশের মনে পৃথিবীর অনিত্যতা সম্বন্ধে এমন একটা উপলব্ধি আসিল যে, কেহই আর বিবাহ করিলেন না। পরেশ ভাবিলেন—'কা তব কান্তা'—ইহাই সত্য। 'রিলেটিভিটির ছাত্র নরেশ ভাবিতে লাগিলেন··· নির্ম্মলা সত্যই কি মরিয়াছে ? আমি দেখিতে পাইতেছি না—এইমাত্র!

সুতরাং নরেশ এবং পরেশ সহোদর হওয়া সত্ত্বেও ভিন্ন প্রকৃতির এবং ভিন্ন প্রকৃতির হওয়া সত্ত্বেও একই বাড়ীতে শান্তিতে বাস করেন।

এক বিষয়ে কিন্তু উভয়ের মিলও ছিল।

পল্টুকে উভয়ে ভালবাসিতেন। পল্টু তপেশের পুত্র। নরেশ এবং পরেশের ছোট ভাই তপেশ। এলাহাবাদে চাকুরি করিত। হঠাৎ এক-দিন কলেরা হইয়া তপেশ এবং তপেশের পত্নী মনোরমা মারা গেল। টেলিগ্রামে আহূত নরেশ এবং পরেশ গিয়া তাহাদের শেষ কথাগুলিমাত্র

শুনিবার অবসর পাইলেন। তাহার মর্ম্ম এই—"আমরা চলালাম। পল্টুকে তোমরা দেখো।" পল্টুকে লইয়া নরেশ এবং পরেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিলেন। তপেশের অংশে পৈতৃক কিছু টাকা ছিল। নরেশ তাহার অর্দ্ধাংশ পরেশের সন্তোষার্থে রামকৃষ্ণ মিশনে দিবার প্রস্তাব করিবামাত্রই পরেশ বলিলেন—"বাকী অর্দ্ধেকটা তাহলে বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে খরচ হোক্।" তাহাই হইল। পল্টুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহারা নিজেরা যখন কেহই সংসারী নহেন তখন পল্টুর আর ভাবনা কি?

পল্টু, নরেশ এবং পরেশ উভয়েরই নয়নের মণিরূপে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। নরেশ কিম্বা পরেশ কেহই নিজের মতবাদ পল্টুর উপর ফলাইতে যাইতেন না। পল্টুর যখন যাহা অভিরুচি সে তাহাই করিত। নরেশের সঙ্গে আহার করিতে করিতে যখন তাহার মুর্গী সম্বন্ধে মোহ কাটিয়া আসিত তখন সে পরেশের হবিষ্যান্নের দিকে কিছুদিন ঝুঁকিত। কয়েকদিন হবিষ্যান্ন ভোজনের পর আবার আমিষ-লোলুপতা জাগিলে নরেশের ভোজনশালায় ফিরিয়া যাইতেও তাহার বাধিত না।

নরেশ এবং পরেশ উভয়েই তাহাকে কোন নির্দ্দিষ্ট বাঁধনে বাঁধিতে চাহিতেন না—যদিও দুইজনেই মনে মনে আশা করিতেন যে বড় হইয়া পল্টু তাঁহার আদর্শকেই বরণ করিবে।

পল্টুর বয়স ষোল বৎসর। এইবার ম্যাট্রিক দিবে। সুন্দর স্বাস্থ্য—ধপধপে ফরসা গায়ের রঙ্—আয়ত চক্ষু। নরেশ এবং পরেশ দুইজনেই সর্ব্বান্তঃকরণে পল্টুকে ভালবাসিতেন। এ-বিষয়ে উভয়ের কিছুমাত্র অমিল ছিল না।

এই পল্টু একদিন অসুখে পড়িল।

নরেশ এবং পরেশ চিন্তিত হইলেন। নরেশ বৈজ্ঞানিক মানুষ; তিনি স্বভাবতঃই একজন এলোপ্যাথিক ডাক্তার লইয়া আসিলেন। পরেশ প্রথমটায় কিছু আপত্তি করেন নাই, কিন্তু যখন উপর্যুপরি সাত দিন কাটিয়া গেল, জ্বর ছাড়িল না তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। নরেশকে বলিলেন—"আমার মনে হয় একজন ভাল কবিরাজ ডেকে দেখালে কেমন হ'ত ?"

"বেশ দেখাও—"

কবিরাজ আসিলেন—সাত দিন চিকিৎসা করিলেন। জ্বর কমিল না, বরং বাড়িল। পল্টু প্রলাপ বকিতে লাগিল। অস্থির পরেশ তখন নরেশকে বলিলেন, "আচ্ছা, একজন জ্যোতিষীকে ডেকে ওর কুষ্টিটা দেখালে কেমন হয় ? কি বল ?"

"বেশ ত। তবে তাই কর, এ জ্বর একুশ দিনের আগে কমবে না। ডাক্তারবাবু বলেছিলেন—টাইফয়েড।"

"তাই না কি ?"

পল্টুর কোষ্ঠি লইয়া ব্যাকুল পরেশ জ্যোতিষীর বাড়ী ছুটিলেন। জ্যোতিষী কহিলেন—"মঙ্গল মারকেশ। তিনি রুষ্ট হইয়াছেন।" কি করিলে তিনি শান্ত হইবেন, তাহার একটা ফর্দ্দ দিলেন। পরেশ প্রবাল কিনিয়া পল্টুর হাতে বাঁধিয়া মঙ্গলের শান্তির জন্য শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাদি করিতে লাগিলেন।

অসুখ কিন্তু উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। নরেশ একদিন বলিলেন—"কবিরাজি ওষুধেত বিশেষ উপকার হচ্ছে না, ডাক্তারকেই আবার ডাকব না কি ?"

"তাই ডাক না হয়—"

নরেশ ডাক্তার ডাকিতে গেলেন। পরেশ পল্টুর মাথার শিয়রে

বসিয়া মাথায় জলপটি দিতে লাগিলেন। পল্টু প্রলাপ বকিতেছে—"মা আমাকে নিয়ে যাও। বাবা কোথায়।"

আতঙ্কে পরেশের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল। হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, তারকেশ্বরে গিয়া ধর্না দিলে শুনিয়াছি দৈব ঔষধ পাওয়া যায়। ঠিক।

নরেশ ফিরিয়া আসিতেই পরেশ বলিলেন—"আমি একবার তারকেশ্বর চল্লাম ফিরতে দু-এক দিন দেরী হবে।"

"হঠাৎ তারকেশ্বর কেন ?"

"বাবার কাছে ধর্না দেব—"

নরেশ কিছু বলিলেন না। ব্যস্তসমস্ত পরেশ বাহির হইয়া গেলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—"বড় খারাপ টার্ণ' নিয়েছে।

ডাক্তারি চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

দিন দুই পরে পরেশ ফিরিলেন। হস্তে একটি মাটির ভাঁড়। উল্লসিত হইয়া তিনি বলিলেন—"বাবার স্বপ্নাদেশ পেলাম। তিনি বললেন যে রোগীকে যেন ইন্জেক্শন দেওয়া না হয়। আর বললেন, এই চরণামৃত রোজ একবার করে খাইয়ে দিতে, তাহলেই সেরে যাবে।"

ডাক্তারবাবু আপত্তি করিলেন। নরেশও আপত্তি করিলেন। টাইফয়েড রোগীকে ফুলবেলপাতা পচা জল কিছুতেই খাওয়ান চলিতে পারে না।

হতবুদ্ধি পরেশ ভাণ্ডহস্তে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আসলে কিন্তু ব্যাপার দাঁড়াইল অন্যরূপ। পরেশের অগোচরে পল্টুকে ডাক্তারবাবু যথাবিধি ইন্জেক্শন দিতে লাগিলেন এবং ইহাদের অগোচরে পরেশ লুকাইয়া পল্টুকে প্রত্যহ একটু চরণামৃত পান করাইতে লাগিলেন।

কয়েকদিন চলিল। রোগের কিন্তু উপশম নাই

গভীর রাত্রি। হঠাৎ নরেশ পাশের ঘরে গিয়া পরেশকে জাগাইলেন। "ডাক্তারবাবুকে একবার খবর দেওয়া দরকার, পল্টু কেমন যেন করছে"

"অ্যাঁ, বল কি?"

পল্টুর তখন শ্বাস উঠিয়াছে।

উন্মাদের মত পরেশ ছুটিয়া নীচে নামিয়া গেলেন ডাক্তারকে 'ফোন' করিতে। তাঁহার গলার স্বর শোনা যাইতে লাগিল—

"হ্যালো—শুনছেন ডাক্তারবাবু, হ্যালো—হাঁ, হাঁ, আমার আর ইনজেকশন দিতে আপত্তি নেই—বুঝলেন—হ্যালো—বুঝলেন—আপত্তি নেই—আপনি ইনজেকশন নিয়ে শিগ্‌গির আসুন—আমার আপত্তি নেই, বুঝলেন—"

এদিকে নরেশ পাগলের মত চরণামৃতের ভাড়টা পাড়িয়া, চামচে করিয়া খানিকটা চরণামৃত লইয়া পল্টুকে সাধ্যসাধনা করিতেছেন—"পল্টু খাও—খাও ত বাবা—একবার খেয়ে নাও একটু—"

তাঁহার হাত থর থর করিয়া কাঁপিতেছে চরণামৃত কস বাহিয়া পড়িয়া গেল।

শেষ



বনফুল

রচনাবলী ০১